আহলে যিক্‌র-কে জিজ্ঞাসা করুন

ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

شبكة الفكر
alfeker.net

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

আহলে যিক্‌র-কে জিজ্ঞাসা করুন

মূল ঃ ***ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী***

ভাষান্তর ঃ ***ইরশাদ আহমেদ***

প্রকাশনায় ঃ ***হাউজা-এ-ইলমিয়া সাহেবুজ্জামান***
খালিশপুর, খুলনা। ফোন ঃ ০৪১-৭৬১১৭৬

প্রকাশকাল ঃ
১৩ই রজব ১৪২৮ হিজরী
২৯শে জুলাই ২০০৭ ইসায়ী
১৪ই শ্রাবন ১৪১৪ বাংলা

সংখ্যা ঃ ১০০০ টি

মূল্য ঃ **১০০ (একশত) টাকা মাত্র।**

==

Fasalu Ahluz Zikr

By: **Dr. Mohammad Tijani Samavi**

Translated By: **Ershad Ahmed**

Published By: **HAWZA-E-ILMIA SAHEBUZZMAN**

Khalishpur, Khulna. Ph: 041-761176

First Edition: **13th Rajab 1428, 29th July 2007, 14th Srabon 1414.**

Copy: **1000 Pice**

Price: **Taka 100.00 (One Hundred) Only.**

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★

আহলে যিক্‌র-কে জিজ্ঞাসা করুন

[ফাস্‌আলু আহলুজ যিক্‌র]

সূরা ঃ নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ৪৩

মূল ঃ ***ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী***

ভাষান্তর ঃ ***ইরশাদ আহমেদ***

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

পাকের ওয়াদা এবং তাঁর ওয়াদা পূরণ হবেই হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন **'উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে দিতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে।'** [১]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর বলেছেন ঃ **'যারা কুফর গ্রহণ করেছে তারা তাদের ধন-সম্পদ কেবল মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য খরচ করে এবং পরে এই বিষয় তাদের আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং অবশেষে পরাজিতও হবে আর যারা কুফর গ্রহণ করলো তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।**

অতএব ওলামায়ে দ্বীন, সুধী লেখক মন্ডলী এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় (যে অবস্থা তাদের সম্মুখে উপস্থিত) তারা যেন মানুষের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন এবং সেরাতে মুস্তাকীমের দিকে দিক নির্দেশনা দেন। যেহেতু আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ **"নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদিগকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারাই তাহারা যাহাদের তওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু"**। [২]

আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর হেদায়েত ও নিদর্শন সমুহ বর্ণনা করেই দিয়েছেন, তাহলে আলেমগন এই বিষয়ের উপর একমাত্র আল্লাহ্ এবং সত্যপক্ষ অবলম্বন করে মুখ খুলছেন না কেন, গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাচ্ছেন না কেন? আর আল্লাহ্ যখন তাঁর নেয়ামত সমুহকে পূর্নতা দান করে দিয়েছেন, রাসুল (সাঃ) তাঁর আমানত আদায় করেই দিয়েছেন এবং রিসালত প্রচারের দায়িত্ব সম্পন্ন করে গেছেন এবং উম্মতকে সমস্ত বিষয়ের বুঝ দিয়েই গেছেন, তাহলে এই ফেরকাবাজি, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেশ, একে অপরকে মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করার কারণ কি, আর একে অপরকে কাফের বলেই বা আখ্যায়িত করা হয় কেন?

এই স্থানে আমি কিছুক্ষন অপেক্ষা করে সমস্ত মুসলমানদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, নাজাত, ঐক্য, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রাপ্যতা, দু'টি মুল ভিত্তির (উসুল) উপর নির্ভরশীল ঃ একটি **'আল্লাহ্‌র কিতাব'** অপরটি ইতরাতে রাসুল (সাঃ) অথবা **'নাজাতের তরীর'** উপর আরোহন করলেই কেবল নাজাত হবে এবং ঐ তরী হলেন রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র বংশধর। আর এই কথাটি আমার আবিষ্কার নয়, বরং এটা পবিত্র কোরআনে আলাহ্ পাক ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজ মুসলমানদের এক প্লাটফর্মে জমায়েত হওয়ার জন্য দু'টি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঃ

---

১ সূরা সাফ্‌ফ ঃ ৮

২ সূরা বাকারা ঃ ১৫৯-১৬০

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

আম্মাবা'দ ঃ আমি মুসলমান চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন প্রস্তুত করেছি। বিশেষ করে আহলে সুন্নাতের আলেমগণের জন্য যাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে একমাত্র তারাই হলেন রাসুল (সাঃ)-এর সঠিক সুন্নাহ'র সাথে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয় বরং তারা তাদের বিপক্ষগণের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন খারাপ উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন।

বিভিন্ন ইসলামী দেশে সুন্নাতে মুহাম্মাদী (সাঃ)-কে রক্ষার নামে **'আনসারূস সুন্নাহ্'** ও **'আনসারূস সাহাবা'** এবং **'সীপাহ-এ-সাহাবা'** নামকরণ করে সংগঠনেরও জন্ম দেয়া হয়েছে এবং শিয়াদের কাফের সাব্যস্ত করা ও তাদের ইমামগণকে ঠাট্টা মশকরা করার জন্য বেশ কিছু বইও রচনা করা হয়েছে। আর এই চিন্তাধারাকে সমগ্র ইসলামী ও অইসলামী অঞ্চলে বিস্তৃত করার জন্য আন্তর্জাতিক ও আধুনিক প্রচার মাধ্যম গুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আজ মানুষের আলোচনার একমাত্র বিষয় বস্তু হচ্ছে শিয়া-সুন্নি সম্পর্ক।

অনেক অনুষ্ঠানে কিছু সত্য সন্ধানী ও কৃতি মুসলিম যুবকদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা শিয়াদের বাস্তবতা ও তাদের বিরোধিতার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকেন এবং শিয়াদের বিরুদ্ধে বই-পুস্তকে যেসব কথা পাঠ করে থাকেন এবং যা কিছু শুনে থাকেন তার মাঝে অনেক ব্যবধান অনুধাবন করেন। তারা জানেনই না যে সত্য কি? আমি কয়েকজনার সাথে আলোচনা করেছি এবং আমার লিখিত বই **'অবশেষে আমি সত্য পেলাম'** তাদের উপহার দিয়েছি। আলহামদূলিল্লাহ্, তাদের মধ্যে অনেকেই তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়ে 'সত্য' চিনতে পেরেছেন এবং হত্যের আনুগত্যও শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটি কেবলমাত্র তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া কষ্টকর বিষয় ছিল। কারণ তারা বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বেড়াজালে আবদ্ধ।

'অবশেষে আমি সত্য পেলাম' ও **'আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গি হয়ে গেলাম'** বই দু'টিতে সঠিক তথ্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল উপস্থাপন করা সত্যেও শিয়াদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রপাগান্ডা (ডলারের উপর ভর করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রচার) করা হচ্ছে তা'দ্বারা আত্ম রক্ষা সম্ভব নয়।

এতদসত্তেও এই হই-হট্টগোলের মাঝে সত্যের আহ্বান সাড়া জাগাবেই এবং অদূর্রবিষ্যতে এই গহীন অন্ধকারেও সত্যের আলো প্রস্ফুটিত হবেই। কারণ এটাই আল্লাহ্

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

আর মাযহাবগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও এই হাদীসটি যখন সমস্ত মুসলমানের নিকট সত্য বলে স্বীকৃত, তাহলে মুসলমানের একটি দলের কি হলো যে তারা এই হাদীস মোতাবেক আমল করে না। যদি সমস্ত মুসলমান এই হাদীসের উপর আমল করত তাহলে তাদের মাঝে এমন শক্তিশালী ইসলামী ঐক্য সৃষ্টি হত যাকে কোন 'কালের বাতাস' নড়াতে পারত না, কোন ঝড়ও স্থানচ্যুত করতে পারত না। কোন প্রপাগান্ডা বা ইসলামের শত্রুরা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।

আমার আকিদা-বিশ্বাস মতে মুসলমানদের সমস্যাবলীর সমাধান তথা নাজাতের এটাই হল একমাত্র পথ, এটা ছড়া সব দলই হচ্ছে বাতিল ও পথভ্রষ্ট। যারা কোরআন ও সুন্নাহর উপর গবেষণা করে থাকেন এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর আস্থাবান তাঁরা বিনা বাক্যে আমার উক্ত কথার সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেন।

কিন্তু প্রথম ভিত্তি (আকিদা-বিশ্বাস) সে দিনই নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল যে দিন রাসুল (সাঃ) এই ধরণী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। সাহাবারা তাঁর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণেই বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং উম্মত দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একই ভাবে মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী দ্বিতীয় ভিত্তি তথা 'ইমামত' ও 'কিতাবের' দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে দ্বিধা-দন্দের শিকার হয়েছেন। যা অতিতে বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসীয়দের শাষন আমলে তাদের প্রচারভিযান দ্বারা প্রমানিত। আজকের দিনেও আহলে বাইতের আনুগত্যকারীদেরকে কাফের বলা হচ্ছে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট হিসাবে প্রমান করার জন্য চেষ্টা তদবীর চালানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, আর তা হলো ঃ এই সমস্ত অপকর্ম ও অপপ্রচারকে সাহসের সহিত মোকাবেলা করা এবং প্রকাশ্যে হক কথা প্রকাশ করা এবং সেটা প্রকাশ করার সময় কোরআন মজীদ থেকে দলিল উপস্থাপন করা। যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন ঃ **বল, 'যদি তোমরা সত্যবদী হও তবে দলিল-প্রমান পেশ কর'**। [১]

হুজ্জত বা দলিল কারোর উপর জোর পূর্বক চাপানো যায় না। আর না ঐ সমস্ত স্বাধীনচেতা মানুষকে লোভ-লালসার জ্বালে ফাসিয়ে কথা স্বীকার করান যায়, যারা নিজের নাফস্‌কে আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করে দিয়েছেন, আর এ জন্য যদি প্রানও দিতে হয় তবুও সত্যের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয়কে স্বীকার করতে রাজি নন।

হায়! আফসোস **'উম্মত-এ-মুহাম্মদী'**র আলেমগণ যদি একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে এই সমস্ত বিষয়ের উপর মুক্ত মন, সুচিন্তা ও আন্তরিকতার সাথে গবেষণা করে মুসলিম উম্মাহর খেদমত করতেন তাহলে পারস্পারিক সমস্ত বিভেদ ও দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যেত।

---

১ সুরা বাকারা ঃ ১১১

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

প্রথমত ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত, যেন আহলে বাইতের মাযহাবকে স্বীকার করে নেন অর্থাৎ শিয়া ইসনা আশারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। এভাবে শিয়া মাযহাব তাদের কাছে ৫ম মাযহাব হিসাবে গৃহিত হবে। আর তার সাথে ঠিক একই ব্যবহার করেন যেমনটি অন্যান্য ইসলামী মাযহাবরগুলির সাথে করে থাকেন, তার কোন ভূলত্রুটি অনুসন্ধান না করেন, তার অনুসারীদের মন্দ উপাধিতে ভূষিত না করেন। আর ছাত্র মহল এবং বুদ্ধিজীবিদেরকে এই মাযহাব গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। একই ভাবে সমগ্র মুসলমান (শিয়া ও সুন্নি) অন্যান্য ইসলামী মাযহাব যেমন যাইদিয়া গুলিকেও স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। যদিও এই সমস্যার সমাধান আছে, কিন্তু আমাদের উম্মতের মাঝে শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ফেরকাবাজি ও হিংসা পরায়নতার কারনে এর অবস্থা এখন একটি অভিসাপের মত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ঃ সমস্ত মুসলমান যেন ঐ একই আকীদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান, যার কথা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এবং স্বয়ং তাঁর রাসুল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যেন সমস্ত মুসলমান আহলে বাইতের ইমামদের অনুসরন করবে যাদের মধ্য হতে আল্লাহ্ সমস্ত অপবিত্রতা (রিজস্) দূর করে দিয়ে তাঁদেরকে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছেন যতটা পবিত্রতার হক আছে। এই কারণে সমস্ত মুসলমান তাঁদের জ্ঞান-গরিমা এবং সমস্ত বিষয়ের উপর (যেমন তাকওয়া, ইবাদত বান্দেগী, আচার-ব্যবহার, ইল্‌ম ও আমল) তাঁদের প্রাধান্য এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন। অপর দিকে সাহাবাদের বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ ঐ সমস্ত বিষয় পরিহার করে চলা যেগুলিতে মতভেদ আছে এবং যে সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত আছে কেবল সেগুলোকেই গ্রহণ করে নেয়া। ঠিক যে কথাটি রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **'সন্দেহভাজন বিষয়গুলি বর্জণ কর এবং সন্দেহমুক্ত বিষয়গুলিকে গ্রহণ কর'**। এভাবেই উম্মত এক প্লাটর্ফমে জমায়েত হতে পারবে এবং একই আকীদা-বিশ্বাসের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। ঐ আকিদাই হচ্ছে সবকিছুর মূল ভিত্তি, যার ভিত্তিস্তর রাসুল (সাঃ) তাঁর এই কথা দ্বারা স্থাপন করে গেছেন ঃ **'আমি তোমারদের মধ্যে দু'টি ভারি জিনিস রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার ইতরাত। আল্লাহ্‌র কিতাব হচ্ছে একটি দড়ি যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আমার ইতরাত হচ্ছে আমার আহলে বাইত এবং নিশ্চয়ই সুক্ষ্ম সাহায্যকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দুই কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না তারা আমার কাছে হাউযে (কাউছার) উপস্থিত হয়। আতএব আমার পরে এদের সাথে কি আচারণ করবে খেয়াল রেখো।** [১]

সহীহ্ বুখরী, **মুসনাদে আহমাদ**, ৩য় খন্ড ও অনুরুপ হাদীস **সহীহ্ মুসলিম** ঃ ই.ফা. ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৬০০৭ হতে ৬০১০ এবং **[স]হীহ্ তিরমিজী**. ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ খন্ড. হাদীস নং-৩৭২৪ হতে ৩৭২৬।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়েতের মারজা

জনাব আবুল হাসান নাদভী সাহেবের প্রতি

"খোলা চিঠি"

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমাকে মুহাম্মদ তিজানী সামাভী তিউনিসি বলা হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁর হেদায়েতের তৌফিক দান করে আমার উপর করুণা করেছেন। আমি সত্যের সন্ধানে দীর্ঘকাল অতিক্রম করার পর **'শিয়া মাযহাব'** গ্রহণ করেছি। ইতিপূর্বে যদিও আমি মালেকী মাযহাবালম্বি ছিলাম এবং উত্তর আফ্রীকার সুপরিচিত সুফি **'তরিকায়-এ-তিজানিয়া'**-র অনুসারী ছিলাম। শিয়া ওলামায়ে কেরামদের মাঝে যাতায়াতের মাধ্যমে আমি সত্য চিনতে পেরেছি এবং এই বিষয়ে একটি বইও লিখেছি যার নাম রেখেছি **'অবশেষে আমি সত্য পেলাম'**। উক্ত বই আপনার ভারতেও **'মাজমায়-এ-ইলমি ইসলামী'**-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে সবকটি কপি ইতিমধ্যে বিক্রয় হয়ে গেছে। উক্ত লেখনীর ভিত্তিতেই আমাকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

হে আমার প্রিয় নেতা; এই সংক্ষিপ্ত সফরে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি শুনেছিলাম যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আপনি হলেন মার্জা। কিন্তু সফরের কষ্ট-কাঠিন্য ও সময়ের স্বল্পতার কারণে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নি। কেবল বম্বে, পুনা, জাব্বলপুর এবং গুজরাটের কিছু শহরে যেতে পেরেছি। কিন্তু ভারতে শিয়া–সুন্নীর মাঝে বিদ্যমান হিংসা-বিদ্বেশ আমাকে অনেক পীড়া দিয়েছে।

অবশ্য আমি পূর্বেই শুনেছিলাম যে, ভারতে ইসলামের নামে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকে। ফলশ্রুতিতে নেক ও ভালো মুসলমান বান্দাদেরও রক্তপাত হয়, সেটা আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু নিজ ভ্রমনকালে সেখানে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত ভ্রম বাতাসে মিশে গেল এবং আমার বিশ্বাস জন্মালো যে ভারতে ইসলাম এবং শিয়া-সুন্নি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তলে তলে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। আমার এই বিশ্বাসে তখন আরো দৃঢ়তা আসলো যখন আহলে সুন্নাতের একদল ওলামার সাথে আমার কথোপকথন হল। উক্ত দলে **জামায়াতে ইসলামীর মুফতি শেখ আজিজুর রহমান** অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বম্বেতে এই সাক্ষাৎ তাঁরই দাওয়াতের উপর ভিত্তি করে তাদেরই মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমি তখনো ঠিকমত তাদের মাঝে উপস্থিত হতে পারিনি, তারা **'শিয়ান-এ-আহলে বাইত'**-এর উপর লানৎ ও গালমন্দ শুরু করে দেয় এবং বিষদগার করতে থাকে। তারা আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করে হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানতো যে, আমি একটি বই লিখেছি, আর উক্ত বইতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে আহলে বাইতের মাযহাব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছি। কিন্তু আমি তাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলি, তাই

লোকে স্বীকার করুক আর নাই করুক এই একতা প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। কারণ আল্লাহ্‌ পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর **'জুররিয়্যাত'** হতেই ইমাম নিয়োগ করেছেন, অর্দূভবিষ্যতে যিনি **'আদ্‌ল'** ও **'ইনসাফ'**-কে পূর্ণতা দান করবেন তথা জুলুম এবং অত্যাচারের অবসান ঘটাবেন। এই ইমাম হবেন রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র ইতরাতের (বংশধর) মধ্য হতে। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর এই দীর্ঘায়ু দ্বারা উম্মতের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আর যখন তাঁর আগমনের সময় উপস্থিত হবে তখন তিনি ইমামকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সমস্ত ভূল-ভ্রান্তিকে দূর করে দিবেন। তাকে হকের দিকে রুজু করে 'সত্য' পথে আনুগত্য করার সুযোগ দান করবেন, যে পথের দিকে মুহাম্মদ (সাঃ) আহ্বান করে ছিলেন। মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদাই বলতেন **'হে আল্লাহ্‌ আমার কওমকে হেদায়েত কর, কারণ তারা অবুঝ'**।

এখনই সময় উপস্থিত হয়েছে যেন আমি আমার বই **"ফাস আলু আলুজ জিকর্‌" "আহলে যিক্‌র-কে জিজ্ঞাসা করুন"** মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই। বইটি কয়েকটি প্রশ্নের উপর সংগঠিত। আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, আহলে বাইত (আঃ)-এর জ্ঞান ও ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে। আশাকরি ইসলামি বিশ্বের সমস্ত মুসলমানগণ ইহা দ্বরা উপকৃত হবেন। ***'ওয়ামা তাওফিকি ইলাহ বিল্লাহ্‌'।***

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমার এই আমলকে কবুল করে নিন এবং এতে কল্যান ও বরকত দান করুন। ইহাই হচ্ছে একাত্বতার ভিত্তি।

কথাটি আমি এই জন্য বলছি, কারণ অদ্যাবধি মুসলমানগণ একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন এবং পরস্পর ভালো ব্যবহার করে আসছেন।

বিষয়টি আমি ইসলামিক ও অইসলামিক রাষ্ট্রসমূহ ভ্রমনকালে কঠিনভাবে উপলব্ধি করেছি। মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ভারত ভ্রমনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যেখানে ২০ কোটি মুসলমান বসবাস করে, যার চারভগের এক ভাগ শিয়া অবশিষ্ট্য তিন ভাগ মুসলমান সুন্নি। তাঁদের সম্পর্কে আমি অনেক কথাই শুনেছিলাম। কিন্তু নিজ চোখে যা কিছু দেখলাম তা অত্যান্ত ভয়ংকর এবং আশ্চর্যজনকও বটে। সত্যি কথা বলতে উম্মতের এই দূর্দশা আমাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে, আমি অনেক কেঁদেছি। ঈমান ও আশার প্রতি যদি ভরসা না থাকতো, তাহলে হৃদয়টি দুঃখ ও হতাশাতেই চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যেত।

ভারত সফর শেষে আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের মারজা **'আবুল হাসান নাদভী'** সাহেবের নামে একটি পত্র দিয়েছিলাম এবং ওয়াদা করেছিলাম যে উক্ত পত্র এবং তাঁর প্রদত্ত উত্তর একই সাথে প্রকাশ করব। কিন্তু আফসোস অদ্যবধি উক্ত পত্রের কোন উত্তর পাই নি। সুতরাং আমার পত্রটি আমি এই বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করে দিলাম, যেন এই পত্রটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিরজীবি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষ উভয়েই আমার পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবেন যে, আমি তাঁকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম।

- ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী

আমি তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ আমি জীবনে কখনো এমন কথা শুনিনি যে, যারা মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের খেলাফতের উপর ঈমান রাখে না, তারা কাফের। আমি মনে মনে বল্লাম, মুসলমানরা না হয় আবু বকর, উমর ও উসমানের (রাঃ) খেলাফতকে স্বীকার করে নিবে। কিন্তু ইয়াজিদের বিষয়ে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোথাও এমন কথা শুনিনি। আমি সবাইকে সম্বোধন করে বল্লাম, "*আপনারা কি এই লোকের কথার সাথে একমত পোষণ করেন?*" তারা সকলেই বল্লোন, "*হ্যাঁ*"।

এবার আমি চিন্তা করলাম যে, এদের সাথে কথা বলে আর কোন লাভ হবে না এবং বুঝে ফেল্লাম যে, তারা আমাকে রাগান্বিত করে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং সাহাবাদের প্রতি লানতের দোষ চাপিয়ে আমাকে হত্যা করে ফেলবে এবং কেউ টেরও পাবে না।

আমি তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট ক্রোধ অনুভব করলাম এবং নিজের সংগীকে (যে আমাকে এদের কাছে নিয়ে এসেছে) বল্লাম, "যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো"। সে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। অথচ সে এই সাক্ষাত ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্য জানার আকাংখা পোষণ করেছিল। এই ঘটনার জন্য সে খুবই লজ্জা পেল এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইল। আমার এই সংগী হচ্ছেন একজন ভদ্র ও সত্য সন্ধানী যুবক এবং বম্বের **'মাতবায়-এ-ইসলামিয়া'** নামক একটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নাম শারফুদ্দিন। তিনি উভয় পক্ষের মাঝে হওয়া সমস্ত কথা-বার্তার জলজ্যান্ত স্বাক্ষি। তার সম্মুখে ঐ সমস্ত লোকের অভদ্র আচরণ ফুটে উঠলো যারা নিজেদেরকে বড় বড় **'আলেম-এ-দ্বীন'** বলে দাবী করে থাকেন।

আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তবে মুসলমানদের এই দূর্দশা দেখে আমি খুবই মর্মাহত এবং আফসোস করেছিলাম। বিশেষ করে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে, যারা কেন্দ্রের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে আছেন, আর নিজেদেরকে **'আলেম-এ-দ্বীন'** বলে দাবী করেন। আমি নিজের মনে মনে ভাবলাম, অন্ধ বিশ্বাস ও হিংসা-বিদ্বেশে যখন ওলামাগনের এই দশা তখন এখানকার সাধারণ মানুষ ও মুর্খদের অবস্থা কেমন হবে। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন হয়ে থাকে, যে যুদ্ধে পবিত্র রক্ত অকালে ঝরে যায় ও ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠিত হয়। আর এই সবকিছুই ইসলামকে রক্ষা করার নামেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

আমি উম্মতের এমন দূর্দশার কথা চিন্তা করে অনেক কেঁদেছি। কারণ আল্লাহ্‌পাক এই উম্মতের উপর হেদায়েতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, রাসুল (সাঃ) অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্ত রগুলিকে নূর দ্বারা আলোকিত করার দায়ীত্ব নিয়েছিলেন, আর হেদায়েতের সেই অতীব গুরুত্বটি আজও বিদ্যমান। এখনও বিস্তৃত ভারতের ৭০ কোটি মানুষ শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত, গো এবং মুর্তি পুজায় লিপ্ত। ভারতবর্ষের মুসলমানদের উচিৎ ছিল, তাদেরকে ঐ অন্ধকার গহব্বর থেকে বের করে **'আলোর পথে'** নিয়ে আসা তথা আল্লাহ্‌র একাত্মবাদের প্রতি হেদায়েত করা, তারা যেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে চিনতে পারে এবং

নিজেকে সংযত করলাম এবং মুচকি হাসি দিয়ে বল্লাম, "*আমি আপনাদের মেহমান, আপনারা দাওয়াত দিয়েছ তাই এসেছি। আপনারা কি আমাকে গালমন্দ করার জন্য ডেকেছ, ইসলাম কি আপনাদের এই চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছে?*" তারা বেফাঁস বলে উঠলো, "*তুমি জীবনে কখনো মুসলমান ছিলে না, কারণ তুমি শিয়া, আর শিয়ারা মুসলমান নয়।*"

আমি বল্লাম, "*ভাইয়েরা আমার, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। আমাদের আল্লাহ্‌ এক, নবী (সাঃ) এক, কিতাব আর কিবলা এক এবং শিয়ারা এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে এবং নবী (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-কে অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের উপর আমল করে থাকে। যারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, জাকাত দেয়, হজ্জ্ব পালন করে, তাদের কাফের বলা আপনাদের কাছে কিভাবে জায়েজ হলো?*"

তারা আমাকে উত্তর দিলেন, "*কোরআনের উপর তোমাদের বিশ্বাস নেই, তোমরা মুনাফেক, তাকিয়্যার উপর আমল কর, তোমাদের ইমামরা বলে ঃ 'তাকিয়্যাই হলো তাদের পূর্ব পুরেষদের ধর্ম'। তোমরা ইহুদী, কারণ ঐ মাযহাবের স্রষ্টা হচ্ছে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সাবা, সে একজন ইহুদী।*"

আমি হাসতে হাসতে বল্লাম, "*আমার সাথে শিয়া মনে করে কথা বলেল না, আমি নিজে আপনাদের মত একজন* '***মালেকী***' *ছিলাম। গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহলে বাইত (আঃ)-দের আনুগত্য করাই উত্তম। আপনাদের নিকট এমন কোন দলীল আছে যেটার দ্বারা আমার সাথে মত বিনিময় করবেন অথবা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কোন দলীলের ভিত্তিতে কথা বলছি। হয়তো আমরা একে অপরকে বুঝতে পারবো।*"

তারা বল্লেন, "*আহলে বাইত হলেন নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ, তুমি কোরআন সম্পর্কে কিছুই জানো না।*" আমি বল্লাম, "*সহিহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের ভাষ্য আপনাদের কথার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।*"

তারা বল্লেন, "*সহিহ্‌ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থ্যগুলিতে এমন কিছু বর্ণনা আছে যেগুলিকে তোমরা হুজ্জাত মনে করে দলীল রূপে উপস্থাপণ করে থাকো, সেগুলি কিন্তু শিয়াদেরই রচনা করা, যা আমাদের বইগুলিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।*"

আমিও হাসতে হাসতেই বল্লাম, "*শিয়ারা যখন আপনাদের বই এবং সিহাহ্‌ সিত্তার মধ্যে নিজেদের মতের কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাহলে ঐ গুলোর উপর ভিত্তি করে দন্ডায়মান আপনাদের মাযহাবের কোন বিশ্বাস বা ভরসা নেই।*" আমার এই বাক্য শুনে তারা চুপসে গেল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন লাগামহীন যুক্তি দ্বারা তর্ক জুড়ে দিয়ে বল্লেন, "*যারা খোলাফায়ে রাশেদীন সৈয়েদেনা আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর খেলাফতের উপর ঈমান রাখে না, তারা মুসলমান নয়।*"

হয় না। যে বিষয়গুলো **'হক'** ও **'বাতিল'**-এর মাঝে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐগুলির উপরই মানব জাতির হেদায়েত বিদ্যমান আর সমগ্র মানব জাতির নাজাত বা মুক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ **"ওয়া ইজা হাকামতুম ফাহ্কুম বিল আদ্ল"** অর্থাৎ **"আর যখন কোন ফয়সালা কর তখন ইনসাফের সাথে কর"**। আল্লাহ্ পাক অন্যত্রে বলেছেন ঃ **"ইয়া দাউদা ইন্না জায়ালনাকা খালিফাতু ফিল আরদে ফাহ্কুম বাইনান্নাসে বিল হাক্কে ওয়ালা তাত্তাবেউল হাওয়া ফাইয়াজলেকা আনিল হাওয়া।"** অর্থাৎ **"হে দাউদ আমি তোমাকে জমিনের বুকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছি সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে হক মোতাবেক ফয়সালা কর এবং নিজ খায়েশের অনুগত হয়োনা, যা আল্লাহ্র পথ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেয়।"**

আবার রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"হক কথা বল, যদিও সেটা তোমার বিপক্ষে যায়"**। তিনি (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন ঃ **"হক কথা বল, তা যতই তিক্ত হোক না কেন"**।

আমার প্রিয় মোহতারাম, আপনাকে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করছি। সমস্ত বিষয়ই স্পষ্টাকারে বয়ান করুন তা যতই তিক্ত হোক না কেন। এই স্পষ্ট কথাগুলিই আল্লাহ্র দরবারে আপনার পক্ষে স্বাক্ষ্য বহন করবে। নিজের পালনকর্তার কসম খেয়ে বলুন, **'আপনার দৃষ্টিতে শিয়ারা কি মুসলমান নয়?'**

এটাই কি আপনার আকিদা-বিশ্বাস যে, শিয়ারা কাফের? নবী (সাঃ)-এর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-কে যারা অনুসরণ করে তারা আল্লাহ্র একাত্মবাদ ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে সমস্ত ফেরকার তুলনায় অগ্রগামী। তাঁরা বলেন যে কোন প্রকার আকৃতি, চেহারা-সুরত ও দৈহিক অবয়ব থেকে আল্লাহ্ পাক মুক্ত। তারা আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ)-এর উপর ঈমান পোষণ করেন এবং অন্যান্য ফেরকার তুলনায় তাঁকে (সাঃ) অনেক বেশী ইজ্জত ও সম্মান করে থাকেন। তারা বলেন যে, নবী (সাঃ) নবুয়াত ঘোষণার পূর্বেও সম্পূর্ণ রূপে মাসুম ছিলেন। এমতাবস্থায়, **আপনি কি তাদেরকে কাফের বলবেন?**

যারা আল্লাহ্, রাসুল (সাঃ) এবং মোমিনগণের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন, যারা নবী (সাঃ)-এর বংশধরকে ভালবাসেন,[১] **আপনি কি তাদেরকে অ-মুসলিম বলে গণ্য করেন?**

শিয়ারা, যারা সুন্দর রূপে নামাজ কায়েম করেন, যাকাত দেন এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করে নিজের মালের 'খুমস্' বাহির করেন, রমজান এবং অন্যান্য মাসের রোজা রাখেন, খানায়ে কা'বায় হজ্জ্ব পালন করেন এবং আল্লাহ্র নিদর্শনগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, **আল্লাহ্র দুশমন এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃনা প্রদর্শন করে থাকেন -আপনার দৃষ্টিতে তারা কি মুশরিক?**

শিয়ারা, যারা আহলে বাইতের ঐ বারো ইমামের **'বেলায়েত'**-কে স্বীকার করেন যাদের নিকট হতে আল্লাহ্ সমস্ত (রিজস্) অপবিত্রতা দূর করে দিয়ে তাঁদেরকে এমনভাবে

---

১ যেমন ইবনে মঞ্জুর তার **"লেসানুল আরব"** গ্রন্থের **'মাদ্দায়ে শিয়া'** অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

স্বীকার করে নেয়। কিন্তু হায় আফসোস! আজ আমি উপলব্ধি করছি, পক্ষান্তরে ভারতের এই মুসলমানদেরকেই হেদায়েত করার প্রয়োজন আছে।

সুতরাং হে আমার সৈয়দ ও সরদার, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ রহমানুর রহিম, তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং বৃহত্তর ইসলামের স্বার্থে আল্লাহ্‌র রশ্মিকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরুন এবং পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করা তথা ফেরকাবাজি থেকে বিরত থাকুন। আমার অনুরোধ আপনি একজন বীর মুসলিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমান করে দিন যে আপনি আল্লাহ্‌র বিষয়ে কারোর নিন্দা-সমালোচনার তোয়াক্কা করেন না। শয়তানের মনের ইচ্ছা (যেমন ফেরকাবাজি ও দলা-দলিতে মানুষকে লিপ্ত রাখা) পূরন হতে দিবেন না।

আমি আপনাকে খালেস এবং স্পষ্ট ধারণা পোষন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের উপরেই মহান আল্লাহ্‌ পাক এই এলাকায় হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের উপর আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আল্লাহ্‌ কখনই আপনার ঐ ভূমিকার প্রতি রাজি হবে না, যে ভুমিকার জন্য শিয়া-সুন্নি উভয়কে তাদের রক্ত দিয়ে মুল্য পরিশোধ করতে হয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাক আপনার সমস্ত ছোট বড় কর্মের হিসাব নিবেন এবং সমস্ত নাফারমানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কারণ **'আলেম'** আর **'জাহেল'** সমান নয়। প্রত্যেককে তার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে দায়ীত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং আখলাকের মাধ্যমেই সম্মান ও ইজ্জত প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

সুতরাং আপনি নিজেকে যতক্ষণ **'ভারতের আলেম'** বলে দাবী করবেন ততক্ষন পর্যন্ত আপনার দায়ীত্বও অপরিসীম। এতে কোন সন্দেহ নাই যে আপনার কথা অনুসারে ভারতের অনেক মানুষের সংশোধন হয়ে যেতে পারে আবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম আপনার কথার উপর ভিত্তি করে ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। হে বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিবেকবান, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেস্তাদের পরে ওলামাদের মর্যদা দান করেছেন। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে ঃ **"আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও; আল্লাহ্‌ ন্যয়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"**। [১]

আবার আল্লাহ্‌ পাক যখন আমাদের এই ভাবে আদেশ করছেন ঃ **"ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না"**। [২]

আবার মুফাসসেরীনগণও যখন মুল্যবান বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে বলেছেন তখন এই সমস্ত আকিদাগত বিষয়সমূহ কেন ইনসাফের সাথে গ্রহণ করা

---

১ সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮

২ সূরা রহমান ঃ ৮

আমাকে লানত করল, আর যে আমাকে লানত করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই লানত করল।"

এই সমস্ত বিষয়াবলী আহলে সুন্নাতের সহিহ্ গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরো অনেক এমন সব কর্মকান্ড আছে যা সম্পুর্ন রূপে ইসলাম বহির্ভুত। মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদের পক্ষে বায়াত গ্রহনের জন্য অনেক নেক ও ভালো মানুষকে হত্যা করেছে। জাদাহ্ বিনতে আশ্ আত-এর দ্বারা হাসান ইবনে আলী-কে হত্যা করিয়েছে। এ ছাড়াও তার আরো অনেক কু-কর্ম আছে যেগুলি আহলে সুন্নাতের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে আলী (কাঃ)-এর শিয়াগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মোহতারাম, আমি আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষন করি না যে আপনি ঐ সমস্ত কাজগুলিকে সমর্থন করবেন। আর যদি আপনি তা করেন, তা'হলে ইসলামের উপর শান্তি হোক এবং দুনিয়া ধুলিস্যাৎ হোক। কারণ এমন হলে দুনিয়াতে মানদন্ড বলে আর কিছু থাকলো না, না আকল, না শরিয়াত, না দর্শন, না দলিল বলতে কোন কিছু বাকি থাকলো। আল্লাহ্ পাক বলছেন ঃ **"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও"**। [১]

আল্লাহ্‌র কসম, পাকিস্তানের আলেম আবুল আ'লা মওদুদী (রহঃ) নিজের বই **"খেলাফত ও রাজতন্ত্র"**-র ১০৬ নম্বর পৃষ্ঠায় আবুল হাসান বসরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ "*খোদার কসম মুয়াবিয়ার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত ৪টি এমন স্বভাব ছিল, যার মধ্য হতে মাত্র একটিই তার পথভ্রষ্টতার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত*" ঃ

(ক) মুসলমানদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই খলিফা হয়ে বসল। অথচ তখনও অনেক মর্যদাবান সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) নিজের পরে নিজের ছেলেকে খলিফা নিযুক্ত করলো, যে মদ খেত, যে হারির (রেশমী পোষাক) পরিধান করত, তাম্বুরা বাজাতো এবং বাঁদর নাচাতো।

(গ) জিয়াদকে নিজের ভাই বলে স্বীকার করে ছিল। অথচ রাসুল (সাঃ)-এর স্পষ্ট বাণী আছে যে, "*সন্তান জারজ বলে বিবেচিত হবে এবং জেনাকারীর জন্য হবে পাথরের শাস্তি*"।

(ঘ) সে হাজর ও তার সাথীদেরকে হত্যা করেছিল এবং হাজর ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, "মোয়াদের উপর গজব নাযিল হোক" (কথাটি সে তিন বার বলেছিল)।

আল্লাহ্ আবুল আলা মওদুদীর উপর রহম করুন, কারণ তিনি **'সত্য'** প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চাইলে মুয়াবিয়ার চরিত্রের উপরোক্ত স্বভাব ব্যতীত অন্ততঃ আরো ৪০টি বদস্বভাকে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার পথভ্রষ্টতার জন্য এই ৪টি তিনি যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন।

---

১ সূরা ঃ তাওবা ১১৯

পূতঃপবিত্র করে দিয়েছেন, যতটা পবিত্রতার হক আছে এবং তাদের **'ইমামত'**-কে স্বয়ং রাসুল (সাঃ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই বিষয়টি আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ যেমন, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যরা নিজেদের সহীহ্ গ্রন্থাদির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। **আপনার দৃষ্টিতে তারা কি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়?**

আপনার দৃষ্টিতে কি তারা মুসলমান, যারা রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইমাম বা রাসুল (সাঃ)-এর পরে **'ইমামত'**-কে চিনতে পারেনি, এবং বলে থাকে যে, **'ইমামত' হলো ইরানী এবং পথভ্রষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী?**

আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা দেন যে, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে ইমাম বলে স্বীকার করে? অথচ সমস্ত মুসলমানই ইয়াজিদকে ফাসেক বলে গণ্য করেন। ইয়াজিদের লাঞ্ছনার জন্য ইহাই যথেষ্ট এবং এটার প্রতি সমগ্র মুসলিম জাতির ঐক্যমত আছে যে, সে নিজের পক্ষে **'বায়াত'** হাসিল করার জন্য পবিত্র মদিনা নগরীকে তার সৈনিকদের জন্য **'মোবাহ্'** বলে ঘোষণা করেছিল, যার যা খুশি করতে পারে। সুতরাং তার যোদ্ধারা হাজারো উত্তম সাহাবীকে হত্যা করেছিল, তাবেয়ীনদের হত্যা করে অগনিত মহিলা ও যুবতিকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে পিতৃ পরিচয়হীন ভূমিষ্ট হওয়া সন্তানের সংখ্যা যে কত, তা আল্লাহ্ মা'বুদই জানেন। ইয়াজিদের জন্য পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অপমান ও বদনামিই যথেষ্ট যে, সে বেহেস্তের যুবকদের সরদারকে শহীদ করেছে এবং রাসুল (সাঃ)-এর কন্যাদের বে-পরদা করেছে। ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পবিত্র দন্ত মোবারকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেছিল ঃ

"*আহ্ আজকে যদি বদরের যুদ্ধে নিহত আমার পূর্ব-পুরুষেরা থাকতো তাহলে দেখতে পারত*"। তারপর সে এই ন্যাক্কারজনক কথাটি বলে ঃ "*বনী হাশিমেরা বাদশাহ্ হওয়ার জন্যই কেবল এরূপ নাটক রচনা করেছিল, আসলে না কোন ফেরেশতা এসেছে আর না কোন ওহি নাযিল হয়েছে*"।

ইয়াজিদের কথিত এই কাব্য দ্বারা ইহাই প্রমান হয় যে, সে মুহাম্মদ (সাঃ)-র নবুয়্যাত এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো না। সুতরাং এই জঘন্য কাজের জন্য ইয়াজিদ এবং তার পিতা মুয়াবিয়ার প্রতি যারা লানত করবে, **তাদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া কি আপনার জন্য জায়েজ হবে?**

যে আলী (কাঃ)-এর প্রতি লানত দিত এবং লানত করার জন্য নির্দেশ দিত। বরং সাহাবাদের মধ্যে যারা আলী (কাঃ)-এর প্রতি লানত করতে অস্বীকার করতেন তাঁদেরকে হত্যা করে দিত। যেমনঃ হজর ইবনে আদী কান্দি (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছিল। এই লানতবাজির ধারাবাহিকতাকে একটি সুন্নাতের রূপ দিয়েছিল এবং মুয়াবিয়ার এই সুন্নাতটি প্রায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত সমাজে চালু ছিল। অথচ মুয়াবিয়া রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাটি ভালো করেই জানতো ঃ "*যে আলীর উপর লানত করল, সে*

মোহতারাম; আমাদের ঐ সমস্ত বেহুদা ও নীচ প্রকৃতির বিষয়গুলিকে ত্যাগ করতে হবে, যার কোন দলিল নাই বা যেগুলিকে বিবেক-বুদ্ধিও গ্রহণ করে না এবং সেগুলিকে যুব সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়াও যুক্তি সংগত হবে না যে, **'শিয়াদের কাছে ৪০ পারা কোরআন আছে'** অথবা **'শিয়ারা আলীকেই শরীয়াতের হোতা মনে করে'** বা **'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা শিয়া মাযহাবের স্রষ্টা'**। ইহা ছাড়া আরো কত বে-হুদা ও লজ্জাস্কর বিষয় আছে যেগুলিকে ইসলামের শত্রু এবং আহলে বাইত (আঃ)-দের প্রতি বিরুদ্ধচারীগন হিংসা-বিদ্বেশ এবং মুর্খতার দরুন সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে।

মোহতারাম; আমার প্রশ্ন হলো, **ভারতের ওলামারা মিশরের 'জামেয়া আজহার' - এর ওলামাদের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখেন?** জামেয়া আজহারের ওলামাগণ তো **'শিয়া ইমামিয়া মাযহাব'**-কে কেবল স্বীকারই করে নেন নি বরং ২০ বৎসর পুর্বেই স্বীকারোক্তি স্বরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁদের মতে ও বিশ্বাসে **'জাফরী ফিকাহ্'** (যেটার উপর শিয়াগণ আমল করে থাকেন) অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অনেক বেশী ইসলাম সম্মত এবং তার **'ফুরু-এ-দ্বীন'** গুলি গ্রহণযোগ্য এবং ঐ ফতোয়া দানকারী ওলামাদের মধ্যমণি হচ্ছেন **'শেখ মাহমুদ সালতুত (রহঃ)'**। তাহলে বলুন, **তারা কি ইসলামের ওলামা নন অথবা তারা কি মুসলমান চিনতে পারেন নি? অথবা ভারতের আলেম সমাজ কি তাঁদের চেয়েও বেশী জ্ঞান রাখেন?** আমার মনে হয় না যে, আপনিও এমনটি বিশ্বাস করেন।

মোহতারাম; দৃষ্টিগুলি আপনার উপর নিবদ্ধ। আপনার সহানুভুতি ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমার অন্তর উন্মুক্ত। নিঃসন্দেহে বিগত দিনগুলিতে আমিও আপনার মত সত্য হতে অজ্ঞ ছিলাম এবং **'আহলে বাইত'** ও তাঁদের অনুসারীদের চিনতাম না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নিজ দয়ায় তাঁদের পথ চিনিয়ে দিলেন, যাদের পথ ছাড়া বাকি সবকটি পথই বাতিল ও গোমরাহীর পথ। আমি হিংসার বেড়াজাল ও অন্ধ অনুকরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি। আজ আমার কাছে পরিস্কার হয়েছে যে, বেশীর ভাগ মুসলমান এখনো বাতিল ও অপপ্রচারের ধূম্রজালে আবদ্ধ। তারা যেন **'নাজাতের তরী'**-তে আরোহন করতে না পারে এবং **'আল্লাহ্র রশ্মি'**-কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে না পারে, সে কারণে তাদের সত্যের কাছাকাছি যেতে দেয়াই হয় না। এই কথাটি আপনিও ভাল করেই জানেন যে, শিয়া ও সুন্নির মাঝে খুব বেশী দুরুত্ব নেই। কেবল একটি মাত্র দ্বন্দ্ব এই ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে, সেটা হলো এই যে, রাসুল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর **'খেলাফতের দ্বন্দ্ব'**। আর এই দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি হলো সাহাবাদের প্রতি আপনাদের আকিদা-বিশ্বাস। যদিও সাহাবাগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, একে অপরকে লানত দিতেন, মারা মারি করতেন, এমনকি একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করেছেন।

অতএব এই দ্বন্দের কারনে শিয়ারা যদি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, তাহলে (নাউজুবিল্লাহ্) এই অপবাদের জন্য তাদের চেয়ে বেশী সাহাবারা হকদার। আমি বুঝতে পারছি না আপনি কিভাবে এটাকে সহ্য করবেন। ন্যায় তথা ইনসাফের উপর ভিত্তি করে আপনি এমনটা বলতে পারেন না যে তাঁরা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে গেছেন। আহলে বাইত

মাওলানা মওদুদী সাহেব সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত লোকের অনুভূতির কথা চিন্তা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, যারা হচ্ছে মুয়াবিয়ার গুণগ্রাহী, তাকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তার অনুসরণ করে এবং তার নামের সাথে **'রাদিয়াল্লাহু আনহু'** ব্যবহার করে। এমনকি তার ছেলে ইয়াজিদকেও একইভাবে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক **'রাদিয়াল্লাহু আনহু'** বলে থাকে। আর এই কথা তো আমি নিজ কানে-ই ভারতের ওলামাদের মুখে শুনেছি। **লাহাওলা ওয়লা ক্যুয়াতা ইলা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।**

তদরুপ আমিও তাদের অনুভূতির কথা চিন্তা করেছিলাম (যারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল) এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্য হতে একটিও আমি বর্ণনা করি নাই, কারণ আমার নিজেরও ভয় ছিল।

মোহতারাম; আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনি স্পষ্ট বিষয়বস্তু এবং সত্যকে ধারণ পূর্বক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হকের বিষয়ে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমি আপনার কাছে এই দাবী করছি না যে আপনিও তাদের সমকক্ষ হয়ে যান, আর না তাদের অপকর্মের জালকে ছিন্ন ভিন্ন করেন। এই কাজের জন্য তো ইতিহাসের বইগুলিই যথেষ্ট।

কিন্তু আমি এটা অবশ্যই দাবী করব যে, আপনি নিজেই স্বীকার করে নিন এবং নিজের অনুসারীদেরকে জানিয়ে দিন যে, যারা মুয়াবিয়া, ইয়াজিদ ও তাদের দোসরদের ইমামত-কে (নেতৃত্বকে) অস্বীকার করে এবং তাদের ভালবাসে না, তারাই হলো সত্যপন্থী এবং প্রকৃত মুসলমান। আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে শিয়ারা সকল যুগেই মজলুম ছিল, কারণ তারা ঐ মালাউনদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয়নি, যার উদাহরণ স্বয়ং আল্লাহ্ পাক কোরআনে বর্ণনা করেছেন।

আপনি শপথ বলুন, শিয়ারা কোন দোষে দোষী? রাসুলে পাক (সাঃ) তাঁর পরে তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-কে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাঁদের নূহ (আঃ)-এর কিস্তির সাথে তুলনা করে বলেছেন ঃ **"যারা এতে আরোহন করবে তারা নাজাত পাবে, আর যারা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল তারা ধ্বংস হবে"**।

শিয়াদের অপরাধ কোথায়? তারা তো রাসুল (সাঃ)-এর এই আদেশেরই আনুগত্য করে যে, **"আমি তোমাদের মাঝে অতিব ভারি দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার ইতরাত (বংশধর)। যতক্ষন তোমরা তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে গোমরাহ হবে না।"** আর এই কথার সাক্ষ্য কেবল শিয়াদের বইগুলিতে নয় বরং আহলে সুন্নাতের কিতাবাদিতেও বিদ্যমান।

কিন্তু হায় আফসোস! রাসুল (সাঃ)-এর এই আদেশের প্রতি আনুগত্য করে তাঁর শুকুরগুজারী করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য ও ফজিলত দান করার পরিবর্তে উল্টা তাঁদেরকে গালি-গালাজ করেন এবং কাফের বলে ফতোয়া দেন, **তাদের সাথে শত্রুতা পোষন করে থাকেন। এটাই কি ন্যায় সংগত আচরণ?**

জিজ্ঞসা করে নাও

"ফাসআলু আহলুয যিক্‌র"[১]-এই আয়াতটি মুসলমানদের সকল সমস্যার সময় আহলে আহলে যিকিরের স্বরণাপন্ন হওয়ার জন্য আহ্বান করছে, তারা যেন সহজ সরল পথটিকে চিনতে পারে। কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদের শিক্ষা দান করার পর এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁরাই হলেন **"রাসেখুনা ফিল ইলম"** এবং পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকারী।

এই আয়াতটি আহলে বাইত তথা মুহাম্মদ (সাঃ), মাওলা আলী (আঃ), মা ফাতিমা (সাঃআঃ), ইমাম হাসান (আঃ) ও ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পরিচয় দানের জন্য নাযিল হয়েছে। নবী (সাঃ)-এর জামানার পর কিয়ামত পর্যন্ত পাক পাঞ্জাতন, **'আসহাব-এ-কেসা'**-র অন্তর্ভূক্ত ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নস্‌ল হতে আরো নয়জন ইমাম হবেন, যাঁদেরকে স্বয়ং রাসুল (সাঃ) নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। এই কথাটি তিনি (সাঃ) বিভিন্ন উপযুক্ত সময়ে ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁদেরকে **"আইম্মায়ে হুদা"**, **"মাসাবিহুদ্দুজা"**, **"আহলুয যিক্‌র" এবং "রাসেখুনা ফিল ইলম"**-এর উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

উক্ত রেওয়াতটি নবী (সাঃ)-এর আমল হতেই শিয়াদের কাছে মুতাওয়াতির এবং সহীহ্ বলে গৃহিত। আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ওলামা এবং মুফাস্‌সীরগণও সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি আহলে বাইত (আঃ)-এর শানে নাযিল হয়েছে। আহলে সুন্নাতের কয়েকজন ওলামার নাম উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) ইমাম সা'লাবী - **তাফসীরে কবীরে ঃ** সুরা নাহল-এর উক্ত আয়াতের অর্থের নীচে বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবনে কাসির - **তাফসীরুল কোরআনের** ২য় খন্ডের ৫৭০ পৃষ্ঠায়।

(৩) **তাফসীরে তাবারীর** ১৪তম খন্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায়।

(৪) **তাফসীরে আ'লুসী আল মুসাম্মা** – বেহ্ রূহুল মোয়ানীর ১৪তম খন্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায়।

(৫) **তাফসীরে কুরতাবা** - ১১তম খন্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায়।

(৬) **তাফসীরে হাকিম আল মুসাম্মা** – বেহ্ শাওয়াহেদুত্ তানজিল - ১ম খন্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায়।

(৭) **তাফসীরে তাসতারী আল মুসাম্মা** – বেহ্ এহকাকুল হক - ৩য় খন্ডের ৪৮২ পৃষ্ঠায়।

(৮) কান্দোজী হানাফীর, **নেয়াবিউল মোওয়াদ্দাত** - ৫১ ও ১৪০ পৃষ্ঠায়।

---

১ সূরা নাহ্ল ঃ ৪৩

(আঃ)-এর মর্তবা ও মর্যাদা দানের ব্যাপারে শিয়াদের যেমন ভূমিকা আছে, সাহাবাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতদের অনুরূপ ভূমিকা আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শিয়া-সুন্নি উভয়ে দোষী। কারণ সাহাবাগণ আহলে বাইত (আঃ)-কে নিজেদের চেয়ে উত্তম বলে গণ্য করতেন এবং তাঁদের উপর ঠিক ঐ ভাবেই দুরূদ প্রেরণ করতেন যেভাবে রাসুল (সাঃ)-এর উপর দুরূদ প্রেরণ করতেন। আমি এমন একজন সাহাবী সম্পর্কের বলতে পারব না, যিনি নিজেকে **'আহলে বাইত-এ-মুস্তফা'**-র চেয়ে উত্তম বলে দাবী করেছেন অথবা জ্ঞান ও আমলের দিক থেকেও নিজেকে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেছেন।

সুতরাং এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যেন, আহলে বাইত (আঃ)-এর অনুসারীদের উপর থেকে ইতিহাসের ধুম্রজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নেক ও ভালো কাজে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। **এই উম্মতের মধ্যে এমনিতেই রক্তপাত ও ফেৎনাবাজি কি কম হয়েছে? এবার ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ নয় কি?**

অর্দূভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক আপনাদের এক কলেমার ছায়াতলে জমায়েত করবেন এবং আপনার মাধ্যমে বিভেদকে দূর করবেন এবং আপনার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব ও সেচ্ছাচারিতাকে বিলীন করে দিবেন। আপনার কারণে এই রোগের চিকিৎসা হবে, আপনার উসিলায় সকল ফেতনার আগুন নিভে যাবে। আপনারই উসিলায় শয়তান ও তার দোসরদের লাঞ্ছনা দিবেন এবং আপনিও আল্লাহ্‌র দরবারে সফলকাম বলে বিবেচিত হবেন। বিশেষ করে আমি যতদূর শুনেছি, আপনি হলেন আহলে বাইত (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যার ফলে আপনার হাশর যেন তাঁদের (আহলে বাইত) সঙ্গে হয়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ **"আর তোমার এই উম্মত হলো এক, আমি তোমার পালনকর্তা। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং বলে দিন যে, নেক আমল কর। কারণ আল্লাহ্, তাঁর রাসুল এবং মোমিনগণ তোমার আমল দেখতে পারে"**।

অতএব আলাহ্ পাক যেন আপনাকে এবং আমাদের তৌফিক দান করুন, তাতেই সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জনপদের কল্যাণ নিহিত আছে। আলাহ্ পাক যেন আপনাকে এবং আমাদের তাঁর মুখলেছ বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

অত্র পত্রের সহিত আপনার খেদমতে হাদীয়া স্বরূপ আমার লিখিত একটি বই "*অবশেষে আমি সত্য পেলাম*" পাঠালাম। এই বইটি আমি চলতি বিষয়ের উপরই রচনা করেছি। আশাকরি এই ক্ষুদ্র হাদীয়াটুকু গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করবেন। –*ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু।*

–মুখলেছ,
মুহাম্মদ তিজানী আস্ সামাভী
তিউনিসি।

ঈসা (আঃ)-কে নবী বলেও স্বীকার করতে চায় না। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ উভয়েই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামকে অস্বীকার করে এবং বলে থাকে যে ঃ "**মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন অনেক বড় মিথ্যাবাদী ও দজ্জাল (মায়াজাল্লাহ্)**"।

এতদসত্ত্বেও কি আমরা উক্ত আয়াতে কারিমার অর্থ এভাবে করব যে, আল্লাহ্ আমাদের ইয়াহুদ ও নাসারাদের দিকে রূজু করতে বলেছেন? অসম্ভব, যেহেতু বর্ণিত আয়াত দ্বারা আহলে কিতাব বলতে ইয়াহুদ ও নাসারাকে বুঝানো হয়নি, সেহেতু প্রমানিত হল যে উক্ত আয়াতে কারিমাটি রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-এর শানেই নাযিল হয়েছে। এই কথাটি শিয়া ও সুন্নি উভয়ের সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমানিত এবং তদ্বারা এই কথাটিও প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকেই (আহলে বাইত) এই কিতাবের (কোরআন) জ্ঞানের ওয়ারেশ বানিয়েছেন -যার মধ্যে কোন কিছুই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে তাঁদেরকে এই জন্য নির্বাচিত করেছেন, বান্দারা যেন কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যার জন্য তাঁদের দিকে রুজু হয়ে যায় এবং বান্দারা যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করবে, তখন তাদের জামানতও হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষকে তাঁর মনোনীত ও কিতাবের জ্ঞান ধারণকারী ব্যক্তিবর্গের অনুগত ও অনুসারী করে দিতে চেয়েছিলেন, যেন পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং তাঁদের (আহলে বাইত) মত ব্যক্তিত্ব যদি মানুষের মাঝে না থাকেন, তাহলে প্রত্যেকই স্বীয় ইচ্ছার দাসে পরিনত হয়ে যাবে। সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঁঙে পড়বে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে আলেম বলে দাবী করবে।

'**আহল-এ-যিক্‌র**' বলতে পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-গণকে বুঝানো হয়েছে, উক্ত বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ ও সন্তুষ্ট হওয়ার পর, এখন আমি কথাটির স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করব। আমি এমনসব প্রশ্ন উত্থাপন করব, আহলে সুন্নাতের কাছে যার কোন জবাব নাই। কোন জবাব যদি থাকেও, তারা কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যান অথবা এমন সব দলিল উপস্থাপণ করে থাকেন, সেগুলিকে কোন সত্য সন্ধানী মানুষ গ্রহণ করতে পারবে না। এই সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর একমাত্র পবিত্র ইমাম (আঃ)-দের কাছেই পাওয়া যাবে, যাঁরা পৃথিবীকে তাঁদের জ্ঞান, মারেফাত ও নেক আমল দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

যদি আয়াতের জাহেরী অর্থে, আহলে কিতাব বলতে **"ইয়াহুদ ও নাসারা"** বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই আয়াত দ্বারা ইয়াহুদ ও নাসারাকে বুঝানো হয়নি।

প্রথমত ঃ কারণ পবিত্র কোরআন বিভিন্ন আয়াতে ইংগিত করেছে যে, ইয়াহুদ ও নাসারা আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে নিজেদের হস্ত দ্বারা লিপিবদ্ধ করে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে দাবী করতো, যেন এই কর্ম দ্বারা কিছু অর্থ হাসিল করতে পারে। পবিত্র কোরআন তাদের মিথ্যাচারিতা ও নিজেদের হাতে আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। সুতরাং এই কথাটি কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, ইয়াহুদ ও নাসারাদের এহেন অপকর্ম থাকা সত্বেও কোরআন তাদের দিকে রুজু করার জন্য নির্দেশ দিবে এবং বলবে ঃ **"যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা অবগত নও, সে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাকে জিজ্ঞাসা কর"**।

দ্বিতিয়ত ঃ সহীহ্ বুখারী **'কিতাবুশ্ শাহাদাত'**-এর **"লা ইয়াস্য়ালু আহলিশ্ শির্‌ক"**-অধ্যায়ের ৩য় খন্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ "রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আহ্‌লে কিতাবগণকে সত্য বা মিথ্যাবাদী কোনটাই বল না, বরং এভাবে বল যে ঃ **"আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর নাযিলকৃত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি"**।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা পরিস্কার হলো যে, ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রত্যাখ্যান কর, তাদের দিকে রুজু হয়ো না। কারণ সত্য বলে স্বীকার বা মিথ্যা বলে অস্বীকার করা উভয়েই ঐ প্রশ্নের জন্য **'না সূচক'** ইংগিত বহন করছে, যে প্রশ্নের সঠিক জবাব চাওয়া হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ সহীহ্ বুখারী তার ৮ম খন্ডের ২০৮ পৃষ্ঠায় **'কিতাবুত তাওহীদ'** অধ্যায়ে, আল্লাহ্ পাকের কালাম **"কুল্লা ইয়াওমিন হুওয়া ফি শান"** -সম্পর্কে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ *"তিনি বলেন, হে মুসলমানগণ -তোমরা কোন বিষয়ে আহলে কিতাবদের নিকট কোন্ অধিকারে জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের কিতাব তো সেই কিতাব যে কিতাব আল্লাহ্ তাঁর নবী (সাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন, যা কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ্ বহন করে, সেটা কোন কাসিদা (কাব্য) নয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো জানিয়েছেন যে, আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ ও নাসারাগণ আল্লাহ্‌র কিতাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে এবং নিজেদের হাতে লিখে দাবী করে থাকে যে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, তদ্দারা যেন কিছু মুনাফা হাসিল করতে পারে। অথবা তোমাদেরকে তাদের নিকট ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, যা তোমরা জান না। অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের (ইয়াহুদ ও নাসারা) কাউকে কখনো দেখেনি যে তারা তোমাদের নিকট ঐসব বিষয়ে প্রশ্ন করে যা তোমাদের উপর নাযিল হয়েছে।"*

চতুর্থত ঃ আজ আমরা যদি **'আহল-এ-কিতাব'** নাসারাদের প্রশ্ন করি তখন তারা বলে যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন খোদা এবং ইয়াহুদীরা সেটাকে মিথ্যাচার বলে, এমনকি তারা

আল্লাহ্ তায়ালা এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে অনেক উর্ধ্বে এবং শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্ তুমি তো তোমার সিফাত (গুণাবলী) বর্ণনাকারীদের সিফাতের তুলনায় অনেক পুতঃপবিত্র।

'আইম্মায়-এ-হুদা' ও 'মাসাবিহুদ্দুজা'-গণের পক্ষ থেকে এই সমস্ত উদ্ভট কথা-বার্তার উত্তর হলো এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত এবং ছবি-প্রতিচ্ছবির সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পুর্ণ রূপে মুক্ত। হযরত আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লার। তাঁর গুণরাজী কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না। তাঁর নেয়ামতসমুহ গনাকারীরা গুনে শেষ করতে পারে না। প্রচেষ্টাকারীগণ তাঁর নেয়ামতের হক আদায় করতে পারে না। আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা ও জ্ঞান দ্বারা তাঁর পরিপুর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং আমাদের সমগ্র বোধ শক্তি দ্বারা তাঁর মাহাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব নয়। তাঁর সিফাত বর্ণনা করার পরিসীমা নির্ধারিত নেই এবং সেজন্য কোন লেখা বা বক্তব্য, কোন সময় বা স্থিতিকাল নির্দিষ্ট করা হয় নি। তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন, আপন করুণায় বাতাসকে প্রবাহিত করেছেন এবং শিলাময় পাহাড় দ্বারা কম্পমান পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহ্‌র মারেফাতই হচ্ছে দ্বিনের ভিত্তি। এ মারেফাতের পরিপূর্ণতা আসে তাঁকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ায়; সাক্ষ্যের পরিপুর্ণতা হয় তাঁর ঐকল্যের বিশ্বাসে; বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হয় তাঁকে পরম পরিপুর্ণরূপে নিরীক্ষণ করার জন্য আমল করায়; আমলের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় তাঁর প্রতি কোন সিফাত (গুণ) আরোপ না করায়। কারণ কোন কিছুতে গুণ আরোপিত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরোপিত বিষয় থেকে গুণ পৃথক এবং যার ওপর গুণ আরোপিত হয় সে নিজে সেই গুণ থেকে পৃথক। যারা আল্লাহ্ হতে সত্তা বহির্ভূত কোন সিফাত বা গুণ আরোপ করে তারা তাঁর সাদৃশতার স্বীকৃতি দেয়; যারা তাঁর সাদৃশতা স্বীকার করে তারা দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি দেয়; যারা তাঁর দ্বৈতের স্বীকৃতি দেয় তারা তাঁকে খন্ডভাবে দেখে; যারা তাঁকে খন্ডভাবে দেখে তারা তাঁকে ভুল বুঝে; যারা তাঁকে ভুল বুঝে তারা তাঁকে চিনতে অক্ষম; যারা তাঁকে চিনতে অক্ষম তারা তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে; যারা তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে তারা তাঁকে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে।

যদি কেউ বলে তিনি কি? সে জেনে রাখুক, তিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন এবং যদি কেউ বলে তিনি কিসের ওপর আছেন, সে জেনে নাও, তিনি নির্দিষ্ট কোন কিছুর ওপর নেই। যদি কেউ তাঁর অবস্থিতি নির্দিষ্ট কোন স্থানে মনে করে তবে সে কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ্‌বিহীন গন্য করলো। তিনি ঐ সত্তা যাঁর আগমন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেনি। তিনি অস্তিত্বশীল, কিন্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসেননি। তিনি সবকিছুতেই আছেন, কিন্তু কোন প্রকার ভৌত নৈকট্য দ্বারা নয়। তিনি সবকিছু থেকে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতা ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নয়। তিনি কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু সঞ্চলন ও হাতিয়ারের মাধ্যমে নয়। তিনি তখনও দেখেন যখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেউ দেখার মতো

প্রথম অধ্যায়

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে

আল্লাহ্র চেহারা এবং তাঁর মুজাস্সাম (দেহাবয়ব) হওয়া সম্পর্কে?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ **"দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না"।** [১] **"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে"।** [২] আর যখন মুসা (আঃ) তাঁর দীদার লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ পাক বলেছিলেন ঃ **"তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না"।** [৩]

এমতাবস্থায় আপনারা (আহলে সুন্নাত) ঐ সমস্ত হাদীস গুলিকে কিভাবে সত্য বলে কবুল করে নিয়েছেন, যেগুলি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

- **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ্যে উপস্থিত হবেন এবং মানুষ তাঁকে পূর্ণিমা চাঁদের মত দেখতে পাবে।** [৪]
- **প্রত্যেক জুমা'র রাত্রিতে তিনি পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন।** [৫]
- **আল্লাহ্ জাহান্নামে তাঁর বাম পা দিয়ে দিবেন, তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে।** [৬]
- **তিনি তাঁর উরু (পিন্ডলি) উন্মুক্ত করে দিবেন, যেন মুমিনগন তাঁকে চিনতে পারে।** [৭]
- **তিনি হাসেন এবং আশ্চর্য হন।** [৮]
- **ইহা ছাড়াও আরো অনেক বর্ণনা আছে যাদ্বারা আল্লাহ্র দেহাবায়ব এবং চলমান একটি বস্তুর প্রমান মিলে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ তাঁর দু'টি হাত এবং দু'টি পা আছে, পাঁচটি আংগুল আছে, যার প্রথমটি আসমানের উপর, দ্বিতীয়টি জমিনের উপর, তৃতীয়টি গাছ পালার উপর, চতুর্থটি ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে এবং পঞ্চমটি সমস্ত সৃষ্টির উপর স্থাপন করে আছেন।** [৯]
- **তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করছেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েছিলেন।**

---

১ সূরা আন্'আম ঃ ১০৩

২ সূরা শোরা ঃ ১১

৩ সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৩

৪ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ২০৫ এবং **সহীহ্ মুসলিম** খঃ ১, পৃঃ ১১২

৫ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ৪৭

৬ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ১৭৮ ও ১৮৭

৭ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ১৮২ এবং **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ১১৫

৮ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ৩৩

৯ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ১৮৩

করতে সক্ষম ছিলেন না। এমনকি একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আবু হুরায়রাকে প্রহার করে বলেছিলেন যে, তিনি যেন এধরণের হাদীস বর্ণনা না করেন যে ঃ **'আল্লাহ্ আসমান ও জমিনকে সাত দিনে সৃষ্টি করেছেন।'**

যতক্ষন পর্যন্ত আহলে সুন্নাতগন বুখারী ও মুসলিম-কে বিশ্বস্ত বলে মেনে চলবেন এবং ঐ দু'টিকে অন্যান্য কিতাবাদির তুলনায় শ্রেষ্ঠ্য বলে গণ্য করবেন এবং আবু হুরায়রার প্রতি অন্যান্য সকল রাবীর চেয়ে অধিক আস্থা পোষণ করবেন (যিনি আহলে সুন্নাতের নিকট উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী এবং ইসলামের রাবি হিসাবে আখ্যায়িত) ততক্ষণ পর্যন্ত আহলে সুন্নাতগণ নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। যতক্ষন পর্যন্ত তারা অন্ধ অনুকরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়ে **"আইম্মা-এ-হুদা"**, নবী (সঃ)-এর ইতরাত (বংশধর) এবং **'জ্ঞানের দ্বার'**-এর প্রতি রুজু হবেন না, ততক্ষন পর্যন্ত তারা **'সত্যের আলো'** পাবেন না।

কেবলমাত্র আহলে সুন্নাতের মুরুব্বীদের জন্য নয় বরং চিন্তাশীল যুব সমাজের প্রতিও এই উদার আহ্বান জানানো হলো, তারা যেন অন্ধ অনুকরণ বাদ দিয়ে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন দলীল ও যুক্তি মোতাবেক আনুগত্য করেন।

থাকে না। তিনিই একমাত্র একক, কেননা এমন কেউ নেই যার সাথে তিনি সঙ্গ রাখতে পারেন অথবা যার অনুপস্থিতি তিনি অনুভব করেন।" [১]

আমি যুব সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টি এমন সম্পদের দিকে আকর্ষন করেছি যা হযরত আলী (আঃ) রেখে গেছেন। তিনি যা কিছু **"নাহ্জ আল-বালাঘা"**-তে জমা করে রেখে গেছেন, সেটা হলো উত্তম একটি কিতাব। কোরআনের পরে এরচেয়ে মর্যাদাবান দ্বিতীয় কোন কিতাব নেই। কিন্তু আফসোস! উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের অপপ্রচার, নৃশংসতা এবং ইমাম আলী (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনকারীদের উপর তাদের জুলুম, নির্যাতন ও কারাগারে নিক্ষেপের ভয়ে মানুষ এই মুল্যবান সম্পদ হতে অজ্ঞই রয়ে গেল এবং বঞ্চিত হয়েছে।

কথাটি যদি আমি এভাবে বলি তা'হলে নিশ্চই অতিরিক্ত বলা হবে না যে, **'নাহ্জ আল-বালাঘা'**-তে এমন গভীর ও অগনিত ইলম্ (জ্ঞান) ও মারেফাত উপস্থাপিত হয়েছে, যার প্রয়োজন প্রত্যেক যুগের মানুষেরই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে -দর্শন, গণিত, রাজনীতি ও হেকমাত ছাড়াও **'নাহ্জ আল-বালাঘা'**-তে চারিত্রিক জ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ধাতুর বিজ্ঞান, আকাশ-বাতাস ও শূন্য মন্ডলের জ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রতি বহু মুল্যবান দিক নির্দেশনা রয়েছে।

সাপেক্ষ (তা'লীক) ঃ উপরোক্ত দুই প্রকারের আকিদা-বিশ্বাসে স্পষ্টরূপে পার্থক্য বিদ্যমান।

আহলে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহ্-কে চেহারা-সুরত যুক্ত একটি আকৃতি রূপে উপস্থাপন করেছে, যে তিনি একটি মানুষের ন্যায় হাটা-চলা করেন, নেমে আসেন, কোন একটি গৃহে বসবাস করেন, এসমস্ত বেহুদা কথাবার্তা ছাড়াও আরো অনেক **'মাকরূহ্'** ধারণা আছে, যেগুলো হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত।

আমাদের আকীদা হলো যে, আল্লাহ্ পাক আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত, লিঙ্গগত গুণাবলী এবং দেহাবয়ব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। শিয়ারা বলেন যে, **"দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র দর্শন সম্ভব নয়"**। স্বয়ং আমারও আকীদা হচ্ছে যে, যে সমস্ত রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাতগণ আল্লাহ্র জন্য আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত ও লিঙ্গগত গুণাবলীর সত্বারুপে ধারণা পোষণ করেন, ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত সমুহ সাহাবাদের যুগে ইহুদীরা বর্ণনা করেছে। কারণ **"কা'বুল আহবার"**, যে একজন ইয়াহুদী ছিল, সে ইহুদী মতবাদকে বিভিন্ন দূর্বল চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধিহীন রাবি (রেওয়ায়েতকারী) যেমন আবু হুরায়রা ও ওয়াহেব বিন মুম্বাহ্দের মাধ্যমে ঐসমস্ত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অতঃপর সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বেশীরভাগ হাদীসই আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আমি ইতিপূর্বেই প্রমান করেছি যে, আবু হুরায়রা, নবী (সঃ)-এর হাদীস এবং কা'বুল আহবারের বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয়

---

১ **নাহ্জ আল-বালাঘা**, অনুবাদ ঃ জেহাদুল ইসলাম, খোৎবা-১, আকাশ, পৃথিবী ও আদম সম্পর্কে

বেহেশতের জন্য এমন কি তার এবং বেহেশতের মাঝে এক গজের ব্যবধান থাকবে, এতদসত্ত্বেও ভাগ্যলিপি তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এবং তার দ্বারা এমন সব কর্মকান্ড করাবে, যেগুলি সরাসরি জাহান্নামের দিকে ধাবিত করবে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেহ মন্দ আমল করবে এমন কি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক গজ ব্যবধান থাকবে, এতদসত্ত্বেও ভাগ্যলিপি তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে এবং তার দ্বারা এমন কর্ম করাবে যার জন্য সে বেহেশতে দাখিল হয়ে যাবে"। [১]

মুসলিম অনুরূপভাবে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে আয়শা বলেন ঃ *"একজন আনছারের বাচ্চার মৃত্যুর পর রাসুল (সাঃ)-কে ডাকা হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাঁর ভাগ্য সু-প্রসন্ন যে সে বেহেশতের পাখি হয়ে গেল, কারণ তার দ্বারা কোন পাপ কর্ম হয়নি আর না সে পাপ সম্পর্কে কিছু জানতো'। নবী (সাঃ) বল্লেন, 'হে আয়শা, ইহা ছাড়া আরো অনেক কিছু আছে, আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত তৈরী করেছেন এবং তার জন্য বেহেশ্‌ত বাসীকেও পয়দা করেছেন। আল্লাহ্ জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং তার জন্য জাহান্নাম বাসীদেরকে পয়দা করেছেন। আর এইটা তখন থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, যখন তারা তাদের পূর্বপরুষদের ঔরশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।* [২]

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন যে, *এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "ইয়া রাসুল্লাহ্, জান্নাতবাসী কি জাহান্নামবাসীদের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে"। রাসুল (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ।* তখন লোকটি বল্লো, *'তাহলে আমরা আমল কেন করি?'* রাসুল (সাঃ) বল্লেন, *'যে ব্যক্তি যে আমল করে তাকে সেই আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং সে ঐ আমলই করতে বাধ্য'।* [৩]

হে পরয়ারদিগার, তুমি পুতঃপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত, তুমি এমন ধরণের জুলুম হতে মুক্ত, তুমিই মহান। আমরা এ ধরণের হাদীস সমুহকে কেমন করে কবুল করে নিব, যেগুলি তোমার পবিত্র কিতাবের সরাসরি বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ঐ কিতাবে তুমিই বলেছ ঃ

- **"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে"।** [৪]
- **"আল্লাহ্ অণু পরিমানও যুলুম করেন না"।** [৫]
- **"তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলুম করে না"।** [১]

---

১ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৮, পৃঃ ৪৪ কিতাবুল ক্বদর এবং **সহীহ্ বুখারী** খঃ ৭, পৃঃ ২১০

২ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৮, পৃঃ ৫৫ কিতবিুল ক্বদর

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ২১০ কিতাবুল ক্বদর

৪ সূরা ইউনুস ঃ ৪৪

৫ সূরা নিসা ঃ ৪০

দ্বিতীয় প্রশ্ন

আদ্‌লে ইলাহী (আল্লাহ্‌র ইনসাফ) ও জবর (বাদ্ধবাধকতা) সম্পর্কে ঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ **"বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক"।** [১] **"দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে"।** [২] **"কেহ্ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু যে পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে"।** [৩] **"অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা, তুমি উহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ"।** [৪]

অতএব আপনারা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঐ সমস্ত হাদীসগুলিকে কেন কবুল করে থাকেন, যে হাদীসগুলিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কর্মকান্ডকে জন্মের পুর্বেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ *"আদম (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর মাঝে বিতর্ককালে মুসা (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আদম (আঃ) আপনি আমাদের পিতা, কিন্তু আপনিই আমাদের বিপদে ফেলেছেন এবং বেহেশ্‌ত হতে বিতাড়িত হওয়ার কারণও আপনি'। হযরত আদম (আঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'হে মুসা আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাকে তাঁর কালামের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং নিজ হাতে সেটা তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অথচ ঐ ব্যাপারের জন্য তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করছ যেটা আল্লাহ্ আমার জন্মের চল্লিশ বৎসর পূর্বেই আমার জাতির (মানব জাতি) জন্য ভাগ্য বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন'*। সুতরাং আদম (আঃ), মুসা (আঃ)-এর উপর তিনটি হুজ্জাত (দলিল) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন"। [৫]

মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে ঃ "*যে পদ্ধতিতে তোমাদের প্রত্যেকের জন্ম হয়েছে, সেটা এই রকম -নিজ মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন অবস্থান কর, তারপর আল্লাহ্ (বির্য স্থিতি) হয়, এই অবস্থা চল্লিশ দিন থাকে, তারপর মায্‌গাহ্ (মাংশপিন্ড) তৈরী হয়, এই অবস্থায় চল্লিশ দিন থাকে। তারপর ফেরেশ্‌তাকে পাঠানো হয়, ফেরেশতা তাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেয় যে, তার রিয্‌ক, মৃত্যু, আমল এবং তার ভাল-মন্দকে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হোক। সেই সত্তার কসম যিনি হলেন আল্লাহ্, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ*

---

১ সূরা কাহাফ ঃ ২৯

২ সূরা বাকারা ঃ ২৫৬

৩ সূরা যিল্‌যাল ঃ ৭-৮

৪ সূরা গাশিয়া ঃ ২১-২২

৫ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ২১৪ কিতাবুল ক্বদরে এবং **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৮, পৃঃ ৪৯

জব্বার, শক্তিমান এবং তার অধিকার আছে, তিনি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে তাঁর ইচ্ছামত জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেন, কোন দোষের কারণে নয়, যেহেতু তাঁর অধিকার আছে সেহেতু তাঁর ইচ্ছামত যা খুশি তাই করবেন। **তাহলে কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এমন আল্লাহ্‌কে রহীম, প্রজ্ঞাবান বা ন্যায় পরায়ন বলে স্বীকার করবে?**

আমরা যদি কোন অমুসলিম আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আলাপ কালে বলি যে, আমাদের দ্বীন ঐ সমস্ত গুণাবলীর উপর দন্ডায়মান, আমাদের দ্বীন, মানুষ জন্ম লাভের পূর্বেই তার পুরস্কার এবং শাস্তিকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। **এমতাবস্থায় তারা কি কখনো দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং দলে দলে আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে?**

হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি পুতঃপবিত্র, এগুলি এমন সব জঘন্য আকিদা-বিশ্বাস যা উমাইয়ারা তাদের দোষ-ক্রটিকে গোপন করার জন্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যসন্ধানীগণ এই রহস্যটি জানেন। এগুলি হলো সম্পুর্ণ রূপে বাতিল ধ্যান-ধারণা, কারণ এগুলি তোমার পাক কালামের বিরুদ্ধাচরণ করে।

তোমার প্রিয় রাসুল (সাঃ) তোমার সাথে এমনসব মিথ্যাকে সম্পৃক্ত করতে পারেন না, যেগুলি তোমার ওহির বিরুদ্ধাচরণ করবে। ইহা তো প্রমানিত যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"যখন তোমাদের মাঝে আমার কোন হাদীস বর্ণিত হয় তখন সেটাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে মিলিয়ে নাও, সেটা যদি কিতাব সন্মত হয় তাহলে গ্রহণ কর, আর যদি কিতাবের বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেটাকে দেয়ালে ছুড়ে মারো।"**

উপরে বর্ণিত হাদীস এবং এধরণেরই আরো কত হাদীস আছে, যেগুলি আল্লাহ্‌র কিতাব আর রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং বিবেক-বুদ্ধিও সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং সেগুলিকে দেয়ালে ছুড়ে মারাই উচিৎ। সেগুলির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করাই উচিৎ নয়। যদিও সেগুলি সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহিত হয়ে থাকে, কারণ বুখারী ও মুসলিম সাহেব পাপমুক্ত (মাসুম) নন। তাদের মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে এই দলিলই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ এই মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষের নিকট নবী, রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন যেন তাঁরা তাঁর পথভ্রষ্ট বান্দাদের ইসলাহ্ (সংশোধন) করেন এবং **'সেরাত-এ-মুস্তকীম'**-এর দিকে হেদায়েত করেন। নেককার বান্দাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন এবং পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি ন্যায় পরায়ন ও দয়ালু, তিনি কেবল তাদের প্রতিই আযাব দিবেন যাদের কাছে রাসুল পাঠিয়ে নিজের হুজ্জাতকে পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে ঃ **"যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মংগলের জন্য**

- **"আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি যুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে"।** [২]
- **"আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল"।** [৩]
- **"আমি উহাদের প্রতি জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল যালিম"।** [৪]
- **"ইহা তাহা তোমাদের হস্তে যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ তো তাহার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন"।** [৫]
- **"যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্য করবে। আর যে খারাপ আমল করবে সেটার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে এবং আপনার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।** [৬]

হাদীসে কুদসীতে বলেছেন ঃ *"হে আমার বান্দারা, জুলুমকে আমি নিজের উপর এবং তোমাদের জন্য হারাম করেছি, সুতরাং পরস্পর জুলুম কর না"*।

অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ্ এবং তাঁর ন্যায় বিচারের প্রতি ঈমান পোষন করে, সে এমন কথা কখোনই মেনে নিতে পারে না যে, আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেই কারোর জন্য **'বেহেশ্‌ত'** ও কারোর জন্য **'দোজখ'** নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছেন এবং তাদের সমস্ত আমলগুলিকেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তারা আমল করতে বাধ্য। ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতগুলি কোরআন বিরোধি, ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলারও বিরোধি, যেটার ভিত্তিতে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি সেটার বিরুদ্ধে এবং মানুষের অধিকার বিস্তৃত নয়।

আমরা ঐ মাযহাবকে কেমন করে কবুল করে নিব যা মানুষের আক্‌ল তথা জ্ঞানকে এই কথার মধ্যে সীমিত করে রাখে যে, মানুষ রক্ত মাংসের পিন্ড এবং প্রকৃতির হাতের কাঠপুতুল। যেমন খুশি তেমন নাচাবে এবং শেষঅবধী জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবে। এটা এমনই একটি আকীদা-বিশ্বাস, যা বিবেক-বুদ্ধি, স্রষ্টা, সৃষ্টি, আবিস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং মানুষ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে, আর যে অবস্থায় আছে সেটারই উপর চুপসে পড়ে থাকে। অথবা যা কিছু তার কাছে আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কারণ তাকে দূর্বল বা বাধ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতগুলিকে কেমন করে গ্রহণ করবো, যেগুলি আক্‌ল তথা জ্ঞান ভিত্তিক নয়। সেগুলি আমাদেরকে এমন সব ধারণা দেয় যে, আল্লাহ্ খালিক,

---

১ সূরা কাহাফ ঃ ৪৯

২ সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৭

৩ সূরা তাওবা ঃ ৭০, সূরা আনকাবূত ঃ ৪০ এবং সূরা রুম ঃ ৯

৪ সূরা যুখরুফ ঃ ৭৬

৫ সূরা আনফাল ঃ ৫১

৬ সূরা ফুস্‌সেলাত ঃ ৪৬

বিনা প্রয়োজনে কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি জমিন, আসমান এবং তার মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করেন নি। এগুলো ঐ সমস্ত লোকের ভ্রান্ত ধারণা যারা কুফুর গ্রহণ করে জাহান্নামের আগুন কামাই করেছে"।

এখানে এই কথাটি বলে রাখতে চাই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ভাইয়েরা আল্লাহ্‌কে জুলুম এবং মন্দ কার্যাবলী হতে মুক্ত জ্ঞান করে থাকেন। এ সম্বন্ধে যখন তাদের নিকট কোন প্রশ্ন করা হয় তখন তারা আল্লাহ্-কে জালিম বলতে অস্বীকার করেন ঠিকই, কিন্তু ঐসমস্ত হাদীসকে যেগুলি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সেগুলিকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের নফস্ দ্বিধা-দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেকারণে তাদের সাথে আলোচনাকালে স্পষ্টই অনুভব করবেন যে তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ পাক ঐসমস্ত কর্মকান্ড করতে পারেন, কিন্তু সে জন্য তাঁকে জালিম বলা যাবে না। কারণ "**তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর ইচ্ছামত যা খুশি তাই করতে পারেন**"।

আবার তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সৃষ্টির পূর্বে তার জন্য কিভাবে জাহান্নামের ফয়সালা করে রেখেছেন? শুধু একারনেই যে, সৃষ্টিকালেই তার ভাগ্যে লিখে রাখা হয়েছিল। আর যে সমস্ত বান্দাদের জান্নাতি হওয়ার জন্য হুকুম দিয়ে থাকেন সেটাও কি তাদের ভাগ্যে সৃষ্টিকালেই লিখে রাখা হয়েছিল? তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই কি জুলুম প্রমানিত হয় না? কারণ যে জান্নাতবাসী হতে চলেছে, সে তার নেক আমলের কারণে নয় বরং আল্লাহ্ তো তার জন্য জান্নাত পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ঠিক তদরুপ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিও তার অপকর্মের জন্য জাহান্নামবাসী হবে না, কারণ সৃষ্টিলগ্ন হতেই তো জাহান্নামী হওয়া তার জন্য নির্ধারিত ছিল? -**এটা জুলুম এবং কোরআনের পরিপন্থি নয় কি?**

হে আল্লাহ্ তুমি পুতঃপবিত্র, যা খুশি তাই কর, আপনারা তাদের এই বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারবেন না। এটাতো পরিষ্কার যে, তারা বুখারী ও মুসলিমকে কোরআনের পাশাপাশি মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের পরে একমাত্র সহীহ্ শুদ্ধ গ্রন্থ হলো বুখারী ও মুসলিম। এখানেই হলো মূল সমস্যা। যার কারণে আজ মুসলমানরা নিষ্পেশিত। বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসীয়রা তাদের এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে সফল হয়েছে যে, তাদের '**বিদ্আত**' গুলি আজ সমাজে বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের নিদর্শন আজকের অসফল রাজনীতি হিসাবে টিকে আছে। কারণ মুসলমানগণ তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও রাজনীতিকে নিজেদের জন্য বৃহত্তর মীরাস বলে গণ্য করে থাকেন। সেটা এই জন্য যে মুসলমানদের দৃষ্টিতে তারাই নবী (সাঃ)-এর হাদীস সমূহ পরিশুদ্ধ রূপে সংকলন করে গেছেন। ঐ সমস্ত মুসলমানরা যদি জানতে পারতো যে তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, তাহলে তারা কস্মিনকালেও ঐ সমস্ত হাদীসগুলিকে বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করত না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত হাদীস যেগুলি আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক।

সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।" [১]

অতএব যে সমস্ত রেওয়ায়েত বুখারী ও মুসলিম সংগ্রহ করেছেন যার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ জন্মের পূর্বেই তাঁর বান্দাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, কাউকে জান্নাতি ও কাউকে জাহান্নামী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, ঐ বিষয়গুলির প্রতি আমি পূর্বেও ইংগিত করেছি যে ঐগুলিই হচ্ছে **'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'**-এর আকীদা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, **"যদি এটাই সত্য হবে তাহলে রাসুলগণের আগমন এবং কিতাবের অবতরণ তো অযথাই হয়েছে"**। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন সব ভ্রান্ত বিষয়াবলীর অনেক উর্দ্ধে, অনেক শ্রেষ্ঠ্য। আল্লাহ্ তাহাই নির্দিষ্ট করে থাকেন যাহা সত্য। সুতরাং এ ধরণের কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। হে মাবুদ, এতবড় অপবাদ হতে তুমি মুক্ত!

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ **"এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, তোমার নিকট যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি। আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি যুলুম করিতে চাহেন না"**। [২]

এই কথাটির স্বপক্ষে **'আইম্মায়ে হুদা'**, **'মাসাহিবুদ্দোজা'** এবং **'উম্মতের মিনারাগণ'** বলেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমস্ত রকমের জুলুম ও মন্দ কাজ হতে মুক্ত তথা স্বাধীন।

আসুন এবার আমরা **'জ্ঞান নগরীর তোরণ'** আমীরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) হতে কিছু শ্রবণ করি। তিনি ঐ সমস্ত ধারণা পোষণকারী মানুষের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন যে, এরাই জ্ঞানে তোরণকে ছেড়ে দিয়েছিল। অতঃপর তাঁর একজন সাহাবী একটি প্রশ্ন করেছিল যে, *"আমাদের শাম নগিরীতে যাওয়া কি আল্লাহ্‌রই ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট (কাযা ও কদ্‌র)"*? মাওলা আলী (আঃ) তার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, ***"আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুক, তুমি সম্ভবত নির্দিষ্ট বলতে ভাগ্যের লিখনকে মনে করছো। যদি বিষয়টি এরকমই হত, সোয়াব এবং আযাবের প্রশ্নই থাকতো না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে স্বাধীনতা দান করে ন্যায় কাজের জন্য আদেশ করেছেন এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার জন্য সাবধান করার পর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন। তিনি কষ্টকে সহজ করে দিয়েছেন, দুঃখ-দুর্দশা থেকে রেহাই দিয়েছেন, অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক বেশী প্রতিদান দিয়েছেন। তাঁর অবাদ্ধতা এজন্য করা হয়না যে তিনি পরাধীন হয়ে গেছেন অথবা তাঁর আনুগত্য এজন্য করা হয়না যে তিনি আনুগত্য করার জন্য বাদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি নবীগণকে বিনোদনের জন্য প্রেরণ করেন নাই, আর না বান্দাদের জন্য***

১ সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ১৫

২ সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৮

হাদীসগুলিকেই গ্রহণ করে থাকেন যেগুলি তিনটি মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক ভাবে) সনদের ভিত্তিতে সহীহ্ বলে প্রমাণিত এবং কোরআন ও আকলের পরিপন্থি নয়।

কিন্তু অপর দিকে আহলে সুন্নাতগণ নিজেদের জন্য ঐ কিতাবগুলিকে অকাট্য দলিল হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বলে থাকেন যে ঐ গ্রন্থাদিতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবই সহীহ্-শুদ্ধ, সেগুলিকে কিছুতেই মিথ্যা বলা যাবে না। আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ট আলেম গবেষণা ও সন্ধান ব্যতিরেকেই অকপটে এই কথাটি স্বীকার করেন। অন্যথায় ঐ সমস্ত গ্রন্থাদিতে এমন প্রচুর হাদীস বর্ণিত আছে যা জ্ঞান সম্মত ও দলিল ভিত্তিক নয়। বরং সেগুলি তো সরাসরি কুফুরের অন্তর্ভূক্ত এবং সম্পুর্ণরূপে কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর চরিত্র এবং আমলের পরিপন্থি। এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শেখ মাহমুদ আবু রিয়াহ্ মিসরীর লিখিত **"আয্‌যু আ'লাস্ সুন্নাতুল মুহাম্মাদীয়াহ্"**-বইটি পাঠক মহলের নিকট যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। উক্ত বইটি পাঠান্তে বুঝতে পারবেন যে, সিহাহ্ সিত্তার মর্যাদা ও মূল্য কতটুকু। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যুবক শ্রেণীর অনেক চিন্ত াশীল ব্যক্তিবর্গ, অন্ধ অনুকরণের শিকল ছিন্ন করে **'হক'** ও **'বাতিল'**-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এমনকি ফেরকাবাজ বড় বড় আলেমগণও এখন বিভিন্ন হাদীস ও সেগুলির রেওয়ায়েত সমুহকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন, সেটা আবার এ কারণে নয় যে, তাদের কাছে ঐসমস্ত হাদীসগুলি দূর্বল বলে প্রমানিত হয়েছে, বরং এই জন্য যে ঐ হাদীসগুলির মধ্যে শিয়াদের জন্য হুজ্জাত ও দলিল নিহিত আছে, যা'দ্বারা তারা **'ফিকাহ্‌গত আহ্‌কাম'** এবং **'গায়েবাতের আকিদা'** প্রমান করে থাকেন। যে সমস্ত হুকুম-আহ্‌কাম তথা আকিদা-বিশ্বাস শিয়াগণ পালন করে থাকেন, সেগুলি সুন্নিদের সিহাহ্ সিত্তার কোন না কোন গ্রন্থে মজুদ আছে।

অনেক ফেরকাবাজ আলেম আমাকে বলে থাকেন যে, তোমাদের (শিয়া) আকীদা মতে বুখারীর হাদীস বিশ্বস্ত নয়, তাহলে তোমরা বুখারীর হাদীস দ্বারা দলীল-প্রমান কেন উপস্থাপন কর? আমি উত্তরে বলি যে, বুখারীর সকল হাদীসই সত্য নয়, আবার মিথ্যাও নয়। **অতএব সত্য সত্যই, আর মিথ্যা মিথ্যাই, এতে পার্থক্য নির্ণয় করা আমাদের দায়ীত্ব।**

এক ভদ্রলোক তো বলেই ফেল্লেন যে, "তোমার কাছে কি কোন অনুবিক্ষণ যন্ত্র আছে, যা তোমাকে সত্য ও মিথ্যা বলে দেয়?" আমি বল্লাম, "তোমাদের কাছে যা আছে, আমাদের কাছেও তাই আছে। যে সমস্ত বিষয়ে শিয়া-সুন্নি উভয়েই একমত, সেগুলিই হলো সঠিক, কারণ উভয় পক্ষের কাছে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত। আমরা আহলে সুন্নাতগনকে ঐ সমস্ত হাদীস গ্রহণ করতে বলি, যেগুলিকে তারা সন্দেহ মুক্ত মনে করেন, আর যে সমস্ত হাদীসে দ্বিমত আছে যদিও সেগুলিকে একপক্ষ সঠিক বলে দাবী করেন, সেগুলিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না, আর সেগুলিকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য কাউকে বাধ্যও করা যাবে না। অনুরূপ ভাবে কোন অমুসলিমকেও আমরা সেটা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারি না, আবার সেগুলিকে তাদের সামনে দলিল বা হুজ্জাত হিসাবেও উপস্থাপন করতে পারি না। এই কাথার উপর ভিত্তি করে আমি আপনাদের সামনে একটা উদাহরণ পেশ

কোরআনুল করীমের হেফাজতের দায়ীত্ব আল্লাহ্‌ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কোরআন সাহাবাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল, তাঁরা নবী (সাঃ)-কে পড়ে পড়ে শুনাতেন, সেই কারণে উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা কোরআনের মধ্যে তো কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করতে পারেনি। কিন্তু পবিত্র সুন্নাতের ক্ষেত্রে যেমন খুশি তেমন এবং যে যার ইচ্ছামত রচনা করে নিয়েছে। তারা প্রকৃত পক্ষে কোরআন ও হাদীসের রক্ষকদের প্রাণের দুশমন ছিল, পবিত্র আহলে বাইতের দুশমন ছিল। প্রত্যেক ঘটনার সাথে একটি হাদীস রচনা করে সেটা রাসুল (সাঃ)-এর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের ধোকার মধ্যে রেখে বুঝালো যে, সমস্ত হাদীসের মধ্যে তাদের সংকলনকৃত হাদীসগুলিই হচ্ছে সত্য। অতঃপর মুসলমানগন তাদের উপর বিশ্বাস করে সেগুলিকেই স্বীকার করে নেয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর হতে থাকে। সত্য কথা বলতে কি শিয়ারাও রাসুল (সাঃ) এবং ইমাম (আঃ)-গনের হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে সেগুলিকে রাসুল (সাঃ)-এর কথা বলে চালিয়েছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই অপকর্ম হতে শিয়া-সুন্নি কেহই রেহাই পায়নি। কিন্তু শিয়াগণ ৩টি বিষয়ের জন্য আহলে সুন্নাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এই ৩টি বিষয়ের জন্য শিয়ারাই ইসলামের অন্যান্য ফেরকার চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্যতা রাখেন, কারণ কোরআন ও সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস মতে ঐ বিষয়গুলি বিশ্বস্ত বলে প্রমানিত। বিষয় ৩টি হলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ শিয়াগণ আহলে বাইতকে ভালবাসেন, তাঁদের উপর অন্য কাউকেই প্রাধান্য দেন না। আর আমরা তো জানিই যে আহলে বাইত হচ্ছেন তাঁরা, যাদের নিকট হতে আল্লাহ্‌ পাক সমস্ত প্রকার রিজ্‌স ও পাপ পংকিলতাকে দূর করে দিয়ে এমন ভাবে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছেন, যেমনটি পবিত্রতার হক আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ আহলে বাইত (আঃ)-গণের ইমামের সংখ্যা হলো ১২ (বারো) এবং তাঁদের ধারাবাহিকতা ৩ (তিন) শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যপ্ত এবং তাঁরা দ্বীনের সমস্ত হুকুম-আহ্‌কাম ও হাদীসের সাথে একমত পোষণ করতেন। তাঁদের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর কোন দ্বিমত ছিল না, যেগুলি তাঁদের শিয়াগণ জ্ঞান ও মারেফাতের সাহায্যে হাসিল করেছেন। তাঁদের আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই।

তৃতীয়ত ঃ শিয়াগণ তাদের রচিত বই পুস্তক তথা গ্রন্থাদিতে ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনাকে অকপটে স্বীকার করে থাকেন। আল্লাহ্‌র কিতাব (যাতে কোন বাতিল প্রবিষ্ট হতে পারে না) ছাড়া অন্য সকল কিতাবাদিকে সম্পুর্ণরূপে সঠিক বলে গ্রহণ করেন না। আপনাদের জ্ঞতার্থে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, শিয়াদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির মধ্যে **'উসুলে কাফি'** হলো সবচেয়ে বড় গ্রন্থ, অথচ এই গ্রন্থ সম্পর্কেও তাঁরা বলে থাকেন যে, **"এটার মধ্যেও অনেক মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণিত আছে"**। সুতরাং আপনি শিয়া আলেম সমাজ তথা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করলে অনুধাবন করতে পারবেন যে, তারা সর্বদাই সত্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজে নিমগ্ন থাকেন। অতঃপর ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি হতে কেবল ঐ সকল

এখানে সত্যসন্ধানীদের জন্য জরুরী হয়ে যায় যে, যুক্তি-তর্কের সময় তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে যেন সত্য পথ থেকে দূরে সরে না যান এবং নাফ্‌সের অনুগত হয়ে গোমরাহীর মধ্যে পতিত না হন। সত্য যদি প্রতিপক্ষের পক্ষেই অবস্থান করে তবুও হকের সামনে মাথা নত করে দেয়াই তাদের জন্য ওয়াজিব। তাদেরকে নাফ্‌সানিয়াত মুক্ত হয়ে ঐ সমস্ত মানুষের দলভুক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ যাঁদের প্রসংসায় আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে বলেছেন ঃ **"যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন"**। [১]

সুতরাং এমন কথা যুক্তিসংগত হবে না যে, ইয়াহুদীরা বলছে সত্য আমাদের কাছে আছে, খ্রীষ্টানরা বলছে সত্য আমাদের কাছে আছে, আবার মুসলমানরা বলে যে সত্য আমাদের কাছে আছে। অথচ প্রত্যেকের হুকুম-আহ্‌কাম এবং আকীদা-বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় বিতর্ককারীকে ৩টি দ্বীন সম্পর্কেই যাঁচাই বাছাই করা উচিৎ এবং একে অন্যের সাথে তুলনা করে দেখা উচিৎ, যেন **'সত্য'** প্রকাশ পেয়ে যায়।

আবার ইহাও যুক্তি সংগত নয়, যাহা আহলে সুন্নাতগণ দাবী করেন যে, তারা হকের উপর কায়েম আছেন বা শিয়ারা বলেন যেন তারাই হকের উপর কায়েম আছেন। অথচ উভয়ের হুকুম-আহ্‌কাম ও আকীদা-বিশ্বাসে অনেক অমিল ও ফারাক বিদ্যমান। **'হক'** তো কেবল তাই, যাকে খন্ড-বিখন্ড করা যায় না।

বিতর্ককারীর জন্য জরুরী হয়ে পড়ে, সে যেন নিরপক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের কথাকে যাঁচাই-বাছাই করে, একটির সাথে অপরটির তুলনা করে এবং জ্ঞান তথা বিবেক দ্বারা বিচার করে দেখে, যেন তার কাছে হক পরিস্কার হয়ে যায়। হকের দাবীদার সমস্ত ফেরকার প্রতি আল্লাহ্ পাক আহ্বান করছেন ঃ **"বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের দলিল-প্রমান পেশ কর"**। [২]

সংখ্যাগরিষ্ঠরা হকের উপর কায়েম নাই। বরং বিষয়টা সম্পূর্ন বিপরীত, এবং ইহাই সত্য। কারণ আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন ঃ **"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে"**। [৩]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন ঃ **"আপনি যতই চাহেন না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার না"**। [৪]

সুতরাং সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও ধন-সম্পদ এই কথার দলিল হতে পারে না যে, পশ্চিমারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পূর্বের মানুষেরা বাতিলের উপর কায়েম

---

১ সুরা যুমার ঃ ১৮

২ সুরা বাকারা ঃ ১১১

৩ সুরা আন্'য়াম ঃ ১১৬

৪ সুরা ইউসুফ ঃ ১০৩

করতে চাই, তারপর আর কোন সমস্যা থাকবে না, আর না বিভিন্ন কলা-কৌশলে এটাকে রদ করা বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে।

- শিয়াদের দাবী হলো যে, রাসুল (সাঃ) ১৮ই জিলহজ্জ, বিদায় হজ্জ শেষে **'গাদীর-এ-খোম'** নামক স্থানে হযরত আলী (কাঃ)-কে মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত করে বলেছিলেন ঃ **"আমি যার মাওলা, এই আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্‌ আলীর বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু বলে গণ্য কর"**।

যেহেতু উপরোক্ত হাদীস এবং ঘটনাটিকে আহলে সুন্নাতের অনেক আলেমগন তাদের সহীহ্‌ মুসনাদ ও ইতিহাসের গ্রন্থবলিতে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু শিয়াগণ উক্ত হাদীসকে আহলে সুন্নাতের প্রতি হুজ্জাত ও দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন।

- আহলে সুন্নাতের দাবী করে থাকেন যে, রাসুল (সাঃ) মৃত্যুর সময় অসুস্থ অবস্থায় আবু বকরকে (রাঃ) মুসলমানদের নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, **"আল্লাহ্‌, রাসুল এবং মোমিনগন কেবল আবু বকরের প্রতিই রাজী"**।

শিয়াদের গ্রন্থাদিতে উক্ত ঘটনার বা হাদীসের কোথাও কোন উল্লেখ নাই। তবে তাদের কাছে এমন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, রাসুল (সাঃ) আলী (কাঃ)-কে ডেকে পাঠান, কিন্তু আয়শা (রাঃ) তার পিতাকে ডেকে আনান। রাসুল (সাঃ) এই অবস্থা দেখে বলেছিলেন, **"তোমার মত মহিলারাই হজরত ইফসুফ (আঃ)-এর সংগে ছিল"**। আতঃপর তিনি (সাঃ) নিজেই নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে বাহির হলেন এবং আবু বকরকে (রাঃ) মুসাল্লাহ্‌ হতে সরিয়ে দিলেন।

সুতরাং, এটা কিছুতেই ইনসাফ ভিত্তিক হবে না যে, আহলে সুন্নাতগন ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা শিয়াদের প্রতি হুজ্জাত কায়েম করবেন, যেগুলি কেবল তাদের কাছেই সংরক্ষিত আছে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত হাদীস যার মধ্যে দূর্বলতা পাওয়া যায় এবং ঘটনাটি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কারণ রাসুল (সাঃ) হযরত আবু বকরকে (রাঃ) ওসামার অধীনে যুদ্ধে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এই বিষয় তো সকলেরই জানা যে, সৈন্য বাহিনীর সিপাহসালারই (আমীর) পেশ ইমামের দায়ীত্ব পালন করে থাকেন। এবং ইতিহাস স্বাক্ষী যে রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় আবু বকর (রাঃ) মদীনায় ছিলেন না, তিনি তো তখন ১৭ বৎসর বয়স্ক সেনাবাহিনীর আমীর উসামা ইবনে জায়েদের নেতৃত্বে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। এরপরও কি আমরা এটাকে সত্য বলে মেনে নিব যে, রাসুল (সাঃ) আবু বকরকে (রাঃ) নামাজের ইমামতির জন্য নিযুক্ত করে ছিলেন? বরং আমরা উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) ঐ কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করবো যে, রাসুল (সাঃ) **'প্রলাপ বকছেন'** (মায়াজাল্লাহ্‌), তিনি (সাঃ) বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি (সাঃ) কি করছেন, আর কিই বা বলছেন? হুজুর (সাঃ) সম্পর্কে তো এধরনের কথা চিন্তাও করা যায় না এবং শিয়ারা এ ধরণের আকীদা পোষন করেন না।

তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর কর্তৃত্ব শক্তিশালী করার জন্য বা সময়ের পরিণতির ভয়ে করেননি। কোন শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণে সাহায্য পাবার আশায় অথবা কোন দাম্ভিক অংশীদার বা কোন ঘৃণ্য সূত্রের বিরোধিতা ঠেকানোর জন্যও তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অপরদিকে সৃষ্টির সব কিছুকেই ঘৃণ্য শত্রুর বিরোধিতা ঠেকানোর জন্যও তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অপরদিকে সৃষ্টির সব কিছুকেই তিনি প্রতিপালন করেন এবং সকল সৃষ্টিই তাঁর দাসানুদাস। তিনি কোন কিছুর সাথেই যুক্ত নন (বস্তুমোহ নিরপেক্ষ) যাতে বলা যেতে পারে তিনি অমুক বস্তুতে রয়েছেন, আবার কোন কিছু থেকে তিনি বিভক্ত নন যাতে বলা যেতে পারে অমুক বস্তু থেকে তিনি আলাদা। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনা করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন না। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন অক্ষমতা বা ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর কোন নির্দেশে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন প্রকার সংশয় তাঁকে স্পর্শ করে নি। তাঁর রায় সুনিশ্চিত তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং তাঁর শাসন অদম্য। দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর সহায়তা রচনা করা হয়, আবার ঐশ্বর্য আপ্লুত অবস্থায়ও তাঁকে ভয় করা হয়।" [১]

"প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি মানুষের স্রষ্টা এবং যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। তিনি প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছেন প্রবাহিত হওয়ার জন্য এবং লতা-গুল্ম-বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন উচ্চভূমিতে জন্মাবার জন্য। তাঁর আদিত্বের কোন প্রারম্ভ নেই এবং চিরন্তনতার কোন শেষ নেই। তিনিই প্রথম এবং সর্বকালীন। তিনিই চিরস্থায়ী যাতে কোন সীমা নেই। কপাল তাঁর সামনে আবনত হয় (সেজদা করে) এবং ঠোঁট তাঁর একত্ব ঘোষণা করে। তিনি বস্তুনিচয় সৃষ্টি করার সময়েই তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নিজেকে তাদের সাদৃশ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

গতিবিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বোধশক্তির গন্ডিতে কল্পনাশক্তি তাঁকে আন্দাজ করতে পারে না। তাঁর সম্বন্ধে "কখন" বলা যায় না এবং "পর্যন্ত" বলে তাঁকে কোন সময়সীমার গন্ডিভূক্ত করা যায় না। তাঁকে স্পষ্টত প্রতীয়মান করা যায়, কিন্তু "কোথা হতে" বলা যায় না। তিনি সংগুপ্ত, কিন্তু "কিসের মধ্যে" বলা যায় না। তিনি শরীরি নন যে, মরে যাবেন এবং তিনি আবৃত নন যাতে আবদ্ধ করা যায়। তিনি স্পর্শ দ্বারা বস্তুর নিকটবর্তী নন এবং বিচ্ছেদ দ্বারা বস্তু থেকে দূরবর্তী নন।

মানুষের চোখের স্থিরদৃষ্টি, কথার প্রতিধ্বনি, পাহাড়ের মিটমিটে আলো, রাতের গভীর অন্ধকারের পদচারণা -কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। চন্দ্রকিরণ যেখানে পড়ে, সূর্য রশ্মি যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়, সূর্য যেখানে অস্তমিত ও আবার উদিত হয়, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন যেভাবে হয়, সময়ের পরিবর্তন যেভাবে হয় -এসবের কোন কিছুই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়।

---

১ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, অনুবাদ ঃ জেহাদুল ইসলাম, খোৎবা ঃ ৬৪, আল্লাহ্‌র গুণরাজী সম্পর্কে

আছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ "সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিবে"। [১]

আল্লাহ্‌র প্রতি আহলে যিকিরের ধারণা ঃ

হযরত আলী (আঃ) বলেছেন ঃ "প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন এবং সকল প্রকাশ্য বস্তু তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দর্শকের চক্ষু দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু দর্শন করা যায় না বলে তাঁকে অস্বীকারও করা যায় না। যে হৃদয় তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, সে হৃদয়ও তাঁর সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারে না। মহত্ত্বে তিনি এত উঁচু যে, কোন কিছুই তাঁর চেয়ে মহান হতে পারে না। নৈকট্যে তিনি এত নিকটে যে, কোন কিছুই তাঁর চেয়ে নিকটতম হতে পারে না। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব তাঁকে সৃষ্টির কোন কিছু থেকে দুরত্বে রাখে না; আবার তাঁর নৈকট্য সৃষ্টির কোন কিছুকেই তাঁর সমপর্যায়ে আনে না। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান তাঁর গুণাবলী প্রকাশে অক্ষম। এতদসত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে তিনি বাধা সৃষ্টি করেন না। সুতরাং তিনি যে অস্তিত্ববান, সকল বস্তু (আয়াত) এ সাক্ষ্য বহন করে। যে মন তাঁকে স্বীকার করে না, সেও তাঁকে বিশ্বাস করে। যারা তাঁকে বস্তুর সদৃশতায় বর্ণনা করে অথবা তাঁকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তাদের বর্ণনার অনেক উর্ধ্বে।" [২]

"প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর এক অবস্থা অন্যটির শর্ত নয়, যাতে তিনি শেষ হবার পূর্বেই প্রথম হতে পারেন অথবা গুপ্ত হবার পূর্বেই স্ব-প্রকাশ হতে পারেন। তিনি ব্যতীত যাকেই 'এক' (একাকী) বলা হয়, তাকেই ক্ষুদ্রতার জন্য তা বলা হয় এবং তিনি ব্যতীত যে কোন সম্মানিত ব্যক্তিই নগণ্য। তিনি ব্যতীত যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিই দূর্বল। তিনি ব্যতীত প্রত্যেক মনিবই দাসানুদাস।

তিনি ব্যতীত প্রত্যেক জ্ঞানীই জ্ঞানানুসন্ধানী। তিনি ব্যতীত সকল নিয়ন্ত্রকই নিয়ন্ত্রিত। তিনি ব্যতীত সকল শ্রবণকারীই বধির, কারণ হালকা স্বর সে শুনতে পায় না, আবার উচ্চস্বর তাকে বধির করে দেয় এবং দূরবর্তী স্বরও তার কানে পৌছে না। তিনি ব্যতীত সকল দৃষ্টিমান ব্যক্তিই অন্ধ, কারণ সে গুপ্ত রং ও সূক্ষ জিনিস দেখতে পায় না। তিনি ব্যতীত প্রতিটি স্ব-প্রকাশ জিনিসই গুপ্ত, কিন্তু তিনি ব্যতীত কোন গুপ্ত জিনিস প্রকাশ পেতে অসমর্থ।

---

১ সুরা তাওবা ঃ ৫৫

২ নাহ্জুল আল-বালাঘা, অনুবাদ ঃ জেহাদুল ইসলাম, খোৎবা ঃ ৪৯, আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে

রাসুল (সাঃ)-এর (ইস্‌মাত) নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে তৃতীয় প্রশ্ন ঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ **"আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন"**। [১]

অন্যত্র বলেছেন ঃ **"এবং সে মনগড়া কথা বলে না, যা বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"**। [২]

আল্লাহ্ পাক আরো বলেছেন ঃ **"রাসুল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক"**। [৩]

উক্ত আয়াত সমুহ রাসুল (সাঃ)-এর নিষ্পাপ হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট দলিল। অথচ আপনারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) বলেন যে, "**কেবল কোরআন প্রচারের ক্ষেত্রেই রাসুল (সাঃ) মাসুম ছিলেন, আর অন্যান্য সময়ে তিনি সাধারণ মানুষের মত ভাল-মন্দ উভয় কাজই করতেন**" এবং বিভিন্ন ঘটনা ও বর্ণনা, যা আপনাদের সিহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য সহীহ্ গ্রন্থাদিতে সংকলিত আছে, সেগুলিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে কথাটিকে সত্য বলে প্রমান করে থাকেন।

এমন উদ্ভট আকীদা পোষন করার পর, আপনাদের দাবীর স্ব-পক্ষে আর কি দলিল থাকতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকাই যথেষ্ট। অথচ রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত তো আপনাদের কাছে অরক্ষিত বা অগ্রহণযোগ্য, কারণ এতে ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু আপনাদের আকীদা মতে রাসুল (সাঃ) ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন। পক্ষান্তরে আমরা বিশ্বাস করি যে, "**পবিত্র কোরআনের সম্পূর্ন তফসীর রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সমুহের উপরই নির্ভরশীল**"। **কিন্তু আপনাদের কাছে এমন কোন দলিল আছে কি যে, ঐ তফসীর 'আল্লাহ্‌র কিতাব'-এর বিরুদ্ধে নয়?**

এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন যে, "**রাসুল (সাঃ) মুসলেহাতের কারণে অনেক সময় কোরানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন**" (নাউজুবিলাহ্)। আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন

---

১ সুরা মায়েদা ঃ ৬৭

২ সুরা নজম ঃ ৩

৩ সুরা হাশর ঃ ৭

তিনি সকল সীমা ও পরিসীমা এবং সকল গননা ও সংখ্যার অতীত। যারা তাঁর প্রতি সীমিত গুণারোপ করে, তাদের ধারণার অনেক অনেক উর্ধ্বে তিনি। পরিমাপের গুণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা, ঘরে বসবাস করা, কোন স্থানে থাকা -এসব গুণ তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ সীমা-পরিসীমা সৃষ্টির জন্যই নির্ধারিত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব বস্তুতে আরোপ করা যায়।

তিনি চিরন্তন বস্তু থেকে বা উপস্থিত কোন নমুনা থেকে বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি আকৃতি দিয়েছেন যেভাবে আকৃতি দিতে চেয়েছেন এবং তাতে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি হয়েছে। কোন কিছুই তাঁর অবাধ্য হতে পারে না। কিন্তু কোন কিছু তাঁর বাধ্য হলেও তাঁর কোন উপকার হয় না। অতীতে যারা মরে গেছে তাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেরূপ বর্তমানে যারা বেঁচে আছে তাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান একইরূপ। উর্ধ্বাকাশে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেরূপ মাটির নিম্নদেশে যা কিছু আছে উহা সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান একইরূপ।

কাজটি করেছেন"। অনুরুপভাবে লোকটির ঐ কথা যে, "রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ঐ সময় কোন ভুল-ত্রুটি হত না যখন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর হুকুম প্রচারের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তিনি যখন নিজের ইচ্ছায় কিছু বলতেন তখন তিনি মাসুম হালতে থাকতেন না। সেই কারণে সাহাবাগণ তাঁকে সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন যে, আপনি এই কথা নিজ ইচ্ছায় বলছেন না এটা আল্লাহ্‌র বানী। রাসুল (সাঃ) যদি বলতেন যে, তিনি কথাটি নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেছেন, তখন সাহাবাগন তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিতেন, তাঁকে উপদেশ দান করতেন এবং রাসুলও (সাঃ) সাহাবাদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতেন। আবার কখনো এমনও হত যে, বিভিন্ন সাহাবীর সিদ্ধান্তের সমর্থনে এবং রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোরআনের আয়াত নাজিল হত। যেমনটি বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এধরণের আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে"।

আমিও ভদ্রলোকটিকে বিভিন্ন ভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা হয়ে যায়। কারণ আহলে সুন্নাতের লোকজন কেবল ঐ সমস্ত বর্ণনার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন যেগুলি তাদের **'সিহাহ্ সিত্তার'** মধ্যে বর্ণিত আছে। যেগুলি দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর নিস্পাপতা (ইসমাত) কলংকিত হয় এবং তাঁকে সাধারণ মানুষের চেয়েও নিচের কাতারে নামিয়ে দেয়। একজন যোদ্ধা বা সেনাপতি অথবা একজন সুফি তরিকার শায়েখের চেয়েও কম মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। আমি কথাটি অযথা বলিনি যে, **"আহলে সুন্নাতগণ রাসুল (সাঃ)-কে সাধারণ মানুষের কাতারের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছেন"**, কারণ আমরা যখন আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সহীহ্ গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করি, তখন স্পষ্ট রূপেই প্রতিয়মান হয় যে, উমাইয়াদেরই ধ্যান-ধারণা তাদেরই আমল হতে অদ্যাবধি মুসলমানদের বুদ্ধি-বিবেক তথা আকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমরা যখন ঐ সমস্ত হাদীস রচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি সন্ধান চালাব তখন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, উমাইয়ারা তাদের রাজত্বকালে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লোভ অথবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মুসলমানদের দ্বারা রচনা করিয়েছে। সবচাইতে অধিক মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এই গর্হিত কাজটি আঞ্জাম দিয়েছে। বনু উমাইয়ারা কষ্মিনকালেও এমন আকীদা পোষণ করেনি যে, **"মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুলাহ্ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসুল বা সত্য নবী"**। তারা খুব বেশী হলে তাঁকে একজন যাদুকর বলে বিশ্বাস করত এবং বলতো যে, **"তিনি যাদুর প্রভাব খাটিয়ে মানুষের উপর বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং গরীব তথা মুস্তাদআফীনদের দোহাই দিয়ে নিজের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। বিশেষ করে গোলামরাই তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিল এবং তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল"**।

এটাই ছিল বনু উমাইয়াদের আকীদা-বিশ্বাস এবং এই ধ্যান-ধারণাই তাদের পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যখন ইতিহাসের বই-পুস্তক অধ্যয়ণ করব, তখন মুয়াবিয়া ও তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং এই কথাটিও পরিস্কার হয়ে যাবে যে, মুয়াবিয়া তার জীবনে কি না করেছে। বিশেষ করে তার নিজ রাজত্বকালে তার ভূমিকা কি ছিল? তখনই কেবল এই সমস্ত ধারণা সত্যে পরিনত হবে।

করেছিলাম, **“রাসুল (সাঃ) কর্তৃক কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান করা সম্পর্কে আপনার কাছে দলিল হিসাবে কোন উদাহরণ আছে কি?”**

ঐ লোকটি উত্তরে বলেছিলেন যে, এই বিষয়ে স্বয়ং কোরআন ঘোষণা দিচ্ছে ঃ **“ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী –উহাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করিবে”**। [১] কিন্তু রাসুল (সাঃ) ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি) করার হুকুম দিয়েছেন অথচ এই আদেশটি কোরআনে নাই”।

আমি বল্লাম ঃ “বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি জেনা করে তখন তাদের ক্ষেত্রে রজমের শাস্তি দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে দোর্‌রা (কোড়া) মারার শ্বাস্তি দেয়ার হুকুম দিয়েছেন”। আমার কথার জবাবে সে বল্লো, “কিন্তু কোরআনে বিবাহিত বা অবিবাহিত বলে কিছু উল্লেখ নাই, কোন বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয় নি বরং **‘জানি’** ও **‘জানিয়া’** (ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিনী) বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে”। আমি বল্লাম, “এই দৃষ্টিকোণ থেকে তো কোরআনের সমস্ত হুকুমই হচ্ছে স্বাধীন, সেগুলিকে রাসুল (সাঃ) নির্দিষ্ট করেছেন। আর এটা হচ্ছে কোরআনের বিরুদ্ধাচারণ, কারণ আপনিই তো বলছেন যে, রাসুল (সাঃ) অনেক ক্ষেত্রে কোরআনের হুকুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।”

তিনি দিশাহারা হয়ে বল্লেন, “কেবল কোরআনই হচ্ছে মাসুম, কারণ সেটাকে রক্ষা করার দায়ীত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করছেন”। কিন্তু রাসুল (সাঃ) হলেন গায়ের মাসুম, তাঁর দ্বারা ভূল-ভ্রান্তি হতে পারে। কারণ কোরআনে বলা হয়েছে, **‘কুল আনা বাশারুম মিসলুকুম’** আমি অবাক হয়ে বল্লাম, “তাহলে আপনারা ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশার নামাজ কেন পড়েন, যখন কোরআনে সময়ের কথা না বলেই, নামাজ পড়ার হুকুম করা হয়েছে”। উত্তরে তিনি বল্লেন, “কোরআনে বলা হয়েছে, **‘ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মওকুতা’** অর্থাৎ ‘‘নামাজ মুমিনদের উত্তম সময়ের সাথে ওয়াজিব করা হয়েছে’ রাসুল (সাঃ) কেবল নামাজের ঐ সময়গুলি বর্ণনা করেছেন”। তখন আমি বল্লাম, “তাহলে আপনারা নামাজের সময়ের ক্ষেত্রে কেন রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে গ্রহণ করে থাকেন, আর জেনাকারীর ক্ষেত্রে রজমের শাস্তিকে কেন কোরআন বিরোধী হুকুম বলে বিবেচনা করে থাকেন?”

ভদ্রলোক আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার ভ্রান্ত যুক্তি-দর্শন দ্বারা নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কোন দলিলই দাড় করাতে পারলেন না। উদাহরণ স্বরূপ তার এই ভাষ্য যে, “নামাজ সম্পর্কে কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই, কারণ রাসুল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন। কিন্তু পাথর মারার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, কারণ তাঁর জীবদ্দশায় একবার কি দু’বার তিনি এই

---

১ সুরা নুর ঃ ২

করে আড়াল করে রাখলাম, কারণ তাদের অন্তর মুয়াবিয়ার ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং তাকে রক্ষা করে থাকেন।

কিন্তু আমরা মুয়াবিয়ার নাফসের দাসত্ব এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তার আকীদা-বিশ্বাসকে বর্ণনা না করে ক্ষান্ত হব না। আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে মুয়াবিয়ার নিজের বাপ-দাদা থেকে কোন অংশে কম ছিল না। সে ঐ হিন্দার দুগ্ধ পান করেছিল, যে মহিলা জেনা, ব্যাভিচার ও খারাপ কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। [১]

অনুরূপভাবে মুয়াবিয়া তার পিতা **'শায়খুল মুনাফেকীন'** আবু সুফিয়ান হতে সবকিছু **'মীরাস'** হিসাবে পেয়েছিল এবং সেও কখনো অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেনি। যাকিছু আমরা তার পিতার নাফসানিয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছি তার সবগুলোই মুয়াবিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বরং ধূর্ততা ও মুনাফেকীতে সে তার বাপকেও হার মানিয়েছে।

জুবায়ের ইবনে বকার মাতুফ ইবনে মুগীরাহ্‌, ইবনে, শোবা সাকাফী হতে বর্ণনা করে বলেছেন, "একদিন আমার পিতা মুয়াবিয়ার নিকট গিয়েছিলেন, তার সাথে দেখা করে আমার নিকট ফেরৎ এসে আমার সাথে আলোচনা কালে বলেন যে, '*মুয়াবিয়া দ্বারা সংঘটিত কান্ড-কারখানা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।*' এক রাত্রে তিনি মুয়াবিয়ার কাছ থেকে ফেরৎ আসলে আমি পিতাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও অনুতপ্ত অবস্থায় দেখে, কিছুক্ষন চুপচাপ থাকলাম, মনে মনে চিন্তা করলাম হয়তো কিছু হয়েছে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, '*আজ রাতে আমি আপনাকে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখছি, ব্যাপারটা কি?*' তিনি উত্তরে বল্লেন, '*হে আমার পুত্র, আমি এই মাত্র একজন খবিসের নিকট থেকে উঠে আসলাম*'। আমি বল্লাম, '*কি এমন ঘটেছে?*' তিনি বল্লেন, 'আজকে মুয়াবিয়ার কাছে আমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। আমি মুয়াবিয়াকে বল্লাম, '*হে আমিরুল মুমেনীন, আপনি তো আপনার লক্ষ্যে পৌছে গেছেন, এখন যদি ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করেন, উদারতা প্রদর্শন করেন তাহলে আপনার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার ভাই বনু হাশিমদের খোঁজ-খবর নেন তাহলে তারা বনু উমাইয়াদের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেছিলেন সেটার প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র কসম আজ তাঁদের কাছে এমন কিছুই নাই যা আপনার জন্য ভীতির কারণ হতে পারে। এই বদান্যতা দ্বারা আপনি চিরকালীন সোয়াব পাবেন এবং আপনার স্মরণও চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।*' আমার এই কথার উত্তরে মুয়াবিয়া বলে, '*আফসোস, শতবার আফসোস, আমি কোন স্মরণ বা সোয়াবের আশা করব, বনু তামিমের একজনার হাতে যখন ক্ষমতা এলো, তখন সে ইন্‌সাফের সাথে কর্ম সম্পাদন করল, যখন মারা গেল তখন তার স্মরণও শেষ হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সমালোচকরা কখনো কখনো আবু বকরের নাম উচ্চারণ করে ফেলে। তারপর বনী আদীর একজনার হাতে ক্ষমতা এল, তখন সে নিজের ইচ্ছামত যা খুশি তাই করল এবং দশ বৎসর উদারতা প্রদর্শন করল। খোদার কসম যেই না মারা গেল, সাথে সাথে তারও স্মরণ বন্ধ হয়ে গেল। কদাচিৎ কখনো কেউ উমরের নাম*

---

১ **রাবিউল আবরার,** খঃ ৩, 'বাবুল কুরবাত ওয়াল ইনসান' এবং **শারহে নাহজুল বালাঘা,** ইবনুল হাদীদ, খঃ ১, পৃঃ ১১১

আমরা সবাই জানি, মুয়াবিয়া কে? তার পিতৃ পরিচয় কি? তার পিতা হল আবু সুফিয়ান ও মাতা হিন্দা। সে হলো এমনই একজন পাপির পাপিষ্ঠ সন্তান, যার পিতা রাসুল (সাঃ)-এর সাথে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে তাঁর (সাঃ) তাবলিগ কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য সৈন্য-সামন্ত জমায়েত করাতেই যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর বিফল হয়ে যায়। আর রাসুল (সাঃ) যখন বিজয় লাভ করলেন, তখন অবস্থা বেগতিক দেখে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু মনের দিক থেকে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। রাসুল (সাঃ), যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ভদ্রতা প্রদর্শন করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমরা স্বাধীন। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তার মনের তাড়নায় আবারও ফেতনা সৃষ্টি তথা ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। এক রাত্রে ইমাম আলী (আঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে আবু বকরের (রাঃ) হুকুমাত ও খেলাফতের অবৈধতা সম্পর্কে উসকানি দিয়ে উত্তেজিত করতে চাইল এবং বললো, "টাকা পয়সা এবং সৈন্য সামন্তের জন্য আমি প্রস্তুত আছি, যা প্রয়োজন সবই যোগান দিব"। কিন্তু আলী (আঃ) তাঁর কু-মতলব বুঝতে পেরে তার প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। আবু সুফিয়ানের তো সমগ্র জীবন ইসলাম তথা মুসলমানদের সাথে দুশমনিতেই শেষ হয়েছে।

এমনকি যখন খেলাফতের বাগদন্ড তার চাচাতো ভাই উসমান ইবনে আফ্ফানের (রাঃ) হাতে এলো তখন সে প্রকাশ্যে কুফর ও মোনাফেকী প্রদর্শন করতে থাকে এবং এভাবে ঘোষনা দেয়, "হে বনু উমাইয়া, খেলাফতকে বলের মত নাচাও, আবু সুফিয়ান কসম খেয়ে বলছে যে, 'বেহেশ্ত ও দোজখ বলতে কিছুই নেই"। [১]

ইবনে আসাকির তার ইতিহাসের ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "আবু সুফিয়ান যখন অন্ধ হয়ে যায়, উসমান ইবনে আফ্ফানের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আর কেউ বসা নাই তো?' হযরত উসমান বল্লেন, 'না কেউ নেই'। তখন আবু সুফিয়ান বললো, "জাহেলিয়াহ্ যুগের আইন জারী করে দাও, রাষ্ট্রকে বিলাসিতার কোলে সোপর্দ করে দাও এবং সমস্ত বড় বড় পদগুলি বনু উমাইয়াদের মাঝে বন্টন করে দাও।"

আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া সম্পর্কে আপনারা তো জানেনেই যে, সে কে? আমরা এখানে তার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করছি এবং জানাতে চাই যে, সে তার শাসনামলে সিরিয়া নগরীতে মুসলমানদের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছে?

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মুয়াবিয়া জোরপূর্বক খেলাফতের আসনে আসীন হয়েই কোরআন ও সুন্নাহর অবমাননা, শরীয়াতের সীমা লংঘন এবং এমনসব কর্মকান্ড শুরু করে দিয়েছিল যা লিখতে গেলে কলমের পবিত্রতা নষ্ট হবে এবং বর্ণনা করতে গেলে জিহ্বার শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা ঐ সমস্ত দোষ-ত্রুটিগুলো সুন্নি ভাইদের কথা চিন্তা

---

১ তারিখে তাবারী, খঃ ১১, পৃঃ ৩৫৭ এবং মুরাওয়াজুয যাহাদ, খঃ ১, পৃঃ ৪৪০

তার গজব উপভোগ করবে, কেননা তুমি আল্লাহ্‌র শরীয়তে 'পরিবর্তন' ও 'পরিবর্ধন' ঘটিয়েছ এবং এই জঘন্য কাজের জন্য শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

আবার আমরা যখন মুয়াবিয়ার মনোনীত অযোগ্য, মদখোর, ফাসেক ও ফাজের পুত্র ইয়াজিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই যে, যেভাবে বেহুদাপনা, নির্লজ্জতা, মদ্যপান, জেনাকারী ও জুয়াবাজীর মত যতসব অপকর্ম পিতা মুয়াবিয়া ও দাদা আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে মীরাস হিসাবে পেয়েছে ঠিক সেইভাবে আকীদা-বিশ্বাসও মীরাসে পেয়েছিল। ঐ জঘন্য বৈশিষ্টগুলো যদি **'মীরাস'** হিসাবে না পেত তাহলে মুয়াবিয়া তাকে নিজের উত্তরাধিকার বলে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত না। সবাই তার চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। অথচ তখনও সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হুসাইন ইবনে আলী (আঃ), **"সৈয়াদে শাবাবি আহলিল জান্নাহ্"** উপস্থিত ছিলেন। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি যে, মুয়াবিয়া কেবল ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অসম্মান করেনি বরং ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য হারাম উপায়ে অর্জিত অনেক ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে।

আমরা পূর্বেই অবলোকন করেছি যে, বনু উমাইয়ারা কিভাবে রাসুল (সাঃ)-এর নামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। যখন তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি তখন নবী (সাঃ)-এর উত্তরসূরী হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মুয়াবিয়া যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে যতক্ষন না জোর পূর্বক রাজা হতে পেরেছে। যতসব খারাপ কাজের রীতি-নীতি চালু করেছিল। নিজ রাজত্বের সমস্ত আলেমদের নামাজ শেষে মিম্বর হতে হযরত আলী (আঃ) এবং আহলে বাইত (আঃ)-গণের উপর লানত করার নির্দেশ দিয়েছিল। আসলে মুয়াবিয়া এ ভাবে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতিই লানত করতে চেয়েছিল। যখন সে নিজের মৃত্যুর নিকটবর্তী হল এবং বুঝতে পারল যে তার উদ্দেশ্য সফলকাম হয়নি, তখন নিজের পাপিষ্ঠ ছেলে ইয়াজিদকে ডেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর হাকিম (শাসক) নিযুক্ত করে দিল, যেন তার এবং তার পিতা আবু সুফিয়ানের মনবাসনা ইয়াজিদ কর্তৃক পূর্ণতা লাভ করতে পারে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই সমস্ত কর্মকান্ড ছিল ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জাহেলিয়াতেরই পশ্চাৎধ্বনি।[১]

অতঃপর, ফাসেক ও ফাজের ইয়াজিদ খেলাফতের বাগদন্ড নিজের হাতে নিয়ে নেয়। পিতার ইচ্ছানুসারে নিজের সেনাপতিদের ডেকে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিয়ে দেয়। রাজত্ব পাওয়ার পর তার প্রথম কাজটি হল যে, রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র নগরী

---

১ **আল আকদুল ফরিদ**, ২য় খন্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্দুরবা বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াবিয়া নিজে মিম্বরে বসে আলী (আঃ)-এর উপর লানত করেছে এবং রাজ্যময় নিজের গর্ভণরদের কাছে মিম্বর হতে আলী (আঃ) উপর যে লানত পাঠ করার জন্য লিখে পাঠায়। সে কারণে তার সহচরগণও লানত পাঠ শুরু করে দেয়। এমন পরিস্থিতে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) মুয়াবিয়ার কছে এই কথা লিখে পাঠিয়ে ছিলেন ঃ *'তুমি মিম্বরে বসে খোদা ও রাসুলের উপর লানত করছো, কারণ, তুমি আলী ও তাঁর বন্ধুদের প্রতি লানত করছো। অথচ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ), আলী (আঃ)-কে বন্ধু গণ্য করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া উম্মে সালমার এই কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনি'*।

স্মরণ করে নেয়। তারপর আমার বংশীয় উসমান ইবনে আফ্‌ফান খলিফার আসনে আসীন হল। তারপর খেলাফতের আসনে ঐ ব্যক্তি আসন গেড়ে বসল, হাসাব-নাসাবের দিক থেকে যার সমকক্ষ অন্য কেউ ছিল না। তার যা করার ছিল সে তা করেছে এবং তার সাথে যা হওয়ার ছিল তা হয়েছে। সেও যখন মারা গেল, তখন তার স্মরণ এবং তার সাথে কৃত সমস্ত ব্যবহারের স্মরণও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বনু হাশিমের লোকটির নাম প্রতি দিন উচ্চ স্বরে পাঁচ বার ***"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌"*** *বলে ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। হে দুর্ভাগা, তার উপস্থিতিতে আর কারোর আমল বা স্মরণ বেঁচে থাকতে পারে কি? আল্লাহ্‌র কসম, হত্যাযজ্ঞ ছাড়া আমার অন্য কোন বিকল্প নেই।'* [১]

দূর্ভাগা, অপদার্থ, আল্লাহ্‌ তোকে লাঞ্ছিত করুক, তুই রাসুল (সাঃ)-এর স্মরণকে দাফন করতে চেয়েছিস, সে জন্য প্রচুর ধন-সম্পদও ব্যয় করেছিস। কিন্তু তোর সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ ও বিফল হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ্‌ নিজেই তোর দিকে ফাঁদ পেতে বসে আছেন এবং রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, **"ওয়ারাফায়ানা লাকা যিক্‌রাক"** অর্থাৎ **আমি আপনার স্মরনকে সমুন্নত করেছি।**

যে যিকিরকে স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত মর্যাদা দান করে দিয়েছেন তুমি সেই যিকিরকে কখনোই দাফন করতে পারবে না। যে আলোকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তুমি তোমার আপ্রাণ চেষ্টা ও সমস্ত সঙ্গী-সাথীকে নিয়েও সেই আলোকে কখনো নিভাতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করে তোমার মুনাফেকীকে প্রকাশ করবেই করবে। তুমি যদি পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর বাদশাহ হয়ে যাও না কেন, তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে তোমার সমস্ত নাম-নিশানা মুছে যাবে। আর একান্তই যদি কেউ তোমার স্মরণ করেই, তাহলে শুধু তোমার ঐসমস্ত কালো ও কু-কর্মকান্ডেরই আলোচনা করবে, যে কুৎসিৎ কর্মকান্ড দ্বারা তুমি ইসলামকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "*হাশিমের বংশধর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র যিকির শত শত বছর বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকবে, এমনকি এক সময় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তাঁর রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে এবং আলোচনাকীরা যখনই তাঁর নাম উচ্চারন করবে* ***'সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম'****-সহ উচ্চারণ করবে*'। [২]

তোমাকে এবং বনু উমাইয়াদেরকে সর্বদাই অপমান-অপদস্থ করা হবে, কারণ তারা তোমার খেলাফত ও রাজত্বকে আহলে বাইত (আঃ)-এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী করার জন্য সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তারা আহলে বাইত (আঃ)-এর ফাযায়েলকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অথচ আল্লাহ্‌র কুদরতে আহলে বাইত (আঃ)-এর ফাযায়েল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিয়ামত দিবসে তোমরা যখন আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন

---

১ **কিতবুল মওফেকিয়াত**, পৃঃ ৫৭৬। **,মুরাওয়াজুজ জোহব**, খঃ ১, পৃঃ ৩৪১। **শারহে ইবনুল হাদীদ**, খঃ ৫, পৃঃ ১৩০ এবং **আল গাদীর**, খঃ ১০, পৃঃ ২৮৩

২ **কিতাবুস সিফ্‌ফীন**, পৃঃ ৪৪

আল্লাহ্র কসম হত্যাজজ্ঞ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এটাতো বনু হাশিমের বাদশাহ্ হওয়ার জন্য একটি নাটক রচনা করা হয়েছিল, আসলে কোন অহি নাযিল হয়নি আর না কোন সংবাদ এসেছে"। [১]

আল্লাহ্, রাসুল (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে বনু উমাইয়াদের আকীদা-বিশ্বাস কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম এবং তাদের ঐসমস্ত জঘন্য কীর্তি-কলাপের কথাও জানতে পারলাম, যা'দ্বারা তারা ইসলামের স্তম্ভ রাসুল (সাঃ)-এর চরিত্রকে কলুসিত করতে চেয়েছিল। সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে অতি সামান্যই বর্ণনা করেছি। যদি বিস্তারিত বর্ণনা করতে চাই তাহলে শুধু মুয়াবিয়ারই কু-কীর্তি দ্বারা একটি মোটা খন্ডের বই রচনা করা যাবে, যুগের নগ্ন ধিক্কার ও গালমন্দই যাদের জন্য প্রযোজ্য। যদিও তাদের কাছ থেকে উপঢৌকন ও বখশিশ্ পাওয়ার মানসে ততকালীন অনেক **'আলেম-এ-দ্বীন'** তাদের দোষ-ত্রুটির উপর পর্দা ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কারণ আলেমগন লোভ-লালসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আলেমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করেছিলেন এবং **'বাতিল'**-এর কাছে **'হক'**-এর সওদা করেছিলেন। অথচ তারা সত্য অবগত ছিলেন, তথাপিও অনেক মুসলমান এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

এই ক্ষুদ্র আলোচনার মাধ্যমে যে কথাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে, তা এই যে, "উমাইয়ারা প্রায় শত বছর ধরে মুসলমানদের উপর রাজত্ব করেছিল, যদিও তারা প্রাগ-ইসলামি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলোকে ত্যাগ করতে পারেনি"।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুনাফেকদের প্রভাব বিস্তার হওয়ায় মুসলমানদের উপর কঠিন আঘাত হেনেছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাসে পরির্তন ঘটানো হয়, চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটানো হয়, তরীকা সমূহে পরিবর্তন ঘটানো হয়, এমনকি তাদের ইবাদত সমুহে অনেক বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যার কারণেই উম্মাত সত্য ও বিজয়ের পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর শত্রুদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিল, আর এভাবেই আল্লাহ্র ওলিরা অপমানিত ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন।

আজ আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে যে আমরা, কু-চরিত্রের পুত্র কু-চরিত্র এবং লানতির পুত্র লানতি মুয়াবিয়ার খেলাফতকাল পর্যন্ত পৌছাব। যে নাকি নিজেকে রাসুল (সাঃ)-এর খলিফা বলে দাবী করতো। এক স্থানে তো ইতিহাস বেত্তাগণও আমাদেরকে ধোকা দিয়ে ফেলেন যে, লোকেরা উমর ইবনে খাত্তাব কে বললো, **'আমরা যদি তোমাকে উল্টা-পাল্টা করতে দেখতাম তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে মোকাবেলা করতাম'**। অন্য স্থানে সেই ইতিহাস বেত্তাগনকে আমরা এই কথাও লিখতে দেখেছি যে, 'মুয়াবিয়া জোর জুলুম করে খেলাফতের আসন দখল করে নেয় এবং নিজের

---

১ **ইনসাবুল আশরাফ**, বালাযারী, খঃ ৫, পৃঃ ৪২। **লেসানুল মিজান**, খঃ ৬, পৃ২৯৪। **তারিখে ইবনে কাসির**, খঃ ৮, পৃঃ ২২১ এবং **আল-এসাবা**, খঃ ৩, পৃঃ ৪৭৩

মদীনাকে তার সৈন্যদের জন্য **'মোবাহ'** ঘোষণা করে দেয়, সুতরাং তার সৈন্যরা তিন দিন পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ, জেনা, ব্যাভিচার চালিয়ে দশ হাজার মর্যাদাবান সাহাবীকে হত্যা করেছিল। কারবালার উতপ্ত মরু প্রান্তরে জান্নাতের সর্দার ও নবীর (সাঃ) প্রতিচ্ছবি ইমাম হুসাইন (আঃ) সহ সকল আহলে বাইতকে ঐ মূর্তিপুজারী হত্যা করেছে। অথচ তিনি উম্মতের মাঝে চন্দ্রের মত অবস্থান করছিলেন। ঐ নরাধম, আহলে বাইতের কন্যাদের চাদর কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বেপর্দা করে ছিল। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।**

আল্লাহ্ পাক যদি শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে না পাঠাতেন তাহলে তো ঐ বজ্জাত ও খবিস, ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আরো না জানি কত বালা-মুসিবাতের আয়োজন করতো। ইয়াজিদের বাপ-দাদার আকীদা যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই ইয়াজিদেরর আকীদা-বিশ্বাসকে প্রকাশ করা একান্ত জরুরী বলে মনে করছি।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে 'হাররাহ্'-কে এমন একটি নিকৃষ্ট ও জঘন্য সময় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যে সময়টাতে হাজারো নারী ও পুরুষ মুসলমান নিহত হয়েছেন, হাজারো যুবতী মহিলা ইয়াজিদের সৈন্যদের ব্যাভিচারের শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়েছেন। এমন পশুতুল্য আচরণ দেখে বাকি লোকেরা জীবনের ভয়ে নিজেদেরকে ইয়াজিদের দাস বলে তার বায়াত গ্রহণ করে নেয়। যারা ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেনি তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হল। এই নির্লজ্জ ও জঘন্য ঘটনার খবর (যার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় খুজে পাওয়া দুস্কর, এতে যে ধরণের জুলুম ও অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তার তুলনায় মোঘল, তাঁতার ও ইসরাইলের নৃশংসতাও হার মানায়) যখন ইয়াজিদকে দেয়া হল তখন ইয়াজিদ অত্যান্ত খুশি হল এবং রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি কটাক্ষ করে কবি যুবায়রীর নিম্নের কবিতাটি পুনরাবৃতি করেছিল। ঐ কবিতা যুবায়রী ওহুদের যুদ্ধ শেষে পাঠ করেছিল ঃ

"হায় আফসোস, আজ যদি বদরের যুদ্ধে নিহত আমার পূর্ব পুরুষরা থাকতো
তাহলে তরবারীর ভয়ে ইতস্ততঃ কুণ্ঠিত, খাজরাজ গোত্রের লোকজনকে দেখে আনন্দে লাফাতো
হে ইয়াজিদ! তোর হাত যেন না থামে, অবশ্যই আমরা বনি হাশিমের বীরদেরকে হত্যা করেছি
আর এটা দ্বারা আমরা বদরের যুদ্ধে নিহত আমাদের পূর্ব পুরুষদের বদলা নিয়েছি
আমি যদি মুহাম্মাদের সন্তানদের সাথে বদলা না নেই তাহলে আমি খাজাফ গোত্রভূক্ত নই
এটা তো বনু হাশিমের বাদশাহ হওয়ার জন্য একটি ঢং করা হয়েছিল মাত্র
আসলে কোন অহি নাজিল হয়নি, আর না কোন ফেরেস্তা এসেছে।"

ওদিকে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর এক নম্বর দুশমন ইয়াজিদের দাদা আবু সুফিয়ান, হযরত উসমান (রাঃ)-কে পরিস্কার ভাষায় বলেছিল ঃ "হে বনু উমাইয়া! খেলাফতকে বলের মত নাচাতে থাক, আবু সুফিয়ান কসম খেয়ে বলছে যে, বেহেশ্‌ত ও দোজখ বলতে কিছুই নেই"। অন্যদিকে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর দুশমন ইয়াজিদের পিতা মুয়াবিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল, "মুয়াজ্জিন যখন আযানে **'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'** বলে, তখন কামবাখ্‌ত এটা ছাড়া আর কি কোন যিকির বা আমল বাকী থাকে?

ঐ মু'মিনদেরই আমীরগণ প্রকাশ্যে মদ্য পান করেছে। জেনা করেছে, রক্তের হোলি খেলেছে, নৃত্য-তামাশা করেছে -কিন্তু এগুলিকে কখনো কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি।

অতএব **'উম্মাত-এ-আসআদিয়া'**-র হাকিমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট যখন এমন ছিল, তখন তাদের আমলাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকতে বাধ্য যাদের উপর তাদের আকীদা-বিশ্বাস প্রভাব ফেলে ছিল। আমাদের আলোচনায় এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ তাদের সাথে রাসুল (সাঃ)-এর ইস্‌মাত ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত আছে।

সর্ব প্রথম আমাদের হুশিয়ারী ঐ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে, প্রথম তিন খলিফা আবু বকর (রাঃ), উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লিখে রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, এমনকি বর্ণনা করতেও নিষেধ করে দিয়ে ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ) তার খেলাফত কালে একদিন সাহাবীদের জড় করে বলেন, "তোমরা রাসুল (সাঃ) হতে হাদীস লিপিবদ্ধ কর এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কর, এর কারণে তোমাদের পরবর্তি লোকজনার মধ্যে চরম বিভেদ সৃষ্টি হবে। সুতরাং এখন হতে তোমরা রাসুল (সাঃ)-এর কোন হাদীস বয়ান করবে না। আর কেউ যদি তোমাদের প্রশ্ন করে তবে বলে দিও যে, তোমার ও আমার মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব তো উপস্থিত আছেই, অতএব তার মধ্যে যা হালাল করা হয়েছে তাকে হালাল গণ্য কর এবং যা হারাম করা হয়েছে তাকে হারাম গণ্য কর। [১]

অনুরূপভাবে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সাহাবীদেরকে হাদীস বয়ান করা থেকে নিষেধ করে ছিলেন। কুজতাহ্‌ ইবনে কা'ব বলেন, "আমরা যখন উমর ইবনে খাত্তবের সংগে ইরাকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে উমর বলেন, '*তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সংগে হাঁটছি?*' আমরা সবাই বল্লাম, '*আমাদের সম্মানার্থে আপনি এরূপ করছেন*'। তিনি বলেন, '*এ ছাড়াও উদ্দেশ্য হল যে, তোমরা যখন কোন পল্লী অতিক্রম করবে তখন কোরআন এমনভাবে পাঠ করবে ঠিক যেমন মাছি ভন ভন করে। তাদেরকে হাদীস সম্পর্কে জানতে দিও না, তাহলে তারা তাতেই বেশী ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়বে। কোরআন বেশী বেশী পাঠ করবে আর হাদীস কম বর্ণনা করবে, আমিও আত্মীদের দলভুক্ত হয়ে থাকব*'। রাবী আরো বলেন যে, 'এই ঘটনার পর আমি আর কোন হাদীস বর্ণনা করি নি'। আমরা যখন ইরাকে পৌছালাম, দ্রুত লোকজন আমাদের দিকে ধাবিত হল, যাতে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। কুজতাহ্‌ তাদেরকে বলে দিলেন যে, '**হযরত উমর হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন**'। [২]

---

১ **তাজকেরাতুল হুফ্‌ফাজ**, যাহাবী, খঃ ১, পৃঃ ২-৩

২ **মুস্তাদরাকে হাকিম**, খঃ ১, পৃঃ ১১০ এবং **কানজুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ২৩৬

প্রথম খোৎবায় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলে, **"আমি তো তোমাদের সাথে কেবল নামাজ পড়া ও রোযা রাখার জন্য যুদ্ধ করিনি, বরং আমি তোমাদের উপর নিজের রাজত্ব কায়েম করার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। সুতরাং আজ হতে আমি তোমাদের আমির ও হাকিম"**। তখন কোন সাহাবাদের কেন সাহস হয়নি যে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। অথচ তারা তারই পদাংঙ্ক অনুসরণ করে চলতে থাকেন। শুধু ইহাই নয় বরং যে বছর মুয়াবিয়া খলিফা হল, সেই বছরের নাম করণ করা হল ***"আ'মুল জামায়াত"*** অথচ ঐ বছরটি ছিল ***"আ'মুল ফিরকাহ্"***।

অতঃপর মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদকে নিজের ওয়ালি বলে নিযুক্ত করে দেয়, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলেরই জানা ছিল, অথচ আমারা তখনও সাহাবাদেরকে উক্ত ব্যপারে রাজি ও সন্তুষ্ট দেখতে পাই। মুয়াবিয়ার এই গর্হিত কাজের প্রতিও সাহাবাদের মনে কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য যেসমস্ত ছালেহ মানুষের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাদেরকে ইয়াজিদ **'হাররাহ্'**-এর ঘটনায় হত্যা করিয়ে দেয়। আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের কাছে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করায় যে তারা হলো ইয়াজিদের গোলাম। এই সমস্ত কথার কোন জবাব আছে কি? তারপর আমরা মুমিনদের প্রতি নেতৃত্ব ও রাজত্বের কল-কাঠি, উমাইয়াদের শ্রেষ্ঠতম ফাসেক ব্যক্তিবর্গ যেমন **'মারওয়ান ইবনে হাকাম'** এবং **'ওয়ালিদ ইবনে উক্ববাদের'** হাতে দেখতে পাই।

তার ফলফল এই হল এই যে, মুমিনদের হাকিম ও আমীর রাসুল (সাঃ)-এর মদীনাকে **'মোবাহ্'** ঘোষনা করে, অধম সৈন্যরা যা করার তা করলই, ইজ্জত ও আব্রু লুষ্ঠন করল, খানায়-এ-কা'বাতে অগ্নি সংযোগ করল, হেরেম শরীফে সব জলিলুল কদর সাহাবীদের হত্যা করল। মু'মিনদের হাকিম রাসুল (সাঃ)-এর বংশধরদের রক্তে হোলি খেলা করল, অর্থাৎ **'রাইহানা'** ও **'যুররিয়্যাতে রাসুল'** (সাঃ)-কে নিঃশেষ করে দিল, রাসুল (সাঃ)-এর কন্যাদের বন্দি করল। কিন্তু আশ্চর্য উম্মাতের মধ্যে কারোর সাহস হল না যে বেহেশতের সরদারের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

ঐ মু'মিনদের আমীরের মধ্য হতে আরেকজন ছিল ওয়ালিদ, সে আল্লাহ্‌র কিতাবকে কুচি কুচি করে ফেলে এবং পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করে বলে, **"হে কোরআন, হাশরের দিন যখন আল্লাহ্‌র সম্মুখে যাবে, তখন তাকে বলে দিও যে, ওয়ালিদ আমাকে কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলে দিয়েছিল"**।

সেও তো মু'মিনদেরই আমীর ছিল, যে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) প্রতি মসজিদের মিম্বর হতে লানত করিয়েছে এবং নিজের রাজত্বে জনগনকে আলী (আঃ)-এর প্রতি লানত করার জন্য নির্দেশ জারি করেছিল। এভাবেই তারা রাসুল (সাঃ)-এর উপরই লানত করত। এতদ্বসত্বেও ঐ সমস্ত মু'মিনদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি, আর যদি কেউ আলী (আঃ)-এর প্রতি লানত করতে অস্বীকার করত, তাকে হত্যা করা হয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলান হয়েছে।

প্রকৃত ওয়ারেশ বা উত্তরাধিকার হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালেব"। আর এভাবেই তাঁর (আলীর) হক তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ের উপর আমি আমার বই ***"কুনু মায়াস্‌সাদেকীন"*** **(সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও)**-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আগ্রহী পাঠকগণের নিকট অবশ্যই তা পাঠের অনুরোধ রইল।

উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হলো এই যে, তিনি ঐ সমস্ত সন্দেহ যুক্ত কথাগুলির পক্ষে উৎসাহ প্রদর্শন করতেন যেগুলি খেলাফত বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকত।

একদিকে আমরা তাকে দেখতে পাই যে, তিনিই আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতের জন্য বায়াতের পথ পরিস্কার করে ছিলেন এবং তার জন্য জোর পূর্বক বায়াত গ্রহণ করাচ্ছিলেন। যেটা নাকি **"হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটি বিষয় ছিল এবং আল্লাহ্‌র অনিষ্টা থেকে রক্ষা করেছেন"**। অন্যদিকে খেলাফতের বিষয়ে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে বলেছিলেন যে, **"আমি যদি আলী ইবনে আবি তালিবকে খলিফা নিযুক্ত করে যাই, তাহলে তিনি মানুষকে সোজা পথে পরিচালিত করবেন"**। অতএব তিনি যখন বিশ্বাস করতেন যে, আলী ইবনে আবি তালিবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করবেন, তাহলে হযরত আলী (আঃ)-কে খলিফা নিযুক্ত করে সমস্ত বিতর্ক ও সমস্যার সমাধান কেন ঘটালেন না? তাহলে তো **'উম্মাত-এ-মুহাম্মাদী'**-র ইসলাহ্‌ ও হেফাজত হয়ে যেত।

এরপর আবার আমরা হযরত উমরকে (রাঃ) সন্দিহান দেখতে পাই যে, তিনি ঐ ৬ সদস্য কমিটির মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে অন্য সবার চাইতে বেশী ক্ষমতা দান করেছিলেন। তারপরও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, বরং বলে ছিলেন, **'হাফ্‌সার গোলাম সালিম যদি জীবিত থাকত তাহলে আমি তাকেই খলিফা নিযুক্ত করতাম'**। এই হাদীসের আলোকেই আবু হানিফা মানুষের খেলাফতের জন্য হুজ্জাত কায়েম করেছেন। এভাবে তিনিও রাসুল (সাঃ)-এর ঐ হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, যেটাতে বলা হয়েছে যে, খেলাফত কোরাইশদের মধ্যেই সীমিত থাকবে। সে কারণেই হয়তো তুর্কিরা খেলাফত অজর্নের জন্য আবু হানিফার মাযহাবকেই গ্রহণ করেছিল এবং তাকে **'ইমাম-এ-আজম'** উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

এটার চেয়ে আরো আর্শ্চযের বিষয় তো এই যে, হযরত উমর (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, সাহাবাদের বন্দী করেন তাঁদেরকে শহরের বাহিরে যেতে নিষেধ করে দিলেন। কাউকে কোন কাজে কোথাও নিয়োগ দিয়ে পাঠালে তখন তাকে হাদীস বর্ণনা না করার জন্য কড়া-কড়ি ভাবে সাবধান করে দিতেন। সাহাবাদের ঐ সমস্ত বইগুলিকে পুড়িয়ে দিলেন, যেগুলিতে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) দূর-দুরান্ত থেকে জনগণকে ডেকে বল্লেন, "রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা কর না এবং এই কাজে সারা জীবন আমার সাথে থেক, কখনো বিচ্ছিন্ন হইও না"। **অতঃপর উমরের জীবদ্দশায় সাহাবাগণ আর কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই'**।[১]

খতিব বাগদাদী এবং যাহবী **'তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজে'** লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "উমর ইবনে খাত্তাব মদীনাতে তিনজন সাহাবা, আবু দারদা, ইবনে মাসউদ এবং আবু মাসউদ আনসারীকে বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করার দায়ে বন্দী করে রাখেন। অনুরুপভাবে তিনি সাহাবাদের হাদীসের কিতাবগুলি জমা করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ ভাবলেন হযরত উমর হয়তো সেগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে চান, যেন সেগুলির মধ্যে কোন বিরোধ না থাকে। তাই তারা তাদের হাদীসের বইগুলি তার নিকট জমা করেন। কিন্তু তিনি হাদীসের সমস্ত বইগুলিকে পুড়িয়ে ফেলেন"।[২]

তারপর হযরত উসমান খেলাফতের আসনে আসীন হয়ে লোকজনকে এই মর্মে অবগত করেন যে, "আবু বকর ও উমরের আমলে যে সমস্ত হাদীস প্রচার হয়নি, ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করার অধিকার কারোর নাই"।[৩]

তারপর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের যুগ এলো। মাসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথেই মিম্বরে উঠে বললো, "হে লোক সকল, খবরদার তোমরা রাসুল (সাঃ) হতে কোন হাদীস বয়ান করবে না। কেবল ঐগুলি বর্ণনা করতে পার, যেগুলি উমরের যুগে বর্ণিত হয়েছে"।[৪]

রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বয়ান না করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ নিহিত ছিল। কারণ এটাই হতে পারে, ঐ হাদীস গুলোর উপর কেউ যেন আমল করতে না পারে। তা না হলে ঐ হাদীসগুলো বর্ণনা না করার জন্য কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে? অথচ হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজ উমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফত আমলে শুরু হলো !

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ) এজন্য হাদীস রচনা করতে নিষেধ করেছিলেন, যেন রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে **'মাওলাইয়্যাত'** ঘোষণার ঐ হাদীসটি বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে না পড়ে। এমনকি পল্লী অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রকাশ না হয়ে যায় যে, আবু বকর ও উমরের (রাঃ) খেলাফত সম্পূর্ণ অবৈধ এবং রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসের পরিপন্থী। যে হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, **"খেলাফতের**

---

১ **আত-তাবাকাতুল কুবরা**, ইবনে সা'দ, খঃ ৫, পৃঃ ১৪০

২ **সুনানে ইবনে মাজা**, খঃ ১, পৃঃ ১২। **সুনানে দারি**, খঃ ১, পৃঃ ৮৫ এবং **তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ**, খঃ ১

৩ **মুন্তাখাব কানজুল উম্মাল**, হাশিয়ায় এবং **মুসনাদে আহমদ**, খঃ ৪, পৃঃ ৬৪

৪ **খতিবে বাগদাদী**, শারফে আসহাবুল হাদীস, পৃঃ ৯১

প্রলাপ বকছেন। ইতিহাসে তার নজীর মেলা দায়। তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি তার কেনা গোলাম এবং সাহাবীদের রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত রেখেছিলেন। বিশেষ করে তিনি যখন খলিফা ছিলেন এবং শক্তি সামর্থ তার পক্ষেই ছিল। আবার এতেও কোন সন্দেহ নাই যে, সাহাবাদের মাঝে বেশীর ভাগই আনসার ও কোরাইশদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং তারাই উত্তম বলে বিবেচিত হতেন, গোত্রদের মাঝে তাদের প্রাধান্য ছিল, ঐ সমস্ত লোকেরা ভয় ও মুনাফেকীর কারণে রাসুল (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন। তাদের একটি বৃহৎ অংশটাকেই উমরের (রাঃ) কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে দেখা গিয়েছে। এবং তারাও নবী (সাঃ)-এর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** দোষ আরোপ করেছেন। এবং রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা না করার নির্দেশের ক্ষেত্রেও তাদেরকেই উমরের (রাঃ) সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাতে দেখা গেছে। আমার তো আকীদা হচ্ছে যে, নবী (সাঃ) শেষ হাদীসটি লেখানো থেকে এই জন্য বিরত থাকলেন, হয়তো আল্লাহ্ তাঁকে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে থাকবেন যে, তাদের পরিকল্পনা অনেক মজবুত, আর এই পরিস্থিতিতে যদি কোন কথা লিখে দেয়া হয় তাহলে সেটা ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করবে। লোকেরা বিশ্বাস করবে না এবং **'মৃত্যু শয্যার প্রলাপ'** বলে উড়িয়ে দিবে।

রাসুল (সাঃ) ঐ বিষয়টিই লিখতে চেয়েছিলেন, যেটার মাধ্যমে উম্মাতকে সমস্ত অন্ধকার ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেদিন নেতৃবৃন্দরা যদি তাদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াত তাহলে আজ ঐ লেখনী দ্বারা পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকার হতে মানুষ মুক্তি পেত।

সুতরাং রাসুল (সাঃ)-এর চেহারার রং কেন পাল্টবে না, তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়ীত এবং তাঁর কানে একাধারে আল্লাহ্‌র ওহির আওয়াজ ভেসে আসছে। নিজের উম্মাতের বেয়াদবী ও দুঃসাহসিকতা দেখে তাঁর অন্তর ছারখার হয়ে গিয়েছিল।[১]

"আফা ইম্মাতা আও কুতেলান কুলাবৃতুম আ'লা আ'কবাবেকুম"।

এই আয়াত তো অনর্থক নাযিল হয়নি বরং ইহা একটি চূড়ান্ত ফল। কেননা আল্লাহ্ পাক তার নবী (সাঃ)-কে উম্মাতের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা এবং ধোকাবাজীর কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তো চোখের খেয়ানত আর অন্তরে লুকায়িত রহস্য পূর্ণাঙ্গরূপে অবগত আছেন। কসম ঐ সত্ত্বার যিনি রাসুল (সাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন ও

---

১ **অনুবাদকের মন্তব্য :** এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, রাসুল (সাঃ) কর্তৃক দোয়াত-কলম আনার বিষয়টিকে সবাই প্রলাপ বলে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছিল। অথচ তাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, তোমরা সবাই আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও, এখনো আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম হালতে আছি"। কই! তখন তো কেউ রাসুল (সাঃ)-এর ঐ কথাটিকে 'প্রলাপ' বললো না, বরং সবাই কথাটির মর্ম বুঝে সুড় সুড় করে তাঁর (সাঃ) গৃহ ত্যাগ করেছিল। রাসুল (সাঃ)-এর পূর্বের কথাটি যদি 'প্রলাপ' হয়ে থাকে তাহলে তো পরের কথাটিকেও 'প্রলাপ' জ্ঞান করে তাঁর (সাঃ) মৃত্যু অবলোকন করার জন্য ঘরেই অবস্থান করা উচিৎ ছিল।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কি জানতেন না যে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসই হচ্ছে কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই বাণী কি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি যে, **"তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল"**। [১] অথবা তিনি কি রাসুল (সাঃ)-এর চেয়েও কোরআন ভাল বুঝতেন?

এটা তো হচ্ছে ঐ সমস্ত লোকের চেষ্টা যারা বলে থাকে যে, কোরআন মজিদের অনেক আয়াত উমরের (রাঃ) রায়ের পক্ষে এবং রাসুল (সাঃ)-এর রায়ের বিপক্ষে নাযিল হয়েছে। হযরত আম্মারের (রাঃ) ঐ কথার প্রতি বড় আশ্চর্য লাগে যা, তিনি উমর (রাঃ)-কে বলে ছিলেন, **"হে উমর আপনি বললে আমি ইহা প্রচার করব না"**। ইহা তো স্পষ্ট যে উমর রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের উপর ক্ষুব্ধ হতেন এবং রাবীগণ বিপদে পতিত হতেন।

যাদের সম্পর্ক ছিল কোরইশের সাথে, ঐ সমস্ত সাহাবারাই যখন খলিফাকে ভয় পেতেন, তারা মদীনার বাইরে যেতে পারতেন না। এমনকি নেহায়েত যদি কেউ মদীনার বাহিরে যেত, তখন তাকে হাদীস বর্ণনা না করার জন্য কড়া হুশিয়ারী প্রদান করা হত। তাদের ঐ সমস্ত বই যেগুলিতে তারা হাদীস লিখে রাখতেন, সেগুলিকে পুঁড়িয়ে ফেলা হত, অথচ তারা কোন প্রতিবাদ করার সাহসও পেতেন না। তাহলে এমন পরিস্থিতিতে বেচারা আম্মারের (রাঃ) অবস্থান কোথায়, আর আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ)-এর শিয়া বা অনুসারী হওয়ার কারণে এমনইতেই তিনি কোরাইশগণের চোখের শূল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমরা যখন ঠান্ডা মন মানসিকতা নিয়ে বিবেচনা করি তখন দেখতে পাই যে, **'ইয়াওমুল খাবীস'** যে দিন রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন, সে দিনটিকে ইবনে আব্বাস **'মুসিবতের দিন'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐদিন রাসুল (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে **'লেখার উপকরণ'** আনতে বলেছিলেন। তিনি তাদের জন্য এমন একটি ওসিয়াত লিখে যাবেন, যেন তারা কখনো পথভ্রষ্ট না হয়। সেদিনও এই উমর ইবনে খাত্তাবই (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত কথার উপর আপত্তি করেছিলেন এবং রাসুল (সাঃ) কর্তৃক **'প্রলাপ বকার'** দোষ চাপিয়ে ছিলেন (মায়াজাল্লাহ্) এবং বলে ছিলেন যে, **'আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট'**। উক্ত ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, নাসায়ী, আবু দাউদ এবং ইমাম আহম্মাদ ছাড়া আরো অনেক ইতিহাস বেত্তাগণ তাদের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নিজেই যখন দুঃসহসিকতার সাথে রাসুল (সাঃ)-কে হাদীস লিখতে বাধা দিয়েছিলেন তাও আবার আহলে বাইত ও সাহাবাদের একটি বিরাট জামায়েতর উপস্থিতিতে। রাসুল (সাঃ)-এর শানে বেয়াদবী করে বলেন যে তিনি (সাঃ)

---

১ সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪৪

যেখানে রাসুল (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, **"তিনি যেন তাঁর স্ত্রীদের পর্দা করতে বলেন"**। [১]

শয়তান রাসুল (সাঃ)-কে ভয় পেত না অথচ উমরকে (রাঃ) দেখে পালিয়ে যেত। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক হাস্যকর ও লজ্জাজনক বিষয়াদি আছে, যেগুলি দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে খাটো করা হয়েছে এবং সাহাবাদের মান-মর্যাদাকে রাসুল (সাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখানো হয়েছে। আর এই সমস্ত জঘন্য কাজে হযরত উমরই (রাঃ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি উমরের (রাঃ) ভক্তবৃন্দ এমন গুজবও ছড়িয়ে রেখেছে যে, **"রাসুল (সাঃ) নিজেই উমরের প্রতি নবী হওয়ার সন্দেহ পোষন করতেন"**। তারা এই হাদীসটি এই জন্য বলে থাকে, কারণ নবী (সাঃ) নাকি বলেছেন যে, **'জিব্রাইল আসতে বিলম্ব হলেই আমি মনে করি সে হয়তো উমরের কাছে গেছে।'** (নাউজুবিল্লাহ্)।

আমার আকীদা হলো এই যে, এ ধরণের হাদীস মুয়াবিয়ার যুগে এ জন্য রচনা করা হয়েছে, যেন আলী (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলাতকে ঢেকে রাখা যায়। সে কারণেই মুয়াবিয়া আবু বকর, উমর ও উসমানের (রাঃ) প্রশংসা ও ফাজায়েল উল্লেখ করে অনেক হাদীস রচনা করিয়েছে, যেন মুসলমানদের নিকট তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আলী (আঃ)-এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ভূ-লুণ্ঠিত হয় -এর ফলে দুটো উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে ঃ

প্রথম উদ্দেশ্য হল ঃ হযরত আলী (আঃ) যাকে আবু তোরাব বলা হয়, তাঁর ব্যক্তিত্বকে খাটো করা আর সাধারণ মানুষকে তাঁর প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করে দূরে সরিয়ে রাখা এবং প্রথম তিন খলিফাকে তাঁর উপরে প্রাধান্য দেয়া।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ঃ হাদীসগুলির মধ্যে জ্বালিয়াতি করা, যেন খেলাফতের বিষয়ে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ ও ওসিয়াত বিলীন হয়ে যায়। বিশেষ করে ইমাম হাসান ও হুসাইন (আঃ) দ্বয়ের খেলাফত সম্পর্কে, কারণ তাঁরা মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে বেঁচে ছিলেন। অতএব প্রথম তিন খলিফা যখন আলী (আঃ)-এর ক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশের কোন তোয়াক্কাই করেন নি, তখন আলী (আঃ)-এর সন্তানদের ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া কর্তৃক রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করা এমন কোন কঠিন কাজ ছিল না।

হিন্দার পুত্র নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে বহুলাংশেই সফলতা অর্জন করেছে। তার প্রমান এটাই যে, আজ আমরা যখন হযরত আলী (আঃ)-এর জ্ঞান, বীরত্ব, নৈকট্য ও ইসলাম তথা মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বা করুনার সন্ধান করতে চাই, তখন আমাদের সামনে কারোর কণ্ঠ ভেসে ওঠে যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"আবু বকরের ঈমানকে যদি সমগ্র উম্মতের ঈমানের পাশে রেখে ওজন করা হয়, তাহলে আবু বকরের ঈমানের পাল্লাটাই ভারী থাকবে"**। আবার কখনো কারোর এই গান আমাদের সামনে বেজে ওঠে যে, **"উমর ফারুক হলেন এমনই ব্যক্তিত্ব যিনি 'হক'-কে 'বাতিল' হতে পৃথক করে**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৪৬

প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন এবং তা তাঁকে এতবেশী প্রতিদান দিয়েছেন যা তাঁর উম্মত দিতে পারেনি। উম্মতের মুর্তাদ হওয়া ও কুফুরিয়াত গ্রহণ করার জন্য তাঁকে দোষারোপ করেননি। বরং রাসুল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেছেন, **"যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম! 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমূককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম! 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছিবার পর।' শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। রাসূল বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে। আল্লাহ্ বলেন, 'এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদেগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।"** [১]

এই আলোচনায় যে বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশনা করে দেয়া জরুরী তা হলো সেই বেদনাদায়ক পরিনাম, যার দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছেছি, পরিনামটা এই যে, যদি আবু সুফিয়ান ও মুয়াবিয়ার পূর্বে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ঐ ন্যাক্কারজনক দুঃসাহসিকতা প্রর্দশন না করতেন তাহলে আবু সুফিয়ান ও মুয়াবিয়া, নবী (সাঃ)-এর শানে বেয়াদবী করার কখনো কোন সাহসই পেত না। বিশেষ করে আমরা যখন রাসুল (সাঃ)-এর দীর্ঘ জীবনকালে হযরত উমরের (রাঃ) ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করি তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অসংখ্যবার রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন।

এতে প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত বিরোধিতার পেছনে নিঃসন্দেহে কোন রহস্য লুকানো ছিল। সম্ভবতঃ রহস্যটি হলো এই যে, রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন উপায়ে হেয় প্রতিপন্ন করে মানুষের দৃষ্টিতে তাঁকে (সাঃ) একজন সাধারণ মানুষের কাতারে নামিয়ে নিয়ে আসা। তাতে হযরত উমরের (রাঃ) আত্মাহংকার, পথভ্রষ্টতা ও নিজ নাফ্‌সের খাহেশ-কে পূরণ করার অভিলাশ যুক্ত ছিল। আর এগুলি এজন্যই করা হতো, যেন মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, নবী (সাঃ) মাসুম (নিষ্পাপ) নন। কথাটির দলিল এই যে, হযরত উমর (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে, "**কোরআন বহু আয়াত উমর ইবনে খাত্তাবের সমর্থনে নাযিল হয়েছে**"। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে আল্লাহ্ পাক রাসুল (সাঃ)-কে ভয় প্রদর্শন করলেন এবং তিনি (সাঃ) কান্না জুড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, "**আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যদি কোন মুসিবতে ফেলে দেন তাহলে উমর ব্যতীত অন্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না**"। [২]

হযরত উমর (রাঃ) কখনো রাসুল (সাঃ)-কে নির্দেশ দিতেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করতে বলুন। কিন্তু রাসুল (সাঃ) তার নির্দেশ অমান্য করতেন, যার ফলশ্রুতিতে উমরের (রাঃ) কথার স্বপক্ষে কোরআনে পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে।

---

১ সুরা ফুরকান ঃ ২৭-৩১

২ **ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান্নেহায়াতে, সহীহ্ মুসলিম, আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ ও সহীহ্ তিরমিযি** হতে সংকলন করেছেন। অনুরূপভাবে **সীরাতে হালবিয়া ও সীরাতে দাহ্‌লানিয়ার** ১ম খন্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

একদা আবু বকর (রাঃ) দু'জন সাহাবাকে একখন্ড জমি লিখে দিলেন এবং তাতে স্বাক্ষর করার জন্য উমরের (রাঃ) নিকট পাঠালেন। উমরের (রাঃ) সামনে যখন ঐ লিখনীটা ধরা হলো তখন তিনি উক্ত লিখনীর উপর থুথু দিয়ে মুছে ফেলেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় উমরকে (রাঃ) গালমন্দ করতে করতে আবু বকরের (রাঃ) নিকট ফেরৎ যেয়ে রাগান্বিত স্বরে বলেন ঃ 'আমরা বুঝতে পারছি না, খলিফা আপনি, না উমর?' উত্তরে আবু বকর (রাঃ) বল্লেন, 'উমর'। তার কিছুক্ষন পর উমর (রাঃ), আবু বকরের (রাঃ) নিকট এসে বল্লেন, 'ঐ দু'জনকে জমি দেয়ার ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নাই'। আবু বকর (রাঃ) বল্লেন, **'আমি তো পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে, এই কাজের (খেলাফতের দায়িত্ব) জন্য আপনিই আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত কিন্তু আপনি আমার প্রতি জোরা জুরি করলেন'**। [১]

এখনে কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সাধারণতঃ কোরায়েশ ও বিশেষ করে বনি উমাইয়াদের শক্তির মূল উৎস ছিলেন। তারা তাকে আবক্বরী (অতি উত্তম) নামে সম্বোধন করতে লাগলো এবং **'ফারুক'** ও **'আদ্‌ল-এ-মুত্‌লাক্ব'** উপাধিতে ভূষিত করলো। এমনকি রাসুল (সাঃ)-এর চেয়েও বেশী ফজিলাত দেয়া আরম্ভ করল।

এখান থেকেই ইসলামের দুশমন ও ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তারা বলা শুরু করল যে রাসুল (সাঃ) ছিলেন **'মারদ-এ-আবক্বরী'** (অতি উত্তম পুরুষ), তার জাতি মূর্তি পূজারী ছিল, পাথরের খোদাকে পূজা করা তাদের অভ্যাস ছিল। **মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদের এই অভ্যাসটাকে ত্যাগ করাতে পেরেছেন বটে, কিন্তু পূজা করার জন্য 'হাজর-এ-আসওয়াদ' (কালো পাথর)-কে রেখে গেছেন**।

এই সমস্ত বিষয়াদির পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে, উমর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ বা বর্ণনা না করার জন্য কঠোর এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি তিনি সাহাবাদেরকে মদীনাতেই গৃহবন্দী করে রাখতেন। হাদীসের বইগুলিকে আগুনে পুঁড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন, যেন রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারে।

এই বিষয়গুলো দ্বারা আমরা ইহাও বুঝতে পারছি যে, আলী (আঃ) কেন নিজ ঘরে চুপচাপ বসে ছিলেন। কেবল তখনই তিনি বাহির হতেন যখন সাহাবাগণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়ে, উপযুক্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। হযরত উমর (রাঃ) আলী (আঃ)-কে রাষ্ট্রীয় কোন পদেই বহাল করেন নি, বরং তাঁকে ফাতিমার (সাঃআঃ) প্রাপ্য মীরাস থেকেও বঞ্চিত করেছেন। আলী (আঃ)-এর কাছে পৃথিবীর কোন সম্পদই ছিল না। সেই কারণে হয়তো ইতিহাস বেত্তাগণ লিখে ফেল্লেন যে, ফাতিমার

---

১ আল-এসাবা গ্রন্থে হাজর আসকালানী আইনিয়াহর বর্ণনায় লিখেছেন এবং ইবনে আবিল হাদীদ শারহে নাহজুল বালাঘার ৩য় খন্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

থাকেন"। আবার কখনো উসমানের (রাঃ) ক্ষেত্রে এই প্রমান চোখে ধরা পড়ে যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "**উসমান হলেন জুন্নুরাইন, ফেরেশতারাও তাকে লজ্জা পায়**"।

উক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যসন্ধানীদের নিকট নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উমর ইবনে খাত্তাবকে (রাঃ) বেশী ফজিলাত দেয়া হয়েছে। এটা মোটেই কোন সাধারণ বিষয় নয়। কারণ তার ভূমিকাটাই ছিল রাসুল (সাঃ)-এর সাথে ঝগড়া-বিগ্রহ করা, রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা। সে কারণেই কোরাইশগন উমরকে (রাঃ) বন্ধু বলে গণ্য করতেন। বিশেষ করে তার গুরুত্ব কোরাইশগণের নিকট তখন আরো বৃদ্ধি পেল যখন তিনি আলী (আঃ)-এর খেলাফতকে কেড়ে নিয়ে কোরাইশকে পুনঃরায় হাকিম নিযুক্ত করলেন। তারপর তো বনী উমাইয়ার পাপি ও মালাউনদের অন্তরেও খেলাফতের লোভ দানা বেঁধে উঠল। সমগ্র কোরাইশ ও তাদের সমাজপতি আবু বকরও (রাঃ) জানতেন যে মুসলমানদের উপর তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব উমরের (রাঃ) দয়াতেই জুটেছে। রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতায় উমরই (রাঃ) সবচেয়ে বেশী দুঃসাহসী এবং অগ্রনী ছিলেন এবং তিনি আলী (আঃ)-এর পক্ষ্যে রাসুল (সাঃ)-কে ওসিয়াতটি লিখতে দেননি। উমরই (রাঃ) সেই ব্যক্তি যে রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে মানুষকে ধ্বমক দিয়েছেন এবং আবু বকরের খেলাফত ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত রেখেছেন, যেন তারা তড়ি-ঘড়ি করে আলী (আঃ)-এর বায়াত গ্রহন না করে ফেলে। সকীফার আখড়ায় উমরই (রাঃ) চ্যাম্পিয়ন হলেন। তিনিই আবু বকরের (রাঃ) বায়াতকে শক্তিশালী করলেন এবং আবু বকরের (রাঃ) বায়াত অস্বীকারকারী, আলী (আঃ)-এর গৃহে আশ্রয় গ্রহনকারী সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, "**ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবু বকরের বায়াত গ্রহণ কর অন্যথায় আমি ঘরে আগুন ধরিয়ে সবাইকে পুঁড়িয়ে মরাব**"। তিনিই জোর পূর্বক আবু বকরের (রাঃ) পক্ষে সাহাবীদের বায়াত গ্রহণ করেন। আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতকালে এই তিনিই সাহাবীদেরকে বিভিন্ন পদের দায়িত্ব বন্টন করতেন। আমি যদি বলি তাহলে মিথ্যা বলা হবে না যে, আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতকালে মূল শাসক উমরই (রাঃ) ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, '**মুয়াল্লেফাতুল কুলুব**' খলিফার নিকট নিজেদের সেই অধিকার নিতে এসেছিলন, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। দাবী অনুসারে আবু বকর (রাঃ) তাদের অধিকার লিখে দিলেন। কিন্তু তারা যখন ঐ লিখিত আদেশ নিয়ে উমরের (রাঃ) সামনে গেলেন তখন তিনি উক্ত আদেশনামাটি ছিড়ে ফেলে দিলেন এবং বল্লেন যে, "**আমাদের কাছে তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ ইসলামকে সম্মান ও ইজ্জত দিয়েছেন, ইসলাম তোমাদের মুখাপেক্ষি নয়। তোমরা যদি ইসলাম কবুল কর তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় তোমাদের আর আমাদের মাঝে তরবারী তো আছেই**"। উমরের (রাঃ) এমন ব্যবহার দেখে তারা পুনঃরায় আবু বকরের (রাঃ) কাছে ফেরৎ গিয়ে বল্লো, '**খলিফা কে, আপনি না উমর?**" তখন আবু বকর (রাঃ), তার কর্মের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, '**তিনিই হলেন খলিফা**'। [১]

---

[১] **কিতাবুল জাওহিরাতুন নীরাহ ফিল ফিকহিল হানাফী**, খঃ ১, পৃঃ ১৬৪

নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে রাসুল (সাঃ)-এর উত্তম আদর্শ ছিল, কারণ তিনিও (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় মজলুম ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও তিনি মজলুম-ই আছেন।

অথচ আপনি (সাঃ) সমগ্র জীবন জিহাদ, নসীহত এবং মু'মিনদের নাজাতের চেষ্টায় অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু লোকেরা শেষ মুহূর্তে আপনার প্রতি খারাপ ভাষা প্রয়োগ করল, এমন কি **'প্রলাপ বকার'** অভিযোগ উত্থাপন করল। আপনি (সাঃ) যখন তাদের ওসামার অধীনে যুদ্ধে যেতে বল্লেন তখন তারা আপনার হুকুম অমান্য করলো এবং খেলাফতের লালসায় **'সকিফা'**-তে গিয়ে অবস্থান নিল। আর আপনার পবিত্র দেহ মোবারককে বিনা কাফন-দাফনে ফেলে রেখেছিল। এবং মৃত্যুর পর আপনার ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে খাটো করে উপস্থাপন করার চেষ্টায় মেতে উঠল। আপনাকে অ-মাসুম (ভূল-ক্রটির উর্দ্ধে নন) বলে আখ্যায়িত করল, যদিও পবিত্র কোরআন ও বিজ্ঞান আপনার নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে স্বাক্ষ্য বহন করছে। আর এসব কিছু তো এ কারণেই ছিল, যেহেতু সমস্ত হুকুমই মুছে যাবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হবে।

পূর্ববর্তী আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, সাহাবারা খেলাফতের লালসায় রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে খাটো করেছেন। অতঃপর খেলাফত যখন মীরাস রূপে বনু উমাইয়া ও তাদের কর্ণধার মুয়াবিয়ার হস্তগত হল তখন তার দিক থেকে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেটা কেবল একজনের আশপাশ দিয়ে ঘুরপাক খাওয়ার কোন বিষয় নয়। একদিন না একদিন তা হাতছাড়া হওয়ারই কথা, সে কথাকে স্মরণ রেখেই বনু উমাইয়ারা তাদের রাজত্বকালে রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্যাদাকে ভূ-লুন্ঠিত করার জন্য কোন কিছুকেই বাদ রাখেনি। বরং নিজেদের মন-মর্জি মোতাবেক হাদীস রচনা করলো। আমার আকীদা-বিশ্বাস মতে এর জন্য দু'টি বড় কারণ ছিল ঃ

প্রথম কারণ ঃ রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে খাটো করা, আরবদের মাঝে বনু হাশিম রাসুল (সাঃ)-এর কারণে যে সম্মান, মান-মর্যাদা হাসিল করেছিলেন তাকে ধুলিস্যাৎ করা। বিশেষ করে আমরা যখন অবগত আছি যে, বনু উমাইয়া তার ভাই বনু হাশিমের প্রতি চরম হিংসা-বিদ্বেশ পোষন করত এবং তার বিরুদ্ধে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত।

সোনার উপর সোহাগা এই যে, আলী (আঃ), রাসুল (সাঃ)-এর পরে বিনা বাক্য ব্যয়ে বনু হাশিমের সরদার ছিলেন। এই কথা **'খাস'** ও **'আম'** ভবে সবারই জানা ছিল যে, মুয়াবিয়া আলী (আঃ)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষন করত এবং তাঁর কাছ থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যুদ্ধ ও ফ্যাসাদের আগুন ছড়িয়ে দিতে থাকে। অতঃপর আলী (আঃ)-এর শাহাদতের পর মিম্বর থেকে তাঁর উপর লানত পাঠাত। মুয়াবিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে খাটো করার জন্য আলী (আঃ)-এর পরাজয় ও সম্মান হনন অতি আবশ্যক ছিল। ঠিক ঐ রকমটি, যেমন আলী (আঃ)-এর প্রতি লানত পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি লানত পাঠানো।

(সাঃআঃ) ইন্তেকালের পর আলী (আঃ) যখন সাহাবীদের কাছে নিজেকে অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে আবিস্কার করলেন তখন আবু বকরের (রাঃ) বায়াত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

হে আবুল হাসান! আপনার জন্য মোবারকবাদ। তারা কেনই বা আপনার শত্রু হত না? যেহেতু আপনি তাদের বড় বড় বীর সৈন্য ও আত্মীয়দেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন, তাদের অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন, তাদের রাতের নিদ্রা হারাম করে দিয়েছিলেন, তাদের মান-সম্মান ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, পূণ্যের মাঠেও তাদের জন্য কোন স্থান খালি রাখেন নি। উপরন্তু আপনি ছিলেন রাসুল (সাঃ)-এর চাচাত ভাই এবং সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়, ফাতিমা যাহ্‌রার স্বামী, সিবতাইন সৈয়েদা শাবাবি আহ্‌লিল জান্নাহ্‌র পিতা, সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী এবং সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আপনার চাচা হলেন সৈয়েদুশ শুহাদা হযরত হামজা (রাঃ), আপনার সহোদর ভাই হলেন জাফরে তাইয়ার (রাঃ), সৈয়েদুল বাত্‌হা নবী (সাঃ)-এর সাহায্যকারী হলেন আপনার পিতা হযরত আবু তালিব (আঃ)। সমস্ত ইমামগণ আপনারই ঔরস থেকে। আপনি পূর্বগামীদের পূর্বে, আপনি মিলিতদেরও মিলিত। আপনি হলেন শের-এ-খোদা এবং রাসুল (সাঃ)-এর হেফাজতকারী। আপনি হলেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর তরবারী। আপনি হলেন আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর আমিন, তাইতো আপনাকে দিয়ে **'সুরা বারায়াত'** প্রচার করালেন, কারণ আপনি ছাড়া সেটা মাহফুজ (সংরক্ষিত) থাকত না। আপনিই হলেন সিদ্দিকে আকবর, আপনি ছাড়া এই উপাধির দাবীদার হচ্ছে মহা মিথ্যাবাদী। আপনিই হলেন ফারুকে আজম, কারণ আপনি যেদিকে যেতেন 'হক' (সত্য) সেদিকেই যেত। বাতিলের অন্ধকারে আপনার দ্বারাই 'হক' চিহ্নিত হত। আপনিই হলেন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট চিহ্ন, যার ভালবাসার দরুন মুমিনদের ঈমান এবং যার প্রতি শত্রুতার কারণে মুনাফেকদের নেফাক (অপবিত্রতা) চিহ্নিত হত। আপনিই হলেন জ্ঞান নগরীর তোরণ। যে রাসুল (সাঃ) পর্যন্ত যেতে চায় তাকে এই দরজা দিয়েই যেতে হবে। আপনার মারেফাতকে না পাওয়া পর্যন্ত যে রাসুল (সাঃ)-কে পাওয়ার দাবী জানায় সেতো ডাহা মিথ্যাবাদী।

সুতরাং হে আবুল হাসান! তাদের মধ্যেকার কে আছেন যে সমকক্ষ হতে পারে। আপনার মত ফজিলাতের অধিকারী আর কে আছে। কেউ যদি ভদ্রতার নমুনা হয়েই থাকে, তাহলে তো আপনিই হলেন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজুর্গীর শুরু ও শেষ। নিশ্চয়ই সমস্ত গুনাবলী আল-াহ্‌ পাক নিজ করুণায় আপনাকে দান করেছেন, আর সেটার জন্য তো সাহাবীরা আপনাকে হিংসা করবেই। আপনাকে এই কারণে সরিয়ে রাখা হবে যেহেতু আলাহ্‌ পাক নিজের কুরব (নৈকট্য)-এর জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট করেছেন। **"ফাসা ইয়া'লামুল্লাযিনা জ্বলামু আইয়্যো মুন কুলাবিন ইয়নকুলেবুন ..."**

আমার কলম নিশ্চিত রুপে হযরত আমিরুল মুমিনিনের প্রশংসার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় মজলুম ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও মজলুম-ই আছেন।

লক্ষ্য করি যে তারাও মিলনের সময়কে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমলে রাখে, তারাও প্রথমে পরিবেশ সৃষ্টি করে তারপর প্রস্তুত হয়। আর আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল (সাঃ) এমন কাজ কিভাবে করতে পারেন? আল্লাহ্ যেন এই সমস্ত মিথ্যা বর্ণনাকারীদে ধ্বংস করুন। তাদের প্রতি লানত বর্ষিত হোক।

তৎকালীন সময়ে আরবেরা যদিও নারী পুরুষের মিলনকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে ধারণা করত এবং সেটাকে পৌরুষত্বের চিহ্ন বলে দাবী করত। অথচ তারা ঐ রাসুল (সাঃ)-এর মর্যাদার খেলাপ এমন একটি কাহিনী রচনা করে বসল, যিনি নিজেই বলেছেন যে, **"নিজের স্ত্রীর সাথে পশুর মত ব্যবহার করবে না, বরং উভয়ের সমস্যাবলী আপসে সমাধান কর"**।

এই ধরণের রেওয়ায়েত সমুহকেই ইসলামের শত্রুরা রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বলেছে যে, তিনি ছিলেন নারী আসক্ত, সহবাসের ভক্ত, এই যাতীয় অপবাদ তাঁর (সাঃ) প্রতি আরোপ করেছে। (মায়াজাল্লাহ্)

আমরা কি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে,

- **আপনার কাছে এই ঘটনাটি কে বর্ণনা করেছেন?**
- **আপনকে কে বল্লো যে, রাসুল (সাঃ) এক ঘন্টার মধ্যেই ১১ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস সেরে নিতেন?**
- **কথাটি কি স্বয়ং নবী (সাঃ) আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন?**
- **আমাদের মত লোকের কারোর পক্ষে কি সম্ভব হবে যে, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাহিনী অন্য মানুষের সামনে বর্ণনা করবে?**
- **তাহলে কি নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের কেউ একজন কি এই ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন?**
- **কোন মুসলিম মহিলার পক্ষে কি এটা সম্ভব হবে যে, স্বামীর সাথে মিলনের কথা অন্য পুরুষের সম্মুখে ব্যক্ত করবে?**

ব্যাপারটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আনাস ইবনে মালিক নিজেই রাসুল (সাঃ)-কে গোপনে অনুসরণ করতেন এবং রাসুল (সাঃ) যখন স্ত্রীদের গৃহে যেতেন তখন দরজা জানালার ফাক-ফোকর দিয়ে সবকিছু দেখতেন। আমি শয়তানের ধোকাবাজী হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি। মিথ্যাচরীদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক।

এই বিষয়ে আমার তিল পরিমান সন্দেহ নাই যে, বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসীয়দের শাসক গোষ্ঠীরা, যারা নারী ও কৃতদাসীদের প্রতি চরমভাবে আসক্ত ছিল, তারাই নিজেদের অপকর্মকে যায়েজ করার মানসে এমন সব রেওয়ায়েত রচনা করিয়েছে।

(২) বুখারী তার সহীহ্-র ৩য় খন্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম তার সহীহ্-র ৭ম খন্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি

দ্বিতীয় কারণ ঃ রাসুল (সাঃ)-এর ইজ্জত, মান-মর্যাদা, এজন্য হনন করতে চেয়েছিল, যেন বনু উমাইয়াদের ঐ সমস্ত অপকর্ম ও মন্দ কার্য-কলাপ পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারে, যেগুলি দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বনু উমাইয়ারা রাসুল (সাঃ)-এর এমন চিত্র অংকন করেছে যে, তিনি নিজ নাফ্সের অনুগত ছিলেন, নারীর প্রতি এমন আসক্ত ছিলেন যে ওয়াজিব তরক করে দিতেন। আবার দু'য়েক জন স্ত্রীর প্রতি তো এমনই আশেক ছিলেন যে, অন্যের প্রতি ভূলেও ফিরে চাইতেন না। যার কারণে অন্যান্য স্ত্রীগণ ইনসাফের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। সুতরাং **রাসুল (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের মত বদকার, হীন মানুষের জন্য কি ভাবে লানত করা হবে**?!

দ্বিতীয় কারণে সম্ভবতঃ এই গোপন তথ্যও নিহীত থাকতে পারে যে, উমাইয়াগণ রাসুল (সাঃ)-এর জন্য ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত ও হাদীস রচনা করেছে যার উপর ইসলাম পূর্বে আমল করা হত এবং মুসলমানগণ সেগুলিকে সত্য সত্যই রাসুল (সাঃ)-এর কথা বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং সেগুলি তাদের কাছে **'সুন্নাত-এ-রাসুল'** বলে বিবেচিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি হাদীস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা রাসুল (সাঃ)-এর মর্যাদাহানী এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে খাটো করার জন্য রচনা করা হয়েছে। আমি এই আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কেবল ঐ সমস্ত হাদীস উল্লেখ করব যেগুলি বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ্ গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে মানহানীকর হাদীস ঃ

(১) বোখারী **'কিতাবুল গোসল'**-এ **"সহবাসের পর পুনঃ সহবাস"**-এর অধ্যায়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত আনাস বলেন, 'নবী (সাঃ) রাত দিনের মধ্যে ১১ জন স্ত্রীর সাথে এক ঘন্টার মধ্যেই সহবাস করতেন'। রাবী বলছেন, 'আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম যে নবী (সাঃ)-এর কত শক্তি ছিল'? আনাস বলেন, 'আমি এই হাদীস বয়ান করছি যে তাঁকে ৩০ জন বলিষ্ঠ যুবকের শক্তি দান করা হয়েছিল'।

সুধী পাঠকমন্ডলী, এই লজ্জাস্কর রেওয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যেটা আমাদের সামনে রাসুল (সাঃ)-কে একজন নারী সম্ভোগকারী রূপে উপস্থাপন করছে (মায়াজাল্লাহ্)। তিনি (সাঃ) ১১ জন স্ত্রীর সাথে রাত অথবা দিনে এক ঘন্টার মধ্যেই সহবাস সেরে নিতেন, সেটা আবার এমন ভাবে যে বিনা গোসলেই একজনার পর আর একজনার সাথে মিলিত হতেন। (মায়াজাল্লাহ্)

আপনারাই চিন্তা করুন মানুষ কি কখনো স্ত্রীর উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাকি তার সাথে হাস্যরস করে তাকে রাজি করাতে হয়। এটা তো পশুদের মাঝেও আমরা

চরিত্রের এমনই চিত্র অংকন করেছেন, যা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের দিক থেকে মহা আপত্তিকর ও লজ্জাজনক। **তাদের মাঝে নির্লজ্জতার কোন সীমারেখা আছে কি?**

এমন আরো অনেক উদাহরণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যাবে, যেগুলি রচনা করার পিছনে রাবীগনের উদ্দেশ্য ছিল, হয় কোন সাহাবীর সম্মান বৃদ্ধি করা নচেৎ আয়েশার (রাঃ) মর্তবা প্রতিষ্ঠা করা, কারণ তিনি ছিলেন আবু বকরের (রাঃ) কন্যা। অতএব আহলে সুন্নাত জেনে শুনে অথবা তাদের অজান্তেই রাসুল (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকেন। পুর্ববর্তী আলেচনাগুলির মাধ্যমে বিষয়টি প্রমানিত হয়েছে। ঐ সমস্ত হাদীস রাসুল (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাহানীর উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে। এরকম আরো একটি নমুনা তৃতীয় রেওয়াতের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি।

> **(৩)** মুসলিম তার সহীহ্তে **'ফাযায়েলে উসমান ইবনে আফ্ফান'** অধ্যায়ে আয়েশা ও উসমান (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ আবু বকর রাসুল (সাঃ)-এর নিকট আসতে চাইলেন, ঐ মুহুর্তে রাসুল (সাঃ) আয়েশার পাশে শুয়ে ছিলেন। তিনি (সাঃ) আবু বকরকে গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন, কিন্তু যেভাবে শুয়ে ছিলেন ঠিক সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। আবু বকর তার প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা সেরে বিদায় নিলেন। তারপর উমর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, রাসুল (সাঃ) তাকেও প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন, তখনও তিনি (সাঃ) পূর্বাবস্থায় শুয়ে ছিলেন। উমরও তার প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে বিদায় নিলেন। অতঃপর উসমান গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, উসমানের কণ্ঠ শুনা মাত্র রাসুল (সাঃ) শোয়া অবস্থা হতে উঠে বসলেন এবং আয়শাকে বলেন, '*নিজের কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করে উঠে বস*'। উসমান বর্ণনা করেন, '*রাসুলের সাথে আমার প্রয়োজন মিটে গেলে আমিও সেখান হতে প্রস্থান করি*'। তারপর আয়েশা বল্লেন, '*হে আল্লাহ্র রাসুল আমি আপনাকে আবু বকর এবং উমরের আগমনে মোটেই বিচলিত হতে দেখেনি অথচ উসমানের ক্ষেত্রে আপনি ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন*'। উত্তরে রাসুল (সাঃ) বল্লেন, **'হে আয়শা, উসমান হচ্ছে অতি লজ্জাশীল ব্যক্তি, আমার সন্দেহ ছিল, আমি যদি ঐ হালতে শুয়ে থাকি তাহলে উসমান আমার কাছে আসবে না, ফলে তার প্রয়োজনও মিটবে না'**।

নিম্নোক্ত রেওয়াতও উপরোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঘটনাটি বোখারী **'ফাজায়েলে উসমান'**-এ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

> "রাসুল (সাঃ) তাঁর উরু উন্মুক্ত অবস্থায় শুয়ে ছিলেন। আবু বকর প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি (সাঃ) অনুমতি দেন কিন্তু উরুর উপর কাপড় দিলেন না এবং ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকলেন। উমরকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন, কিন্তু পূর্বাবস্থায়ই শুয়ে থাকলেন। কিন্তু উসমান যখন প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন রাসুল (সাঃ) নিজের খোলা ঢেকে ফেল্লেন এবং কাপড় ঠিক-ঠাক করে উঠে বসেন। আয়েশা যখন এটার

বলেন, "একদিন নবীর (সাঃ) কয়েকজন স্ত্রী ফাতিমাকে নবীর কাছে পাঠলেন। নবী তখন আমার পাশে শুয়ে ছিলেন। ফাতিমা গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, অনুমতি পেয়ে ফাতিমা গৃহে প্রবেশ করে বলেন, 'আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আয়েশা বিনতে আবু বকর এবং অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে আদ্‌ল ও ইন্‌সাফ গ্রহণ করেন'। আয়েশা বলেন আমি চুপ করে ছিলাম। রাসুল (সাঃ) ফাতিমাকে বল্লেন, 'হে আমার কলিজার টুকরা, তুমি কি ঐ জিনিসকে পছন্দ করবেনা যা আমার কাছে প্রিয়'? ফাতিমা বল্লেন, **'তাহলে একে (আয়েশাকে) ভালবাস'**।

রেওয়ায়েতে আরো বলা হচ্ছে -দ্বিতীয়বার নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ জয়নাব বিনতে যাহাশকে পাঠিয়ে নবী (সাঃ)-কে আয়শা এবং অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে ইন্‌সাফ গ্রহন করার দাবী উত্থাপন করলেন। জয়নাব যখন রাসুল (সাঃ)-এর কাছে আসেন তখন তিনি আয়েশার কাছে শুয়ে ছিলেন এবং আয়েশার পায়ের উপর কাপড় ছিল না। জয়নাব অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর কাছে ইন্‌সাফের দাবী উত্থাপন করেন এবং আয়েশার প্রতি বকা-ঝকা শুরু করে দেন, অতঃপর আয়েশাও জয়নাবের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু করে দেন। উভয়ে ক্ষান্ত হওয়ার পর রাসুল (সাঃ) হাসতে হাসতে বলেন, **"এ হচ্ছে আবু বকরের কন্যা"**।

আমি নির্ভয়ে বলতে চাই যে, উপরোক্ত রেওয়ায়েত যার মধ্যে রাসুল (সাঃ)-কে একজন নারী সম্ভোগকারী, কামুক এবং স্ত্রীদের ব্যাপারে বে-ইন্‌সাফ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (মায়াজাল্লাহ্‌), তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। আরে বাবা, ইনিই তো সেই রাসুল, যার পবিত্র মুখ হতে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি প্রচার হয়েছে, **"যদি তুমি তাদের প্রতি ইন্‌সাফ করতে না পারার আশংকা অনুভব কর তখন কেবল একজনকেই অথবা তোমার মালিকানাধীন যে দাসী আছে তাকে গ্রহণ কর।"**

অন্যদিকে রাসুল (সাঃ) তাঁর কন্যাকে ঐ মুহূর্তে নিজ গৃহে কেমন করে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারেন, যে মুহূর্তে তিনি তাঁর স্ত্রীর পাশে শায়িত এবং আয়েশার (রাঃ) পায়ের উপর তখন কাপড়ও ছিল না। রাসুল (সাঃ) না তো উঠে বসলেন আর না দাঁড়ালেন বরং শায়িত অবস্থাতেই কন্যাকে বল্লেন, **'তুমি কি ঐ জিনিসকে পছন্দ কর না, যাকে আমি ভালবাসি'**? ঠিক অনুরূপ ঘটনা জয়নাব গৃহের মধ্যে প্রবেশ করার পরও ঘটে। জয়নাব যখন, **'ন্যায়'** ও **'ইন্‌সাফ'**-এর দাবী তোলেন তখন রাসুল (সাঃ) এই কথা বলে রফা-দফা করেন যে, **'এ হচ্ছে আবু বকরের কন্যা'**।

সুধী পাঠক মন্ডলী, উক্ত লজ্জাজনক ঘটনা -যা রাসুল (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সেটার বিষয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করুন। **'আদ্‌ল'** ও **'ইন্‌সাফ'**-এর প্রতি আহলে সুন্নাতরে দৃষ্টি ভংগীকে অবলোকন করুন। অথচ তারাই বলে থাকেন যে, **"ইন্‌সাফ ও ন্যায় বিচার তো হযরত উমরের সাথেই দাফন হয়েগেছে"**। তারা রাসুল (সাঃ)-এর

রাসুল (সাঃ)-এর উপর যাদু করা হয়েছিল। যাদুর প্রভাবে তিনি কি বলছেন বা কি করছেন, কিছুই বুঝতে পারতেন না। মাঝে মধ্যে এমনও মনে করতেন যে, কে জানি তাঁর পাশে এসেছে অথচ তখন তাঁর কাছে কেহই থাকত না।[১]

অনুরুপভাবে এই ঘটনাও রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসুল (সাঃ) সকাল পর্যন্ত মুজনাব (অপবিত্র) অবস্থায় থাকতেন।[২]

রাসুল (সাঃ) গভীর নিদ্রা হতে উঠে বিনা ওজুতেই নামাজ পড়া শুরু করে দিতেন।[৩]

নামাজে সন্দেহ দেখা দিলে রাসুল (সাঃ) বুঝতে পারতেন না যে কত রাকাত নামাজ পড়েছেন।[৪]

রাসুল (সাঃ) ইহাও জানতেন না যে, কিয়ামত দিবসে তাঁর কি হবে বা তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে।[৫]

রাসুল (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেন, সেটা দেখে সাহাবীরা দূরে সরে পড়তেন। কিন্তু রাসুল (সাঃ) সাহাবীদেরকে তাঁর নিকটে এসে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকতে বলতেন যতক্ষণ না তাঁর প্রসাব করা শেষ হয়।[৬]

জী হ্যাঁ, রাসুল (সাঃ) অয়েশার (রাঃ) আবদারের প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন। একদা তার আবদার রক্ষা করতে গিয়ে আয়েশার (রাঃ) গলার হার তালাশ করার জন্য, তিনি (সাঃ) নিজের সাথে অন্যান্য সঙ্গীদেরকে জংগলের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অথচ ঐ মুহুর্তে তাঁর কাছে পর্যাপ্ত পানি ছিলো না আর না আশে পাশে কোথাও কোন পানির হদীস ছিল। এক সময় অধৈর্য হয়ে সাহাবীরা তার পিতা আবু বকরের (রাঃ) কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। তিনি আয়েশার (রাঃ) কাছে এসে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, কিন্তু রাসুল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর পাশেই শুয়ে থাকলেন।

বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ্‌তে **'তাইয়ামুম অধ্যায়'**-এ আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসুল (সাঃ)-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। যখন আমরা একটি জনশূন্য প্রান্তরে অথবা খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী **'বেজাতুল জাইশ'** নামক স্থানে পৌছালে আমার গলার হারটি ভেঙ্গে পড়ে যায়। রাসুল (সাঃ) এবং

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ১৮, এবং খঃ ৭, পৃঃ ২৯

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ২৩২-২৩৪

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৪৪ এবং ১৭১

৪ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১২১৩ এবং খঃ ২, পৃঃ ৬৫

৫ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ৭১

৬ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ২, পৃঃ ১৫৩, আল মাসেহ্ আ'লাল খুফ্‌ফাইন অধ্যায়ে

কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, **"আমি কি ঐ ব্যক্তির সামনে লজ্জা পোষণ করবো না যার কাছে ফেরেশ্‌তারাও লজ্জা পায়"** ।

বনু উমাইয়াদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক। কারণ, তারা তাদের নেতার সম্মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে রাসুল (সাঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলীকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে।

(৪) মুসলিম তার সহীহ্‌র **"ইন্তেক্বায়ে খাতানাইন"** দ্বারা গোসল ওয়াজিব হওয়া অধ্যায়ে রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রী হতে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ একজন ব্যক্তি রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, '*কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটানোর পর যখন তার দেহে ক্লান্তি আসে, তখন কি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপরই গোসল ওয়াজিব হবে*'। ঐ মুহূর্তে রাসুল (সাঃ)-এর পাশে আয়শাও ছিলেন। লোকটির প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (সাঃ) বলেন, '*আমি আর এ (আয়েশা) এরূপই করে থাকি, তারপর গোসল করি*'।

উক্ত রেওয়ায়েতের প্রতি বিচার-বিবেচনা ও মন্তব্য করার দায়-দায়ীত্ব আমি পাঠককুলের উপরই ন্যস্ত করলাম। রাসুল (সাঃ)-এর এই পদাংক অনুসরণ করে আয়েশা (রাঃ) এমনই দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন যে, নিজের সহবাসের ঘটনাবলী সাধারণ ও বিশেষ মহলে অনায়াসেই বর্ণনা করতে আরম্ভ করে দিলেন !!

"আয়েশা বিনতে আবু বকর" হতে বর্ণিত এমন আরো অনেক হাদীস আছে যেগুলো দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর বুজুর্গী ভূ-লুণ্ঠিত এবং তাঁর সম্মানহানী হয়েছে। এক জায়গায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, '*একদা রাসুল (সাঃ) নিজের গাল আয়েশার গালের উপর রেখে হাবশীদের খেল-তামাশা উপভোগ করেছিলেন*'। (মায়াজাল্লাহ্‌)

আবার কোথাও বলা হচ্ছে যে, "রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে নিজের স্কন্ধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। কখনো আয়েশার সাথে ধ্বস্তা-ধ্বস্তিরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে, কখনো আয়েশা রাসুল (সাঃ)-এর উপরে জয়ী হচ্ছেন, আর রাসুল (সাঃ) অপেক্ষায় থাকেন এবং মোটা-তাজা হয়ে পুনরায় আয়েশার মোকাবেলা করে বলেন, **'এটা হলো তোমার পাল্টা জবাব'**। কখনো রাসুল (সাঃ) নিজ গৃহে আয়েশাকে কাঁধের উপর বসিয়ে মহিলাদের ঢোল-বাজনা উপভোগ করছেন, এমন সময় আবু বকর এসে আয়েশাকে বকা-ঝকা করেন"।

উক্ত সহীহ্‌ গ্রন্থাদিতে আরো না জানি এরকম কত নির্লজ্জ ও সম্মানহানিকর রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে -যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে কলংকিত করা। প্রমান স্বরূপ নিম্নের রেওয়ায়েতগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঃ

তিনি **'তাইয়ামুম'**-এর আয়াত সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না। ঘটনাটি বুখারী ও মুসলিম তাদের **'সহীহাইন'**-এ উল্লেখ করেছেন।

অত্র আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই যে, আমরা যেন রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কৃত ষড়যন্ত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো অত্যন্ত নীচ ও হীন প্রকৃতির ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বকে অনেক খাটো করা হয়েছে, তাঁর মান-মর্যাদার প্রতি কালিমা লেপন করা হয়েছে। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী পাপাচারে পরিপুর্ণ, তবুও এ যুগের কোন মানুষই নিজের ক্ষেত্রে এমন সব কথা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করবে না। তাহলে ঐ মহা মানবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে যাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই। যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, **"তিনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্তবায় আসীন"**।

আমার আকীদা হচ্ছে যে, বিদায়ী হজ্জ্বের পরে এবং **'গাদীর-এ-খুম'**-এর দিনে আলীর (আঃ) খলিফা নিযুক্তির পর পরই এ ধরণের ষড়যন্ত্রের সুত্রপাত করা হয়েছিল। কারণ নেতৃত্ব ও রাজত্বের লোভী ব্যক্তিবর্গরা বুঝতে পেরেছিল যে, রাসুল (সাঃ)-এর এই ওসিয়ত তথা ঘোষণার বিরুদ্ধে, অবাধ্যতা প্রদর্শন ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। এই কাজের জন্য আমাদের যদি কুফুরের দিকে ফিরে যেতে হয় তাও যাব। এভাবেই আপনারা রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী লোকজনদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে সক্ষম হবেন। উক্ত দুঃসাহসিকতা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক **'শেষ অসিহাত'** লেখায় বাধাদানকারীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে অথবা উসামার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সাথেও সম্পৃক্ত হোক না কেন। এভাবেই রাসুল (সাঃ)-এর হতাশাব্যঞ্জক ইন্তেকালের পরও তারা ষড়যন্ত্র এবং অবাধ্যতা পরিত্যাগ করেনি। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

- আবু বকরের (রাঃ) পক্ষে জোরপূর্বক বায়াত গ্রহন, বায়াতে অস্বীকৃতি দানকারীদেরকে পুঁড়িয়ে মারার হুমকি প্রদান, যেখানে আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইন (আঃ)-ও অবস্থান করছিলেন।
- গাহাবীদের প্রতি রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস প্রচার করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
- ঐসমস্ত বই গুলোকে পুঁড়িয়ে ফেলা যাতে রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।
- সাহাবাদের এজন্য গৃহবন্দী করে রাখা, তারা যেন রাসুল (সাঃ) হাদীস বর্ণনা করতে না পারেন।
- ঐসমস্ত সাহাবাকে হত্যা করা, যারা আবু বকরকে (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন। [কারণ যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে আবু বকর (রাঃ) খলিফা ছিলেন না। নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তারা আবু

অন্যান্য সঙ্গীরা সেটা খোঁজার জন্য সেখানেই অবস্থান করেন, ঐমুহুর্তে তাদের কাছে বা আশে পাশে কোথাও কোন পানির সন্ধান ছিল না। সাহাবীরা আবু বকরকে গিয়ে বল্লো, '*আপনি আয়েশার কর্মকান্ডের প্রতি লক্ষ করছেন না কেন? তিনি রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের বিরক্ত করছেন। অথচ এই মুহুর্তে আমাদের কাছে বা আশে পাশে কোথাও পানি নাই*'। কথাটি শুনে আবু বকর আয়েশার নিকটে গেলেন, ঐ সময় রাসুল (সাঃ) আয়েশার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর বলেন, '*হে আয়েশা তুমি নবী এবং অন্য সবাইকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলেছ, অথচ তাদের কাছে বা আশে পাশে কোথাও পানি নাই*'। আয়েশা বলেন যে, '*আবু বকর আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন, বকা-ঝকা করলেন এবং আমার পেটে আঘাত করতে থাকেন। আমি পিতার সম্মানে দাঁড়াতে পারছিলাম না কারণ ঐ মুহুর্তে রাসুল আমার উরুর উপর তাঁর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন*'।

পুরো ঘটনাটি ঘটে গেল অথচ রাসুল (সাঃ) ঘুমিয়ে থাকলেন। এমনকি পানি বিহীন অবস্থায় সকাল হয়ে গেল। তখনই আল্লাহ্ পাক **'তাইয়াম্মুম'**-এর আয়াত নাযিল করলেন। সৈয়দ ইবনে খযীর যিনি নকীবদেরই একজন, তিনি বলেন, **'হে আলে আবু বকর, এটা তোমার প্রথম বরকত নয়, বরং অরো অনেক বরকত আছে'**। আয়েশা বলেন, আমার উটকে যখন দাঁড় করান হল, তখন আমার হারটি তার নিচে পাওয়া গেল। [১]

একজন ইসলাম ভক্ত মো'মিন এটা কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে পারবে না যে, রাসুল (সাঃ) নামাজকে এতই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। লোকজনকে এমন জংগলে আটকে রাখবেন যেখানে পানির কোন নাম গন্ধ ছিল না। এমনকি তাদের কাছেও পানি ছিল না। পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর স্ত্রীর গলার হারের জন্য। মুসলমানরা নামাজ কাযা হওয়ার জন্য আফসোস করেন এবং আবু বকরের (রাঃ) কাছে নালিশ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আয়েশার (রাঃ) কাছে গিয়ে দেখেন যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর উরুর উপর মাথা রেখে এমন গভীর নিদ্রায় ঘুমাচ্ছিলেন যে, আবু বকরের (রাঃ) আগমন, আয়েশার (রাঃ) প্রতি তার বকা-ঝকা ও তার পেটে আঘাত করা, কোন কিছুই তিনি (সাঃ) টের পাননি। রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয় যে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের পানির কষ্টের মধ্যে ফেলে দিবেন। নামাজের সময় উপস্থিত অথচ তিনি তখনো তাঁর স্ত্রীর উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকবেন।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, উক্ত রেওয়ায়েতটি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের আমলে রচনা করা হয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই। এমন ঘটনার ব্যাখ্যায় আমরা কি বলব? যেটা সম্পর্কে সমস্ত সাহাবারাই অবগত ছিলেন অথচ হযরত উমর (রাঃ) সে বিষয়ে কিছুই জানতেন না, কারণ তাকে **'তাইয়াম্মুম'** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি **'তাইয়াম্মুম'** সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যদি ঘটনাটি তাঁর জানা থাকত তাহলে

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৮৬, **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ১৯১

আমার এতো শক্তি নাই যে, বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করে দেই বা ইহার বর্ণনা বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু আমার আপ্রান চেষ্টা অব্যাহত থাকবে, আমি যেন রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর নিষ্পাপতাকে ঐসমস্ত বেহুদা ও জঘন্য রেওয়ায়েতসমুহ হতে রক্ষা করতে পারি এবং বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ও চিন্তাশীল মুসলমানদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আল্লাহ্ পাক রাসুল (সাঃ)-কে সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে **'ক্বমর'** ও **'সিরাজুম্মুনির'** বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) হলেন জলিলুল ক্বদর (সর্বোচ্চ সম্মানিত), মহা মর্যাদাবান এবং আল্লাহ্র নিদর্শন। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনিই সবচাইতে পবিত্রতম। ঐসমস্ত রেওয়ায়েত, যেগুলি রচনা করে রাসুল (সাঃ)-এর মান-সম্মান ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ভূ-লুণ্ঠিত করাই যার উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে যে সমস্ত আকীদা আহলে সুন্নাতগণ পোষন করে থাকেন এবং তারা নিজেদের সহীহ্ হাদীস গ্রন্থাদি এবং মুসনাদগুলোতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সেগুলির ব্যাপারে আমরা কষ্মিন কালেও নিশ্চুপ বসে থাকব না। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীও যদি ঐ জঘন্য রেওয়ায়েতগুলিকে বিশ্বাস করে নেন, তাহলেও আমাদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই ঘোষণাই যথেষ্ট হবে, **"ইন্নাকা লে আ'লা খুলুকুল আযীম"**, এই বাণীই হচ্ছে শ্বাশত বাণী, অবশিষ্ট সব কিছুই বাতিল ও মূল্যহীন। সৈয়েদুল আনাম, অন্ধকার ও গোমরাহী হতে নাজাত দানকারী এবং শান্তির দূত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য শিয়াদের জন্য এই কথাই যথেষ্ট ঃ **"ফা'তাবেরু ইয়া উলিল আলবাব"**।

রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আহলে যিকিরের ধারণা ঃ

হযরত আলী ইবনে তালিব (আঃ) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ নবিগণকে জমা করে রেখেছিলেন জমা করার সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে এবং তাদেরকে থাকতে দিয়েছিলেন থাকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে। তিনি তাদেরকে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষগণের উত্তরাধিকারিত্বে গর্ভাশয়সমূহ শুদ্ধ ও সংশোধনার্থে প্রেরণ করেছিলেন। যখনই তাদের মধ্যে একজন পূর্বসুরীর মৃত্যু হতো তার অনুবর্তী আরেক জন আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যেতো।

মুহাম্মাদের (সাঃ) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মহিমান্বিত আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে বিশিষ্টতম মূলোৎস ও গাছ লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান থেকে বের করে আনলেন। যে সাজারাহ থেকে তিনি অন্যান্য নবীকে বের করে এনেছিলেন এবং যে শাজারাহ থেকে তিনি তাঁর আমানতদার মনোনীত করেছিলেন, সেই সাজারাহ থেকেই তিনি মুহাম্মদকে এনেছিলেন। মুহাম্মদের অধঃস্তন (ইতরাহ্) বংশধরগণ সর্বোত্তম বংশধর, তাঁর জ্ঞাতিগণ সর্বোত্তম এবং তাঁর সাজারাহ সর্বোত্তম সাজারাহ। এ সাজারাহ সুরামের

বকরের (রাঃ) বায়াত গ্রহন করেননি। বরং তখনো **'গাদীর-এ-খুম'**-এর ঘটনা তাঁদের চোখের সামনে ভাসছিল]।

- ফাতিমা যাহ্‌রা (সাঃআঃ)-এর হক যেমন, ফিদাক, খোমস্‌ ও মীরাসকে কেঁড়ে নেয়া এবং তাঁর ন্যায্য দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
- আলী (আঃ)-কে রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব না দেয়া।
- বনী উমাইয়ার পাপিষ্ট লোকজনকে হাকিম বা শাসক নিযুক্ত করা।
- রাসুল (সাঃ)-এর বিভিন্ন চিহ্ন ও তাবাররুক সমুহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা থেকে সাহাবীদের বিরত রাখা।
- আযান হতে রাসুল (সাঃ)-এর নামের স্বাক্ষ্য প্রদানের অংশটিকে বাদ দেয়ার চেষ্টা চালানো।
- পবিত্র মদীনা নগরীকে সৈন্যদের জন্য **'মোবাহ্‌'** ঘোষনা করা, যে যার ইচ্ছানুসারে যা খুশি তাই করল।
- মিনজানিক (আগুনের তৈরী গোলা) দ্বারা **'খানায়-এ-কা'বা'**-র উপর আগুন নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়া, আল্লাহ্‌র হারাম শরীফে সাহাবাদের রক্ত দ্বারা হোলী খেলা।
- রাসুল (সাঃ)-এর ইতরাতদের (বংশধর) রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করা।
- রাসুল (সাঃ)-এর বংশধরদের প্রতি লানত করা এবং লানত পাঠ করার জন্য মানুষের প্রতি নির্দেশ জারি করা।
- আহলে বাইত (আঃ)-গণের অনুসারী ও তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের জুলুম-নির্যাতন করা।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হল যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন যেন একটি রঙ-তামাশার রূপ ধারণ করল এবং হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে পরিনত হল এবং পবিত্র কোরআনকে খন্ড-বিখন্ড করা হল।

উক্ত ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান এবং তার ফল ও নিদর্শন উম্মাতে মুসলেমার শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে আছে। যতক্ষন মুসলমানরা মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের ভক্ত থাকবেন, তাদেরর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, তাদের অপকর্মগুলিকে সঠিক-শুদ্ধ বলে চালাতে থাকবেন এবং বলবেন যে তাদের ভূল-ক্রটিগুলো হচ্ছে **'ইজতিহাদী ভূল'**। তারা (মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদ) আল্লাহ্‌র নিকট এটার প্রতিদান পাবে। আর যতক্ষন মুসলমানরা আহলে বাইত (আঃ)-এর শিয়া বা অনুসারীদের বিরুদ্ধে বই লিখবেন, বক্তৃতা দিবেন এবং শিয়াদের উপর লানত ও গালিগালাজ করবেন আর যতদিন পর্যন্ত হারাম শরীফ ও হজ্বের সময় আহলে বাইতের (রাঃ) শিয়াদের রক্ত ঝরানোকে **'মোবাহ্‌'** মনে করবেন, ততদিন পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে এবং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আহলে বাইত (আঃ) সম্পর্কে

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ আহলে বাইত (আঃ) কারা?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ **"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃ পবিত্র রাখতে"**। [১]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত দাবী করেন যে, **"এই আয়াতটি নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে"**। তারা তাদের এই দাবীর পক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতের সফল অগ্রযাত্রা বলে ধরে নিয়েছেন। সুতরাং তাদের দাবী অনুসারে আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্য হতে সমস্ত রকমের পাপ পংকিলতাকে দূর করে দিয়ে পূত-পবিত্র করে দিয়েছেন।

আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরা রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের পাশাপাশি, আলী (আঃ), ফাতেমা (সাঃআঃ), হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ)-কেও আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

কিন্তু জ্ঞান, বিবেক, বর্ণনা ও ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে উক্ত কথার বিরোধিতা করছে। কারণ আহলে সুন্নাতগণই নিজেদেরই সহীহ্ গ্রন্থগুলোতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উক্ত আয়াত পাঁচ জনার শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যথা -মুহাম্মদ (সাঃ), আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আলাইহিমুস সালাম)। রাসুল (সাঃ) নিজেও উক্ত আয়াত দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন। যখন আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন রাসুল (সাঃ)-এর চাদরের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখনই রাসুল (সাঃ) বলেন, **"হে পারওয়ারদিগার, এঁরাই হলো আমার আহলে বাইত, এঁদের নিকট হতে রিজস্ দূর করে দিয়ে পূত-পবিত্র রাখ।"** আহলে সুন্নাতের একটি বৃহৎ অংশ উক্ত ঘটনাকে তাঁদের কিতাবগুলোতে সংরক্ষণ করেছেন, তাঁদেরই মধ্য হতে কয়েকজনের নাম নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

১। **সহীহ্ মুসলিম**, ফাযায়েলে আহলে বাইতুন্নবী অধ্যায়ে ঃ খঃ ২, পৃঃ ৩৬৮।
২। **সহীহ্ তিরমিজি**, খঃ ৫, পৃঃ ৩০।
৩। **মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল**, খঃ ১, পৃঃ ৩৩০।
৪। **মুস্তাদরাক আল হাকিম**, খঃ ৩, পৃঃ ১২৩।
৫। **খাসায়েসে ইমাম নাসায়ী**, পৃঃ ৪৯।

---

১ সূরা আহযাব ঃ ৩৩

মধ্যে জন্মেছিল এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর শাখাসমূহ সুউচ্চ এবং ফল নাগালের বাইরে (অর্থাৎ কেউ সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য নয়)।

তিনি তাদের সকলের ইমাম (নেতা) যারা (আল্লাহ্‌র) ভয় অনুশীলন করে এবং তাদের জন্য আলোকবর্তিকা যারা হেদায়েত গ্রহণ করে। তিনি একটা প্রদীপ যার শিখা জ্বলছে, একটা উল্কা যার আলো উজ্জ্বল এবং একটা চকমকি পাথর যার ঝলক উজ্জ্বল। তাঁর আচরণ ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁর সুন্নাত পথ নির্দেশক, তাঁর বক্তব্য সিদ্ধান্তমূলক এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ন্যায়ের প্রতীক। পূর্ববর্তী নবিগণ থেকে দীর্ঘদিনের বিরতির পর আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ আমলের ভূল-ভ্রান্তি ও অজ্ঞতায় নিপতিত হয়েছিল। তোমাদের ওপর রহমত স্বরূপ আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ এমন এক সময় রাসুল (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন যখন মানুষ জটিল অবস্থার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল এবং যত্রতত্র ফেতনার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। কামনা-বাসনায় তাদের পদস্খলন হয়েছিল এবং আত্মগর্বে তারা উদ্ধত ছিল। চরম অজ্ঞতা তাদেরকে মূর্খ করে রেখেছিল। অস্থিরতা ও অজ্ঞতার কুফলে তারা বিভ্রান্ত ছিল। এরপর রাসুল (সাঃ) তাঁর সাধ্যমত তাদেরকে আন্তরিক উপদেশ দিলেন এবং তিনি নিজে ন্যায় পথে থেকে তাদেরকে প্রজ্ঞা ও সৎ পরামর্শের দিকে আহ্বান করলেন।

রাসুল (সাঃ)-এর অবস্থান স্থল সর্বোত্তম স্থান এবং তাঁর মূলোৎস হলো সব চাইতে মহৎ-সম্মানের আকর ও নিরাপত্তার ক্রোড়। নেককারগণ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তাদের আঁখি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দাফন করলেন এবং বিদ্রোহের শিখা নির্বাপিত করলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ভালোবাসা দিলেন এবং যারা (কুফুরিতে) ঐক্যবদ্ধ ছিল তাদেরকে বিভেদ করলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ নিচদের সম্মানের পাত্র করলেন এবং (কুফুরের) সম্মানকে হেনস্থা করলেন। তাঁর কথা সুস্পষ্ট এবং তাঁর নীরবতা গভীর বাণীবহ।

আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ)-কে আলোর দিশারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর মনোনীতগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ বিচ্ছিন্নগণকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, শক্তিশালীগণকে পরাভূত করলেন, সকল বিপদগ্রস্থতা দূরীভূত করলেন, অসমতল ভূমিকে সমতল করলেন এবং এভাবে চতুর্দিকের গোমরাহি দূরীভূত করলেন।[১]

---

১ **নাহ্জুল আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-৯৩, ৯৪, ৯৫ ও ২১২-এর অংশ বিশেষ।

তোমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, আতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত"। [১] অবতীর্ণ হল, তখন রাসুল (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ)-কে সংগে নিয়ে বলেন, **"এরাই আমার পুত্র, মহিলা ও নিজ অতএব তোমরা তোমাদের পুত্রগণ, মহিলাগণ ও নিজদিগকে নিয়ে এসো"।** [২]

তারপরও রাসুল (সাঃ) উক্ত সন্দেহভাজন ও ভ্রান্ত ধারণাকে নিজেই দূর করে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মুসলমানরা কোরআন পাঠ করবে এবং সিয়াক ও সাবাক (সফল অগ্রযাত্রা) অবলম্বন করে **'আহলে বাইত'** শব্দ দ্বারা অন্যদেরকে বুঝাবে। সুতরাং **'মুবাহেলা'**-র ঘটণাটি আহলে বাইতের দল হতে নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে পৃথক করে দিয়েছে। **'আয়াত-এ-তাত্বহীর'** নাযিল হওয়ার পর রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মাতকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য একাধারে ছয় মাস পর্যন্ত, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনের (আঃ) গৃহের দরজায় উপস্থিত হয়ে, **'আয়াত-এ-তাত্বহীর'** পাঠ করতেন, **"ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লি ইউযহিবা আন্ কুমুর রিজ্‌সা আহলাল বাইতি ওয়া ইউত্বাহ্‌ হিরাকুমতাত্বহীরা"** অর্থাৎ **"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্‌ কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃ পবিত্র রাখতে"।** [৩]

রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত আমলকে তিরমিযি তাঁর **'সহীহ্‌'**-র ৫ম খন্ডের ৩১ পৃষ্ঠায় এবং হাকিম তাঁর **'মুস্তাদরাক'**-এর ৩য় খন্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায়; যাহাবী তাঁর **'তাখলিস'**-এ; আহমদ বিন হাম্বল তাঁর **'মুসনাদ'**-এর ৩য় খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায়; ইবনে আসীর তাঁর **'উসুদুল গাবা'**-র ৫ম খন্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠায়; হাসক্বানী তাঁর **'শাওয়াহেদুত্ তানযিল'**-র ২য় খন্ডের ১১ পৃষ্ঠায়; সুয়ুতি তাঁর **'দুররে মুনসুর'**-এর ৫ম খন্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায়; তাবারী তাঁর 'তাফসীর'-এর ২২তম খন্ডের ৬ পৃষ্ঠায়; বালাজারী তাঁর **'আনসাবুল আশরাফ'**-এর ২য় খন্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায়; ইবনে কাসির তাঁর **'তাফসীর'**-এর ৩য় খন্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় এবং হ্য়সামী তাঁর **'মাজ্‌মাউজ্‌ জাওয়াদ'**-এর ৯ম খন্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর আমরা যখন আহলে বাইতের ইমামগণ ও শিয়া ওলামাদের কথা এর সাথে যুক্ত করি যারা উক্ত বিষয়ে তিল পরিমানও সন্দেহ পোষণ করেন না যে, এই আয়াতটি মুহাম্মদ (সাঃ), আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আহলে বাইতের দুশমন এবং মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের গুণগ্রাহিদের বিরোধিতার কোন মূল্যই থাকে না। কারণ, **তারা ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেই করবে, সেটা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন?** [৪]

---

১ সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১

২ **সহীহ্‌ মুসলিম**, খঃ ৭, পৃঃ ১২১, **'ফাযায়েলে আলী ইবনে আবি তালিব'** অধ্যায়ে।

৩ সূরা আহযাব ঃ ৩৩

৪ তওবা ঃ ৩২

৬। **তাখলিসে আয্ যাহাবী**, খঃ ২, পৃঃ ১৫০।
৭। **মুয়াজ্জামে আল তিবরানী**, খঃ ১, পৃঃ ৬৫।
৮। **শাওয়াহেদুত্ তান্‌যিলুল হাকিম আল হেসক্বানী**, খঃ ২, পৃঃ ১১।
৯। **আল-বুখারী ফিত্তারিখুল কুবরা**, খঃ ১, পৃঃ ৬৯।
১০। **আল এসাবা আল ইবনে হাজর আল আসক্বেলানী**, খঃ ২, পৃঃ ৫০২।
১১। **তাফসীরে আল ফাখরে রাজি**, খঃ ২, পৃঃ ৭০০।
১২। **নেয়াবিউল মোওয়াদ্দাত**, আল ক্বান্দোজী হানাফী ঃ পৃঃ ১০৭।
১৩। **মানাক্বিবে আল খোয়ারেজমি**, পৃঃ ২৩।
১৪। **আস সীরাতুল হালবিয়াহ্**, খঃ ৩, পৃঃ ২১২।
১৫। **আস সীরাতুদ্ দাহলানিয়াহ্**, খঃ ৩, পৃঃ ৩২৯।
১৬। **উসুদুল গাবাহ্ ইবনুল আসীর**, খঃ ২, পৃঃ ১২।
১৭। **তাফসীরে তাবারী**, খঃ ২২, পৃঃ ৬।
১৮। **দুররে মুনসুর**, সুয়ুতি ঃ খঃ ৫, পৃঃ ১৯৮।
১৯। **তারিখে ইবনে আসাকির**, খঃ ১, পৃঃ ১৮৫।
২০। **তাফসীরুল কাশ্‌শাফ**, যামাখ্‌শারী ঃ খঃ ১, পৃঃ ১৯৩।
২১। **আহকামুল কোরআন**, ইবনে আ'রাবী ঃ খঃ ২, পৃঃ ১৬৬।
২২। **তাফসীরে আল ক্বোরতাবী**, খঃ ১৪, পৃঃ ১৮২।
২৩। **আস সোওয়ায়েকুল মুহরেক্বাহ্**, ইবনে হাজর ঃ পৃঃ ৮৫।
২৪। **আল ইস্তিয়াব**, ইবনে আব্দুল বার্ ঃ খঃ ৩, পৃঃ ৩৭।
২৫। **আল আক্বদুল ফরীদ**, ইবনে আব্দরবাহ্ ঃ খঃ ৪, পৃঃ ৩১১।
২৬। **মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ৯৬।
২৭। **মাছাবিহুস সুন্নাহ্**, বাগ্‌বী ঃ খঃ ২, পৃঃ ২৭৮।
২৮। **আসবাবুন্ নুযুল**, ওয়াহেদী ঃ পৃঃ ২০৩।
২৯। **তাফসীরে ইবনে কাসির**, খঃ ৩, পৃঃ ৪৮৩।

ইহা ছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরো অনেক ওলামাগণ উক্ত ঘটণা বর্ণনা করেছেন। আমি আপাততঃ এই কয়েকটির নাম উল্লেখ করে, মূল বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আহলে সুন্নাতগণ যখন এই কথা স্বীকার করেই থাকেন যে, স্বয়ং রাসুল (সাঃ) এই আয়াতের পক্ষে স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন, তাহলে তাঁর (সাঃ) কথার পরে বিভিন্ন সাহাবা, তাবেয়ী বা অন্যান্য মুফাসসেরীনদের কথার মূল্য বা গুরুত্ব কতটুকু? বরং তারা (সুন্নিগণ) মুয়াবিয়ার সন্তুষ্টি অর্জন তথা মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে উপঢৌকনের লালসায় এমন সব অর্থ বা ব্যাখ্যা করে থাকেন যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

অনুরূপভাবে রাসুল (সাঃ) অন্য এক স্থানে সে দিকের প্রতিই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, আহলে বাইতের মধ্যে আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ অন্তর্ভূক্ত নয়। যখন মুবাহেলার এই আয়াত, **"তোমার নিকট সত্য আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সাহিত তর্ক করে তাহাকে বল 'আইস, আমারা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও**

(৩) আহলে বাইত (আঃ)-গণ সমগ্র মানবতার জন্য নমুনা স্বরূপ ছিলেন। যাদের মধ্যে জিহাদ, তাক্বওয়াহ্, এখলাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহস ও বিরত্ব, দয়া ও মমতা, দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য বিরাজ করতো। ইতিহাস তাঁদের দীর্ঘ জীবনকালে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন একটি পাপের নিদর্শন উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সত্য যখন স্পষ্ট হয়েই গেল, তখন আমরা নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের বিষয়ে প্রথম উদাহরনের দিকে ফিরে যাই। সেটা এই যে, আয়েশা (রাঃ) অনেক মান-সম্মান, মর্তবা ও সুখ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। তার মত সুখ্যাতি রাসুল (সাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীই অর্জন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, আমরা যদি রাসুল (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ফাযায়েলকে একত্রিত করি তবুও আয়েশা বিনতে আবু বকরের (রাঃ) ধারে কাছে পৌছাতে পারবে না। আর এটাই হল আহলে সুন্নাতগণের বিশ্বাস, তাই তো তারা বলে থাকেন যে, **"দ্বীনের অর্ধেক তো আয়েশার কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে"** ।

আর আমরা যদি, হিংসা-বিদ্বেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে সত্যের মানদন্ড দ্বারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি তাহলে এই কথা কি নিশ্চিত রূপে বলা যাব যে, **আয়েশা (রাঃ) সমস্ত প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত ছিলেন? অথবা আল্লাহ্ পাক নবী (সাঃ)-এর পরে তার উপর থেকে পবিত্রতার ছায়া তুলে নিয়েছিলেন? আসুন সত্য অনুসন্ধান করি।**

রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতে -হ্যরত আয়েশা (রাঃ) ঃ

রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আমরা যখন আয়েশার (রাঃ) প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপ-পংকিলতা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে হাফসার (রাঃ) যোগ সাজসে এমন সব ন্যাক্কারজনক কাজ করেছেন, যার কারণে রাসুল (সাঃ) **'হালাল'** বস্তুকে নিজের জন্য **'হারাম'** করে নিয়ে ছিলেন। ঘটনাটি সহিহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) উভয়ে নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই ঘটণাটি সিহাহ সিত্তাহ ও তাফসীরের কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে। অনেক ঘটনার মধ্য হতে দু'টি ঘটণা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামের মধ্যেও বর্ণনা করেছেন।

আয়েশার (রাঃ) **'কলব'** ও **'আকল'**-এর উপর অহমিকার পর্দা পড়ে গিয়েছিল, সে কারণেই তিনি নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে বেআদবী করতেন। নবী (সাঃ) একদা খাদীজার (রাঃ) প্রশংসামূলক আলোচনা করছিলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বলে ছিলেন যে, **"আমার ও খাদীজার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে, সে (খাদীজা) এমনই বৃদ্ধা ছিল যে তার গালে ভাজ পড়ে গিয়েছিল, আপনাকে আল্লাহ্ তার চেয়ে উত্তম দান করেছেন"** । আয়েশার

এখানে একটি কথা স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় যে, প্রত্যেক যুগেই নবী (সাঃ)-এর তাফসীরের বিপরীতে যারা তাফসীর করেছে, তারা হল ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয়দের কেনা গোলাম ছিল। তারা ঐসমস্ত হতভাগ্য মানুষ, যারা আলী (আঃ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো। অথচ তারা প্রত্যেকেই **'ফকীহ্'** এবং **'ওলামাদের'** লিবাস পরিধান করে থাকতো।

এটা তো জ্ঞান তথা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও বুঝে আসে যে উক্ত আয়াতে রাসুল (সাঃ)-এর পত্নীগণ অন্তর্ভূক্ত নন।

(১) আমরা যখন আয়েশার (রাঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে, তিনি দাবী করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে তাকেই বেশী ভালবাসতেন। তিনিই রাসুল (সাঃ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। যার কারণে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাকে হিংসা করতেন, যেটা আমি পূর্বেই আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, অন্যান্য স্ত্রীগণ এই মর্মে রাসুল (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন, তিনি (সাঃ) যেন আবু বকরের কন্যার ব্যাপারে ইন্‌সাফ ভিত্তিক কাজ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়েশা (রাঃ) আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত নন। আয়েশার (রাঃ) ভক্তদের মধ্য হতেই যে কেউ এই কথাটা বলার সাহস দেখিয়েছে যে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার সময় তিনিও চাদরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অতএব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা ও কাজের চেয়ে বেশী অন্য কারোর কথা ও কাজের কোন মর্যাদা নাই। নিশ্চয়ই এতে কোন হিকমত ছিল যে, তিনি (সাঃ) **'আয়াত-এ-তাত্বহীর'** নাযিলের দিন একমাত্র তাঁর আহলে বাইতগণকেই চাদরের মধ্যে স্থান দিয়ে ছিলেন। তদুপরি উম্মে সালমা (রাঃ) যখন চাদরের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন, তখন রাসুল (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করে বলেছিলেন, **"হে উম্মে সালমা তুমি সত্যের উপরেই অবস্থান করছো"**।

(২) তাছাড়া আয়াতটি বিশেষ ও সাধারণ অর্থেই নিষ্পাপতার দলীল উপস্থাপন করছে। কারণ **'রিজস্'** দূরিভূত করার অর্থই হলো, সমস্ত রকম ছোট বড় পাপ-পংকিলতাকে দূর করে ফেলা, বিশেষ করে আমরা যখন পবিত্রতাকে আল্লাহ্‌র দিকে নিসবাত করি। যদিও মানুষ পানি ও মাটি দ্বারা দেহকে পবিত্র করে থাকে কিন্তু তাতে তার বাতেন (অন্তর) পবিত্র হয় না। আসলে আল্লাহ্ পাক আহলে বাইত (আঃ)-এর রূহকেই পবিত্র করেছেন, তাঁদের আকল, বিবেক, জ্ঞান ও ক্বালব তথা অন্তরকে এমনভাব পুত-পবিত্র করে দিয়েছেন যে, সেখানে শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ভূল-ভ্রান্তির কোন অবকাশই থাকে না। অতএব তাঁদের ক্বালব (অন্তর) সমস্ত বিষয়েই তাঁদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং মুখলেছ ছিল।

আর আল্লাহ্‌ পাক যখন এই আয়াত নাযিল করলেন, **"তুমি উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার"**। [১] তখন বেহায়ার মত আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ)-কে বলেন, **"আপনার পালনকর্তাকে তো সব সময় আপনার নাফসের চাহিদারই পক্ষপাত করতে দেখতে পাই"**। [২]

আবার আয়েশা (রাঃ) যখন রাগান্বিত হতেন (এবং বেশীর ভাগ সময় রাগান্বীতই থাকতেন) তখন নবীকে (সাঃ) **'নবী'** বলা হতে বিরত থাকতেন। **'মুহাম্মাদ'**ও বলে ডাকতেন না, বরং **'ইব্রাহীমের পিতা'** বলে সম্বোধন করতেন। [৩]

আয়েশা (রাঃ) প্রায়শঃই নবী (সাঃ)-এর প্রতি মান-অভিমান প্রদর্শন করতেন এবং অসন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু নবী (সাঃ), ক্ষমা ও দয়ার সাগর, তাঁর চরিত্র এতই উন্নত, এতই ধৈর্য্যশীল, তিনি সর্বদাই আয়েশাকে বলতেন, "হে আয়েশা নিজের শয়তানকে দমিয়ে রাখ"। তিনি (সাঃ) প্রায়ই আয়েশা ও হাফসা বিনতে উমরের (রাঃ) ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাবধানবাণীর জন্য আফসোস করতেন। একাধিকবার তাদের অপকর্মের ফলে কোরানের আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়েশা ও হাফসার (রাঃ) উদ্দেশ্যে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"তোমরা দু'জনই তওবাহ্‌ কর, কারণ তোমাদের অন্তর বেঁকে গেছে"**। [৪] অর্থাৎ এরা হক (সত্য) হতে সরে পড়েছেন। [৫] আল্লাহ্‌ পাক আরো বলেছেন, **"আর তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর (তাহলে) মনে রেখ, আল্লাহ্‌ তাঁর (রাসুলের) অভিভাবক, জিব্রাইল ও নেক মুমিনগন উপরুন্তু ফেরেশতাগণও হচ্ছে তাঁর সাহায্যকারী"**। [৬]

আয়েশা ও হাফসার (রাঃ) জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এগুলিই হলো প্রকাশ্য সতর্কবাণী। আয়েশা (রাঃ) অনেক সময় হাফসার (রাঃ) কথা মত আমল করতেন। আল্লাহ্‌ পাক উভয়ের উদ্দেশ্যে আরো ইরশাদ করেছেন, **"যদি নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী"**। [৭] উমর ইবনে খাত্তাব বলেন যে, উক্ত আয়াত আয়েশা ও হাফসার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। [৮] এই এই আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, **আয়েশার (রাঃ) চেয়ে তো সাধারণ মুসলামানদের নেক স্ত্রীরাই অনেক ভাল**।

---

১ সূরা আহযাব ঃ ৫১

২ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ১২৮ এবং পৃঃ ২৪

৩ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ১৫৮

৪ সূরা তাহরীম ঃ ৪

৫ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১০৬

৬ সূরা তাহরীম ঃ ৪

৭ সূরা তাহরীম ঃ ৫

৮ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ৬৯ এবং ৭১

মুখে এমন বাক্য শুনে রাসুল (সাঃ) এত পরিমানে রাগান্বিত হলেন যে, রাগের চোটে তাঁর সমস্ত পশম শক্ত হয়ে গিয়েছিল। [১]

একদা রাসুল (সাঃ) আয়েশার ঘরে অবস্থান করছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর অপর একজন স্ত্রী খাবারের একটি পেয়ালা পাঠিয়ে ছিলেন। রাসুল (সাঃ) তখন ক্ষুধার্থও ছিলেন। কিন্তু **আয়েশা রাসুল (সাঃ)-কে খেতে না দিয়ে উক্ত পেয়ালাটি ফেলে দিয়েছিলেন**। [২]

আয়েশা (রাঃ) একবার নবী (সাঃ)-কে বলেছিলেন, **"আপনি কি আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার ধারণা পোষণ করেন"?** [৩]

আয়েশা (রাঃ) একবার নবীর (সাঃ) প্রতি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, **"ইনসাফ অবলম্বন করুন"**। ঐ মুহূর্তে তার পিতা আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আবু বকর আয়েশাকে এত মারলেন যে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগে। [৪]

আয়েশার (রাঃ) হিংসা-বিদ্বেশের চরম নমুনা হলো এই যে, তিনি আসমা বিনতে নোমানের (রাঃ) উপর ঐ সময় দোষারোপ করলেন যখন আসমা নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘরে আসেন। তিনি আসমাকে বলেন যে, **"নবী (সাঃ) ঐ মহিলাকে বেশী পছন্দ করেন, যে মহিলা দখুলের (সহবাসের চরম মুহূর্তে) সময় 'আউজুবিল্লাহে মিনকা' শব্দটি উচ্চারণ করে"**। এই কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সাদা-মাঠা মহিলা যখন এই কথা বলবে তখন রাসুল (সাঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিবেন। [৫]

রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে আয়েশার (রাঃ) বেআদবীর কোন সীমা ছিল না। একদা নবী (সাঃ) নামাজ পড়ছিলেন আর আয়েশা পা লম্বা করে বসে ছিলেন, নবী (সাঃ) যখন সেজদায় যেতেন তখন পা সরিয়ে নিতেন এবং তিনি যখন সেজদা হতে উঠে দাঁড়াতেন তখন আবার পা লম্বা করে দিতেন। [৬]

একবার আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-কে এতো বেশী বিরক্ত করলেন যে তিনি (সাঃ) এক মাসের জন্য স্ত্রীদের ত্যাগ করলেন এবং পাটি বিছিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতেন। [৭]

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ২৩১ এবং **সহীহ্ মুসলিমেও** বর্ণিত আছে।

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ১৫৭

৩ **এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন**, ইমাম গাযালী, খঃ ২, পৃঃ ২৯ কিতাবে আদাবুন্নিকাহে।

৪ **কানযুল উম্মাল,** খঃ ৭, পৃঃ ১১৬ এবং **এহইয়ায়ুল উলুম**।

৫ **তাবাকাতে ইবনে সা'দ**, খঃ ৮, পৃঃ ১৪৫। **এসাবাহ্ ইবনে হাজর**, খঃ ৪, পৃঃ ২৩ এবং **তারিখে ইয়াকুবী**, খঃ ২, পৃঃ ২৯

৬ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৩, পৃ ১০১, **'সালাতুল ফারাশ'** অধ্যায়ে।

৭ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১০৫

অভিভাবক, জিব্রাইল ও নেক মুমিনগন উপরন্তু ফেরেশতাগণও হচ্ছে তাঁর সাহায্যকারী"। [১] আল্লাহ্ আরো বলেছেন, **"তোমরা দু'জনই তাওবাহ্ কর, তোমাদের অন্তর বেঁকে গেছে"**। [২]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন **'সূরা তাহ্‌রীম'**-এ ঐ দু'জন (আয়েশা ও হাফসা) এবং সকল মুসলমানকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। মুসলমানদের একটি শ্রেণী উম্মুল মুমিনীনদের ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে, তাঁরা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবেন, কারণ তারা হলেন রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রী। অসম্ভব, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে প্রত্যেক নর ও নারীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, দাম্পত্যের কারণে কোন লাভ হবে না, স্বামী যদি স্বয়ং রাসুল (সাঃ) হন না কেন। আল্লাহ্‌র কাছে ভাল-মন্দ ও পাপ-পুন্য হিসাবে মানুষের আমলই বিবেচ্য হবে। সুতরাং আল্লাহ্ বলছেন, **"আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহে-পত্নী ও লূৎ-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, তারা ছিল আমার দুই নেক বান্দাদ্বয়ের গৃহে, আতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও"**। [৩]

অন্যদিকে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরআউনের স্ত্রীর উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন এবং তার প্রার্থনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, **"আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার পালকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন"**। (দ্বিতীয় উদাহরণ) **"আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান তনয়া মরিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন"**। [৪]

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা সবার কাছে ইহা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দাম্পত্য ও সোহবাত (সঙ্গ) হচ্ছে অনেক বরকতময় বিষয়, তদুপরি এ দু'টি আল্লাহ্‌র আযাব হতে মুক্তি দিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, এ দু'টি যদি নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে আলাদা কথা। আর আমল যদি খারাপ হয়, তাহলে আযাবও দ্বিগুন হবে। কেননা আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের দাবী হচ্ছে যে, তিনি ঐসমস্ত ব্যক্তির উপর আযাবের মাত্রা কমিয়ে দিবেন যারা **'হক'** (সত্য) সম্পর্কে জানতেই পারিনি। অপর দিকে, তাদের প্রতি আযাবের মাত্রা বাড়িয়ে দিবেন যাদের গৃহে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং **'সত্য'** প্রকাশিত হওয়ার পরও যারা সেটাকে অস্বীকার করেছে।

---

১ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৪

২ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৪

৩ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ১০

৪ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ১১-১২

নবী (সাঃ) একবার আয়েশাকে (রাঃ) ওয়াহইয়ায়ে কুলবীর বোনকে দেখার জন্য পাঠালেন, কারণ রাসুল (সাঃ) তার সাথে নিকাহ করতে চেয়েছিলেন। তিনি (সাঃ) আয়েশাকে বলেন যাও দেখে এসো। আয়েশা যদিও দেখে ফেরৎ আসলেন, কিন্তু তার অন্ত র জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাসুল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আয়েশা, কেমন দেখলে?" আয়েশা বলেন, "আমি তো তার মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য খুজে পাই নি"। রাসুল (সাঃ) বলেন, "নিশ্চয়ই তুমি তার মধ্যে এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখেছ, যা আমার কাছে লুকাচ্ছ। তুমি তাকে অনেক সুশ্রী ও সুন্দর রূপে দেখেছ সেই কারণে নিজের গ্রহনযোগ্যতা হারানোর আশংকা করছো"। আয়েশা বলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না আর না কেউ কোন কথা আপনার কাছ থেকে লুকাতে পারবে"। [১]

আয়েশা (রাঃ), নবী (সাঃ)-এর সাথে যত ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার মধ্যে বেশীর ভাগ ষড়যন্ত্রেই তার সাথে হাফসাও (রাঃ) শরীক ছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আমরা ঐ দুই মহিলার (আয়েশা ও হাফসা) মাঝে সম্পর্ক ও চিন্তা-চেতনার অনেক মিল খুঁজে পাই। ঠিক যেমনটি তাদের পিতা আবু বকর ও উমরের (রাঃ) মাঝে যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশাই (রাঃ) সব সময় শক্তি ও সামর্থের দিক থেকে অনেক খানি এগিয়ে ছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে হাফসা বিনতে উমর আয়েশাকে (রাঃ) উসকানি যোগাতেন। ঠিক ঐ রকম যেমন আবু বকরের (রাঃ) ব্যাপারে যেখানেই একটু দূর্বলতা প্রকাশ পেত সেখানেই উমর (রাঃ) এগিয়ে আসতেন। সেকারণেই তিনি সমস্ত বিষয়েই আবু বকরের (রাঃ) তুলনায় শক্তিমান ছিলেন। আপনারা পুর্ববর্তী আলোচনায় জানতে পেরেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) নিজ খেলাফত কালে উমরের (রাঃ) প্রতি দূর্বল ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মূল শাসক উমর ইবনে খাত্তাবই (রাঃ) ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, আয়েশা (রাঃ), আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে **'বসরা'** অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসুল (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু হাফসা (রাঃ) ব্যতীত রাসুল (সাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীই তার আহ্বানে সাড়া দেননি। তিনি আয়েশার (রাঃ) সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু হাফসার (রাঃ) ভাই আব্দুলাহ ইবনে উমর (রাঃ) বাধা প্রদান করেন এবং চরমভাবে বকা-ঝকা করার পর তিনি নিজের গাট্টি-বোচকা খুল ফেলেন। [২]

এসমস্ত কারণেই আল্লাহ্ পাক ইতিপূর্বেই আয়েশা ও হাফসাকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বলেছিলেন, **"আর তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর (তাহলে) মনে রেখ, আল্লাহ্ তাঁর (রাসুলের)**

---

১ **তাবাকাতে ইবনে সা'দ**, খঃ ৮, পৃঃ ১১৫ এবং **কানযুল উম্মাল**, খঃ ৬. পৃঃ ২৯৪

২ **শারহে ইবনে আবীল হাদীদ**, খঃ ২, পৃঃ ৮০

যে, **'হে আয়েশা, তুমি অনেক বড় কথা বলে ফেলেছ, সেটা যদি দরিয়ার পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে সমস্ত পানিই অপবিত্র হয়ে যাবে'**।

আমার ধারণা, উক্ত হাদীসের রাবীগণ, আয়েশার (রাঃ) মর্যাদার কথা চিন্তা করে এবং হাদীসের গুরুত্বকে কমানোর লক্ষে, **'কাযা কাযা'** অর্থাৎ **'এমন এমন'** শব্দটি জুড়ে দিয়েছে -এবং এরূপ করা তো রাবীদের চিরাচরিত অভ্যাস ছিলই।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ), অন্যান্য স্ত্রীগণের প্রতি তাঁর হিংসা-বিদ্বেশের কথা নিজেই স্বীকার করে বলেন যে, "আমি মারিয়ার চেয়ে অধিক অন্য কাউকে হিংসা করিনি। তার কারণ হলো, মারিয়া অনেক সুন্দরী ছিল। তার চুল এত সুন্দর ছিল যে রাসুল (সাঃ) সেটা নিয়ে গর্ব করতেন। রাসুল (সাঃ) মারিয়াকে সবার আগে হারিস ইবনে নোমানের বাসাতে তুলে আনেন। মারিয়া যখন আমাকে ভয় করতে লাগল, তখন রাসুল (সাঃ) তাকে তার আপনজনদের কাছেই রেখে আসেন। তিনি (সাঃ) তার কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। মারিয়ার তাঁর কাছে যাওয়াতে আমার মন কষ্ট বৃদ্ধি পেত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মারিয়ার গর্ভে পুত্র সন্তান দান করলেন, অথচ আমরা নিঃসন্তানই রয়ে গেলাম"। [১]

সতীন মারিয়ার (রাঃ) প্রতি আয়েশার (রাঃ) হিংসা-বিদ্বেশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে তার পুত্র ইব্রাহীম পর্যন্ত পৌছে যায়। এই বিষয়ে আয়েশার (রাঃ) নিজ ভাষ্য হলো যে, *"ইব্রাহীমের যখন জন্ম হলো, তখন রাসুল (সাঃ) তাকে নিয়ে আমার কাছে এসে বলেন, 'আমার দিকে তাকাও, এ হচ্ছে অবিকল আমারই প্রতিচ্ছবি'*। আমি বল্লাম, '*আমার চোখে কিন্তু আপনার মত লাগছে না*'। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, '*তুমি কি তার ফর্সা রং এবং মোটা অবয়ব দেখতে পাচ্ছ না*'। তখন আমি বল্লাম, '*যে শিশু বেশী দুধ ধারণকারী মহিলার দুধ পান করবে সে তো ফর্সা এবং মোটা হবেই*'। [২]

আয়েশার (রাঃ) হিংসা-বিদ্বেশ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার মাথায় যখন সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার ভূত চাপতো তখন এমন সব বাজে ও গর্হিত কাজ করতেন যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কখনো রাসুল (সাঃ) তার ঘরে অবস্থান করা সত্বেও এমন ভাব করে শুয়ে থাকতেন, দেখে মনে হতো যেন ঘুমাচ্ছেন। বেশীরভাগ সময়ই রাসুল (সাঃ)-এর পিছু নিতেন এবং অন্ধকারে রাসুল (সাঃ)-এর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যে তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন। সুধী পাঠক মন্ডলী, আপনাদের সম্মুখে আয়েশারই (রাঃ) বয়ানকৃত একটি রেওয়ায়েত উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন যে ঃ

"এক রাত্রে রাসুল (সাঃ) আমার কাছে আসলেন, চাদরটা এক দিকে এবং খড়মটি পায়ের দিকে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষন পর আমাকে ঘুমন্ত মনে করে,

---

১ **তাবাকাতে ইবনে সা'দ**, খঃ ৮, পৃঃ ২১২; **ইনসাবুল আশরাফ**, খঃ ১, পৃঃ ২৪৯; আসকালানী রচিত "এসাবা গ্রন্থে **মা'রেফাতুস সাহাবা**" অধ্যায়ে।

২ **তাবাকাতুল ইবনে সা'দ**, খঃ ১, পৃঃ ৩৭ এবং অনুরূপ ভাবে **ইনসাবুল আশরাফ** গ্রন্থেও বর্ণিত আছে।

সুধী পাঠকমন্ডলী, এবার নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য আহ্বান করছি, যেন আপনারা ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে চিনে নিতে পারেন যারা আলী (আঃ)-কে খেলাফত হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কত রকম ষড়যন্ত্র করেছে এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। আপনারা ইহাও জানতে পারবেন যে, তাদের মধ্য হতে রিজস্ (পাপ পংকিলতা) দূরিভূত হওয়ার বিষয়টির এত দীর্ঘ ব্যবধান আছে, যত ব্যবধান আসমান ও জমিনের মাঝে বিদ্যমান। আসলে আহলে সুন্নাতের বেশীর ভাগ লোকই চোখ বন্ধ করে, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই, বনী উমাইয়দের রচিত হাদীসসমূহকে আনুগত্য করে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধে ঃ

আয়েশার (রাঃ) কাহিনী তাঁর মুখেই শ্রবন করা আমাদের জন্য উচিৎ হবে। হিংসা-বিদ্বেশ তাকে কেমন করে সত্য পথ হতে সরিয়ে রেখেছিল এবং নবী (সাঃ)-এর সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করতেন। আয়েশা বলেন, "একদা রাসুল (সাঃ) আমার কাছে ছিলেন। রাসুল (সাঃ)-এর অপর স্ত্রী 'সাফিয়া' তাঁর জন্য খাবার পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন পরিচারিকাকে খাবার নিয়ে আসতে দেখলাম, আমার সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেল, রাগে আমি কাঁপতে লাগলাম, খাবারের পেয়ালাটি ভেঙে ফেলাম এবং দাসীকে তাড়িয়ে দিলাম। অতঃপর রাসুল (সাঃ)-এর চেহারার দিকে তাকালাম, তাঁর চেহারায় রাগ ও ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম। তাঁর (সাঃ) এই অবস্থা দেখে আমি বল্লাম, '*আজ আমি রাসুলের আশ্রয় কামনা করছি, তিনি যেন আমার প্রতি লানত ও ভর্ৎসনা না করেন*'। রাসুল (সাঃ) বলেন, '*তুমি ক্ষমা পেলে*'। আমি আবার বলাম, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্ এটার জন্য কাফ্ফারা কি হবে?*' তিনি (সাঃ) বলেন, '*খাবারের পরিবর্তে খাবার, আর পেয়ালার পরিবর্তে পেয়ালা*'।[১] নবী (সাঃ)-এর ঐ কথা শুনার পর আমি পুনরায় বলাম, '*এমন সাফিয়া আপনাকেই মোবারক হোক*'। আমার এই কথা শুনার পর রাসুল (সাঃ) আমাকে বলেন, **'হে আয়েশা, তুমি অনেক বড় কথা বলে ফেলেছ, সেটা যদি দরিয়ার পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে সমস্ত পানিই অপবিত্র হয়ে যাবে।**[২]

সুবহানাল্লাহ্, উম্মুল মুমিনিনের চরিত্র কোথায় গেল, তাঁর ঐসমস্ত দায়ীত্ব ও কর্তব্যের চিহ্ন কোথায় যেগুলি ইসলাম ফরজ বলে ঘোষনা দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, গীবত, হিংসা, চোগল খোরী? এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আয়েশার (রাঃ) এই কথা যে, **'এমন এমন সাফিয়া আপনাকেই মোবারক হোক'** তার উত্তরে রাসুল (সাঃ)-এর এই কথা

---

১ **মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৬, পৃঃ ২৭৭ এবং **সুনানে নেসায়ী**, খঃ ২, পৃঃ ১৪৮

২ **সহীহ্ তিরমিযির** সূত্রে যারকাশি ৭৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আয়েশার (রাঃ) উপর প্রায়ই শয়তান আসর করতো অথবা তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকতো। অবশ্যই তার এই সন্দেহ, অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে শয়তান তাঁর কলবের (অন্তরের) পথ খুঁজে পেয়েছিল।

রাসুল (সাঃ) নিকট হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন যে, ***"ঈর্ষা হলো পুরুষের জন্য ঈমান, আর নারীর জন্য কুফর"*** ।

পুরুষ নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে এজন্য অহংকারী হয়ে থাকে যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে ঐ স্ত্রীর জন্য আর কোন পুরুষ জায়েজ নয়। কিন্তু স্ত্রী তাঁর স্বামীর ক্ষেত্রে কোন ঈর্ষা করতে পারবে না, কারণ আল্লাহ্ পুরুষের জন্য একের অধিক স্ত্রী জায়েজ করেছেন। সুতরাং, ঈমানদার ও নেক স্ত্রী তো সেই যে আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ নফ্সকে সংযত রেখে সতিনকে গ্রহণ করে নেয়। বিশেষ করে তাঁর স্বামী যখন ন্যায়ের প্রতীক এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করে। সুতরাং মানবকুলের সরদার, যোগ্যতা ও ন্যায় বিচারের নমুনা এবং খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যদি একাধিক স্ত্রী রাখেন, তাহলে সমস্যা কোথায়? আয়েশার (রাঃ) ভালবাসার মধ্যে যেমন খুঁৎ আছে ঠিক তেমনিভাবে আহলে সুন্নাতগণের এই হাদীসটিতেও খুঁৎ আছে যে, "**রাসুল (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় আয়েশাকে (রাঃ) সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং আয়েশাই তাঁর (সাঃ) কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় পাত্র ছিলেন**"। উক্ত ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্য আহলে সুন্নাতগণ এই রেওয়য়েত রচনা করেছেন যে, **"আয়েশার (রাঃ) প্রতি রাসুল (সাঃ) অতিরিক্ত ভালবাসার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট রাত্রিগুলিকে আয়েশার (রাঃ) জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। কারণ স্ত্রীগণ জানতেন যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) তাঁদের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, তাকে ছাড়া থাকতেই পারেন না"** ।

সুধী পাঠক মন্ডলী, **রাসুল (সাঃ)-এর মত ন্যায় বিচারের প্রতীকের পক্ষে এধরণের আচরণ করা কি আদৌ সম্ভব?** অথচ আহলে সুন্নাতের এই ভ্রান্ত দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত আমরা দেখতে পাই যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) হিংসা-বিদ্বেশের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তার জন্য অনেক বিরক্ত বোধ করতেন। আসলে ঘটনাটা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং আয়েশার (রাঃ) প্রতি রাসুল (সাঃ) কর্তৃক অতিরিক্ত ভালবাসা প্রদর্শনের কারণে তো অন্যান্য স্ত্রীদেরই হিংসা করা উচিৎ ছিল। আহলে সুন্নাতের রাবীদের (বর্ণনাকারী) কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ **"রাসুল (সাঃ) যদি আয়েশাকে (রাঃ) সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন, তাহলে তো এটা মহা আনন্দের ব্যাপার ছিল, এজন্য তো তাকে বেশী বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ ছিল। অথচ তা না করে আরো বেশী বেশী হিংসা-বিদ্বেশ পোষন করার পিছনে কারণ কি?"**

ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাদিতে আয়েশার (রাঃ) ফজিলাতের বর্ণনা প্রচুর মজুদ আছে। কি আশ্চর্য! তিনি এমনই প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, তার থেকে কিছুক্ষন সময়ের জন্যও দূরে সরে থাকা, রাসুল (সাঃ) সহ্য করতে পারতেন না!

তিনি (সাঃ) চাদর নিলেন এবং খড়ম পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। আমিও জামার বাঁধন শক্ত করলাম, ওড়না নিলাম এবং মুখ ঢাকার পাতলা চাদরটি জড়িয়ে তাঁর পিছু নিলাম। একসময় তিনি '**বাকী**'তে (গোরস্থানে) পৌছায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর তিন বার হাত উত্তলন করে ফিরতি পথ ধরলেন। আমিও ফিরতি পথ ধরলাম। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁটছিলেন। আমিও আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু সমতা রাখতে না পেরে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম এবং তাঁর গৃহে প্রবেশ হওয়ার পূর্বেই আমি প্রবেশ করে শুয়ে পড়ি। রাসুল (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করেই বলেন, "*হে আয়েশা তোমার কি হয়েছে, যে নিজের স্বামীকে সন্দেহ করছ*"। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিলাম না। তিনি পুনরায় বলেন, "*তুমি বলবে, নাকি লতিফ ও খবীর (আল্লাহ্‌র গুনবাচক নাম) আমাকে জানাবে*"। তখন আমি বলাম, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনিই বলুন*"। তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, "*তুমিই হলে সেই ছায়া, যাকে আমি আমার সম্মুখে দেখেছিলাম*"। আমি স্বীকার করে নিয়ে বলাম, "*হ্যাঁ*" এবং ভয়ে আমার অন্তর কেঁপে উঠলো। অতঃপর রাসুল (সাঃ) বলেন, "***তোমার মনে কি সন্দেহ হচ্ছিল, যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল তোমার প্রতি জুলুম করবে***"? [১]

অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ "একবার আমি রাসুল (সাঃ)-কে নিজের পাশে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম হয়তো তিনি কোন দাসীর কাছে গেছেন। খুজতে গিয়ে দেখি তিনি সেজদায় মাথা রেখে বলছেন, "***রাব্বিগ ফিরলি***"। [২]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন ঃ এক রাত্রে রাসুল (সাঃ) আমার কাছ থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেলেন। আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষন পরেই তিনি আবার ফেরৎ এলেন এবং আমার কার্যকলাপ দেখে বলেন, "*হে আয়েশা তোমার কি হয়েছে, তোমার মনে এত সন্দেহ কেন*"? আমি বল্লাম, "*আমার কিই বা হবে, আপনার মত মানুষকে আমি কেন আমার পাশে চাইব না*"? উত্তরে তিনি বলেন, "***তোমার উপর কি শয়তান আসর করেছে***"? [৩]

উপরোক্ত শেষ রেওয়ায়েতটি স্পষ্ট রূপে একটি দলিল হয়ে আছে যে, আয়েশা (রাঃ) যখন সন্দেহে লিপ্ত হতেন তখন তার দ্বারা যতসব আজব কান্ড-কারখানা ও উদ্ভট কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হতো। যেমন থালা-বাসন ভেঙে ফেলা, কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদী। সে জন্যেই তো আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) যখন ফেরৎ আসলেন তখন আমার অবস্থা দেখে বলেছিলেন, "***তোমার উপর কি শয়তান আসর করেছে***"?

---

১ **সহীহ্‌ মুসলিম**, খঃ ৩, পৃঃ ৬৪ এবং **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ২, পৃঃ ২২১

২ **মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৬, পৃঃ ১৪৭

৩ **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৬, পৃঃ১১৫

আগত আলোচনা দ্বারা আমরা অবগত হতে পারব যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) মোটেই পছন্দ করতেন না। বরং তিনি (সাঃ) তো তাঁর উম্মতকে তার অনিষ্টা হতে বেচে থাকার জন্যই আহ্বান করেছেন।[১]

যারা আয়েশার (রাঃ) ভালবাসা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমি আমার ঐ সমস্ত বুজর্গদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, **রাসুল (সাঃ) তাকে এত বেশী পরিমানে কেন ভালবাসতেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের কেন তত বেশী ভালবাসতেন না?** তারা বিভিন্ন ধরণের উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু সবটাই দূর্বল ও বিবেক-বুদ্ধিহীন। এক ভদ্রলোক তার জবাবে বলেন যে, *'আয়েশার বয়স কম ছিল এবং অনেক সুন্দরী ছিলেন, রাসুল (সাঃ) একমাত্র তার সাথেই কুমারী অবস্থায় দখুল (সহবাস) করেছিলেন। আয়েশা অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি, সে কারণে রাসুল তাকে এত বেশী ভালবাসতেন'*।

দ্বিতীয় একজন তার জবাবে বল্ল, *'যেহেতু আবু বকর, যিনি সোর গুহায় রাসুলের সংগী ছিলেন, আয়েশা তারই কন্যা ছিলেন, সেহেতু রাসুল (সাঃ) তাকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন'*।

তৃতীয় একজন তার জবাবে বল্ল, *'আয়েশা যেহেতু রাসুল (সাঃ)-এর নিকট হতে অর্ধেক দ্বীনের শিক্ষা পেয়েছিলেন, তিনি আলেম-এ-দ্বীন ও ফিকাহ্ বিদ ছিলেন, সেহেতু রাসুল (সাঃ) তাকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন'*।

চতুর্থ আরেক জন বল্ল, *'যেহেতু হযরত জীব্রাইল আয়েশার রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হতেন এবং ঠিক তখনই হাজির হতেন যখন রাসুল (সাঃ) আয়েশার পাশে অবস্থান করতেন, সেহেতু রাসুল (সাঃ) তাকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন'*।

সুধী পাঠক মন্ডলী, আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, এই সমস্ত উত্তর কোন দলীল ভিত্তিক নয়, আর না তো সততা বা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন কোন অকাট্য যুক্তি। আমরা এই ধরণের আকীদা-বিশ্বাসকে দলীল ও যুক্তি দ্বারা বাতিল ও ভূয়া সাব্যস্ত করবো।

রাসুল (সাঃ) যখন আয়েশাকে (রাঃ) তার সৌন্দর্যের জন্য সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং তিনিই একমাত্র কুমারী অবস্থায় রাসুল (সাঃ)-এর দাম্পত্য জীবনে এসেছিলেন। তাহলে এমন কি ব্যাপার ঘটেছিল যে তিনি রাসুল (সাঃ)-কে এমন সুন্দরীদের সাথে নিকাহ্ করতে বাধা প্রদান করেছিলেন, যাদের সৌন্দর্যের নাম ডাক সমগ্র আরব জাহানে বিস্মৃত ছিল এবং আরবের গোত্ররা যাদের রূপের উদাহরণ দিতে গর্ববোধ করতো? ঐসমস্ত সুন্দরীরা তো শুধু রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষ হতে একটি মাত্র ইংগিতের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। এই কথার উত্তর ইতিহাসবিদগণ পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন যে, **"আয়েশা -**

---

১ **আত্ তাবাকাতুল কুবরা**, ইবনে সা'দ, খঃ ২, পৃঃ ২৯

আমার আকীদা হচ্ছে যে, এই সমস্ত ভ্রান্ত ও উদ্ভট হাদীস ও ঘটণাবলীর আবিষ্কারক হলো উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী। তারাই আয়েশাকে (রাঃ) বন্ধু বলে গন্য করতো এবং তাকেই বেশী প্রাধান্য দিত এবং আয়েশাও (রাঃ) তাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। উমাইয়ারা ঠিক যেভাবে চাইতো তিনিও ঠিক সেভাবে হাদীস বয়ান করতেন। এবং তিনি উমাইয়াদের চিরশত্রু আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

অনুরূপভাবে আমার বিশ্বাস যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) ঐসমস্ত ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের জন্য তাকে অপছন্দ করতেন। তার বেশকিছু কার্য-কলাপের নমুনা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। একজন মিথ্যাবাদী, গীবতকারী, অপরের দোষ-ত্রুটি সন্ধানকারী এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-কে জালিম বলে আখ্যায়িত করেছে তাকে রাসুল (সাঃ) কেমন করে ভালবাসবেন বা পছন্দ করতে পারেন? আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) তাকে কেমন করে বন্ধু গণ্য করতে পারেন, যে রাসুল (সাঃ)-কে তাঁর অগোচরে অনুসরণ করতেন? গৃহ হতে বিনা অনুমতিতে এজন্য বাহির হয়ে পড়তেন, যাতে দেখতে পারে যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? রাসুল (সাঃ) তাকে কিভাবে প্রিয় বলবেন, যিনি তাঁর সামনেই তাঁর অপর স্ত্রীকে গালমন্দ করেন? রাসুল (সাঃ) তাকে কেমন করে আপন বলে মেনে নিবেন, যে তাঁর সন্তান ইব্রাহীমের প্রতি বিদ্বেশ পোষন করতেন এবং ইব্রাহীমের মাতা মারিয়ার (রাঃ) প্রতি জঘন্য চরিত্রের দোষারোপ করতেন? [১] রাসুল (সাঃ) তাকে কিভাবে বন্ধু গণ্য করবেন, যে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের প্রতি মিথ্যার অপবাদ দেন ও কখনো কখনো রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করতেন? রাসুল (সাঃ) তাকে কেমন করে নিজের প্রানের চেয়েও প্রিয় বলে গণ্য করতে পারেন, যিনি রাসুল (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা মা ফাতিমার (সাঃআঃ) প্রতি বিদ্বেশ পোষন করতেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালেবের প্রতি এতো পরিমানে ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রদর্শন করতেন যে তাঁর (আলীর) নাম পর্যন্ত শুনতে নারাজ ছিলেন এবং জীবনের কোন একটি মুহূর্তেও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেননি? [২] এই সমস্ত ঘটনা তো রাসুলে পাক (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ঘটেছে।

এবার রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরের ঘটনাবলী বয়ান করা হচ্ছে। আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) এ ধরণের কথা-বার্তা মোটেই পছন্দ করেন না, আর না এ ধরণের কার্য-কলাপকে পছন্দ করেন। কারণ আল্লাহ্ সত্য, তাঁর রাসুল হলেন সত্যের মানদন্ড। সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না যে, **আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) এমন কাউকে পছন্দ করবেন কি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়?**

---

১ এ সম্পর্কে আল্লামা জাফর মুর্তুজা আমিনীর কিতাব **"হাদীসুল ইফ্‌কা"** অধ্যয়ন করুন।

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১৩৫

হিকমত হবে যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) অবগত আছেন। ঠিক যেমন আয়েশার (রাঃ) সমস্ত অভদ্র আচরন ও কর্মকান্ডের জন্য নিঃসন্দেহে কোন হিকমতের কারণেই তাকে তালাক দেন নি। পরবর্তি আলোচনায় আমরা এগুলোই বিশ্লেষন করবো।

প্রথম স্ত্রী আসমা বিনতে নোমানের (রাঃ) সরলতা তো ঐ সময়ই প্রকাশ পেয়ে গেছে, যখন আয়েশার (রাঃ) ষড়যন্ত্র তার উপর সফলতা অর্জন করেছিল এবং রাসুল (সাঃ) যখন তার দিকে হাত প্রসারিত করলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "**আউজুবিল্লাহে মিনকা**" (আমি আপনার হতে আল্লাহ্‌র কাছে পানা্ চাই)। রাসুল (সাঃ) তার কথাকে স্বীকার করে নেন, যদিও তিনি রুপে ও গুণে অতুলনীয় ছিলেন। তার নির্বুদ্ধিতার কারণে রাসুল (সাঃ) তাকে তাঁর কাছে রাখা সমুচিত মনে করেন নি। ইবনে সা'দ তার '**তাবাকাত**'-এর ৮ম খন্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, '**রাসুল (সাঃ) ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আসমা বিনতে নোমানের সাথে বিবাহ্ করে ছিলেন**'।

ঐ ঘটনা দ্বারা রাসুল (সাঃ) সম্ভবতঃ এটাই বুঝাতে চেয়ে ছিলেন যে, রং-রূপের চেয়ে বুদ্ধি-বিবেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই রং-রূপের কারণেই অনেক মহিলা বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়েছে।

কিন্তু মালিকা বিনতে কা'ব (রাঃ) আয়েশার (রাঃ) ধোকাবাজির শিকার এই কারণে হয়েছিলেন, যেহেতু রাসুল (সাঃ)-কে তার পিতার হত্যাকারী বলা হয়েছিল। সুতরাং রাসুল (সাঃ) চান নাই যে, তাঁর সাথে জীবন যাপন করতে যেয়ে তাকে সারা জীবন মানসিক কষ্ট ভোগ করতে হয়, কখনো শান্তি পাবে না, তাই তাকেও তালাক দিতে বাদ্ধ হয়ে ছিলেন। যদিও তিনি অল্প বয়সী ছিলেন এবং তার কথার তেমন কোন গুরুত্বও ছিল না, যা তার বংশের লোকেরাই রাসুল (সাঃ)-কে বলেছিল। কারণ এধরণের মানসিক যাতনা অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় সমস্যা ডেকে আনে। বিশেষ করে আয়েশার (রাঃ) উপস্থিতিতে তো আরো প্রকোট হয়ে দেখা দিত, কখনোই সুন্দর জীবন যাপন করতে পারতো না। কোন সন্দেহ নাই যে ইহা ছাড়া আরো কত কারণ থাকতে পারে যা একমাত্র রাসুলই (সাঃ) জানেন।

আমাদের বোঝা উচিৎ যে, রাসুল (সাঃ) সোন্দর্য, দৈহিক কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে বেড়াতেন না। বরং কিছু মূর্খ, নাদান ও বিভিন্ন ফেৎনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) সুন্দরী ও রূপসী মহিলাদের জন্য লালায়িত থাকতেন। (মায়াজাল্লাহ্)

আমরা জানতে পারলাম যে, রাসুল (সাঃ) কেমন করে দু'জন আলোচিত সুন্দরী ও রূপসী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন, যা ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ঐ ব্যক্তির কথাটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন, যে বলেছিল যে, '**রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে তার সৌন্দর্য ও অল্প বয়সী হওয়ার কারণে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন**'।

জয়নাব বিনতে হাজশ, সাফিয়া বিনতে হাই এবং মারিয়া কিবতিয়ার সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষা এবং চরম হিংসা প্রদর্শন করতেন, কারণ তাঁরা সকলেই আয়েশার চেয়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন”।

ইবনে সা'দ **'তাবাকাত'**-এর ৮ম খন্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে কাসির নিজের **'ইতিহাস'**-এর ৫ম খন্ডের ২৯৯ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, “রাসুল (সাঃ) মালিকা বিনতে কা'ব (যিনি একক সৌন্দর্যের অধিকারিনী ছিলেন)-এর সাথে বিবাহ্ করলেন। একদা আয়েশা তার কাছে গিয়ে বল্লেন, '*নিজের পিতার হত্যাকারীর সাথে বিবাহ্ করতে তোমার লজ্জা হল না*'। আয়েশার এমন উস্কানীতে মালিকা রাসুল (সাঃ)-এর কাছে তালাক দাবী করলেন। এমতাবস্থায় রাসুল (সাঃ) তাকে তালাক দিতে বাধ্য হলেন। মালিকার আত্মীয়-স্বজনরা রাসুল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলেন যে, '*বাচ্চা মানুষ, কোন বিশ্বাস নেই, নিশ্চয়ই তাকে উস্কানী দেয়া হয়েছে, আপনি আবার রুজু করে নেন*' কিন্তু রাসুল (সাঃ) সম্মত হলেন না। মালিকার পিতাকে মক্কা বিজয়ের দিন খালিদ বিন ওয়ালিদ হত্যা করেছিল”।

উক্ত ঘটনাটি আমাদের দৃষ্টিকে ঐ দিকে আকৃষ্ট করছে যে, রাসুল (সাঃ) কম বয়সী বা অনেক সুন্দরী মহিলাদের সাথে বিবাহ করার জন্য মোটেই লালায়িত ছিলেন না। তাঁর যদি এ ধরণের লালসা থাকতো, তাহলে মালিকা বিনতে কা'ব-এর মত রূপসী ও অপ্সরীকে কিছুতেই তালাক দিতেন না।

এধরণের বিভিন্ন ঘটণাবলী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একথাই প্রমান করে যে আয়েশা (রাঃ), নেক ও ভদ্র মুমিনাতদের ধোকা দিয়ে রাসুল (সাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। ঠিক যেমন, আসমা বিনতে নোমানকে তালাক দেওয়ালেন। ঘটনাটি এরকম যে ঃ আয়েশা, আসমার সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষন্বিত হয়ে ধোকার ছলে বলেছিলেন যে, 'রাসুল (সাঃ) ঐ মহিলাকে বেশী ভালবাসেন যে মহিলা দৈহিক মিলনের সময় “**আউজুবিল্লাহে মিনকা**” (আমি আপনা হতে আল্লাহ্‌র আশ্রায় কামনা করছি) বাক্য উচ্চারণ করে। অন্য দিকে মালিকাকে তাঁর পিতার হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়ে ছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) হলেন তার পিতার হত্যাকারী এবং তাকে বলে ছিলেন যে, '**নিজের পিতার হত্যাকারীর সাথে বিবাহ্ করতে তোমার লজ্জা করেনি**'। সুতরাং রাসুল (সাঃ)-এর কাছে তালাক দাবী করা ছাড়া ঐ বেচারীর কাছে অন্য কোন উপায় ছিল না।

এমতাবস্থায় আমাদেরর প্রশ্ন করার হক আছে যে, **ঐ দুই স্ত্রী যারা আয়েশার (রাঃ) ধোকাবজীর শিকার হয়েছিলেন, রাসুল (সাঃ) কেন তাদের তালাক দিলেন?**

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করার পূর্বে, রাসুল (সাঃ)-কে মাসুম গণ্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। অতএব, একজন মাসুম কারোর প্রতি জুলুম করতে পারেন না। তিনি তো হক ব্যতীত অন্য কোন কাজই করেন না। সুতরাং ঐ দুই জনার তালাকের বিষয় নিশ্চয়ই কোন

বুঝাবো। উমর আরো বলেন যে, আমি আয়েশার নিকট যেয়ে বল্লাম, "*হে বিনতে আবু বকর, তোমার এতো সাহস হয়ে গেছে যে, রাসুল (সাঃ)-কেও কষ্ট দিচ্ছ*"? আয়েশা বলেন, "*হে খাত্তাবের পুত্র, আপনার কি হয়েছে, এই দোষারোপ করা আপনার উপরেই বর্তাক*"। উমর বল্লেন, তারপর আমি হাফসার নিকট পৌছে বল্লাম, "*তোমার এতো সাহস হয়ে গেছে যে, তুমি নবী (সাঃ)-কে কষ্ট দিচ্ছ, খোদার কসম তুমি এটা ভাল করেই জানো যে, রাসুল (সাঃ) তোমাকে পছন্দ করেন না, আমি যদি না থাকতাম তাহলে কবেই তিনি তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন*"। ইহা শুনে হাফসা কান্নায় ভেঙে পড়ল।" [১]

এই রেওয়ায়েতটি নিশ্চিত রূপে ঘোষণা দিচ্ছে যে, নবী (সাঃ) হাফসা বিনতে উমরকে (রাঃ) মোটেই ভালবাসতেন না বরং রাজনৈতিক প্রয়োজন ও সময়ের দাবীর কারণে তাকে কাছে রাখতে বাধ্য ছিলেন।

আর যে বিষয়টি আমাদের বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করেছে, সেটা এই যে, উমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) হাফসাকে (রাঃ) ভালবাসতেন না। ইহা একটি তিক্ত সত্য যে, উমর বলেছিলেন, **"খোদার কসম, রাসুল (সাঃ) তোমাকে মোটেই পছন্দ করেন না"**।

অতঃপর, আমাদের জন্য আর কোন দ্বিধা থাকল না যে, রাসুল (সাঃ) বিভিন্ন মহিলাদের সাথে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিয়ে করেছিলেন এবং এই কথাটি হযরত উমরের (রাঃ) এই বক্তব্যে আরো স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে যে, **"আমি না থাকলে তিনি (সাঃ) তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন"**।

উক্ত রেওয়ায়েতটি আমাদেরকে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যে, রাসুল (সাঃ) রাজনৈতিক হিকমতের কারণেই আয়েশাকে (রাঃ) তালাক দেননি এবং আবু বকরের (রাঃ) কারণেই আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। অথচ তার তুলনায় হাফসা (রাঃ), রাসুল (সাঃ)-এর ভালবাসা পাওয়ার বেশী হকদার ছিল, কারণ আয়েশার তুলনায় রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি হাফসার জ্বালাতন অতি নগন্য। আমরা যখন বনী উমাইয়াদের কর্তৃক আয়েশার (রাঃ) ফজিলাত হিসাবে বর্ণিত হাদীসগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবো তখন বুঝতে পারবো যে, তার দ্বারা রাসুল (সাঃ) কতই না দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছেন। কতবার যে তিনি (সাঃ) আয়েশার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। এবার আমরা আরো একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে যাচ্ছি যেটাকে বুখারী এবং আহলে সুন্নাতের আরো অনেক মুহাদ্দেসীনগণ রেওয়ায়েত করেছেন। **এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) কত অপছন্দ করতেন এবং তিনি নিজেও অবগত ছিলেন যে, তার স্বামী তাকে কতই না অপছন্দ করেন!!**

---

১ **সহীহ্‌ মুসলিম**, খঃ ৪, পৃঃ ১৮৮

কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে, **'রাসুল (সাঃ) আবু বকরের (রাঃ) কন্যা হওয়ার কারণে আয়েশাকে (রাঃ) বেশী ভালবাসতেন'** -এটা হলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তবে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, রাসুল (সাঃ) আবু বকরের (রাঃ) কারণেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। কারণ রাসুল (সাঃ) **'রাজনৈতিক হিকমত'**-এর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন গোত্রের মহিলাদের সাথে বিয়ে করে ছিলেন। যেন ঐ সমস্ত গোত্র গুলির মাঝে সৌহার্দ ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও সমস্ত বিবাদ ও বিগ্রহকে নিঃশেষ করা যায়। সে কারণেই মুয়াবিয়ার বোন **'উম্মে হাবিবা'** বিনতে আবু সুফিয়ানের সাথেও তিনি বিয়ে করেছিলেন। যেন তাদের অন্তরেও কোন ক্রোধ না থাকে। যেহেতু রাসুল (সাঃ) হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, সেহেতু এই মহানুভবতার জন্যই দেখা যায় যে, রাসুল (সাঃ)-এর দাম্পত্য সম্পর্ক আরব গোত্রদের সীমানা ছাড়িয়ে ইয়াহুদ ও নাসারা এবং কিবতিদের গোত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যার এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেন বিভিন্ন গোত্রে ও ধর্মালম্বী একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

বিশেষ করে আমরা যখন সীরাত পুস্তকাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবু বকর (রাঃ) নিজেই রাসুল (সাঃ)-কে আয়েশার সাথে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে উমর ইবনে খাত্তাবও (রাঃ) তার মেয়ে হাফসার (রাঃ) সাথে বিয়ে করার জন্য রাসুল (সাঃ)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অপর দিকে রাসুল (সাঃ) উভয়ের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ রাসুল (সাঃ)-এর অন্তর সমগ্র পৃথিবীবাসীদের জন্য বিস্তৃত ছিল।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, **"আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাস হইতে সরিয়া পড়িত"**। [১]

এবার আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক, যেখানে তিনি বলেছেন, **"রাসুল (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমাকে ঘুমন্ত মনে করে চাদর তুলে দরজা খুলে বের হয়ে যান"**। আয়েশার (রাঃ) এই বাক্য দ্বারা তাঁর এই দাবী মিথ্যা প্রমানিত হয় যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর জন্য সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। [২]

এই কথাটি চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন গাল-গপ্প নয়, বরং আহলে সুন্নাতের সহীহ্ গ্রন্থাদিতে প্রচুর দলিল উপস্থিত আছে। মুসলিম ও অন্যান্যরা তাদের সহীহ্ গ্রন্থগুলিতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ "নবী (সাঃ) যখন তাঁর স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি লোকজন কাঁকর নিক্ষেপ করছে এবং বলছে যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন অথচ তাদেরকে পর্দার হুকুম দেন নাই। আমি বলাম, '*আমি তাদেরকে অবশ্যই*

---

১ সূরা আলে-'ইমরান ঃ ১৫৯

২ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৩, পৃঃ ৬৪ এবং **মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৬, পৃঃ ২২১

আলামীন (নারী কূলের সম্রাজ্ঞী), যার ক্ষুব্ধ হওয়াতে আল্লাহ্ ক্ষুব্ধ হোন, যার রাজি ও খুশি হওয়াতে আল্লাহ্ রাজি ও খুশি হয়ে থাকেন। অথচ ঐ মুসলামানদের কাছে তিনিই অতি নগন্য হয়ে গেলেন। তাঁকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়া হয়েছিল। তাঁর গর্ভের সন্তান-কে হত্যা করা হলো। রাতের অন্ধকারে তাঁকে দাফন করা হয়ে ছিল। **অথচ যে সমস্ত হাদীস তিনি তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন, যেগুলির মধ্য হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে একটি হাদীসও কেন পাওয়া যায় না, এমনটি হওয়ার কারণ কি?**

অপরপক্ষে, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া, জিয়াদ ইবনে আবিহা, ইবনে মারজানাহ্, ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ এবং ইবনে আ'স, যারা কোরআন ও নবীর (সাঃ) ভাষায় **'ফাসেক'** ও **'মালাউন'** হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, তারাই আমিরুল মুমিনিন এবং মুসলমানদের সৈয়দ ও সর্দার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ) যারা হলেন **'সৈয়্যেদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ্'**, এই উম্মাতের নবী (সাঃ)-এর সন্তান, রাসুল (সাঃ)-এর ইতরাত (বংশধর) এবং তাঁর (সাঃ) উম্মাতের জন্য শাফায়াতকারী। অথচ তাঁদেরকেই এই মুসলমানরা হত্যা করলো, বিষ প্রয়োগ করলো, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে রাখলো।

ঠিক তেমনি ভাবে আবু সুফিয়ানের মত মুয়াবিয়া, যে সর্বদাই রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, ঐ মুসলমানরা তারই গুণ কীর্তন শুরু করেদিল, তারই শুকুরগুজারী আরম্ভ করেদিল। এমন কথাও বলা হত যে, **'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করলো সে আমান (রক্ষা) পেল'**। অথচ আবু তালিব (আঃ) যিনি আমরণ নবী (সাঃ)-কে লালন-পালনের পাশাপাশি দ্বীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নিজের জীবন বাজি রেখে সর্বাত্নক সাহায্য-সহযোগিতা করলেন, তাঁর (সাঃ) জন্য নিজ গোত্রভূক্ত লোকদের কটাক্ষ্য সহ্য করলেন, এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত রাসুল (সাঃ)-এর জন্য **'শেব-এ-মক্কা'**-ত বন্দী জীবন যাপন করলেন এবং ইসলামের **'মুসলেহাত'** ও **'হিকমাত'**-এর কারণে নিজের ঈমানকে লুকিয়ে রাখলেন, যেন কোরায়েশদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা যায় এবং কোরায়েশরা যেন মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে না পারে। আবু তালিবের (আঃ) উদাহরণ, আলে ফেরআউনের ঐ মুমিন বান্দাদের মত যারা ফেরআউনের অত্যাচারের ভয়ে নিজেদের ঈমানকে লুকিয়ে রেখেছিল। আর এই আবু তালেব (আঃ)-এর মত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, **"আবু তালেবের ঠিকানাও হবে জাহান্নাম, তাঁর পা দুটোকে পুড়িয়ে মাথার ঘিলু দিয়ে বের করে দেয়া হবে (নাউজুবিল্লাহ্)"**।

অপরদিকে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, পাপির ছেলে পাপিষ্ট, লানত প্রাপ্তর ছেলে লানতী, আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর হুকুম লংঘনকারী, ইসলামকে ধ্বংসকারী, নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নেক বান্দাদেরকে তরবারী দ্বারা হত্যাকারী, যে রাসুল (সাঃ)-এর উপর প্রকাশ্যে লানত করতো (*এই সম্পর্কে নিচে একটি কবিতা দেয়া হল*), সেই ব্যক্তিকেই **'কাতিব-এ-অহি'** বলা হলো (আজও আহলে সুন্নাতগণ বলে থাকেন) এবং ইহাও

বুখারী তাঁর সহীহ্-র ৭ম খন্ডের **'কিতাবুল মারাজ ওয়াত্ তিব'** -এর ৮ম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন যে, আয়েশা বল্লেন, "*হায় আমার মাথা ফাটলো*"। তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, "*এমনটি যদি হতো তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতাম*"। আয়েশা বলেন, **"হায় মুসিবাত! আল্লাহ্র কসম আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমার মরে যাওয়াটাই কামনা করেন, এমনটি যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি শেষ বয়সে অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে মজা করতে পারবেন"**

উক্ত রেওয়ায়েতটি কি বলছে যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) ভালবাসতেন? আমার আকীদা হচ্ছে যে, কারোর মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা মর্যাদাহানীর জন্য উমাইয়াদের একটি মাত্র মানদন্ড ছিল, সেটা এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইত তথা আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ)-এর প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসুল (সাঃ)-এর শত্রু বা বিরোধি হত এবং তাঁর (সাঃ) আহলে বাইতের শত্রু হতো, উমাইয়ারা তাকেই বেশী প্রাধান্য দিত এবং তার শানেই বেশী করে হাদীস রচনা করতো, তাকেই বন্ধু গণ্য করতো, তাকে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করতো, বিভিন্ন রকমের পুরস্কার দিত এবং জনগন তাদেরকেই সম্মান প্রদর্শন করতো।

অথচ যে ব্যক্তি রাসুল (সাঃ)-কে চরম ভালবাসতো এবং তাঁর (সাঃ) পক্ষ অবলম্বন করতো, উমাইয়ারা সেই ব্যক্তিরই নিন্দা করতো, তার মর্যাদাহানী করাতো এবং তার চরিত্রের উপর নানা দোষ-ত্রুটি চাপিয়ে তার নিন্দার জন্য হাদীস রচনা করাতো।

সে কারণেই উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বনী উমাইয়াদের রাজত্বকাল হতেই মুসলমানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আসনে আসীন হয়ে আছেন। কারণ তিনিও পদে পদে রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন, এমনকি রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** একটি জঘন্য দোষ চাপিয়েছিলেন। কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ), যিনি রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এতই প্রিয় ছিলেন, ঠিক যেমন মুসা (আঃ)-এর নিকট হারুন (আঃ)। যিনি আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-কে বন্ধু গণ্য করতেন এবং আল্লাহ্ ও রাসুলও (সাঃ) তাঁকে বন্ধু গণ্য করতেন। যিনি প্রত্যেক মুমিনের মাওলা (অভিবাবক) ছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তির উপরই ঐ মুয়াবিয়া ভক্ত মুসলমানেরা ৮০ বৎসর পর্যন্ত মিম্বরে বসে **'লানত"** পাঠ করেছে।

অনুরুপভাবে আয়েশাও (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-কে নিপীড়ন করতে থাকেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাশাপাশি রাসুল (সাঃ)-এর হুকুমও অমান্য করতেন। রাসুল (সাঃ)-এর উত্তরসূরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তারই কারণে বড় বড় ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সে কথা মুসলমানরা ভাল করেই জানেন। ঐ ফেৎনার দাবানলে হাজারো নিস্পাপ মুসলমানের রক্ত ঝরেছিল। তিনিই আবার মুসলমানদের কাছে গণ্যমাণ্য ব্যক্তিত্বের রূপ ধারণ করলেন, তার কাছ থেকেই ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম ও মাসলা-মাসায়েল গৃহিত হতে থাকে। কিন্তু ফাতিমা যাহ্রা (সাঃআঃ), যিনি হলেন সৈয়্যেদাতুন নিসায়িল

(সাঃ)-এর নিকট হতে অর্ধেক দ্বীন লাভ করেছিলেন। রাসুল (সাঃ) নাকি নিজেই বলতেন যে, **'আর্ধেক দ্বীন তোমরা এই হামিরার (আয়েশা) কাছ থেকে গ্রহন করিও'**। এই হাদীসটি ডাহা মিথ্যা, এটা সত্য হওয়ার পক্ষে কোন ভিত্তিই নেই। আর আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বয়ানকৃত সমস্ত হাস্যকর রেওয়ায়েতগুলিই সত্য নয়। রাসুল (সাঃ) এধরণের হাদীস বয়ান করতেন না। এ সম্পর্কে **'রাজায়াত-এ-কবির'**-এর (বড়দেরকে দুগ্ধ পান করানো) মাসয়ালাটাই তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে। যে মাসয়ালাটি আয়েশা (রাঃ) নিজেই রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যাপারে আমি আমার বই **'কুনু মায়াস্‌ ছাদেকীন' 'সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও'**-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুধী পাঠক মন্ডলী, বিষয়টি বিস্তারিত সেখান থেকে জেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

উক্ত রেওয়াতের মধ্যকার অসৎকর্ম সম্পর্কে এতটুকুই বলা যথেষ্ট হবে যে, নবী (সাঃ)-এর অন্যান্য সতল স্ত্রীগণ **'রেজায়াত-এ-কবীর'**-এর (বয়স্কদের দুগ্ধ পান করানো) মাসয়ালার উপর আমল করাকে অস্বীকার করেছেন। এমনকি এই রেওয়ায়েতের রাবী (বর্ণনাকারী) স্বয়ং এক বৎসর পর্যন্ত আক্ষরিক ভাবে বয়ান করতে ভয় পেতেন।

আমরা যখন সহীহ্‌ বুখারীর ***"ইয়াকসুরু মিনাছ ছালাতে ইযা খারাজা মিন মাওযেয়েহি"*** অধ্যায়টি অধ্যয়ন করি তখন দেখতে পাই যে, তিনি জুহুরী হতে, জুহুরী উরওয়াহ হতে এবং উরওয়াহ আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা বলেন, *"সবার আগে যে দু'রাকাত নামাজ ফরজ করা হলো এবং পড়া হলো, সেটা ছিল সফরের নামাজ। অথচ বাসস্থানে পুরো নামাজ পড়া হতো"*। জুহুরী বলেন আমি উরওয়াহকে জিজ্ঞাসা করলাম, *"আয়েশার কি হয়েছিল যে তিনি পুরো নামাজ পড়তেন"?* উরওয়াহ বলেন, *"আয়েশাও উসমানের ন্যায় তা'বীল (ওজর বা জটিল ব্যাখ্যা) করে নিয়েছিলেন"*।

মুসলিম নিজ সহীহ্‌র ***"ছালাতিল মুসাফেরীন ওয়া কাসারুহা"*** অধ্যায়ে এবং বুখারী তার চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় জুহুরী হতে এবং জুহুরী উরওয়াহ হতে এবং উরওয়াহ আয়েশা হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, *'সর্বপ্রথম যে দু'রাকাত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল এবং পড়া হতো সেটা হলো সফরের নামাজ, অথচ বাসস্থানে নামাজ পুরোটাই পড়া হতো'*। জুহুরী বলেন 'আমি উরওয়াহকে বল্লাম যে, আয়েশার কি হয়েছিল যে তিনি সফরের মধ্যে নামাজ পুরোটাই পড়তেন? উত্তরে জুহুরী বলেন যে, আয়েশাও ঠিক ঐ ভাবেই ওজর বা জটিল ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন যেভাবে উসমান করে নিয়েছিলেন'।

এটাতো স্পষ্টই বৈপরীত্ব যে, একদা আয়শা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন দু'রাকাত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু নিজেই আবার আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসুল (সাঃ)-এর আমালের বিরোধিতা করেছেন এবং উসমানের সুন্নাতকে জীবিত রাখার জন্য আল্লাহ্‌ ও রাসুলের হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছেন। অনুরুপ আহলে সুন্নাতের সিহাহ্‌ সিত্তাগুলিতে আরো অনেক আহ্‌কাম দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে, যেগুলি তারা বুঝে উঠতে পারেন

বলা হলো যে, **'আল্লাহ্ তাঁর অহির জন্য জীব্রাইল, মুহাম্মদ এবং মুয়াবিয়াকে আমিন নিযুক্ত করেছেন'**। এমনকি মুয়াবিয়াকে একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং জ্ঞান ও হিকমতের শ্রেষ্ঠ ভান্ডার বানিয়ে দেয়া হলো।

কবিতাটি আরবীতে লিখিত, তাঁর বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো ঃ

সে আহমদের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেশ এবং আলীর প্রতি শক্রতা পোষণ করেছে
এবং মুনাফেক ও পথভ্রষ্টদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপণ করেছে
মুনাফেকীর আড়াল নিয়ে গোপনে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি গালমন্দ করেছে
অথচ তাঁর (সাঃ) ভাই আলীর (আঃ) প্রতি প্রকাশ্যে লানত করেছে।

কিন্তু আবু যার গিফারী (রাঃ), যার চেয়ে অধিক সত্যবাদী মানুষের প্রতি না আসমান ছায়া করেছে আর না জমিন তার বুকে ধারণ করেছে, তার মত ব্যক্তিত্বকে **'ফেৎনাবাজ'** বলে আখ্যায়িত করা হলো। তাঁকে মারধর করে জীবিত দেশান্তর করা হলো। সালমান, মেকদাদ ও আম্মারদের (রাঃ) মত সমস্ত সাহাবীকে, যারা হযরত আলী (আঃ)-কে ভালবাসতেন ও আনুগত্য করতেন, তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং হত্যাও করা হলো।

এভাবেই খলিফাদের আনুগত্যকারী, মুয়াবিয়ার পক্ষালম্বনকারী এবং জালেম শাসক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাযহাবসমূহের পূজারীগণ **'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'** হয়ে গেলেন। তারাই ইসলামকে ধ্বংস করলেন। অথচ যারা তাদের বিরোধিতা করলেন (যদিও তারা আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসারী ছিলেন) তাদেরক কাফির বলে আখ্যায়িত করা হলো।

অপরদিকে আহলে বাইতের প্রধান ব্যক্তি, জ্ঞানের দ্বার, যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন করেছেন, **'সত্য'** যাঁর সাংগে চলতো, তাঁকে এবং তাঁর ঔরসের মাসুম ইমামদের আনুগত্যকারীদের **'পথভ্রষ্ট'** এবং **'বিদআত পন্থী'** বলা হয়ে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধাচারী ও তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহকারীগণই হলো আজকের মুসলমান। **লাহাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল-াবিলাহিল আলীয়্যিল আযীম। ওয়া সাদাকাল্লাহিল আযীম।**

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, **"তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না', তাহারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আয়িনাছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে তোমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ কিন্তু ইহারা জানে না"**। [১]

এবার আমরা আয়েশার (রাঃ) প্রতি রাসুল (সাঃ)-এর ভালবাসা সম্পর্কে আলোকপাত করবো। কারণ আহলে সুন্নাতের আকীদানুসারে আয়েশা (রাঃ) নাকি রাসুল

---

১ সূরা বাকারা ঃ ১১-১৩

আবার এই জঘন্য কথাও রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, জিব্রাইল (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট ঠিক এমন মহুর্তে আগমন করতেন যে মুহুর্তে নবী (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করতেন। অথচ কথাটির বিপরীতে স্বয়ং কোরআনই স্বক্ষী যে, **তিনি রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ্ পাক তাকে জিব্রাইল (আঃ), ছালেহ মুমিনিন ও ফেরেশ্‌তাদের দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছেন**।

অতএব আমাদের ওলামা ও 'বুজুর্গান-এ-দ্বীন'-দের ঐ সমস্ত কথা-বার্তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, মনগড়া ও বানোয়াট এবং ঐগুলি দ্বারা **'সত্য'**-কে কষ্মিনকালেও ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

সুধী পাঠক মন্ডলী, তাদেরকে বলে দিন, তাদের কাছে সত্যিই যদি কোন দলিল-প্রমান থেকেই থাকে তাহলে ঐগুলি যেন আমাদের সন্মুখে উপস্থাপন করুক। তারা শুধু মনগড়া বিষয়ের আনুগত্য করেন এবং আন্দাজ-অনুমানের ঢিল ছুড়ে থাকেন।

রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর আয়েশা (রাঃ)

রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমরা যখন আয়েশা বিনতে আবু বকরের (রাঃ) জীবনী পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, তার জন্য ময়দান পরিস্কার ছিল। তখন তার পিতা মুসলিম জাহানের খলিফা ও অভিভাবক সেঁজে বসেছিলেন এবং তিনিও মুসলিম জাহানে অঢেল সম্মান লাভ করেছিলেন। **কারণ তার স্বামী ছিলেন রাসুল (সাঃ) এবং তার পিতা হলেন রাসুল (সাঃ)-এর খলিফা**।

উপরন্তু আয়েশার (রাঃ) নিজের ধারণা বা ভ্রম ছিল যে, রাসুল (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই সবার চেয়ে উত্তম, আর এই ফজিলাত কেবল এই জন্য যে, রাসুল (সাঃ)-এর দাম্পত্য জীবনে একমাত্র তিনিই ছিলেন অবিবাহিতা কিশোরী এবং তার ছাড়া অন্য কোন কুমারী রাসুল (সাঃ)-এর জীবনে আসেনি। এবং রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তিনি পূর্ণাঙ্গ যুবতী ছিলেন। রাসুল (সাঃ)-এর সাথে দাম্পত্য জীবনের প্রথম কয়েক বছর তো খেল-তামাশাতেই কেটে যায়। রাসুল (সাঃ)-এর পরিচারিকা আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, **"তিনি এতই অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন যে, আটা খামির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং কুকুর এসে আটা খেয়ে নিত"**।

তবে এটা সত্য যে, ১৮ বৎসার বয়সে মেয়েরা যুবতী তথা বালেগ হয়ে যায়, ইদানিংকালে সেরকমই বলা হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) তার অর্ধেক বয়স ১০ জন সতিনের মাঝে অতিবাহিত করেছেন। আরো মহিলা ছিলেন, কিন্তু তাদের আলোচনা আয়েশার (রাঃ) জীবনীর পাশাপাশি করতে চাই না। যেহেতু রাসুল (সাঃ) তাদেরকে অত্যান্ত ভালবাসতেন সেহেতু তাদের প্রতি আয়েশা (রাঃ) নিজের সতিনদের চেয়েও অধিক আক্রোশ ও ঘৃণা পোষণ করতেন। তারা হলেন ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ) এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া

না, কেননা তারা বেশীর ভাগই আবু বকর ও উমরের (রাঃ) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন এবং উসমান ও আয়শার (রাঃ) ও মুয়াবিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের প্রতি আমল করে থাকেন।

অতএব হামীরা (আয়েশা) যখন রাসুল (সাঃ) হতে অর্ধেক দ্বীন হাসিল করেছিলেন এবং সেই অধিকার বলে যেমন খুশি তেমন ভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কামকে পরিবর্তনও করলেন। এমতাবস্থায় আমার বিশ্বাস যে, রাসুল (সাঃ) কোন অবস্থাতেই আয়েশার (রাঃ) প্রতি রাজি-খুশি থাকতে পারেন না, আর না সমগ্র উম্মতকে তার আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম তথা আহলে সুন্নাতের অন্যান্য গ্রন্থাদিতে এমন সব নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, সে মোতাবেক যদি আয়েশাকে (রাঃ) আনুগত্য করা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহগার হতে হবে।

কিন্তু তারা যখন বলেন যে, "**রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) প্রতি এজন্য বেশী আকৃষ্ট ছিলেন, কারণ তার সাথে বিবাহ করার পূর্বে হযরত জিব্রাইল (আঃ) আয়েশারই আকৃতি ধারণ করে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হতেন এবং তার সাথে বিবাহ হওয়ার পরে ঠিক তখনই অবতরণ করতেন যখন রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) ঘরে অবস্থান করতেন**"। এইটা এমনই একটি রেওয়ায়েত যেটা শুনলে পাগলেরও হাসি পাবে। আমরা বুঝতে পারি না যে, জিব্রাইল (আঃ) যে আকৃতিতে নাযিল হতেন সে আকৃতিটা কি ফটোগ্রাফি ছিল না কাঠের পুতুল। কারণ, আহলে সুন্নাত তাদের সহীহ্ হাদীস গ্রন্থাদিতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "**আবু বকর, আয়েশার মারফত রাসুল (সাঃ)-এর নিকট উপহার হিসাবে খুরমা পাঠিয়ে ছিলেন, যেন রাসুল (সাঃ) এই উসিলায় আয়েশার দর্শন করে নিতে পারেন। যেহেতু ইতিপূর্বেই রাসুল (সাঃ) আবু বকরকে তার কন্যার সাথে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব করে রেখেছিলেন**"। তাহলে সেখানে এমন কোন অজুহাত ছিল যে, জিব্রাইল (আঃ) আয়েশার (রাঃ) আকৃতিতে নাযিল হবেন। অথচ তিনি, নবী (সাঃ)-এর গৃহ হতে মাত্র কয়েক মিটার দূরত্বেই বসবাস করতেন। আমার মতে, জিব্রাইল (আঃ)-কে মারিয়া কিবতিয়ার (রাঃ) (রাসুলের অপর একজন স্ত্রী) আকৃতিতে নাযিল হওয়া উচিৎ ছিল, কারণ তিনি রাসুল (সাঃ) হতে অনেক দূর অর্থাৎ মিসরে বসবাস করতেন। আর এটা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, মারিয়া (রাঃ) কখনো রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রী হয়ে আসবেন। মারিয়াই (রাঃ) তো বেশী হকদার ছিলেন যেন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর আকৃতিতে নাযিল হয়ে ইব্রাহীমের জন্মের আগাম সংবাদ দিতেন।

কিন্তু এই রেওয়াতসমূহ তো আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক রচিত হয়েছে যে, তার কাছে নিজ সতিনদের উপর গর্ব করার মত আর কিছুই ছিল না বিধায় এই সমস্ত ঘটনা, কিস্‌সা অথবা ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত যা বনী উমাইয়ারা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে তার দ্বারা রচনা করিয়েছে, যেন সরলমনা মানুষের মনে আয়েশার (রাঃ) ফজিলত দৃঢ়ভাবে স্থান গেড়ে বসুক।

রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) প্রতি বেশী আকৃষ্ট ছিলেন, সে কারণেই অন্যান্য স্ত্রীগণ তাকে বলে পাঠিয়ে ছিলেন, তিনি যেন আয়েশার (রাঃ) বিষয়ে ইনসাফ অবলম্বন করেন।

আমরা কি উম্মুল মুমেনীন আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করতে পরি যে, **আপনি যখন জীবনেও খদিজা (রাঃ)-কে দেখেন নাই আর না তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন তাহলে কিভাবে এবং কেমন করে তাকে 'অজুযাহ্ হোমরাউশ্ শাদকাইন' বলেন?** একজন ঈমানদার মহিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তো এমন যে একজন জীবিত ব্যক্তির গীবত করাকে হারাম গন্য করবে, সেখানে ঐ মৃত ব্যক্তি যে তার পরওয়ারদিগারের কাছে পৌছে গেছে তার সম্পর্কে আপনার ধারণা, কেমন হওয়া উচিৎ। যার ঘরে জিব্রাইল অবতরণ করে সংবাদ দিয়েছেন যে, **'বেহেশতে তাঁর জন্য এমন মহল নির্মান করা হয়েছে যেখানে কোন কোলাহল নেই'**। [১]

বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে, খাদিজার (রাঃ) বিরুদ্ধে আয়েশার (রাঃ) মনে যে হিংসা-বিদ্বেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা যদি প্রকাশ না করতেন তাহলে তার অন্ত র ফেটে যেত। তাই হিংসা চরিতার্থের জন্য প্রায় নিজের সমবয়সী (রাবীদের বর্ণনানুসারে কিছু কমবেশী) ফাতেমা বিনতে খাদিজা (রাঃ) ছাড়া আর কাউকে পেলেন না।

এটা মনে রাখার বিষয় যে, রাসুল (সাঃ) খাদিজার (রাঃ) প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং তাঁরই একমাত্র কন্যা ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ)-কে তিনি (সাঃ) নিজের কাছেই রাখতেন, অফুরন্ত ভালবাসতেন।

আয়েশার (রাঃ) আক্রোশ তখন আরো বেড়ে যেত যখন রাসুল (সাঃ) ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে বেহেশতের সম্রাজ্ঞী বলতেন। [২]

অতঃপর আল্লাহ্ পাক ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর গর্ভে হাসান ও হুসাইন (আঃ)-কে পাঠিয়ে বেহেশতে যুবকদের সরদারী দান করলেন। আয়েশা (রাঃ) লক্ষ্য করতেন যে, তিনি (সাঃ) ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর গৃহে যেয়ে নাতি দু'টির সেবা-যত্নে রাত্রি জাগরণ করতেন এবং বলতেন, **"আমার এ দু'টি সন্তান উম্মতের দু'টি ফুল"** এবং দু'জনকে ঘাড়ে তুলে নিতেন, তাতে আয়েশার (রাঃ) ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেত, কারণ তিনি হাটখুড়ে (বন্ধ্যা) ছিলেন। এই ক্রোধ তখন আরো অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেত যখন তিনি হাসান-হুসাইন (আঃ)-এর পিতা ও ফাতিমা (সাঃআঃ)-র স্বামী হযরত আলী (আঃ)-কে তাঁদের মাঝে দেখতেন। তার একমাত্র কারণ ছিল যে, রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ)-কে অনেক ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন এবং সর্ববিষয়েই তার পিতা আবু বকরের (রাঃ) উপরে প্রাধান্য দিতেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে এই বিষয়টি আয়েশার (রাঃ) দৃষ্টিতে কাঁটা হয়ে ফুটতো।

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ২৩১, **সহীহ্ মুসলিম**, **'ফাযলুন খাদিজা উম্মুল মু'মেনীন'** অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ২০৯ এবং খঃ ৭, পৃঃ ১৪৩

মাতা খদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। আপনি কি জানেন এই খাদিজা কে? তিনি হলেন সিদ্দিকায়ে কুবরা, যার প্রতি জিব্রাইল (আঃ) সালাম পাঠাতেন এবং তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, **'বেহেশতে তাঁর জন্য এমন ঘর তৈরী করা হয়েছে যেখানে কোন কোলাহল নাই'**। [১]

রাসুল (সাঃ) খাদিজার (রাঃ) বিষয়ে কখনোই পিছপা হননি। রাসুল (সাঃ) যখনই খাদিজার (রাঃ) আলোচনা করতেন তখনই আয়েশার (রাঃ) কলিজা হিংসায় খন্ড-বিখন্ড হয়ে যেত, মনে আগুন ধরে যেত, নিজের হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন এবং মন খুলে খাদিজার (রাঃ) শানে বে-আদবী করতেন, ঐমুহূর্তে রাসুল (সাঃ)-এর অনুভূতিরও কোন চিন্তা করতেন না। খাদিজার (রাঃ) বিষয়ে বুখারী, আহমদ ইবনে হাম্বল, তিরমিযি এবং ইবনে মাজা প্রমুখ আয়েশা (রাঃ) হতেই বর্ণনা করেছেন ঃ আয়েশা বলেন যে, "*রাসুল (সাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি আমার তত হিংসা হত না যত না খাদিজার প্রতি হিংসা হত। কারণ রাসুল (সাঃ) প্রায়ই খাদিজার গুণকীর্তন করতেন। আমি বলাম, 'আপনি কি কোরাইশের ঐ বুড়ির কথা বলছেন, যার গালের চামড়া ঝুলে পড়ে ছিল? সে তো মরে গেছে আল্লাহ্ আপনাকে তার চাইতে উত্তম দিয়েছেন'। আয়েশা বলেন, 'আমার এই কথার দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে আমি তাঁর (সাঃ) এমন রূপ কখনো দেখিনি। তবে হ্যাঁ যখন অহি নাযিল হতো তখন তাঁর (সাঃ) চেহারার অবস্থা এরকমই হতো'। রাসুল (সাঃ) জবাবে বলেন, "আল্লাহ্ আমাকে তার চাইতে ভাল দেননি। সে আমার প্রতি ঐ মুহূর্তে ঈমান এনেছিল যখন অন্য মানুষেরা কাফের ছিল। সে ঐ মুহূর্তে আমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছিল যে মুহূর্তে লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছিল। সে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ এমন মুহূর্তে আমাকে দিয়ে দিল যখন লোকেরা আমাকে বিদ্রুপ করতো। আল্লাহ্ আমাকে তার গর্ভ হতে এমন মুহূর্তে সন্তান দিলেন যখন অন্য কোন স্ত্রী দ্বারা কোন সন্তান হয়নি*"।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা ঐ ব্যক্তির দাবীটি খণ্ডন হয়ে যায়, যে বলে যে, "**আয়েশা নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং নবী (সাঃ)-র কাছে তিনি অন্য সবার চেয়ে প্রিয় ছিলেন**"। উক্ত ঘটনা দ্বারা এই কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খাদিজার (রাঃ) প্রতি তার বিদ্বেশ তখন আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয় যখন রাসুল (সাঃ) তাকে হুশিয়ার করে দেন এবং ধমক দিয়ে বলেন যে, "*আল্লাহ্ খাদিজার চাইতে ভাল স্ত্রী আমাকে দেননি*"। এখানে রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি (সাঃ) নারী লোভী নন, আর না তিনি (সাঃ) কুমারী ও সুন্দরীদের প্রতি লালায়িত ছিলেন। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর দাম্পত্য জীবনে আসার পূর্বে মা খাদিজা (রাঃ) আরো দুই দুইটা বিয়ে করেছিলেন এবং রাসুল (সাঃ) হতে বয়সে ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন। এতদা সত্বেও রাসুল (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সত্য রেওয়ায়েত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত রেওয়ায়েতগুলিতে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ রেওয়ায়েতগুলিতে বুঝানো হয়েছে যে,

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ২৩১ এবং **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৭, পৃঃ ১৩৩ **'ফাজায়েলে উম্মুল মুমিনিন খদিজা'** অধ্যায়ে।

পথ আবিষ্কার করতে পারেন যা তার পিতার অনুকূলে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই, তিনি রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তার পিতাকে নামাজের ইমামতি করার জন্য সংবাদ পাঠান, যদিও তিনি জানতেন যে রাসুল (সাঃ) নামাজের ইমামতি করার জন্য আলী (আঃ)-কে সংবাদ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আলী (আঃ)-এর পরিবর্তে নিজের পিতাকে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন। রাসুল (সাঃ) যখন এই ষড়যন্ত্রটি ধরতে পারলেন তখন তিনি অতি কষ্টে গৃহ থেকে বাহির হয়ে মসজিদে এসে আবু বকরকে (রাঃ) সরিয়ে দিয়ে নিজে বসে নামাজ পড়ান। পরবর্তিতে আয়েশাকে (রাঃ) বলেছিলেন, **"ইউসুফের সাথে তোমারই মত মহিলারা ছিল"**। (অর্থাৎ তার ষড়যন্ত্র মিথ্যা প্রমানিত হল)।

উক্ত ঘটনাবলী যা আয়েশা (রাঃ) বিভিন্নভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। সেগুলোর প্রতি গভীর আলোকপাত করলে স্পষ্টরূপে পার্থক্য ধরা পড়ে। কারণ এই ঘটনার তিন দিন পূর্বে রাসুল (সাঃ) তার পিতাকে ওসামা ইবনে জায়েদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এই কথা তো সবারই জানা আছে যে, বাহিনীর সরদারই নামাজের জামায়াতে ইমামতি করেন। তাহলে ইবনে জায়েদ ঐ বাহিনীতে আবু বকরের (রাঃ) ইমাম ছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তার পিতার সম্মানহানী অনুভব করলেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন যে তিনি ঐ বাহিনীতে আলী (আঃ)-কে যোগ দিতে বলেন নি অথচ আনছার, মোহাজির এবং কোরাইশের নামি-দামী ব্যক্তিবর্গ সবাই শরীক ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বিভিন্ন সাহাবাদের মত ইহা বুঝতে পেরেছিলেন যে রাসুল (সাঃ) আর বেশী দিনের মেহমান নন। অথবা তিনি হযরত উমরের (রাঃ) এই উক্তির সাথে একমত পোষণ করতেন যে, **'রাসুল প্রলাপ বকছেন'**, তাই তিনি অন্তর জ্বালা ও উস্কানিতে আলী (আঃ)-এর মোকাবেলায় নিজ পিতার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করলেন। আর সেই কারণে তিনি এই কথা অস্বীকার করেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ)-র জন্য খেলাফতের ওয়াসিয়ত করেছেন। তাই তিনি চেষ্টা চালান যেন দূর্বল চিত্তের মানুষগুলোকে এই কথা বুঝানো যায় যে, রাসুল (সাঃ) তারই ঘরে ইন্তে কাল করেছেন। সুতরাং এই মর্মে একটি হাদীসও রচনা করে নিলেন যে, অসুস্থ অবস্থায় রাসুল (সাঃ) বলেছেন, *"নিজের ভাই ও পিতাকে ডাক, আমি তাদের জন্য একটি শিলালিপি দিয়ে যাই। এমনও হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কেউ দাবীদার জন্ম নিয়ে বসে এবং আল্লাহ্, রাসুল ও মু'মিনরা আবু বকর ব্যতীত সবাইকে নিষেধ করেছেন"*। **এমন কেউ আছেন যিনি আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করবেন, তাহলে কোন জিনিস তাদেরকে ডাকতে বাধা দিয়েছিল?**

হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশার (রাঃ) আচরণ ঃ

একজন সত্যসন্ধানী, হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আয়েশার (রাঃ) আচরণে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয়বলী লক্ষ্য করতে পারবেন। যার অর্থ আহলে বাইতের প্রতি

আয়েশা (রাঃ) ইহাও লক্ষ্য করতেন যে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর পিতাকে বাজিমাত করতেন অথচ তিনি তাঁর পিতাকে রাসুল (সাঃ)-এর ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু রূপে দেখতে চাইতেন এবং সবার উপরে পিতার প্রাধান্য কামনা করতেন। আয়েশা (রাঃ) জানতেন যে তার পিতা **'খায়বার যুদ্ধে'** অকৃতকার্য হয়ে সৈন্য নিয়ে ফেরৎ এসেছিলেন এবং রাসুল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, **"আগামীকাল আমি ঐ ব্যাক্তির হাতে পতাকা তুলে দিব যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলকে বন্ধু গণ্য করে এবং আল্লাহ্‌ ও রাসুলও তাঁকে বন্ধু বলে গণ্য করেন। সে ক্ষিপ্রতার সাথে সামনে ধাবিত হয়ে হামলা করে আর সে ফেরারী নয়। সে ফাতিমার স্বামী আলী ইবনে আবি তালিব"**। অতঃপর আলী (আঃ) খয়বার দূর্গ বিজয় করে সাফিয়া বিনতে হাইকে সাথে নিয়ে ফেরৎ আসেন, এই সাফিয়ার সাথে রাসুল (সাঃ) বিবাহ করেছিলেন বলেই আয়েশার (রাঃ) অন্তরে আঘাত লাগে।

আপনাদের জানা আছে যে, রাসুল (সাঃ) আয়েশার (রাঃ) পিতাকে **'সূরা বারায়াত'** দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং হাজীদের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু পরে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে পাঠান এবং আবু বকরের (রাঃ) নিকট থেকে **'সূরা বারায়াত'** নিয়ে নিতে বলেন। এই পরিস্থিতিতে তার পিতা কাঁদতে কাঁদতে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এই সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চান, তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, **"আল্লাহ্‌ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তাঁর বাণী আমি অথবা আমার আহলে বাইতের কোন সদস্যই কেবল প্রচার করতে পারে"**।

আপনারা এটাও অবগত আছেন যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আলী (আঃ)-কে নিজের পরে ইসলামের খলিফা নিযুক্ত করেছেন এবং সাহাবা ও রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীগণও হযরত আলী (আঃ)-কে মোবারকবাদ দিয়েছিলেন এবং সবার প্রথমে আয়শার পিতাই এই কথা বলতে বলতে উপস্থিত হয়েছিলেন, ***"বাখ্‌খিন বাখ্‌খিন লাকা ইয়া ইবনে আবি তালিব আসবাহতা ওয়া আমসাইতা মাওলা কুলি মু'মিনিন ওয়া মু'মেনাহ্‌"*** অর্থাৎ **'হে আবু তালিবের পুত্র! আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, আপিনি সকল মু'মিন নর ও নারীর মাওলা নিযুক্ত হয়ে গেলেন'**।

আপনারা ইহাও জানেন যে, রাসুল (সাঃ) আবু বকরকে (রাঃ) একজন ১৭ বছর বয়স্ক যুবকের (যার তখন দাড়িও গজায় নি) নেতৃত্বে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন এবং তাঁর পিছনে নামাজ পড়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত ব্যাপার তথা ঘটনাবলিই আয়েশাকে (রাঃ) প্রভাবিত করেছিল, কারণ তার অন্তর পিতার জন্য সন্দিগ্ধ ছিল, যেহেতু তিনি তার পিতার জন্য খেলাফতের আকাংখা পোষন করতেন, সেহেতু কোরাইশ গোত্রপতিদের মাঝে অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্রে তিনিও শরীক ছিলেন। সেকারণেই ফাতিমা ও আলী (আঃ)-এর প্রতি তার হিংসা-বিদ্বেশ চরম আকার ধারণ করেছিল। সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যেন এমন

তখনই প্রকাশিত হয় যখন মিথ্যাবাদীরা সেটাকে গোপন করতে চায়"। উমাইয়াদের ভক্ত ও সাহায্যকারীরা মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে।

নিঃসন্দেহে কোরআন নাযিলের দিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপর আল্লাহ্‌র হুজ্জাত কায়েম থাকবে -**ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন**।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বয়ান করেছেন যে, 'একদিন আবু বকর রাসুল (সাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু প্রবেশের পূর্বেই আয়েশার চিৎকার শুনতে পেলেন। আয়েশা নবী (সাঃ)-কে বলছিলেন, "**আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভাল করেই জানি যে, আপনি আলীকে, আমি ও আমার পিতার চেয়ে বেশী পছন্দ করেন**"। এই একই কথা তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছিলেন'। [১]

হযরত আলী (আঃ)-কে আয়েশা (রাঃ) এতোই ঘৃণা করতেন যে, নবী (সাঃ)-এর কাছাকাছি তাকে এক মুহূর্তের জন্য দেখতে চাইতেন না। এবং নবী (সাঃ)-এর নিকট হতে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইতেন কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি।

ইবনে আবিল হাদীদ মোতাজালী '**শারহে নাহজুল বালাঘাতে**' বলেন, "একদা রাসুল (সাঃ) হযরত আলীকে তাঁর কাছে ডাকলেন, তিনি (আলী) এসে রাসুল (সাঃ) এবং আয়শার মাঝে বসে পড়েন। তখন আয়েশা বলেন, "**আমার পাশেই তুমি বসার জায়গা পেলে?**"

এই একই রাবী বর্ণনা করেন যে, "একদিন রাসুল (সাঃ) এবং আলী (আঃ) পরস্পর আলাপ করতে করতে হাঁটছিলেন, আয়েশাও তাঁদের পিছু পিছু আসছিলেন, আলাপ কিছু দীর্ঘ হওয়ায়, আয়েশা উভয়ের মাঝে উপস্থিত হয়ে বলেন, "**তোমরা অনেকক্ষন কথা-বার্তা বলেছ**"। আয়েশার উক্ত আচরণের জন্য রাসুল (সাঃ) অনেক ক্ষুব্ধ হলেন"। [২]

তিনি আরো এক জায়গায় বর্ণনা করেন যে, "একবার আয়েশা রাসুল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে দেখেন যে, তিনি হযরত আলীর সাথে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। ঐ অবস্থা দেখে আয়েশা চিৎকার দিয়ে উঠেন এবং বলেন, '**হে ইবনে আবি তালিব! তুমি কেন আমার পিছনে লেগেছ? তার সাথে থাকার জন্য আমি একটি সময় পাই ...**' আয়েশার (রাঃ) এই কথা শুনে রাসুল (সাঃ) চরম ক্ষুব্ধ হলেন।

আয়েশা (রাঃ) নিজের হিংসা, বদমেজাজী ও ধারালো জিহ্বা দ্বারা রাসুল (সাঃ)-কে কতই না কষ্ট দিয়েছেন। রাসুল (সাঃ) কি ঐ মোমিন পুরুষ বা নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, যার অন্তর তাঁর চাচাতো ভাই, তাঁর ইতরাতের (বংশধরদের) সরদারের প্রতি শত্রুতায় পরিপূর্ণ? যার সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, "**আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)**

---

১ **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৪, পৃঃ ২৭৫

২ **শারহে নাহজুল বালাঘা**, ইবনে আবিল হাদীদ, খঃ ৯, পৃঃ ১৯৫

হিংসা-বিদ্বেশ আর শত্রুতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইতিহাস হযরত আলী (আঃ)-এর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের প্রতি আয়েশার (রাঃ) হিংসা-বিদ্বেশ ও শত্রুতাকে সংরক্ষণ করে রেখেছে। তার হিংসা-বিদ্বেশ এমন স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, তিনি আলী (আঃ)-এর নাম মুখে উচ্চারণ করাকেও বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না।[১]

হযরত আলী (আঃ)-কে এক চোখেও দেখতে পারতেন না। হযরত উসমানের (রাঃ) হত্যার পরে আয়েশা (রাঃ) যখন শুনতে পারলেন যে সাহাবীরা হযরত আলী (আঃ)-কে খলিফা নিযুক্ত করে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে, তখন বলে উঠলেন, **"জমিনের উপর আসমান ভেঙে পড়া আমি সহ্য করে নিতাম কিন্তু আলীর খলিফা হওয়া আমার পছন্দ হয়নি"**। আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিরাট এক বাহিনী জমায়েত করেন। আর যখন আলী (আঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পেলেন তখন শুকরানা সেজদা আদায় করেছিলেন।

আমার সাথে আপনারাও কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর আশ্চর্য হবেন না, যারা নিজের সিহাহ্ সিত্তাগুলিতে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"হে আলী, তোমার প্রতি সেই ব্যক্তি ভালবাসা জ্ঞাপন করবে যে মুমিন হবে এবং সেই ব্যক্তি শত্রুতা পোষন করবে যে মুনাফিক হবে"**।[২]

আবার কখনো তারা তাদের সিহাহ সিত্তা, মাসানীদ ও ইতিহাসে লিপিদ্ধ করেন যে, আয়েশা (রাঃ), আলী (আঃ)-এর প্রতি এতোই হিংসা-বিদ্বেশ পোষণ করতেন যে তার নামও শোনা পছন্দ করতেন না। **তাহলে তার এই আসল রূপ তাদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য বহণ করে না?**

অনুরূপভাবে বুখারী তার সহীহ্ কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"ফাতিমা আমার দেহের টুকরো, যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দিল"**।[৩]

আবার এই বুখারী সাহেবই রেওয়ায়েত করেছেন যে, **"ফাতিমা দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন, অথচ আবু বকরের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেননি"**।[৪] তাহলে এটা কি তাদের পক্ষ হতে সাক্ষ্য নয় যে, আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) উভয়ই আবু বকরের (রাঃ) প্রতি ক্ষুব্ধ আছেন? এটাতো এমনই স্পষ্ট ব্যাপার যা প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বুঝতে পারেন। সে কারণেই আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, "সত্য

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১৬২, ও খঃ ৩, পৃঃ ১৫৩ এবং খঃ ৫, পৃঃ ১৪০

২ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ৬১। **সহীহ্ তিরমিজি**, খঃ ৫, পৃঃ ৩০৬। **নাসাঈ**, খঃ ৮, পৃঃ ১১৬

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ২১০

৪ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ৮২ এবং খঃ ৮, পৃঃ ৩

আমার তো আকিদা এই যে, আয়েশার (রাঃ) পক্ষে অযৌক্তিক ফাজিলাতপূর্ণ হাদীস বনি উমাইয়াদের যুগে এই জন্য রচিত হয়েছে যেন তার (আয়েশার) পাপের বোঝাকে হালকা করা যায়। তাদের বিশ্বাস যে, আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের ৪০ জনের সাক্ষ্য দিয়ে আয়শাকে (রাঃ) ভূল বুঝিয়েছেন ... অতএব, তিনি হলেন নির্দোষ। আসলে তারা নির্বোধ ও দূর্বল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা চায় যে, এভাবে সহজ সরল মানুষগুলোকে এ ধরণের রেওয়ায়েত দ্বারা বশ করে নিবে এবং তাদেরকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে যে, আয়শা (রাঃ) যখন **'হাওয়াব'**-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কুকুরের ঘেঁউঘেউ শুনে জায়গার নাম জানতে চাইলে, যায়গার নাম **'হাওয়াব'** বলা হয়, যা শুনা মাত্র তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলেন যে, **'আমাকে ফেরৎ নিয়ে চল'**। যে সমস্ত নির্বোধ লোকেরা আয়েশার (রাঃ) পক্ষে ওজর পেশ করে এই বর্ণনা রচনা করেছে, তাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্ল-াহ্‌র নির্দেশ ছিল, **"তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর"** এবং রাসুল (সাঃ)-এরও নির্দেশ ছিল, **"গৃহে অবস্থান করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব এবং উটে সোওয়ার হইও না"**। উক্ত নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা তো হাওয়াবের নিকটবর্তী হওয়া ও কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ করার বহু পূর্বেকার নির্দেশ, **আয়েশা (রাঃ) কেন এই নির্দেষ লংঘন করলেন? আব্দুলাহ ইবনে যুবায়েরের (রাঃ) ভূল বুঝাবুঝিটা কি তাকে নির্দোশ প্রমান করবে?**

আহলে সুন্নাতের পন্ডিতগণ এখানে আয়েশার (রাঃ) জন্য কোন ধরনের উপস্থাপন করবেন, যেখানে তিনি উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমার (রাঃ) উপদেশ অগ্রাহ্য করেছেন। ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

উম্মে সালমা যখন আয়েশাকে (রাঃ) বলেন, "আমি তোমাকে ঐ দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যেদিন রাসুল (সাঃ)-এর সাথে আমরাও সফরসঙ্গিনী ছিলাম। এক সময় রাসুল (সাঃ) একখন্ড চটের উপর বসে পড়েন এবং আলীর সাথে একান্তে আলোচনা করতে থাকেন। আলোচনা একটু দীর্ঘ হওয়ায় তুমি তাতে ভাঙ্গন ধরাতে চাইলে। আমি তোমাকে থামাতে চেয়ে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বাধা মানলে না এবং তাঁদের কাছে পৌছে গেলে। কিছুক্ষণ পরই কাঁদতে কাঁদতে ফেরৎ এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, '*কি হয়েছে'? তুমি* উত্তর দিলে, '*আমি যে মুহুর্তে তাঁদের কাছে পৌছালাম, সে মুহুর্তে রাসুল (সাঃ) আলীর সঙ্গে একান্তে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। আমি আলী-কে বল্লাম ঃ আমি রাসুল (সাঃ)-এর সঙ্গ পাওয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন সময় পাই ... আজকেই আমার পালা। হে আবু তালেবের পুত্র! রাসুল (সাঃ)-কে ছেড়ে দাও*'। আমার কথা শুনা মাত্র রাসুল (সাঃ) রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার দিকে আসলেন এবং ফিরতি পথ ধরতে বলেন। খোদার কসম যে তাঁকে রাগান্বিত করবে সে ঈমান হারা হয়ে যাবে। আমি লজ্জিত হয়ে ফেরৎ চলে আসি"। উম্মে সালমার সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনার পর আয়েশা বলেন, "*হ্যাঁ, আমার মনে আছে*"।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, 'আজ সেই কথা আমি তোমাকে পুনঃরায় মনে করিয়ে দিতে চাই ঃ আমি আর তুমি যখন রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। রাসুল (সাঃ)

তাঁকে বন্ধু গন্য করেন এবং তিনিও আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-কে বন্ধু গণ্য করেন" ।[১] আরো বলেছেন ঃ **"যে আলীকে বন্ধু গণ্য করবে সে আমাকেই বন্ধু গন্য করল। আর যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্কে রাগান্বিত করল"** ।[২]

নিজেদের গৃহে অবস্থান কর ...

আল্লাহ্ পাক নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে তাঁদের গৃহেই অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর পুরুষের প্রদর্শনির জন্য গৃহে হতে বাহির হতে নিষেধ করেছেন। তাঁদেরকে কোরআন পড়া, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করার জন্য হুকুম দিয়েছেন।

নবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ যথার্থই আমল করেছেন, সবাই আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করেছেন। রাসুল (সাঃ) বিদায় নেওয়ার পূর্বে স্ত্রীগণকে এই বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে ঃ **"তোমাদের মধ্য হতে একজন উটের পিঠে সোয়ার হবে এবং তার প্রতি 'হাওয়াব'-এর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠবে"**। আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীই রাসুল (সাঃ)-এর কথা মোতাবেক আমল করেছেন। কিন্তু আয়শা (রাঃ) প্রত্যেক হুকুমের নাফরমানি করেছেন এবং তিনি সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন ঃ "*হাফসা বিনতে উমরও আয়েশার সাথে বাহির হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার ভাই আব্দুলাহ বাধা দিয়ে কোরআনের উক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনান, তখন হাফসা নিজের মত পরিবর্তন করেন এবং যাত্রা করা হতে বিরত থাকেন। কিন্তু আয়েশা উটে উপবিষ্ট হয়ে যাত্রা করেন এবং তার প্রতি '**হাওয়াব**'-এর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল*"।

ত্বাহা হুসাইন তার কেতাব **'আল ফিতনাতুল কুবরা'**-তে লিখেছেন যে, "আয়েশা যখন একটি জলাশয়ের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়। আয়েশা তখন উক্ত জায়গা সম্পর্কে জানতে চান। তাকে জানানো হয় যে, জায়গাটির নাম হলো **'হাওয়াব'**। ইহা শুনে আয়েশা (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলেন যে, **"আমাকে ফেরৎ নিয়ে চল, আমি রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের যে কোন এক জনের প্রতি হাওয়াবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে"**। এই অবস্থা দেখে আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাকে ফেরৎ যেতে নিষেধ করেন এবং **'বনী আমর'**-এর ৪০ জন লোক দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করালেন যে, **'এই জায়গাটি হাওয়াব নয়'**।

---

১ **সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ঃ 'ফাজায়েলে আলী ইবনে আবি তালিব'**।

২ **মুস্তাদরাকে হাকিম**, খঃ ৩, পৃঃ ১৩০, হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটাকে সহীহ্ বলে গ্রহন করেছেন।

অতঃপর উম্মে সালমা (রাঃ), আয়েশাকে (রাঃ) কঠিন ভাষায় গৃহ হতে বের হতে নিষেধ করে বলেন, **"ইসলামের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, মহিলারা এটাকে ধ্বংস করতে পারবে না। আর এটাতে যদি চিড় ধরে, তাহলে মহিলারা মেরামতও করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে মহিলাদের আপ্রান চেষ্টা হওয়া উচিৎ নিজেদের চক্ষু-লজ্জা এবং ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করা"**। [১]

অনুরূপভাবে আয়েশা (রাঃ) অনেক মুখলেছ সাহাবাদের নসীহতও উপেক্ষা করেছেন। তাবারী নিজের ইতিহাস গ্রন্থে 'মারিয়া ইবনে কাদামাহ্ সা'দী হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি আয়েশাকে (রাঃ) বলেন ঃ "হে উম্মুল মু'মেনীন! উসমান ইবনে আফ্ফানের (রাঃ) হত্যা -আপনার গৃহ থেকে বাহির হওয়া এবং উটে সোওয়ার হওয়ার চেয়ে বড় অপরাধ নয় কি? কারণ আলাহ্ আপনার প্রতি পর্দা ওয়াজিব করে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু আপনি পর্দাকে পিছনে ফেলে মান-সম্মানকে ধূলিস্যাৎ করেছেন। যারা আপনার যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখছে, তারা আপনার নিহত হওয়াও দেখবে। যদি আপনি নিজ ইচ্ছায় এসে থাকেন তাহলে ফেরৎ চলে যান। আর যদি বলপূর্বক আনা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করুন"। [২]

কমান্ডার রূপে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়শা (রাঃ) ঃ

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন যে, সমস্ত হুকুম-আহ্কামের ক্ষমতা আয়েশার (রাঃ) হাতে ছিল। যাকে খুশি তাকে ক্ষমতা ও পদ দান করতেন এবং খেয়াল-খুশি মত যার তার ক্ষমতা কেড়ে পদচ্যূত করতেন। তারই আদেশে সবকিছু হতো। এমন কি একবার তালহা ও যুবায়েরের মাঝে নামাজের ইমামতি নিয়ে ঝগড়া হয়, উভয়ে চাইছিলেন যেন নামাজের ইমামতি তিনি করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) হস্তক্ষেপ করে উভয়কে বরখাস্ত করে নিজের ভাগ্নে আব্দুলাহ ইবনে যুবায়েরকে ইমাম নিযুক্ত করে দেন। আয়েশা নিজে চিঠি লিখে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে বিভিন্ন শহরগুলিতে প্রেরণ করতেন এবং আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং তাদের মাঝে আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ফুটিয়ে তুলতেন।

এমন কি আরবের লোভী এবং দুঃশ্চরিত্র ২০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে খেলাফত হতে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েগেল। আয়েশা (রাঃ) এমনই ফেৎনা সৃষ্টি করলেন যে, উম্মুল মু'মেনীনকে সাহায্য সহযোগিতা করার অযুহাতে অসংখ্য মানুষ নিহত হল। ইতিহাস বেত্তাগণ বলেছেন, *'আয়েশার ভক্তরা যখন বসরার হাকিম উসমান ইবনে হানিফ এর উপর আক্রমন করল এবং*

১. **শারহে ইবনে আবিল হাদীদ**, খঃ ২, পৃঃ ৭৭

২. **তারিখে তাবারী**, খঃ ৩, পৃঃ ৪৮২

বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন উটে সোওয়ার হবে। তার প্রতি **'হাওয়াব'**-এর কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে। সে **'সিরাত-এ-মুস্তাকীম'** থেকে সরে দাঁড়াবে। আমরা বল্লাম, **"তা থেকে আমরা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আশ্রয় চাই"**। তখন রাসুল (সাঃ) তোমার পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে বলেন, **"হে হামীরা! সে মহিলা তুমি নও তো?"** আয়েশা বলেন, **"হ্যাঁ, এ ঘটনাটিও আমার মনে আছে"**।

উম্মে সালমা (রাঃ) আবার বলেন, "এ ঘটনাটিও কি তোমার মনে আছে?" যখন তোমার পিতা আবু বকর ও উমর এসেছিলেন? আমরা পর্দার আড়ালে দাড়িয়ে পড়লাম। যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, তারা সে কথা উপস্থাপন করলেন ঃ **"ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমরা জানিনা, আর কত দিন পর্যন্ত আপনার সোহবত দ্বারা ফায়েজ হাসিল করতে থাকব। আপনি যদি আমাদের বলে যান যে, আপনার পরে খলিফা কে হবে তাহলে আমাদের জন্য সহজ হত।"** তখন রাসুল (সাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, **"আমি জানি যে, খেলাফতের হকদার কে? কিন্তু আমি যদি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই তাহলে তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে এমনভাবে পৃথক হয়ে যাবে, ঠিক বনি ইসরাইলরা যেভাবে হারুন (আঃ) থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল"**। রাসুল (সাঃ)-এর এই বাক্য শুনে দু'জনাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন, তারপর বিনা বাক্য ব্যয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন"। তাদের চলে যাওয়ার পর আমরা রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে আবার হাজির হই এবং আমি বলাম, **"আমাদের প্রতি আপনার ১০১ টি হক আছে, হে রাসুলুল্লাহ্! আপনার উম্মতের খলিফা কে হবে"**? উত্তরে তিনি বল্লেন, **"যে ব্যক্তি আমার জুতা সেলাই করছে"** তখন আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম যে, আলী তাঁর জুতা মবোরক সেলাই করছেন। তখন তুমি (আয়েশা) বল্লে ঃ **"ইয়া রাসুলুলাহ্! আমরা তো শুধু আলীকে দেখতে পাচ্ছি"**। তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, **"হ্যাঁ, সেই"**।[১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, **"হ্যাঁ, এটাও আমার মনে আছে"**। তখন উম্মে সালমা বলেন, **"হে আয়েশা! এতসব কিছুর পরেও তোমাকে কোন্ জিনিষ গৃহ হতে বাহির হওয়ার জন্য বাধ্য করছে?"** আয়েশা বলেন, **"আমি মানুষের সংশোধন করার জন্য বাহির হচ্ছি"**।[২]

---

১ [**অনুবাদকের মন্তব্য ঃ প্রথমতঃ** এ ঘটনা থেকে এই কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসুল (সাঃ)-এর পরবর্তী খলিফা অন্ত ঃত আবু বকর বা উমর (রাঃ) নন। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী আবু বকর ও উমর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তিকে স্বীকার করবেন না বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। রাসুল (সাঃ)-এর এই উক্তিটি সত্যই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ **'গাদীর-এ-খোমে'** হযরত আলী (আঃ)-কে উম্মতের পরবর্তী অভিভাবক ঘোষনা দেয়ার পর, কার্যক্ষেত্রে আবু বকর এবং উমরই (রাঃ) সর্বপ্রথম অস্বীকার করে তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং **'সায়েদায়-এ বনু সকীফা'**-তে গিয়ে খলিফা নির্বাচনের নাটক করেন। **দ্বিতীয়তঃ** এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট রূপেই বুঝা গেল যে, আয়েশা (রাঃ) তার পিতার দিক থেকে নিরাশ হয়ে যান যে আবু বকর (রাঃ) উম্মতের খলিফা হতে পারছেন না ..." এখান থেকেই আয়েশার (রাঃ) মনের ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায় এবং আলী (আঃ)-কে তার পিতার প্রতিপক্ষ মনে করে আদা জল খেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকেন।]

২ আলী (আঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করাকে তিনি মানুষের সংশোধন মনে করেছন, কি আশ্চর্য !!!

ঐ বীর পুরুষ তাকে এমন উপযুক্ত উত্তর দিয়ে ছিল, যা তারই প্রাপ্য ছিল ঃ

"এই পত্র জায়দ ইবনে সুহানের পক্ষ থেকে আয়েশা বিনতে আবু বকরের নামে।

আম্মা বা'দ! আল্লাহ্ কিছু কিছু বিষয়াদি আপনার এবং আমাদের প্রতি ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আপনাদের জন্য গৃহে অবস্থান করা ওয়াজিব এবং আমাদের জন্য জিহাদ করা ওয়াজিব। আপনার পত্র পেলাম, যাতে আপনি আমাকে আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন -যেটা আল্লাহ্ আপনার প্রতি ওয়াজিব করেছেন সেটা আমি পালন করি, আর যেটা আমার প্রতি ওয়াজিব করেছেন সেটা আপনি আঞ্জাম দিবেন। আমার পক্ষে আপনার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয় এবং আপনার এই চিঠি উত্তর পাওয়ারও যোগ্য নয়।"

এখানে এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়েশা (রাঃ) শুধু **'জংগ-এ-জমল'**-এ সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েই ক্ষ্যন্ত হননি বরং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের লালসায় মত্ত ছিলেন। আর সেটা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তালহা ও যুবায়েরকে নির্দেশ দিতেন। হাকিম (শাসক) ও গভর্ণরদেরকে চিঠি লিখতেন এবং বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দেখিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

এই সমস্ত কারণেই তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং বনি উমাইয়াদের নিকট প্রশংসিত হয়ে তাদের দৃষ্টি নন্দিত হলেন। যে বিষয়টির জন্য তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেটা হল ঃ আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা। কারণ আলী (আঃ)-এর সম্মুখ থেকে বড় বড়, নামী দামী বীর পালোয়ানরা পালিয়ে যেত অথচ আয়েশা (রাঃ) বীর বিক্রমের ন্যায় তার মোকাবেলায় দাড়িয়ে সহোয্যের পর সাহায্য চেয়ে সাহাবীদেরকে গৃহের বাহিরে ডাকতে থাকেন। ...

এই সমস্ত কারণেই বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। ইতিহাস বেত্তাগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যারা **'জংগ-এ-জমলে সোগরা'**-তে আলী (আঃ)-এর আগমনের পূর্বেই আয়েশার (রাঃ) উদ্দেশ্যকে বুঝতে পেরেছেন এবং **'জংগ-এ-জমলে কুবরা'**-তে আলী (আঃ)-এর আগমনের পর, আয়েশা (রাঃ) সাহাবীদের **'আল্লাহ্র কিতাব'**-এর দিকে আহ্বান করেন এবং অন্তরের বিদ্বেষের কারণে ঐ সমস্ত সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) বন্ধু গণ্য করেছেন।

রাসুল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তার ফেতনা হতে সাবধান করেছেন ঃ

নিশ্চয়ই রাসুল (সাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া ষড়যন্ত্রগুলিকে বুঝতে পেরেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নাই, তিনি (সাঃ) অবশ্যই জানতেন যে, পুরুষের বিরুদ্ধে মহিলারা ফেতনা করতে ওস্তাদ। তিনি (সাঃ) ইহাও জানতেন যে, নারীদের শঠতা এতই কঠিন হয় যে সেটা পাহাড়কেও নড়বড়ে করে দিতে পারে। বিশেষ করে তিনি (সাঃ) এটাও বুঝতে

তার বায়তুল মালের ৪০ জন রক্ষীকে বন্দী করে আয়েশার সম্মুখে হাজির করা হলে, আয়েশা তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিন। ব্যাস! নির্দেশ পাওয়া মাত্র আয়েশার দলের লোক তাদেরকে ছাগলের ন্যায় জবাই করে দিল। কথিত আছে যে তাদের সংখ্যা ছিল ১৫০ এবং এঁরাই ছিল প্রথম মুসলমান, যাদেরকে সবর (ধৈর্য ধারণ) করার কারণে হত্যা করা হয়েছে। [১]

শা'বি, মুসলিম ইবনে আবি বকর এবং তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, "তালহা ও যুবায়ের যখন বসরায় এলেন, আমি নিজের তরবারী খাপে রেখে দিলাম এবং তাদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। আয়েশার সম্মুখে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি নির্দেশ জারি করছেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন। সেই মুহূর্তে রাসুল (সাঃ)-এর একটি হাদীস আমার মনে পড়ে গেল, যা আমি নিজেই শুনে ছিলাম। তিনি (সাঃ) বলেছেন, '**ঐ জাতি কখনও সফলকাম হতে পারে না, যার শাসনভার মহিলার হাতে থাকে**'। অতঃপর আমি সেখান থেকে ফেরৎ চলে আসি"।

অনুরূপভাবে বুখারী, মুসলিম ইবনে আবি বকর হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "জংগ-এ-জামলের একটি কথা দ্বারা আমার উপকার হয়েছিল। রাসুল (সাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, পারস্যে কিসরার মেয়ে রাজত্ব করছে, তখন তিনি বলে ছিলেন, '**ঐ জাতি কখনও সফলকাম হতে পারে না, যার শাসন ভার মহিলার হাতে থাকে**'।" [২]

একই সময়ে উম্মুল মুমেনীন আয়েশার (রাঃ) বিস্ময়কর ও সন্দেহভাজন আবরন ফুটে ওঠে। এক দিকে তো তিনি আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে গৃহের বাহিরে বেরিয়ে আসেন। অপর দিকে সাহাবাদেরকে গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। আপনারা, এর কারণ জানেন কি? ঐ বিস্ময়কর ঘটনাটি হলো এরূপ ঃ

ইবনে আবিল হাদীদ নিজের '**শারহ**'-এ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, আয়েশা (রাঃ), বসরা হতে জায়দ ইবনে সুহান আব্দীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার বিষয় বস্তু নিম্ন রূপে ছিল ঃ

"এই পত্র উম্মুল মুমেনীন আয়েশা বিনতে আবু বকর ও রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার পুত্র জায়দ ইবনে সুহানের নামে।

আম্মা বা'দ! তুমি নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং লোকজনকে আলী ইবনে আবি তালিবের সাহায্য করা থেকে বিরত রাখ। আশাকরি তোমার সম্পর্কে ঐ সংবাদই পাব যেটাকে আমি প্রিয় মনে করি। কারণ আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি হলে বিশ্বস্ত। ওয়াস্‌সালাম।"

---

১ **তারিখে তাবারী**, খঃ ৫, পৃঃ ১৭৮ এবং **শারহে নাহ্‌জুল বালাগা**, খঃ ২, পৃঃ ৫০১

২ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ৯৭ বাবুল ফিতান, **নাসায়ী**, খঃ ৪, পৃঃ ৩০৫, **মুস্তাদরাকে হাকিম**, খঃ ৪, পৃঃ ৫২৫

বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা যখন বসরা পৌছালেন, তখন আলী (আঃ) নিজ পুত্র হাসান এবং আম্মার ইবনে ইয়াস্‌সার-কে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এ দু'জন (হাসান ও আম্মার) মিম্বরের উপরে উঠলেন, হাসান ইবনে আলী মিম্বরের সর্বোচ্চ ধাপে এবং আম্মার তাঁর নীচের ধাপে বসলেন। আমরা সকলে তাদের নিকট জমায়েত হলাম, আম্মার ইয়াস্‌সারকে বলতে শুনলাম যে, **"আয়েশা বসরায় পৌছে গেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! যদিও তিনি নবীর (সাঃ) স্ত্রী, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, যেন পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো নাকি আয়েশার"?** [১]

আল্লাহ্ আকবর! এই সংবাদও ঐ কথারই স্বাক্ষ্য বহণ করছে যে, **"আয়েশার আনুগত্য করা পাপ এবং তার বিরোধিতা করা তথা তার বিপক্ষে অবস্থান নেয়াই আল্লাহ্‌র আনুগত্য নিহিত"**।

আমরা উক্ত আলোচনায় দেখতে পাই যে, বনী উমাইয়াদের (অর্থ লোভী) রাবীগণ **'আখেরাত'** শব্দ যোগ করে বলে ফেল্লেন যে, **"তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে নবীর (সাঃ) স্ত্রী"** যেন লোকজনকে এই বলে ধোকা দেয়া যেতে পারে যে, **"আল্লাহ্ তার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে বেহেশ্‌তবাসী করে দিয়েছেন এবং এখনো রাসুল (সাঃ) তার স্বামী" - অন্যথায় আম্মার (রাঃ) কি ভাবে জানতে পারলেন যে, আয়েশা (রাঃ) আখেরাতেও রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীই আছেন?"**

এটা হল দ্বিতীয় ভন্ডামী, যা বনী উমাইয়াদের যুগে রেওয়ায়েতকারীগন আয়েশার (রাঃ) জন্য রচনা করেছেন। তারা যখন লোকজনের মুখে মুখে কোন হাদীস জারী দেখতো তখন সেটা অস্বীকার তো করতে পারতো না। তবে বিশেষ কোন শব্দের সংযোজন করে দিত বা কোন শব্দ পরিবর্তন করে দিত, যেন উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল করে দেয়া বা হাদীসের আসল বক্তব্যই উলোট-পালট হয়ে যায়। যেমন তারা এই হাদীসে, **"আনা মাদীনাতুল ইলম ওয়া আলীয়্যুন বাবুহা"**-তে **"আবু বাকরুন আসাসুহা ওয়া উমরুন হায়াতুহা ওয়া উসমানুন সাহাফুহা"** সংযোজন করেছে। অর্থৎ আবু বকর হলেন নবীর জ্ঞানের ভীত, উমর হলেন তার প্রাচীর এবং উসমান হলেন তার ছাদ।

এ সমস্ত ঘটনাবলী সত্যসন্ধানীদের অজানা নয়। তাই তারা ঐ সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে দলিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যার দ্বারা ঐ সমস্ত রবীদের নির্বুদ্ধিতা এবং রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সমুহের **'নূরানী প্রজ্ঞা'**-র মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে।

সুতরাং তারা যখন এই কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন যে, **"আবু বকর হলেন জ্ঞানের ভীত"** -তখন এই কথার অর্থ দাড়ায় যে, **'নবী (সাঃ)-এর সমস্ত জ্ঞান আবু বকরের জ্ঞান হতে নেওয়া হয়েছে'**। অতএব এমন বিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে কুফুর। যখন এই কথার

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ৯৭

পেরেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ তার অন্তর আলী (আঃ)-এর খলিফা হওয়া এবং বিশেষ করে আহলে বাইতের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর রাসুল (সাঃ) তো নিজের জীবদ্দশাতেই আহলে বাইত (আঃ)-দের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা অবলোকন করেছিলেন। সেকারণেই প্রায়ই তিনি আয়েশার প্রতি রাগান্বিত হতেন, তাঁর (সাঃ) চেহারা মোবারক ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে যেত। সব সময়ই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু আফসোস! এই হাদীসটিকে তাদের নফস্ গিলে খেয়েছে, যারা **'হক'**-কে কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য **'হক'** বলে গণ্য করে থাকেন।

সুতরাং রাসুল (সাঃ) যখন বুঝতে পারলেন যে, এটা হল একটি বিরাট ফেতনা, যা আল্লাহ্ উম্মতের পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঠিক যেভাবে পূর্বেকার উম্মতদের পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, **"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?"** [১]

অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বারংবার এটা থেকে উম্মতকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এমনকি একদিন তিনি (সাঃ) দাঁড়িয়ে আয়েশার (রাঃ) গৃহের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্লেন, **"এটা হল ফেতনার জায়গা। এখান থেকে ফেতনা শয়তানের শিং-এর মত গজাবে"**।

বুখারী নিজের সহীহ্‌র **"মাজাআ ফি বয়ুতে আজওয়াজুন্নাবী"** অধ্যায়ে নাফে থেকে এবং নাফে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ রাসুল (সাঃ) খোৎবা দিচ্ছিলেন, ঐ অবস্থায় তিনি (সাঃ) আয়েশার ঘরের দিকে ইংগিত করে তিন বার বলেন, **"এখানে ফেতনা আছে, যা শয়তানের শিং-এর মত গজাবে"**। [২]

অনুরূপভাবে মুসলিম তার **'সহীহ্'**-তে আকরামাহ্ ইবনে আম্মার হতে, তিনি সালিম হতে এবং সালিম ইবনে উমর হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, একদিন রাসুল (সাঃ) আয়েশার গৃহ হতে বাহির হয়ে বলেন, **"কুকুরের মস্তক এখানে আছে, যা শয়তানের শিং-এর ন্যায় গজাবে"**। [৩]

আহলে সুন্নাতগণের এই দৃষ্টি ভংগীর কোন ভিত্তি নেই যে, এটা থেকে রাসুল (সাঃ) পূর্ব দিক বোঝাতে চেয়েছেন। এই ধারণাটা সম্পূর্ণ বানোয়াট, কারণ তারা উম্মুল মুমেনীন আয়েশাকে (রাঃ) এই অপবাদ থেকে রক্ষা করতে চান।

---

১ সূরা আনকাবূত ঃ ২

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ৪৬

৩ **সহীহ মুসলিম** খঃ ৮, পৃঃ ১৮১

তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য এটা মোটেই জায়েজ হবে না যে আমরা আয়েশার (রাঃ) ব্যক্তিত্বকে কটাখ্খ করি বা তার উপর **'লানত'** করি। তবে এতটুকু অধিকার আমাদের আছে, আমরা যেন তাঁর আনুগত্য না করি, তার কৃতকর্মকে ভাল বলে গণ্য না করি। কেবলমাত্র সত্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদি মানুষের সামনে উপস্থাপন করি, সম্ভবতঃ এ কারণে তারা **'সত্যে'**-র হেদায়েত পেয়ে যাবেন।

আমীরুল মুমেনীন আলী (আঃ) বলেছেন, **"অভিসম্পাত ও লানত দানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হইও না, তবে তাদের কার্য-কলাপগুলিকে অবশ্যই বল, যেন হুজ্জাত কায়েম করা যায়"।**

আহলে বাইত (আঃ)-এর মহত্ব সম্পর্কে আহলে যিকিরের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

ইতরাতের সরদার, আমীরুল মুমেনীন আলী (আঃ) বলেন, **"আল্লাহ্র কসম, (আল্লাহ্র) বাণীবাহন, প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আমরা আহলুল বাইতগণ জ্ঞানের দরজা ও শাসনের আলো। সাবধান, দ্বীনের পথ একটই এবং এর রাজপথ সোজা"।** [১]

"কোথায় সেই সমস্ত লোকেরা যারা মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে দাবি করেছিল যে, তারা আমাদের চেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন আর তাদেরকে হীন করেছেন; আমাদেরকে প্রজ্ঞা দান করেছেন আর তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন; আমাদেরকে জ্ঞানের নগর-দূর্গে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন আর তাদেরকে সেই নগরী থেকে বাইরে রেখেছেন। আমাদের কাছেই হেদায়েতের প্রত্যাশী হতে হবে এবং গোমরাহির অন্ধত্ব পরিবর্তন করে উজ্জ্বল আলো পেতে হলে আমাদের কাছেই আসতে হবে। নিশ্চয়ই, ইমামগণ (আধ্যাত্মিক নেতা) কুরাইশ বংশের হাশিমি শাখা থেকেই হবে। এ নেতৃত্ব অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয় এবং অন্য কেউ এ কাজের যোগ্যও নয়"। [২]

"আমরা রাসুল (সাঃ)-এর আপনজন, তাঁর সাহাবী, তাঁর সম্পদ-ভাণ্ডার এবং তাঁর সুন্নাহর দরজা। দরজা ছাড়া কোন ঘরে প্রবেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি দরজা ছাড়া অন্য পথে প্রবেশ করে সে চোর বলেই পরিচিত। আহলুল বাইত কোরআনের সুক্ষ্মতা এবং

---

১ **নাহ্জুল আল-বালাঘা ঃ** খোৎবা নং-১১৯

২ **নাহ্জুল আল-বালাঘা ঃ** খোৎবা নং-১৪৩

প্রতি দৃষ্টিপাত করেন যে, **"উমর হলেন জ্ঞানের প্রাচীর"** -তখন এই কথার অর্থ দাড়ায় যে, **'উমর নবীর জ্ঞানের নগরীতে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে চান না'** অর্থাৎ মানুষকে নবীর (সাঃ) জ্ঞান হতে বঞ্চিত রাখতে চান। আর যখন এই কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় যে, - **"উসমান হলেন ঐ জ্ঞান নগরীর ছাদ"** -তাহলে এই কথা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল বলে গণ্য হবে, কারণ কোন 'শহর' বা 'নগরী' এমন নাই যার ছাদ হয়ে থাকে, আর এটা অসম্ভব। সত্যসন্ধানীগণ ইহাও অবলোকন করেছেন যে, আম্মার (রাঃ) আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছেন যে, **'আয়েশা দুনিয়া ও আখেরাতে নবীর (সাঃ) স্ত্রী'**। এটা তো গায়েবের কথা, **আর আম্মার (রাঃ) কসম খেয়ে গায়েবের কথা বলার অধিকার কোথায় পেলেন? এই সম্পর্কে কি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন আয়াত আছে বা রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস আছে, যার মাধ্যমে তিনি আম্মারকে বলেছিলেন?**

আসলে সত্য হাদীস হলো এই যে, **"আয়শা বসরা পৌছে গিয়েছেন, তিনি আমাদের নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী। তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, যেন বুঝা যায়, তোমরা আয়েশার আনুগত্য কর, নাকি আল্লাহ্‌র"**?

আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তিনি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যার দ্বারা আমরা **'হক'**-কে **'বাতিল'** হতে পৃথক করতে পারি। তিনিই আমাদের জন্য স্পষ্ট পথের নির্দেশনা দেয়ার পরও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং এর দ্বারা কিয়ামত দিবসে আমাদের উপর হুজ্জাত কায়েম করবেন।

আলোচনার সমাপ্তি ঃ

আমাদের পূর্বের আলোচনার মূখ্য বিষয় বস্তু ছিল যে, আয়শা বিনতে আবু বকর (রাঃ) আহলে বাইত (আঃ)-দের (যাদের নিকট হতে সকল প্রকার রিজস দূর করে দিয়ে পূতঃপবিত্র করা হয়েছে এবং তারা মাসুম) অন্তর্ভূক্ত নন।

আয়েশার (রাঃ) জন্য তো ইহাই যথেষ্ট যে, তিনি জীবনের শেষ দিনগুলোতে হায় হুতাশ ও আফসোস করে কাটিয়েছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নিজের কৃত কর্মের কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলেছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তার গোনাহ মাফ করে দিবেন, কেননা বান্দার সমস্ত গোপনীয়তা একমাত্র তিনিই জানেন, তিনিই তাদের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত, তিনিই চোখের খেয়ানতকে জানেন, অন্তরের মধ্যে লুকানো সমস্ত ভেদ জানেন, জমিন ও আসমানের কোন জিনিষই তাঁর জ্ঞানের বাহিরে নয়। আমাদের কারোর অধিকার নাই যে, তাঁর কোন সৃষ্টির জন্য জান্নাতবাসী বা দোজখবাসী হওয়ার ফয়সালা দিয়ে দেই। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকার -সুতরাং বলা হচ্ছে ঃ **"জমিন ও আসমানের সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র জন্য, তোমরা নিজের মনের কথা ফাঁস করে দাও অথবা গোপন করে রাখ, তিনি সব কিছুরই হিসাব নিবেন।**

যেভাবে পানির ঝরনার দিকে ছুটে যায়, হেদায়েতের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য তোমরাও সেভাবে তাদের দিকে যেয়ো।

হে জনমন্ডলী! খাতেমুন নবীর বাণী তোমরা স্মরণ কর। তিনি বলেছেন, "আমাদের মধ্য থেকে যে কেউ মৃত্যুবরণ করে সে মৃত নয় এবং আমাদের মধ্য থেকে যে কেউ ক্ষয়প্রাপ্ত (মৃত্যুর পর) হয় সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত নয়। যে বিষয় তোমরা বুঝ না সে বিষয়ে কথা বল না, কারণ তোমরা যা অস্বীকার কর তাতে অধিকাংশ সত্য ও ন্যায় আছে। যার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন যুক্তি নেই, তার যুক্তি গ্রহণ কর"। রাসুল (সাঃ) এখানে যার কথা বলেছেন আমিই তো সে ব্যক্তি। আমি কি তোমাদের সম্মুখে ছিকলুল-আকবরের (কোরআনের) আমল করি নি? আমি কি তোমাদের ছিকলুল-আছগরের (আহলুল বাইতের) অন্তর্ভূক্ত নই? [১]

নিজের রাসুল (সাঃ)-এর আহলুল বাইতের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাঁদের নির্দেশ মেনেচলো। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো কারণ তাঁরা কখনো তোমাদের হেদায়েতের পথ ছাড়া অন্যদিকে নিয়ে যাবেন না এবং কখণো তোমাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন না। যদি তাঁরা বসেন তোমরাও বসে পড়ো এবং যদি তাঁরা দাঁড়ান তোমরাও দাঁড়িয়ে যেয়ো। তাঁদের পুরোগামী হয়ো না, তাতে তোমরা বিপথগামী হয়ে যাবে এবং তাঁদের থেকে পিছিয়ে পড়ো না, তাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। [২]

মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী (আঃ)-এর উক্ত বাণিসমূহ বিশেষকরে পবিত্র আহলে বাইতের শানে বর্ণিত হয়েছে, যাদের মধ্য হতে আল্লাহ্ পাক 'রিজস্'-কে দূর করে দিয়ে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছেন, যতটুকু পবিত্রতার হক আছে। [৩]

আমরা যদি তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে ইমামদের (আঃ) বাণী খুঁজে দেখতাম, যেগুলি মানুষের সামনে তাঁরা খোৎবা দিয়েছেন, যেমন ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম জাফর সাদিক ও ইমাম রেজা (আঃ) তাহলে অবশ্যই ঐ কথাগুলোই পেতাম যা আলী (আঃ) বলে গেছেন। তাঁরা ঐ দিক নির্দেশনাই দিয়েছেন যা আলী (আঃ) দিয়েছেন এবং প্রত্যেক যুগে ও কালে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর বংশধরদের আনুগত্য করার দিকে জনাতাকে আহ্বান করেছেন। যেন তাদেরকে গোমরাহী থেকে বের করে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করা যায়।

এখানে আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে, আহলে বাইত (আঃ)-গণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে ইতিহাস উত্তম রূপে স্বাক্ষ্য বহণ করছে। তাঁদের ইলম (জ্ঞান) ও তাকওয়া (খোদাভীরুতা), ইবাদত-বান্দেগী, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, দান-দক্ষিণা এবং ঐ সমস্ত

---

১ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-৮৬

২ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-৯৬

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ১৩০

তাঁরাই আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার। তারা যখন কথা বলেন -সত্য বলেন; কিন্তু যখন তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন তখন কেউ কথা বলতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাঁরা কথা বলেন"। [১]

"আহলূল বাইত হলেন জ্ঞানের জীবন ও অজ্ঞতার মৃত্যু। তাঁদের ধৈর্যই তোমাদেরকে তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে বলে দেবে এবং তাঁদের প্রজ্ঞার নীরবতাই তাঁদের মুখের কথা। তাঁরা কখনো ন্যায়ের বিপক্ষে যান না এবং ন্যায় বিষয়ে কখনো তাঁরা নিজেদের মধ্যে দ্বিমত পোষন করেন না। তাঁরা হলেন ইসলামের স্তম্ভ এবং ইসলামের সংরক্ষণাগার। তাঁদের দ্বারাই সত্য ও ন্যায় তার অবস্থান ফিরে পেয়েছে এবং অন্যায় দূরীভূত হয়েছে ও অন্যায়ের জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছে। তাঁরা মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে গভীরভাবে দ্বীনকে বুঝেছেন। শুধুমাত্র প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে বা বর্ণনাকারীদের নিকট শুনে শুনে তাঁরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন নি। দ্বীনের বর্ণনাকারী অনেক হলেও দ্বীনকে প্রকৃতভাবে বুঝাবার মতো লোকের সংখ্যা নগণ্য"। [২]

"রাসুল (সাঃ)-এর বংশধর (ইতরাত) সর্বোত্তম বংশধারা এবং চরিত্র (সীরাত) সর্বোত্তম চরিত্র। নবুয়াতের বৃক্ষ সর্বোত্তম বৃক্ষ এবং এমনই বৃক্ষ যে পবিত্র ভূমিতে জন্মলাভ করে বুজুর্গীর ছায়াতে লালিত পালিত হয়েছে, তার শাখা (ডালপালা) অতি দীর্ঘ এবং তার ফল হচ্ছে ধরাছোয়ার বাহিরে"। [৩]

"আমরা (আহলুল বাইত) নবুয়তের সাজারাহ (বৃক্ষ), ঐশীবাণীর অবস্থান স্থল, ফেরেশতাগণের অবতরণ স্থল, জ্ঞানের আকর ও প্রজ্ঞার উৎস। আমাদের সমর্থক ও প্রেমিকগণ আল্লাহ্‌র ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং আমাদের শত্রু ও যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে তারা আল্লাহ্‌র রোষে নিপতিত"। [৪]

"আমরা কোরাইশদের মধ্যে সম্মানিত এবং আমাদের মর্যাদায় নবীদের মর্যাদা; আমাদের দল হলো আল্লাহ্‌র দল এবং ফেৎনাবাজদের দল চচ্ছে শয়তানের দল"।

হে জনমন্ডলী! সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো এবং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছো! অথচ হেদায়েতের প্রতীক-চিহ্নসমূহ দন্ডায়মান, সদগুণাবলীর লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট এবং আলোর পথের মিনার নির্ধারিত। তোমাদের কোন বিপথে নেয়া হচ্ছে এবং কিভাবে তোমরা অন্ধকারের দিকে যাচ্ছো, যেখানে তোমাদের মাঝে রাসুলের আহলুল বাইত রয়েছে? তাঁরা হলেন ন্যায়ের লাগাম, দ্বীনের প্রতীক ও সত্যের জিহ্বা। তোমরা কোরআনকে যতটুকু মর্যাদা দাও তাদেরকেও ততটুকু মর্যাদা দিও এবং তৃষ্ঞার্ত উট

---

১ **নাহ্‌জুল আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-১৫৩

২ **নাহ্‌জুল আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-২৩৭

৩ **নাহ্‌জুল আল-বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-৯৫

৪ **নাহ্‌জুল আল বালাঘা** ঃ খোৎবা নং-১০৮

অতএব ঐ সব হিংসুটে লোক যাদের চেষ্টাই হলো ফেতনা সৃষ্টি করা ও সত্যকে বিলীন করে দেয়া -**তারা আয়েশাকে (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর আলের মধ্যে গণ্য করার জন্য কেন উঠে পড়ে লেগেছেন?**

তারা শিয়াদেরকে শুধু এই জন্য গালী-গালাজ করে, যেহেতু শিয়ারা উম্মুল মুমেনীন আয়েশাকে (রাঃ) আহলে বাইত (আঃ)-দের চাইতে অধিক প্রাধান্য দেন না। আর যদি গাল মন্দ করতেই হয় তাহলে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঐ সতস্ত আলেমদেরকে কেন গাল মন্দ করেন না, **যারা আয়েশাকে (রাঃ) নবীর (সাঃ) আহলে বাইত থেকে বাহিরে রেখেছেন বা আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত করেননি?**

আল্লাহ্ বলেন, **"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে"।** [১]

১ সূরা আহযাব ঃ ৭১

আমল যা আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ) ভালবাসেন -এসব কিছুই ইতিহাসের কোলে-পিঠে (বুকে) সংরক্ষিত আছে।

অনুরূপভাবে ইতিহাস এই কথার স্বাক্ষী যে, এই উম্মতের মধ্যে সুফি ও শায়খ তরিকার কিছু ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন মাযহাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিগত ও বর্তমান জামানার নেক উলামায়ে কেরামগণ, সবাই আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন এবং ইলম্‌ ও আমলের দিক থেকে তাঁদেরকে সবার চেয়ে উত্তম বলে স্বীকার করেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর ক্বোরবার (নিকট আত্মীয়ের) মধ্যে গণ্য করে থাকেন।

এতো কিছুর পরেও একজন মুসলমানের জন্য এটা জায়েজ হবে না যে, আহলে বাইতের মধ্যে, **"যাদের মধ্য হতে আল্লাহ্‌ পাক 'রিজ্‌স' বাহির করে দিয়ে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছেন, যতটুকু পবিত্রতার হক আছে এবং যাদেরকে রাসুল (সাঃ) চাদরের নিচে একত্রিত করেছিলেন"** রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করবে।

আপনারা কি দেখতে পান না যে, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী তাঁদের সহীহ্‌ ও মাসানীদ গুলিতে ফাযায়েলের হাদীস বর্ণনা করার সময় **'আহলে বাইত'** হতে নবীর (সাঃ) স্ত্রীদেরকে পৃথক করে বয়ান করেছেন।

যেমন সহীহ্‌ মুসলিমে **'ফাযায়েলে আলী ইবনে আবি তালিব'** অধ্যায়ে বয়ান করা হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে আরকাম রাসুল (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি (সাঃ) বলেন, **"জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি অতি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি ঃ একটি আল্লাহ্‌র কিতাব যেটা হলো আল্লাহ্‌র হাবল, যে এটার আনুগত্য করবে সে নাজাত পাবে আর যে এটাকে ছেড়ে দিবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে"**। অতঃপর বলেন, **"আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"** উক্ত বাক্য তিনি আরো দু'বার উচ্চারণ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, **"আপনার আহলে বাইতের মধ্যে কি আপনার স্ত্রীগণও অন্তর্ভূক্ত"?** তিনি (সাঃ) বল্লেন, **"না, খোদার কসম স্ত্রী পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে, যখন সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন নিজের পিতা-মাতার কাছে ফিরে যায়। আহলে বাইত হলো আমার বংশের ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের জন্য ছদকা হারাম"**।[১]

অনুরূপভাবে সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে **'তাইয়াম্মুমের আয়াত'** নাযিলের শানে নযুলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, **"আয়েশা আবু বকরের আওলাদের মধ্য গণ্য, রাসুল (সাঃ)-এর আলের মধ্যে নন"**।[২]

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ১২৩, -ফাযায়েলে আলী ইবনে আবি তালিব অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৮৬ এবং **সহীহ্‌ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ১৯০

আমি সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতেই চাই যাতে প্রতিপক্ষের জন্য কোন **'হুজ্জাত'** বাকি না থাকে, যার দরুন তারা আমাকে দোষারোপ করবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই অধ্যায়ে আমি যেখানে যেখানে সাহাবাদের সম্পর্কে আলোচনা করবো -সেটা থেকে সমস্ত সাহাবাদের বুঝানো হয়নি বরং বিভিন্ন সাহাবাকে বুঝানো হয়েছে। এটাও স্পষ্ট যে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টতা থাকে আবার সংখ্যা লঘুও থাকে। এ বিষয়টি আমরা আলোচনাকালেই বুঝতে পারব। কারণ ফেৎনাবাজরা আমাদের প্রতি দোষারোপ করে থাকে যে আমরা সাহাবাদের বিপক্ষে। আমরা নাকি সাহাবাদের গালি-গালাজ করি। এভাবেই তারা শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত করে থাকেন এবং সত্যসন্ধানীদের পথে বাধার সৃষ্টি করেন। যদিও আমরা সাহাবাদেরকে নিন্দা হতে মুক্ত মনে করি এবং ঐ সমস্ত সাহাবাদের সন্তুষ্টির আকাংখ্যা পোষন করি যাদেরকে পবিত্র কোরআনে শাকেরীন (কৃতজ্ঞ)-এর নামে স্মরণ করা হয়েছে। হ্যাঁ, যারা নবীর (সাঃ) পরে উলটা পা ফেরৎ হয়ে গিয়েছিলেন ও **'মুরতাদ'** হয়ে গিয়েছিলেন এবং বেশীর ভাগ মুসলমানের গুমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন -তাদের প্রতি **'তাবাররা'** করি, তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং আমরা তাদের কেবল ঐ সমস্ত কার্য-কলাপকে প্রকাশ করি যেগুলি ইতিহাস বেত্তা ও হাদীস বেত্তাগণ বয়ান করেছেন। যেন সত্যসন্ধানীগণের সম্মুখে **'হক'** আলোকিত হয়ে উঠুক। **আর এ কাজটি আমাদের সুন্নী ভাইদের কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং একেই তারা গালি-গালাজ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন**!!

পবিত্র কোরআন মজিদ যখন **'সত্য'** বয়ান করতে কোন দ্বিধা বোধ করেনি বরং কোরআন মজিদই তো আমাদের জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করেদিয়েছে এবং কোরআন মজিদই আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, সাহাবাদের মাঝে কিছু কিছু মুনাফিক, ফাসেক, জ্বালিম, মিথ্যাবাদী, মুশরিক ও কুফুরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-কে কষ্ট দানকারীরাও ছিলেন।

স্বয়ং রাসুল (সাঃ) যখন নিজ নাফসের খাহেশ মোতাবেক কিছুই বলতেন না এবং আল্লাহ্‌র বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না -তিনিই তো আমাদের জন্য **'তাবার্‌রার'** দ্বার উন্মুক্ত করেদিয়েছেন এবং তিনিই আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবাদের মাঝে মুরতাদীন, মারেক্বীন, নাকেসীন, ক্বাসেত্বীন এবং তাদেরই মাঝে ঐ ব্যক্তিরাও আছে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সাহাবী হওয়ার বিষয়টি তাদের কোন কাজেই আসবে না। বরং রাসুল (সাঃ)-এর সংস্পর্শ বা সাহচার্য তাদের জন্য **'হুজ্জাত'** বা দলিল হয়ে যাবে এবং তাদের শাস্তিতে বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এতদসত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি মন খারাপ করতে পারব না, অথচ কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত তাদের প্রতি নাখোশ হওয়ার সাক্ষ্য বহণ করছে। আসলে আহলে সুন্নাতগণ সাহাবাদের সমালোচনা করা এ জন্য নিষেধ করে থাকেন, যেন **'সত্য'** প্রকাশিত না হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা সত্য জানতে পেরে যেন আল্লাহ্‌র ওলীদেরকে ভালবাসতে শুরু না করে দেয় এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে ঘৃণা করতে না লাগে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সাহাবাদের সম্পর্কে ঃ

নিশ্চয়ই শারীয়াতের সমস্ত হুকুম-আহ্‌কাম ও ইসলামী আকীদাসমূহ আমাদের পর্যন্ত সাহাবাদের মাধ্যমে এসেছে এবং কেউই এই কথা দাবী করে না যে, **"সে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীরেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং ইসলামের এই দু'টি মূল ভিত্তি পর্যন্ত পৌছানোর জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমানের জন্য সাহাবাগণই হলেন মাধ্যম"**।

যেহেতু রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে সাহাবাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একে অপরের প্রতি গালি-গালাজ ও লানত-মালামতে লিপ্ত হয়ে যান। এমনকি একজন আর একজনকে হত্যাও করেছেন। সেহেতু এই অবস্থার প্রেক্ষিতে যাঁচাই-বাছাই ছাড়া তাদের কাছ থেকে দ্বীনের হুকুম-আহ্‌কাম গ্রহণ করা অসম্ভব। অনুরূপভাবে, তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ইতিহাস পর্যালোচনা না করেই, নবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতে ও ইন্তেকালের পর, তাদের ভূমিকা ও কার্যকলাপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন রায় দেয়া অসম্ভব। আমরা **'হক'**-কে বাতিল থেকে এবং **'মুমিন'**-কে মুনাফিক হতে পৃথক করে দেখি যে কারা উল্টা পা ফেরৎ চলে গিয়েছিলেন এবং কারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করি।

অথচ আহলে সুন্নাতগণ এই বিষয়টিকে কোন গুরুত্বই দেন না এবং সাহাবাদের সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি যাঁচাই-বাছাই করাকে নিষেধ করেন, বরং তাদের প্রতি নির্দ্বিধায় ঐভাবেই দরূদ পাঠান ঠিক যেভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আলে মুহাম্মদ -এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে থাকেন।

আহলে সুন্নাতগণের নিকট প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, **সাহাবাদের সমালোচনা করলে কি মানুষ ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে বা এটার কারণে 'আল্লাহ্‌র কিতাব' এবং রাসুলের (সাঃ) সুন্নাতের বিরোধিতা বলে গণ্য হবে?**

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের নবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পর বিভিন্ন সাহাবার কার্যকলাপ ও কথা-বার্তা উপস্থাপন করতে হবে। এর উত্তর আমরা আহলে সুন্নাতগণের সিহাহ্ সিত্তা, মাসানিদ ও ইতিহাসসমূহেই পেয়ে যাব। এ কাজের জন্য শিয়াদের কিতাবের উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা কিছু কিছু সাহাবাদের সম্পর্কে শিয়াদের ধ্যান-ধারণা সমাজে বহুল আলোচিত। আর এই বিষয়টি কোন বিশ্লেষণেরও দাবী রাখে না।

পেশ ইমাম যখন দেখলেন যে, লোকজন আমার হাদীস বয়ান করার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি বল্লেন, "**আমরা আমাদের মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি যে, ফেতনা ছাপানো আছে, যে এটাতে উস্কানি দিবে তার প্রতি আল্লাহ্‌র লানত**"।

আমি বল্লাম, "হুজুর, ফেতনা ছড়ানো ছিটানোই আছে -চাপা নেই। কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে আছি। আমাদের মধ্য হতে যারা '**সত্যের সন্ধান**' লাভের জন্য জাগ্রত হয় এবং চক্ষু খুলে তাকায়, আপনারা তাদের প্রতি দোষারোপ করেন যে, তারা ফেতনা ছড়াচ্ছে। যা'হোক সমগ্র মুসলমানের ইচ্ছা তারা যেন '**আল্লাহ্‌র কিতাব**' ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের আনুগত্য করে -**তারা ঐ সমস্ত বুজুর্গদের আনুগত্য করতে চান না, যারা মুয়াবিয়া, ইয়াজিদ এবং ইবনে আ'সের মত লোকদের প্রতি রাজি ও খুশি ছিলেন**"।

আমার কথা ইমাম সাহেব এই বলে কর্তন করেন যে, "*তুমি কি কাতিব-এ-ওহি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি রাজী নও*"? আমি বল্লাম, "***এই বিষয় বস্তুর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। এই বিষয়ে আপনি যদি আমার দৃষ্টিভংগী জানতে চান তাহলে আমি আপনাকে আমার একটি বই*** *'অবশেষে আমি সত্য পেলাম'* ***হাদিয়া করছি। হয়তো এটা আপনাকে গভীর নিদ্রার জাল ছিন্ন করে জাগ্রত করবে এবং আপনার চোখের সামনে অনেক সত্য স্পষ্ট ধরা পড়বে***'। ইমাম সাহেব দ্বিধা-দ্বন্দ করতে করতে অবশেষে আমার বইয়ের হাদিয়া গ্রহণ করে নিলেন।

একমাস পরে তিনি আমাকে একটি সুন্দর চিঠি উপহার দিলেন। উক্ত চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "**আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া যে, তিনি দয়া করে আমাকে হেদায়েত দান করেছেন এবং আহলে বাইত (আঃ)-দের 'ইমামত'-কে চেনার তৌফিক দান করেছেন**"। আমি তাঁর উক্ত চিঠিকে "**অবশেষে আমি সত্য পেলাম**" বইটির তৃতীয় সংস্করণে ছাপানোর জন্য অনুমতি চেয়েছি। কারণ এতে '**মোওয়াদ্দাত**'-এর অর্থে এমন পরিচ্ছন্ন আত্মার কথা বলা আছে যে নাকি '**সত্য**'-কে চেনা মাত্রই গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর এই কথা তো বলা হয়েই থাকে যে, "**আহলে সুন্নাতের লোকজন সত্যের পানে চেয়েই আছেন, শুধু পর্দা সরিয়ে দিলেই হবে**"।

কিন্তু ইমাম সাহেব উত্তরে লিখেছেন যে, ঐ চিঠিকে গোপন রাখতে হবে, যেন প্রকাশ না করা হয়। কারণ পেশ ইমাম সাহেব নিজের মুক্তাদীগণকে সন্তুষ্ট করানোর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। তাঁরও একমাত্র আকাংখ্যা এবং সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা, যেন তাঁর এই '**সত্যের**' দাওয়াত বিনা বাধা-বিপত্তিতে পূর্নতা লাভ করতে পারে।

আবার আমরা মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফেরত আসি। সাহাবাদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল, যেন আমরা চরম সত্যকে চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলিকে কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত বয়ান করেছে।

একদিন আমি তিউনিসের রাজধানীর একটি বড় মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য গেলাম। ফরজ আদায় করার পর ঈমাম সাহেব নামাজীদের মাঝে বসলেন এবং সাহাবাদের সমালোচনাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত শুরু করেদিলেন, এমনকি তাদেরকে কাফির প্রমান করতে থাকেন। তিনি তার আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে বল্লেন, "ঐ সমস্ত মানুষ হতে সাবধান থাক, যারা **'হক'** এর মারেফাত ও ইলমী বাহাসের আঁড়ালে সাহাবাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ), ফেরেশতা ও মানুষের লানত হোক। তারা মানুষকে দ্বীনের বিষয়ে সন্দিহান করতে চায়, যদিও রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে, **'আমার সাহাবীদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে যখন কোন ভুল তথ্য পৌছায় তখন তোমরা চুপ থাকবে। কারণ তোমরা যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা দান কর তাহলেও তাদের মর্যাদার দশ ভাগের এক ভাগও সমান মর্যাদা তোমরা পাবে না"** ।

শিয়া মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট আমার এক সংগী তার কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো যে, **"উক্ত হাদীসটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এটাকে রাসুল (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা ভূল হবে"** ।

আমার সংগীর এই কথা শুনে পেশ ইমাম ও মসজিদে উপস্থিত কিছু মুসল্লী রাগে ফেটে পড়লো এবং ভুরু কুঞ্চিত করে আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। আমি নরম সুরে ইমাম সাহেবকে বল্লাম ঃ "হে আমার সৈয়দ ও সরদার, শেখ জলিল, তাহলে ঐ মুসলমানের দোষ কোথায় যখন সে কোরআন মজিদে এই আয়াতের তিলাওয়াত করে, **'আর মুহাম্মদ তো কেবল একজন রাসুল, যার পূর্বে অনেক রাসুল বিদায় নিয়েছেন, যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তখন তোমরা উল্টা পা ফেরৎ চলে যাবে, সুতরাং যারা এমন করবে, তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ অর্দুভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন'** ।

এবং ঐ মুসলামানের পাপ কোথায়, যখন সে সাহাবাদের সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিম ও বুখারীতে রাসুল (সাঃ)-এর এই হাদীস দেখতে পায় ঃ **"কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উত্তরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন আমি জিজ্ঞাসা করবো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? উত্তর দেওয়া হবে, জাহান্নামে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি পুনঃরায় বলবো, পরোয়ার দিগার এরা তো আমার সাহাবী। উত্তর দেওয়া হবে, তুমি জান না, এরা তোমার পরে কত কিছুই না করেছে -এরা কাফেরই থেকে গেছে। তখন আমি বলব, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক যারা আমার পরে শরীয়াতকে পরিবর্তন করেছে এবং আমি খুব কমই মুখলেছ বান্দা খুঁজে পাই"** ।

মসজিদে উপস্থিত সবাই আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছিল। বিভিন্ন লোক আমাকে জিজ্ঞারা করল, **"আপনি কি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছেন যে উক্ত রেওয়ায়েতটি বুখারীতে আছে"**? আমি বল্লাম, **"জ্বি হ্যাঁ, আমি ততটা বিশ্বাসের সাথেই কথাটি বলেছি, যতটা আমার বিশ্বাস আল্লাহ্‌র এক হওয়ার প্রতি আছে এবং তাঁর কোন শরীক না হওয়ার প্রতি আছে এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল"** ।

উপর তাদের আমলের জন্য মুসিবত নাযিল হবে এবং তারা আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে কসম খেয়ে বলবে যে, নেকী হাসিল করা আর একতা সৃষ্টি করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল"।

"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র সহিত ধোঁকাবাজী করে; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে"।[১]

"তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবণ কর যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; উহারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে উহাদের বিরুদ্ধে। উহারাই শত্রু, আতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে"।[২]

"আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সংগে আইস।' উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়- তোমাদের ব্যাপারে কৃপনতাবশত। আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। উহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা সহজ"।[৩]

"উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে"।[৪]

"যাদের অন্তরে নেফাকের রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের মনের বদ খেয়ালগুলি বাহিরে আনবে না? আমি যদি চাই তাহলে তোমাদের দেখিয়ে দিতাম তখন আপনি তাদের ললাট দেখেই চিনতে পারতেন এবং তোমরা তাদের কথা-বার্তার ধরণ দেখেই চিনতে পারবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে আবগত"।

"যে সকল মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, আতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করুন।' উহারা মুখে তাহা বলে যাহা উহাদের অন্তরে নাই"।[৫]

পবিত্র কোরআন মজিদের উপরোক্ত স্পষ্ট আয়াতসমূহ ঐ সমস্ত লোকের নেফাকের কথা বয়ান করছে যারা মুখলেছ সাহাবাদের কাতারে এমনভাবে জায়গা করে নিয়েছিল যে, আল্লাহ্ যদি ওহির মাধ্যমে না বলে দিতেন তাহলে রাসুলও (সাঃ) তাদের হাকিকাত (আসল পরিচয়) বুঝতে পারতেন না।

---

১ সূরা আন-নিসা ঃ ১৪২

২ সূরা মুনাফিকুন ঃ ৪

৩ সূরা আহযাব ঃ ১৮-১৯

৪ সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৬

৫ সূরা ফাত্হ ঃ ১১

আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম দিয়েই আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। কারণ এতে কোন দিক থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারবে না -আর এটাই হচ্ছে অমীয় বাণী এবং সহীহ্ হুকুম।

কোন কোন সাহাবা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, "মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশে পাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জান না; আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহাশাস্তির দিকে"। [১]

"উহারাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব। আতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল। পরিনামে তিনি উহাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করিলেন আল্লাহ্‌র সহিত উহাদের সাক্ষৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল এবং কারণ উহারা ছিল মিথ্যাচারী"। [২]

"কুফুরী ও কপটতায় মরুবাসিগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। [৩]

"কিছু এমনও আছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, অথচ তারা ঈমান আনে নাই। এরা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায়। তারা বরং নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে অথচ বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে রোগ আছে যেটাকে আল্লাহ্ নেফাকের কারণে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এই মিথ্যার জন্য তারা কঠিন আযাব পাবে"।

"যখন মুনাফিকরা তোমর নিকট আসে তাহারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসুল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ! ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিনামে উহারা বুঝে না"। [৪]

"আপনি কি তাদের দেখেন নি, যাদের ধারণা যে তারা আপনি ও আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে নাযিলকৃত বিষয়গুলির প্রতি ঈমান এনেছে -আর তারা অবাধ্যদের কাছে ফয়সালা করাতে চায়। যদিও তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাগুতকে অস্বীকার করে। শয়তান তো তাদেরকে গুমরাহীতে অনেকদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসুলের দিকে আস, তখন তুমি দেখবে যে মুনাফিকরা কত কঠিনভাবে অস্বীকার করে। অতএব তখন তাদের কি হবে যখন তাদের

---

১ সূরা তাওবা ঃ ১০১

২ সূরা তাওবা ঃ ৭৫-৭৭

৩ সূরা তাওবা ঃ ৯৭

৪ সূরা মুনাফিকুন ঃ ১-৩

আজ আহলে সুন্নাতের এই কথার কোন ভিত্তি নেই, যেটা তারা বলে থাকেন, **"আমরা আলী রাদিয়ালাহু আনহু ওয়া কাররামালাহু ওয়াজহাহুকে ভালবাসী"**। তাদের (আহলে সুন্নাত) জন্য আমাদের পরামর্শ হলো যে, মুমিনের কলবে একই সময়ে **'আল্লাহ্র ওয়ালী'** এবং **'আল্লাহ্র শত্রুর'** ভালবাসা একত্রে জমায়েত হতে পারে না। ইমাম আলী (আঃ) স্বয়ং বলেছেন, **"যে আমাদেরকে এবং আমাদের শত্রুদেরকে সমান দৃষ্টিতে দেখে - সে আমাদের দলভূক্ত নয়"**। [১]

অন্যদিকে কোরআন যেখানে সাহাবাদের বিষয়ে কথা বলেছে সেখানে তাদের গুণাবলীও বয়ান করেছে এবং তাদের চিহ্নিতও করেছে। যখন আমরা তাদের মধ্য হতে মুখলেছ সাহাবাদেরকে আলাদা করে নিব তখন বাকীগুলিকে কোরআনে হাকিম ঃ "***ফাসেক, খেয়ানতকারী, মুতাখাযেলীন, নাকেসীন, সাবেক অবস্থানে প্রস্থানকারী, খোদা ও রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি সন্দেহ পোষণকারী, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী, সত্য অস্বীকারকারী, আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ অমান্যকারী, জেহাদ বর্জনকারী, নফসের গোলাম ও অর্থ-সম্পদের ভক্ত, নামাজ তরককারী, কথা ও কাজে গরমিলকারী, নিজের ইসলাম গ্রহণ করাকে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি এহসান (করুনা) বলে গণনাকারী, কঠোর মনের অধিকারী, আল্লাহ্কে ভয় না করনে ওয়ালা, নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উচ্চ স্বরে কথা বলনে ওয়ালা, রাসুল (সাঃ)-কে কষ্ট দানকারী এবং মুনাফেকদের কথায় সম্মতি দানকারী***" - বলে আখ্যায়িত করেছে।

আমরা এতোটুকুতেই সীমিত রাখছি। যতিদও এই বিষয়ে আরো প্রচুর আয়াত মজুদ আছে। আমরা সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলি উল্লেখ করিনি। কিন্তু বিষয় বস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঐসমস্ত আয়াতসমূহের কিছু কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক, যেগুলি সাহাবাদেরকে হুশিয়ারী করে দিয়ে নাযিল হয়েছে এবং তারা এধরণের গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির বদৌলতে রাসুল (সাঃ)-এর পরে ওহির অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পরে, তারা সবাই আদেল (ন্যায় নিষ্ঠাবান) বলে বিবেচিত হন এবং কোন মুসলমানেরই সাহস বা অধিকার নাই যে তাদের কোন সমালোচনা করে।

পবিত্র কোরআন কিছু কিছু সাহাবার হাকিকাত প্রকাশ করেছে ঃ

মুনাফেকীনদের আয়াতসমূহে তো সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, ঐ আয়াতগুলো মুনাফেকদেরকে প্রকৃত সাহাবাদের সারি থেকে পৃথক করেছে এবং এই কথাটি আহলে সুন্নাতগণও বলে থাকেন। আমরা মুমেনীনদের সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহ ধারাবাহিকভাবে একত্রিত করেছি। পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

---

১ নাহ্জুল আল-বালাঘা, খঃ ১, পৃঃ ১৫৫

তাই আহলে সুন্নাতের প্রতি সব সময়ই আমাদের আপত্তি থাকে, কারণ তারা বলে থাকেন যে, **'মুনাফিকদের দিয়ে আমাদের কোন দরকার নেই -সাহাবারা মুনাফিক নন'**। অথবা বলেন যে, যারা সাহাবা তারা মুনাফিক নন। কিন্তু আপনি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করবেন যে, **তাহলে ঐ মুনাফিকগুলি কারা, যাদের সম্বন্ধে সুরা তাওবাহ্ এবং সুরা মুনাফেকুনে ১৫০টিরও বেশী আয়াত নাযিল হয়েছে?** তখন তারা উত্তর দিবেন যে, **'তারা হলো আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি সালুল'**। তাদের কাছে এই দুটি নাম ছাড়া আর কোন নাম নেই।

সুবহান আল্লাহ্! মুনাফেকদের এতবড় সংখ্যা যে, নবীও (সাঃ) তাদের মধ্যে অনেককে জানতেন না -**তাহলে নেফাককে শুধু ইবনে উবাই এবং ইবনে আবি সলুলের মধ্যে কেমন করে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে?** তাদেরকে তো সমস্ত মুসলমানরাই জানেন।

আর রাসুল (সাঃ) যখন এদের মধ্যেকার কয়েকজনকে জানতেন এবং তিনি হুজায়ফা ইয়ামেনী (রাঃ)-কে তাদের নামও বলে দিয়েছিলেন এবং ইয়ামেনীকে ঐ নামগুলি প্রচার করতে নিষেধও করে দিয়েছিলেন -যেটা আপনারা (আহলে সুন্নাত) নিজেরাই বয়ান করে থাকেন। এমন কি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তার খেলাফত কালে হুজায়ফাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **"আমার নামও কি মুনাফেকদের তালিকায় আছে? নবী (সাঃ) কি আমার নামও বলেছেন"?** এভাবেই তো আপনারা (আহলে সুন্নাত) নিজেদের বইগুলিতে রেওয়ায়েত করেছেন। [১]

আবার রাসুল (সাঃ) তো মুনাফিক চিহ্নিত করার আলামত বলেই দিয়েছেন। যার দ্বারা মুনাফেকদেরকে চেনা যাবে তা হলো ঃ **"আলীর (আঃ) প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা"**। যেটা আপনারা (আহলে সুন্নাত) নিজেদের সহীহ্ গ্রন্থগুলিতে লিখেছেন। [২]

তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো, **ঐ সমস্ত সাহাবা কারা; যাদেরকে আপনারা মর্যাদার উচ্চ আসনে বসিয়ে রেখেছেন এবং যাদের ক্ষেত্রে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বলে থাকেন?** আলী (আঃ)-এর প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা এতো পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও শাহাদাতের পরেও তাঁর প্রতি এবং তাঁর আহলে বাইত তথা তাঁদেও প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের প্রতিও লানত করেছে -**অথচ আপনাদের (আহলে সুন্নাত) কাছে এরাই হলো উত্তম সাহাবা**!!

রাসুল (সাঃ)-এর প্রজ্ঞার দাবীই হচ্ছে, তিনি যেন হুজায়ফাকে (রাঃ) ঐ সমস্ত মুনাফেকদের নাম বলে দেন এবং মুসলমানদেরকে মুনাফেক চিহ্নিত করার আলামতও বলে দেন, যেন লোকজনের উপর **'হুজ্জাত'** কায়েম হয়ে যায় এবং পরবর্তিতে যেন তারা না বলতে পারে যে, **'আমরা কিছুই জানতাম না'**।

---

১ **কানযুল উম্মাল**, খঃ ৭, পৃঃ ২৪, **তারিখে ইবনে আসাকির**, খঃ ৪, পৃঃ ৯৭, **এহ্ইয়াউল উলুম**, খঃ ১, পৃঃ ১২৯

২ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ৬১, **তিরমিযি**, খঃ ৫ পৃ ৩০৬, **সুনানে নাসায়ী**, খঃ ৮, পৃঃ ১১৬ এবং **কানযুল উম্মাল**, খঃ ১৫, পৃঃ ১০৫

"উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্‌ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"। [১]

"বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"। [২]

"বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'। বল, তোমারা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পন করিয়াছি', কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।"। [৩]

"তোমরা নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত"। [৪]

"উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের জন্য কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত"। [৫]

"যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকিতেই আনন্দ বোধ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম, যদি তাহারা বুঝিতে! [৬]

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত"। [৭]

"ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন অথচ মু'মিনদের এক দল ইহা পসন্দ করে নাই। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হইতেছিল তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে"। [৮]

---

১ সূরা হুজুরাত ঃ ১৭

২ সূরা তাওবা ঃ ২৪

৩ সূরা হুজরাত ঃ ১৪

৪ সূরা তাওবা ঃ ৪৫

৫ সূরা তাওবা ঃ ৪৭

৬ সূরা তাওবা ঃ ৮১

৭ সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩০

৮ সূরা আনফাল ঃ ৫-৬

"হে মুমিনগণ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভরাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুকিয়া পড়? তোমারা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য"। [১]

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ দীন হইতে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিতে; তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না' ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ "। [২]

"হে মু'মিনগন! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বস ভংগ করিবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বস ভংগ করিও না; এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌রই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে"। [৩]

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্‌বান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলে আহ্বান সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার অন্তরের মধ্যবর্তী হইয়া থাকেন এবং তাহারই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে। তোমরা এমন ফিত্‌নাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম কেবল তাহাগিকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর"। [৪]

"হে মু'মিনগণ! তোমারা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝড়ো বায়ু এবং এক বাহিনী যহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা। যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের প্রান হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠগত এবং তোমারা আল্লাহ্ সম্মন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে; তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে"। [৫]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোসজনক"। [৬]

"যাহারা ঈমান আনে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে?"। [৭]

---

১ সূরা তাওবা ঃ ৩৮

২ সূরা মায়িদা ঃ ৫৪

৩ সূরা আনফাল ঃ ২৭-২৮

৪ সূরা আনফাল ঃ ২৪-২৫

৫ সূরা আহযাব ঃ ৯-১২

৬ সূরা সাফ্‌ফ ঃ ২-৩

৭ সূরা হাদীদ ঃ ১৬

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট হক নিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমাদের সংখ্যাগরিষ্টরা হককে অপছন্দ করেছে"। [১]

এর দ্বারা সত্যসন্ধানীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই সংখ্যা গরিষ্ঠরাই রাসুল (সাঃ)-এর সাথে জীবন যাপন করতেন, তাঁর পিছনে নামাজ পড়তেন, আবাসস্থলে এবং সফরে তাঁর সঙ্গে থাকতেন, এবং তাঁর নৈকট্য লাভের সুযোগ এজন্য খুজে বেড়াতেন যেন মুখলেছ মুমেনীনরা তাদের অবস্থা বুঝতে না পারে এবং ইবাদত ও তাকওয়ার দিক থেকে নিজেদেরকে লোক সমাজে এমনভাবে তুলে ধরতেন যেন মুমিনরা তাদের প্রতি গর্ববোধ করেন।

ইমাম আহমদ নিজের **'মুসনাদ'**-এ এবং ইবনে হাজর নিজের **'এসাবাত'**-এ **"জিশ্‌শাদিয়া"**র ঘটনায় আনাস ইবনে মালিক হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর জামানায় আমরা তার ইবাদত ও আনুগত্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। একদা তার ঘটনা রাসুল (সাঃ)-এর নিকট বয়ান করা হলো, কিন্তু রাসুল (সাঃ) তার নাম শুনে বুঝতে পারেননি। তখন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হলো, তাও তিনি (সাঃ) মনোযোগ দিলেন না। কিছুক্ষণ পর সে যখন বাহির হলো তখন আমরা রাসুল (সাঃ)-কে বল্লাম যে, **'এই সেই ব্যক্তি'**। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, **"তোমরা ঐ লোক সম্পর্কে আমাকে বলছো, যার চেহারা থেকে শয়তানী উঁকি মারছে? সে এবং তার সংগীরা কোরআন পাঠ করে, কিন্তু স্বীকার করে না। দ্বীনের বিষয়-আশয় হতে এমনভাবে বেরিয়ে যায় ঠিক যেমন ধনুক হতে তীর। এদেরকে হত্যা করে দাও, এরাই হচ্ছে পাজি"**।

নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই যখন এদের এই দশা ছিল, তখন নবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পর এরা কি না করেছে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তারা অনেক চতুর ছিল। তখন তো আর কোন নবী নাই যে তাদেরকে চিনতেন, আর না ওলীর (মনোনীত উত্তরসূরী) কোন সিলসিলা ছিল যে তাদের হাকিকাতকে প্রকাশ করবেন। বিশেষ করে নবীর (সাঃ) ভারাক্রান্ত মৃত্যুর পর মদীনাবাসীদের মধ্যে দেখতে দেখতেই বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। এভাবেই **'জাযিরাতুল আরব'**-এর ঐ সমস্ত লোক মুরতাদ হয়ে গেল, যারা কুফুর ও নেফাকে অনেক কঠিন ছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু তো নবুয়াতের দাবী করে বসলো, যেমন ঃ **মাসিলামায়ে কাজ্জাব এবং তালিহা ও সেজাহ বিনতুল হারস এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ। উল্লেখ্য, ইহারা সকলেই সাহাবী ছিলেন**।

আমরা যদি এই সমস্ত ঘটনাবলীর দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই, আর রাসুল (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত সাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি যারা মদীনায় অবস্থান করছিলেন, তাহলে আমার বিশ্বাস! তাদের মাঝেও নেফাকের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমনকি তাদের

---

১ সূরা আরাফ ঃ ৭৮

"দেখ, তোমরাই তো তাহারা, যাহাদিগকে আল্লাহ্ পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদের অনেক কৃপণতা করিতেছে। যাহারা কার্পন্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না।"। [১]

"উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদাকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা প্ররিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু উহাদিগকে না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।" [২]

"উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে"। [৩]

"এবং উহাদের মাঝে এমনও লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী। বল, 'তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে।' সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি"। [৪]

সত্যসন্ধানীদের জন্য স্পষ্ট আয়াতসমূহের মধ্য হতে এগুলিই যথেষ্ট বলে মনে করছি। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) যারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং নিজের ইচ্ছা ও নেতৃত্বকে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর কাছে সোপর্দ করেছেন, তাঁদের আনুগত্য করেছেন, তাঁদের **'সোহবত'**-এ (সাহচর্যে) জীবন কাটিয়েছেন এবং তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য জীবন দিয়েছেন। তারা সফলকাম ও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। কোরআন তাঁদেরকে **'শাকেরীন'** (কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী) এর নামে স্মরণ করেছে।

(২) যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্ ও রাসুলের (সাঃ) প্রতি ঈমান এনেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে রোগ ছিল এবং তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর নিকট সোপর্দ করেননি। হ্যাঁ ব্যক্তি স্বার্থ ও দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করার জন্য চুপচাপ ছিলেন এবং হুকুম আহ্কাম ও রেসালতের আদেশসমূহের ব্যাপারে রাসুল (সাঃ)-এর সাথে ঝগড়া করেছেন -এরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত এবং এরাই সংখ্যাগরিষ্ট। কোরআন এদেরকে নীচ প্রকৃতির রূপে স্মরণ করেছে। যেহেতু ইরশাদ হচ্ছে ঃ

---

১ সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮

২ সূরা তাওবা ঃ ৫৮

৩ সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৬

৪ সূরা তাওবা ঃ ৬১

না। কারণ সবকটি হাদীসই তাদেরই সিহাহ্‌ সিত্তাহ, মাসানীদ ও ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন আমরা বুখারী থেকে হাদীস উপস্থাপন করবো, যে গ্রন্থটি আহলে সুন্নাতের নিকট সবচাইতে বিশ্বস্ত গ্রন্থ। যদিও বুখারী সাহাবীদের ইজ্জত রক্ষার্থে অনেক হাদীস গোপন করেছেন এবং এই বিষয়ে বুখারীর অনেক খ্যাতিও আছে। কারণ বুখারী ছাড়া আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সহীহ্‌ গ্রন্থাদিতে স্পষ্টাকারে তার দূর্বলতা সম্পর্কে বয়ান করা হয়েছে। তদুপরি আমরা নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করার জন্য বুখারীর অল্প কিছু হাদীসকেই যথেষ্ট বলে মনে করছি।

বুখারী তার সহীহ্‌-র ১ম খন্ডের **'কিতাবুল ঈমান'**-এ লিখেছেন ঃ ইব্রাহীম তামিমি বলেন যে, **"আমি আমার কথাকে নিজের আমলের সাথে কখনো যাঁচাই করিনি, কারণ আমার ভয় হয় আমি যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়ে পড়ি"**।

ইবনে আবি মালিকা বলেন যে, **"আমি নবীর (সাঃ) সাহাবাদের মধ্য হতে এমন ৩০ জনের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা নিজেদের সম্পর্কে মুনাফেক হওয়ার ভয় পোষণ করতেন। তাদের মধ্য হতে একজনও দাবী করেনি যে তারা জিব্রাইল ও মিকাইলের ঈমানের উপর টিকে আছেন"**। [১]

ইবনে আবি মালিকা যখন ৩০জন সাহাবাকে নেফাকের সন্দেহে সন্দিহান দেখেছেন এবং নিজেদের ঈমানের পোক্ততার দাবী করনে না, তাহলে **আহলে সুন্নাতদের কি হলো যে, তারা সাহাবাদেরকে নবীদের কাতারে নিয়ে দাঁড় করান এবং কারোর সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে পারেন না** !!

বুখারী তার সহীহ্‌-র ৪র্থ খন্ডের **'কিতাবুল জিহাদ'**-এ লিখেছেন ঃ হাতিব ইবনে আবি বাল্‌ তায়াহ্‌ নামক রাসুল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী মক্কার মুশরিকদেরকে রাসুল (সাঃ)-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। তাকে যখন তার পত্রসহ রাসুল (সাঃ)-এর সামনে হাজির করা হয় এবং তিনি (সাঃ) পত্র দেখিয়ে যখন জিজ্ঞারা করলেন যে, '*এটা কি*'? তখন সে ক্ষমা চেয়ে বল্ল, '*আমি মক্কাতে আমার আত্নীয়দের পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম*'। রাসুল (সাঃ) ইহাকে সত্য বলে সাব্যস্ত করলেন। উমর (রাঃ) বলেন, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফেকের গর্দান নিয়ে নিব*'। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, '*বাদ দাও, এ বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল, আর তুমি তো জানই যে, যারা বদরে শরীক ছিল, আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন* -***"তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম***'।

যখন হাতিবের মত একজন বদরী সাহাবী নবীর (সাঃ) পরিকল্পনা নবীর (সাঃ) দুশমনদের কাছে ফাঁস করে দিতে চায় এবং নিজের আত্নিয়দের পক্ষ অবলম্বন করে আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর সাথে খেয়ানত করতে চায় এবং উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তার

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১৭

মাঝে অনেকেই খেলাফত লাভের চক্করে পড়ে তাদের পূর্বেকার অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ইতি পূর্বেকার আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, তারা রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর জানাশীনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তারা ঐ সময়েও রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন যখন তিনি (সাঃ) মৃত্যুসজ্জায় ছিলেন।

এটা এমনই একটি হাকিকাত, যা ইতিহাস ও নবীর (সাঃ) সীরাতের বই-পুস্তক পাঠ করার সময় প্রত্যেক সত্যসন্ধানীই স্বীকার করতে বাধ্য। এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও এই কথাকে কঠিন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মুহাম্মাদ একজন **রাসুল মাত্র; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করিবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন**"।[১]

অতএব, সাহাবাদের মাঝে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী খুব অল্পই ছিলেন, তাঁরাই দ্বীনের উপর কায়েম ছিলেন এবং তারা দ্বীনের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেন নি। এবং ঐ সময় দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন যখন অন্যরা রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা এবং উহার অর্থবোধক নিষেধাজ্ঞা, আহলে সুন্নাতের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে যে, মুনাফেকদের সাথে সাহাবাদের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ আমরা যদি তাদের (আহলে সুন্নাতের) এই কথা মেনেও নেই, তাহলেও এই আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে ঐসমস্ত সাহাবাদের সাথে যারা মুখলেছ ছিলেন এবং নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতে মুনাফেক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর (সাঃ) ইন্তেকালের পর তাদের পূর্বেকার অবস্থানে ফেরৎ চলে গিয়েছিলেন।

তাদের প্রকৃত অবস্থা তখনই স্পষ্ট হয়ে যাবে, যখন আমরা নবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবাদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করবো এবং তাদের সম্বন্ধে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করবো। এবং তাদের সম্বন্ধে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সমুহে, ইতিহাস গ্রন্থে, হাদীস গ্রন্থে ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে ভূরি ভূরি বয়ান আছে।

রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস কিছু কিছু সাহাবার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছে ঃ

প্রতিপক্ষ এই হাদীসসমূহ যা সাহাবাদের সম্পর্কে কথিত আছে সেগুলিতে কোন প্রকার সন্দেহ বাহির করতে পারবেন না। আর সেগুলিকে দূর্বলও সাব্যস্ত করতে পারবেন

---

১ সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৪

পারবে না"। তারপর আসীদ ইননে খাজির দাঁড়িয়ে বলেন, "**খোদার কসম, তুমিই মিথ্যা বলছো। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। যেহেতু তুমি মুনাফেক সেহেতু তুমি মুনাফেকের পক্ষ অবলম্বন করছো**"। ফলশ্রুতিতে '**আউস**' ও '**খাজরাজ**' গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। পয়গম্বর (সাঃ) মিম্বরে বসে ছিলেন, তিনি 'আউস' ও 'খাজরাজ' গোত্রের লোকজনকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেন। অবশেষে তারা শান্ত হয় এবং রক্তা-রক্তি থেকে বিরত থাকে।[১]

আনসারদের মধ্য হতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী সা'দ ইবনে ওবাদাকে যখন নবীর (সাঃ) সম্মুখেই '**মুনাফেক**' বলা হলো এবং কেউ তার পক্ষ নিল না। **অথচ এই সা'দ ইবনে ওবাদা হলেন সেই আনসারদেরই একজন, যাদের প্রশংসা আল্লাহ্ কোরআন মজিদে বর্ণনা করেছেন!!**

যে রাসুল (সাঃ)-এর আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়, সেই মুনাফেককে হত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য '**আউস**' ও '**খাজরাজ**' গেত্রের লোকেরা একে অপরের মুখোমুখী দাড়িয়ে যায় এবং যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে যায় এবং রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে চেঁচামেচী শুরু করে দেয়।

তাহলে ঐ সমস্ত সাহাবীরা কেন মুনাফেক হতে পারবে না, যারা জীবনভর রাসুল (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? এতে কি আর কোন সন্দেহ আছে যে, তারা মুনাফেক নয়, **যারা রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর খেলাফত দখল করার স্বার্থে তাঁরই কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমার (সাঃআঃ) গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল!!**

বুখারী তার ৮ম খন্ডের '**কিতাবুত তাওহিদ**'-এ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই বাণী "**তা'রেজুল মালায়িকতু ওয়ার রূহু ইলাইহে**"-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ আলী ইবনে আবি তালিব, ইয়ামেন হতে রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে স্বর্ণ প্রেরণ করেন। রাসুল (সাঃ) উক্ত স্বর্ণ বিভিন্ন লোকের মাঝে বন্টন করে দেন। বিষয়টিকে কোরাইশ ও আনসারগণ খুবই অপছন্দ করে বলেন, "*রাসুল (সাঃ) 'নজদ'-এর ধনীদের মাঝে স্বর্ণ বন্টন করে দিলেন এবং আমাদেরকে উপেক্ষা করলেন। রাসুল (সাঃ) বলেন,* "*আমি তাদের মন জয় করার জন্য অনুরূপ করেছি*"। তথাপিও এক ব্যক্তি তাঁর (সাঃ) সম্মুখে এসে বললো, "*হে মুহাম্মদ আল্লাহকে ভয় করুন*"। নবী (সাঃ) বলেন, "*আমিই যদি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হই তাহলে আর কে তাঁর আনুগত্য করবে? তিনি আমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য 'আমীন' নিযুক্ত করেছেন. তোমরা কি আমাকে 'আমীন' বলে স্বীকার কর না?* ঐ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য রাসুল (সাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু রাসুল (সাঃ) অনুমতি দিলেন না। ঐ লোকটি যখন চলে গেল, তখন রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "**এই লোকগুলি আমার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমার সংগেই থাকে। তারা কোরআন তেলাওয়াত**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১৫৬ এবং খঃ ৬, পৃঃ ৮

নেফাকের সাক্ষ্য দেন। তাহলে **ঐ সমস্ত সাহাবার অবস্থা কি হবে যারা, খায়বার, হুনাইন ও মক্কা বিজয়ের পর, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করেছিলেন?**

বুখারী তার সহীহ্-র ৬ষ্ঠ খন্ডের **'কিতাবে ফাযায়েলুল কোরআন'**-এ লিখেছেন ঃ একজন মোহাজের ও একজন আনসারের মাঝে ঝগড়া হয়ে গেল। আনসার ব্যক্তিটি আনসারদের এবং মোহাজের ব্যক্তিটি মোহাজেরদেরকে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। বিষয়টি যখন রাসুল (সাঃ) জানতে পারলেন তখন তিনি বলেন, "*জাহেলিয়াতের যুগের ঝগড়া কি আবার শুরু হয়ে গেল*"? লোকেরা বললো, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মোহাজেরদের একজন আনসারদের একজনার সাথে ঝসড়া করেছে*"। রাসুল (সাঃ) বলেন, "*ঝগড়া-ঝাটি বন্ধ কর, কারণ ইহা অতি জঘন্য কাজ*"। রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত কথার পর আব্দুলল্লাহ্ ইবনে উবাই বল, "*খোদার কসম, আমরা যখন মদীনায় ফেরৎ যাব, তখন যারা ভদ্র, শক্তিশালী এবং সম্মানিত, তারা অবশ্যই নীচ ও হীনমনা লোকজনকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দিবে*"। এ'কান সে'কান হতে হতে এই কথাটি রাসুল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছালো, তখন উমর দাড়িয়ে বলেন, "*হে আল্লাহ্‌র রাসুল, অনুমতি দিন আমি ঐ মুনাফেকদের গর্দান উড়িয়ে দিব*"। হুজুর (সাঃ) বল্লেন, "**বাদ দাও, লোকেরা আবার এই কথা না বলে বেড়ায় যে, রাসুল নিজের সাহাবীদেরকে হত্যা করছেন**"।[১]

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে মুনাফিক ছিল, কারণ রাসুল (সাঃ) হযরত উমরের (রাঃ) কথার সমর্থন করেছেন এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে মুনাফেক বলেছিলেন। কিন্তু মুনাফেক হওয়া সত্বেও পয়গম্বর (সাঃ) হত্যা করার জন্য হযরত উমরকে (রাঃ) অনুমতি দেননি। কারণ লোকে বলে বেড়াতো যে, **'মুহাম্মদ নিজের সাহাবীকে হত্যা করেছে'**। মুহাম্মদ (সাঃ) এই কথা ভাল করেই জানতেন যে তাঁর সাহাবীদের মাঝে অনেক মুনাফিক আছে। **যদি মুনাফিকদেরকে এভাবে হত্যা করা হতে থাকে তাহলে সাহাবীদের সংখ্যা অতি নগন্য হয়ে পড়বে। আহলে সুন্নাতগণ কোথায় আছেন? তারা কি এই তিক্ত বাস্তবতা জানেন না? তাদের ধারণাকে বাতিল করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয় কি?**

বুখারী তার ৬ষ্ঠ খন্ডে **'কিতাবুস শাহাদাত'**-এ লিখেছেন ঃ রাসুল (সাঃ) বলেন, "*এমন কেউ আছে যে আমাকে ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্তি দিবে, যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে কষ্টদেয়*"। এই কথা শুনে সা'দ ইবনে মোয়াজ দাঁড়িয়ে বলেন, "*হে পয়গম্বর, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে তার থেকে মুক্তি দেওয়াব, তার সম্পর্ক যদি আউস বা খাজরাজ গোত্র থেকে হলেও আমি তার গর্দান কেটে ফেলব। আপনি সেই সময় আমাকে ডাকবেন, আমি আপনার সাহায্যের জন্য হাজির হবো এবং আপনার নির্দেশ পালন করবো*"। এই কথা শুনে খাজরাজ গোত্রের গোত্রপতি সা'দ ইবনে ওবাদা অহংকার ভারে দাঁড়িয়ে বল্ল, "*তুমি মিথ্যা বলছো, আল্লাহ্‌র কসম তুমি ঐ খাজরাজ গোত্রের কিছুই করতে*

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ৬৫

দিলেন, আয়ীনাহ্ কেও ১০০টি উট দিলেন এবং আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকেও ধন-সম্পদ দিলেন এবং ঐদিন বন্টনের মধ্য দিয়ে লোকজনকে আকৃষ্ট করে ফেলেন। ঐ লোকটি বল, "*আল্লাহ্‌র কসম এই বন্টনে কোন ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা হয়নি, আর না এতে আল্লাহ্‌র রেজামন্দী ছিল*"। রাবী বলেন, আমি বল্লাম, "*খোদার কসম আমি এ কথা পয়গম্বর (সাঃ)-কে অবশ্যই বলব*"। আমি রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা জানালাম। নবী (সাঃ) বলেন, "**আল্লাহ্ এবং রাসুল যদি আদিল না হোন তাহলে আর কাকে আদিল বলা হবে? আল্লাহ্ মূসার (আঃ) প্রতি রহম করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, অথচ তিনি সবর করেছেন**"। [১]

এ হলো আসহাবে রাসুল (সাঃ)-এর মধ্যে আর এক মুনাফেক। হয়তো লোকটি কোরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কেউ হবে। তাই ভয়ে রাবী তার নাম উল্লেখ করেননি। কারণ ঐ সময় তিনি হয়তো রাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কত আত্মবিশ্বাসের সাথে লোকটি কসম খেয়ে বলে ফেল্লন যে, "**পয়গম্বর আদেল নন এবং বন্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছিল না। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুক। এর চেয়েও অনেক বেশী তাঁর (সাঃ) উপর জুলুম হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন**"।

বুখারী এবং মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ আমরা গনিমতের মাল বন্টনের সময় রাসুল (সাঃ)-এর পাশেই ছিলাম। বনু তামিম গোত্রের '**জুল খোওয়ায়সরা**' নামক ব্যক্তিটি যখন রাসুল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগলো, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ), আদল করুন*"। তিনি (সাঃ) বলেন, "*খোদা তোমাকে ধ্বংস করুক, আমি যদি আদল না করি তাহলে আর কে আদল মাফিক কাজ করবে? আমি যদি আদল না করতাম তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে*"। এই কথা শুনে উমর বলেন, "*ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিন, লোকটির গর্দান কেটে ফেলবো*"। রাসুল (সাঃ) বলেন, "**বাদ দাও এর এমনও বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা তাদের নামাজ-রোজার তুলনায় তোমাদের নামাজ-রোজাকে তুচ্ছ মনে করে। এরা কোরআন তেলাওয়াত করে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। এরা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায় ঠিক যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।** [২]

এ হলো সাহাবাদের মাঝে মুনাফেকদের আর একটি নমুনা। এরা মুমিনদের সম্মুখে নিজেদের তাকওয়া ও পারহেজগারীকে বেশী বেশী করে জাহের করে। এমনকি নবী (সাঃ) উমর (রাঃ) কে বলেন যে, '**তারা তোমাদের নামাজ-রোজাকে নিজেদের নামাজ-রোজার সামনে অতি নগন্য মনে করে। নিঃসন্দেহে তারা উত্তম রূপে কোরআন হেফজ করতো কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামতো না**'। আবার রাসুল (সাঃ)-এর এই কথা

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ৬১ -'**বখশিশ বিল মুয়ালেফাতুল কুলুব**' অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ১৭৯

করে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না, তারা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যায়, যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। এরা মুসলমানদের হত্যা করে এবং মূর্তি পূজারীদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে। আমি যদি তাদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে আ'দ কোওমের মত হত্যা করবো"। [১]

উক্ত ব্যক্তি রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মুনাফেক, যে উধ্বত্বের সাথে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি স্বর্ণ বন্টনে পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করে এবং বলে যে, **"হে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌কে ভয় করুন"**। নবী (সাঃ) তার মুনাফিক হওয়ার বিষয়ে যদিও নিশ্চিত, তবুও বলেন যে, **"আমার সহবতে উঠ-বস্ করীদের মধ্যে কিছু লোক এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায় এবং তারা মূর্তিপূজারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে"**। এ সমস্ত ঘটনার পরেও রাসুল (সাঃ) তাকে হত্যা করা থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদকে বিরত রাখেন।

এগুলি হচ্ছে ঐ সমস্ত আহলে সুন্নাতগণের জন্য জবাব, যারা আমার উপর এই কথা বলে **'হুজ্জাত'** কায়েম করেন যে, "রসুল (সাঃ) যদি জানতেনই যে তাঁর সাহাবীদের মাঝে মুনাফেক আছে এবং শীঘ্রই তারা মুসলমানদের গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে দ্বীনের হেফাজত এবং তার প্রসারের জন্য -তাদেরকে হত্যা করা তাঁর (সাঃ) উপর ওয়াজিব ছিল"।

বুখারী তার সহীহ্‌র ৩য় খন্ডের **'কিতাবুস সোলেহ্'**-তে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ ইবনে যোবায়ের বয়ান করেন যে, তিনি হাররাহের একটি ঘাটনাকে কেন্দ্র করে একজন আনসারের সাথে ঝগড়া করছিলেন, ঐ আনসারটি রাসুল (সাঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা উভয়েই পানি পান করছিলেন। রাসুল (সাঃ) যোবায়েরকে বল্লেন, '*তুমি আগে পান কর তার পর প্রতিবেশীদের পান করতে দাও*"। আনসার লোকটি রাগান্বিত হয়ে বল, "*ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ), এটা এই জন্য যে, সে আপনার চাচাতো ভাই হয়*"? তার কথা শুনে রাসুল (সাঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তিনি বলেন, **"তাহলে তুমিই আগে পানি পান কর এবং বাকিগুলো সংরক্ষন করে ফেল যেন জমিন সেটাকে চুষে নেয়"**।

এটা হল রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে মুনাফেকীর আর একটি নমুনা, যে মনে করে যে রাসুল (সাঃ) পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি তাঁর চাচাতো ভাই (ইবনে যোবায়ের)-এর পক্ষপাতিত্ব করছেন। আর এই কথা সে এতোই ঔধ্যত্বের সাথে বলেছিল যে রাগে রাসুল (সাঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত আছে যে, পয়গম্বর (সাঃ) হুনাইনের দিন লোকজনের মাঝে গনিমতের মাল বন্টন করেন। আক্বরা' ইবনে হাবিসকে ১০০টি উট

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ১৭৮

আল্লাহ্‌র হুকুমকে রাসুল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী বুঝতেন? অথবা তারা আল্লাহ্‌কে রাসুল (সাঃ)-এর চেয়েও বেশী ভয় পেতেন?

নিঃসন্দেহে রাসুল (সাঃ)-এর পরে উমর (রাঃ) '**মোতা হজ্জ**' এবং '**মোতা বিবাহ**' উভয়কে এই কারণেই হারাম ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং তারা যখন নবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই হজ্জের সময় নবীর (সাঃ) এই হুকুমকে অমান্য করতে পারেন যে, "**তোমরা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ কর**", তাহলে নবীর (সাঃ) তিরোধানের পর তারা '**মোতা**'-কে তো হারাম ঘোষণা দিতেই পারেন। কারণ তারা নবীর (সাঃ) হুকুমকে আমল দিতে চাননি এবং '**মোতা বিবাহ**'-কে জেনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমস্ত আহলে সুন্নাত উমরের (রাঃ) এই গর্হিত সিদ্ধান্তকেই মান্য করে থাকেন।

বুখারী আনাস ইবনে মালেক হতে নিজ সহীহ্‌তে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ আল্লাহ্ যখন রাসুল (সাঃ)-কে হাওয়াযানের ধন-সম্পদ গনিমত হিসাবে দান করলেন এবং রাসুল (সাঃ) উক্ত ধন-সম্পদ একজন কোরেশীকে দিয়ে দেন, তখন আনসারগণ বলেছিল, "*আল্লাহ্, রাসুল (সাঃ)-এর মাগফিরাত করুক! তিনি তো সবকিছুই কোরেশদের মাঝে দান করে দিয়ে আমাদের বঞ্চিত করছেন, আমাদের তরবারী হতে কোরেশীদের রক্ত ঝরছে*"। সুতরাং রাসুল (সাঃ) তাদেরকে একটি খিলান করা ছাদের নীচে জমায়েত করে বল্লেন, "*ঐ কথাটি আবার বল, যা আমার কানে এসেছে*"। তারা যখন নিজেদের কথার সত্যতা স্বীকার করলো তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, "*আমি ঐ লোকগুলিকেই গনিমতের মাল দিয়েছি যারা সদ্য মুসলমান হয়েছে। তোমরা কি এটা চাওনা যে তারা মাল নিয়ে দেশে ফিরুক? তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসুলের সঙ্গে (অনুরুপ ভাবে) নিজেদের গৃহে ফেরৎ যাওনি? আল্লাহ্‌র কসম তোমরা যা কিছু নিয়ে নিজেদের ঘরে ফেরৎ গিয়েছিলে সেগুলো এগুলোর চাইতে উত্তম যা এরা নিয়ে ফেরৎ যাবে*"। রাসুল (সাঃ)-এর কথা শুনে আনসারগণ বল্ল, "*হে পয়গম্বর খোদার প্রতি আমরা রাজি ও খুশি হলাম*"। তারপর রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "**তোমরা আমার পরে যদি নিজের নফস্ ও ইচ্ছার আনুগত্য করবে, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর**"। আনাস (রাঃ) বলেন যে, "**আমরা ধৈর্য ধারণ করিনি**"। [১]

এখানে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই! **সমস্ত আনসারদের মাঝে এমন কেউ আছেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি কাজের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, রাসুল (সাঃ) পাপ মুক্ত ছিলেন? আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এই বাণী কি বুঝতে পেরেছিলেন? "কসম আপনার প্রতিপালকের! এরা ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষন না নিজেদের মতভেদের জন্য আপনাকে হাকিম (শাসক) বলে স্বীকার করে নেয়। আর যখন আপনি ফয়সালা করে দিবেন তখন নিজেদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ রাখবে না এবং সম্পূর্ণ রূপে আপনার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে"।**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ৬০, -'**কিতাবুল জিহাদ**' অধ্যায়।

যে, "**বাদ দাও তাদের অনেক বন্ধু বান্ধবও এরকমই**"-স্পষ্ট রূপে দলিল-প্রমান বহন করছে যে সাহাবাদের একটি বৃহৎ সংখ্যা মুনাফেক ছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন যে ঃ রাসুল (সাঃ) একটি বিধান জারী করেন এবং সে মোতাবেক লোকজনকে আমল করতে বলেন। কিন্তু লোকেরা আমল করেনি। সুতরাং রাসুল (সাঃ) খোৎবা দিলেন এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও গুণাবলী পাঠ করে বল্লেন, "**ঐ সমস্ত লোকগুলির কি হয়েছে যে, তারা আমার দেওয়া বিধান মোতাবেক আমল করে না, যেটার উপর আমি আমল করি? আল্লাহ্‌র কসম আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহ্‌কে চিনি এবং তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করি**"। [১]

এটা ঐ সমস্ত সাহাবাদের নমুনা যারা রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত অমান্য করতো এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর কাজ কর্মকে ঠাট্টা করতেন। সে কারণেই তো আমরা রাসুল (সাঃ)-কে তাদের উদ্দেশ্যে খোৎবা দিতে দেখি, যাতে তিনি (সাঃ) আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন, "**আমি তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে চিনি এবং তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করি**"।

বুখারী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণানা করেছেন যে ঃ জিলহজ্জ মাসের ০৪ তরিখে রাসুল (সাঃ) '**তাহ্‌লিল**' করে হজ্জের জন্য আগমন করেন। আমরা যখন তাঁর সাথে মিলিত হই তখন তিনি '**হজ্জ**'-এর পরিবর্তে '**উমরাহ্‌**' করার হুকুম দেন। সুতরাং আমরা হজ্জের পরিবর্তে উমরাহ্‌ করলাম যেন নিজেদের স্ত্রীর সাথে থাকতে পারি। এ সম্পর্কে একটি খবর ছড়িয়ে পড়লো। আ'তা বলেন যে, যাবের বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে কেউ মিনার দিকে যাচ্ছিল তখন তার লিঙ্গ থেকে ধাতু নির্গত হচ্ছিল, তখন জাবের বলেন, "*তাকে থামাও*"। একজন দু'জন হতে হতে খবরটি রাসুল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছায়। তখন তিনি (সাঃ) খোৎবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং বল্লেন, "**আমি খবর পেয়েছি যে, লোকেরা এই সব অপকর্ম করছে, খোদার কসম আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশী নেক ও খোদা ভীরু**"। [২]

রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবাদের মাঝে এরা হলো আর এক ধরণের দল, যারা শরীয়াতের হুকুমসমূহে আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছে। এবং "**আমি খবর পেয়েছি লোকেরা এমন সব অপকর্ম করছে**" -রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাটি স্পষ্টভাবে দলিল প্রমান দিচ্ছে যে, বেশীরভাগ সাহাবীরা স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং বলতেন যে আমরা তো পবিত্র, মিনা যেতে দোষ কোথায় -অথচ তাদের লিঙ্গ হতে ধাতু নির্গত হচ্ছিল। **ঐ নির্বোধরা কি এই কথা জানতেন না যে সহবাসের পর আল্লাহ্‌ তাদের জন্য গোসল ও পাক হওয়াকে ফরজ করেছেন? তাহলে তারা কিভাবে ঐ অবস্থায় মিনার দিকে যাচ্ছিলেন যখন তাদের লিঙ্গ থেকে ধাতু নির্গত হচ্ছিল? তারা কি**

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ৯৬ -'**কিতাবুল আদব**' অধ্যায়।

২ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১১৪

ততটুকুই সত্য জানেন যতটা খলিফাদের দরবার থেকে জানানো হয়েছে। এই দরবারী আলেমগণ, নিজেদের কলা-কৌশল ও ইজতিহাদ দ্বারা আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর হুকুম-আহ্‌কামকে পরিবর্তন করেছে এবং উক্ত পরিবর্তনকে **'বিদআতে হাসানাহ্‌'** নাম দিয়েছেন।

এ কারনে আমি আমার সুন্নী ভাইদের বলে থাকি যে, সাহাবাদের সোহবত দ্বারা ধোকায় পড়বেন না। যখন বাররা ইবনে আজীবের মত প্রথম শ্রেণীর সাহাবী -যিনি বৃক্ষের নীচে রাসুল (সাঃ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন -তিনি বলেন যে, **"ভাতিজা! বৃক্ষের নীচে রাসুল (সাঃ)-এর হাতে আমার বায়াত গ্রহণ করা এবং তাঁর সোহবত নসীব হওয়ার বিষয়টা তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে দেয়, কারণ তুমি জান না যে রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমরা কিনা করেছি"**। অথচ বৃক্ষের নীচে অনুষ্ঠিত বায়াত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাঁর পাক কালামে বলেন, **"যাহারা তোমার হাতে বায়্‌'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়্‌'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মাহাপুরস্কার দেন"**। [১]

অনেক সাহাবা তো রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই বায়াত ভঙ্গ করেছেন। রাসুল (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) কাছে ওয়াদা করিয়ে নেন যে, তিনি (আলী) যেন ওয়াদা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। যা ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

বুখারী, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ হতে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ শাম হতে একটি কাফেলা আগমন করে। তারা নিজেদের খাদ্য-খাবারও সঙ্গে এনেছিল। আমরা নবীর (সাঃ) পিছনে নামাজ পড়ছিলাম। (যখন লোকেরা কাফেলা আগমনের শব্দ শুনলো তো) অনেকে নামাজ ভঙ্গ করে পালিয়ে যায়। মাত্র ১২ জন জামাতে হাজির ছিল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ **"যখন তাহার দেখিল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল"**। [২]

রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবাদের মধ্য হতে এরা হলো আর একটি দল। যাদের মধ্যে না তাকওয়াহ্‌ আছে, না আল্লাহ্‌র ভয় আছে, আর না খুশু আছে। বরং রাসুল (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল রেখে নব্য আগত কাফেলার আগমন ও ব্যবসার জন্য জুমআর নামাজ ফেলে পালিয়ে যায়।

এরাও কি মুসলমান -পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার? অথবা এরা মুনাফেক -যারা নামাজ-কে ঠাট্টা করলো? আর যখন নামাজের জন্য দাড়ায় তখন তাদের মধ্যে আলসেমী (অলসতা) ভরা থাকে। তাদের মধ্য হতে কেবল ওদেরকেই গ্রহণ করা যেতে পারে যারা নামাজ শেষ

---

১ সূরা ফাত্‌হ ঃ ১০

২ সূরা জুমু'আ ঃ ১১ এবং **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ২২৫ ও খঃ ৩, পৃঃ ৬ ও ৭ -**'কিতাবুল জুমু'আ'** অধ্যায়।

তাদের মাঝে এমন কেউ আছেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আনসার কর্তৃক কথিত ঐ কথার প্রতিবাদ করেছে, "**খোদা রাসুল (সাঃ)-এর মাগফিরাত করুক**"?

অবশ্যই ঈমান পরিপূর্ণতার এই আয়াতের আলোকে তাদের মাঝে একজনও পাওয়া যায় না। তার পরও তাদের ঐ কথা, "**হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ্, এখন আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি**"-দ্বারা প্রমান হয়ে যে, তারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এ সম্পর্কে আনাস ইবনে মালেকের সাক্ষ্য বিদ্যমান। তিনি বলেন যে, "**উক্ত ঘটনার সময় সমস্ত আনসারগন উপস্থিত ছিলেন -আমাদের সবর করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু আমরা সবর করিনি**"।

বুখারী, আহমদ ইবনে আশকাব হতে এবং তিনি মুহাম্মদ ইবনে ফজীল হতে এবং তিনি আ'লা ইবনে মাসীব এবং মাসীব নিজের পিতা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি বাররা ইবনে আজীবের সাথে দেখা করে বল্লাম, "**আপনি সৌভাগ্যবান, যেহেতু আপনি রাসুল (সাঃ)-এর সংগে ছিলেন এবং বৃক্ষের নীচে তার (সাঃ) বায়াত গ্রহণ করেছেন**"। বাররা বলেন, "**ভাতিজা তুমি জান না যে, আমরা তাঁর (সাঃ) পরে কি না করেছি**"।[১]

নিশ্চয়ই বাররা ইবনে আজীব সত্যই বলেছেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেশীর ভাগ মানুষই জানে না যে, সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কি কি করেছে?

- কেউ কেউ তাঁর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত হযরত আলী (আঃ)-এর উপর জুলুম করেছেন এবং তাঁকে খেলাফত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।
- কেউ আবার তাঁর (সাঃ) কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমার (সাঃআঃ) উপর জুলুম করেছেন এবং তাঁকে পুঁড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছেন।
- তাঁর খোম্স, উপঢৌকন এবং মীরাসকে কুক্ষিগত করেছেন।
- নবীর (সাঃ) ওসিয়াত অমান্য করেছেন।
- শরীয়াতের হুকুম-আহ্কামকে পরিবর্তন করেছেন।
- নবীর (সাঃ) হাদীস সমূহকে পুঁড়িয়ে দিয়েছেন।
- রাসুল (সাঃ)-এর আহলে বাইতের প্রতি লানত ও গালমন্দ করে তাঁদের কষ্ট দিয়েছেন।
- মুনাফেকী, ফাসেকী করে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর শত্রুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন।

আরো বহু '**বিদআত**' আছে যা তারা রাসুল (সাঃ) ইন্তেকালের পর চালু করেছেন, সেগুলি সাধারণের (আহলে সুন্নাতের) জনগনের নিকটে গোপন করেছেন এবং তারা

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ৬৬, -'**কিতাবুল মাঘাজী**' অধ্যায়।

বসিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "*যতক্ষন পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ না পাঠাই ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জায়গা থেকে নড়বে না, যদিও তোমরা দেখ যে পাখিরা আমাদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে*"। অথচ ইসলামী সৈন্যরা যখন কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল -তখন ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি নারীদেরকে দ্রুতগতিতে পালাতে দেখি, তাদের হাঁটুর নীচে পর্যন্ত খোলা দেখি এবং তারা তাদের জামা-কাপড় সংকুচিত করে নিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের-এর সাথীগণ '**গনীমত**' '**গনীমত**' বলে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং বলে যে, '*তোমাদের সেনারা বিজয় অর্জন করেছে, এখন আর কি দেখছো*'? আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বলেন, '*তোমরা কি রাসুল (সাঃ)-এর কথা ভুলে গেলে*'? তার সঙ্গী সৈন্যরা বল্লো, '*আল্লাহ্র কসম, আমরা অবশ্যই লোকজনের গনীমতের মাল থেকে নেবই*'। অতঃপর তারা যখন কাফেরদের নিকটবর্তী হলো তখন তারা পাল্টা আক্রমন চালায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়। **রাসুল (সাঃ) যখন তাদেরকে ডাক দিলেন তখনও আপনার সাথে মাত্র ১২ জন সাহাবী ছিলেন**। (রাবী বলেন) উক্ত যুদ্ধে আমাদের ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়।[১]

ইতিহাস বেত্তাগণ বয়ান করেন যে, এই যুদ্ধে রাসুল (সাঃ)-এর সঙ্গে ১০০০ সাহাবী শরীক হয়েছিলেন। সবাই আল্লাহ্র পথে জিহাদের আকাংখা এবং বদর যুদ্ধে বিজয়ের স্পৃহা নিয়েই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তারা রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য করায় চরম পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাদেরই কারণে ৭০ জন সাহাবী নিহত হন। শহীদদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন রাসুল (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামজা (রাঃ)। বুখারী বলেন যে, বাকীরা পালিয়ে যান। নবী (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১২ জন সাহাবী ছিলেন, অন্য সকলে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু বুখারী ব্যতীত অন্যান্য ইতিহাস বেত্তাগণ -রাসুল (সাঃ)-এর পাশে টিকে থাকা সাহাবীদের সংখ্যা ১২ জনের পরিবর্তে মাত্র ০৪ জনের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে হযরত আলী (আঃ) তালিকার শীর্ষে। তিনি সম্মুখ হতে রাসুল (সাঃ)-কে রক্ষা করছিলেন এবং মুশরিকদেরকে তাঁর কাছে ভিড়তে দিচ্ছিলেন না। রাসুল (সাঃ)-এর পিছন দিক থেকে আবু দুজানা, তালহা ও যুবায়ের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিলেন এবং কথিত আছে যে, সোহাইল ইবনে হানিফও সংগে ছিলেন।

এই সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা রাসুল (সাঃ)-এর ঐ কথা সহজেই বুঝতে পারি যে, "**আমি এদের মাঝে কাউকে দৃঢ় রূপে পাই না**"। (এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ পরেই আলোচনা হবে)।

অথচ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীদেরকে আল্লাহ্ দোজখের আগুনের ভয় দেখিয়ে বলেছেন ঃ "**হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৩৬, -'**কিতাবুল জিহাদ**' অধ্যায়।

না হওয়া পর্যন্ত রাসুল (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। **উল্লেখ্য এমন লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন।**

যদি কেহ সাহাবাদের ঘটানাবলী ও খবরা-খবর গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে তাহলে তাদের কার্য-কলাপ দেখে দাঁত দিয়ে আংগুল কামড়াবে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে তারা জুমআর নামাজ থেকে বেশ কয়েকবার পলায়ন করেছে। যার কারণেই তো আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে বলেছেন, **"কুল মা ইন্দাল্লাহি খাইরুম মিনাল্লাহওয়ে ওয়া মিনাত্তিজারাহ্"** অর্থাৎ **'যখন তাহারা দেখিল ব্যবসায় কৌতুক তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল'**। [১]

সুধী পাঠকমন্ডলী! সম্মানিত সাহাবাদের নিকট জুমআর নামাজের গুরুত্ব বর্তমান যুগের মুসলমানদের চেয়ে বেশী ছিল না। যার তুলনা আপনি নিম্নের রেওয়ায়েত দ্বারা করতে পারেন ঃ

বুখারী সোহাইল ইবনে সাঈদ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ আমরা জুমআর দিনে চিত্তবিনোদন করছিলাম। আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ছিল। আমরা যে ঘাসটি বুধবারে রোপন করতাম, ঐ বৃদ্ধটি তার অভ্যাসবশতঃ সেই ঘাসের শিকড় ডেগচীর মধ্যে ফেলে দিত এবং তার সাথে কিছু যবের দানাও ফেলে দিত। এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে বৃদ্ধার মুখে আমি এতটুকুই শুনেছি যে, এতে কোন চর্বি নাই আর না তেল নামক কোন জিনিষ আছে। আমরা যখন জুমআর নামাজ পড়ে তার কাছে গেলাম তখন সে উক্ত জিনিষই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করল। এই কারণে আমরা জুমআর দিনে চিত্তবিনোদনে বের হতাম। কিন্তু জুমআর নামাজের পূর্বে না ঘুমাতাম আর না কিছু খেতাম।

বাহ্ বাহ্! কি চমৎকার ঐ সমস্ত সাহাবারা, যারা জুমআর দিন রাসুল (সাঃ)-এর জিয়ারত, তাঁর খোৎবা ও নসীহত শ্রবণ, তাঁর নেতৃত্বে নামাজ আদায় করা, পরস্পর সাক্ষাৎ করা এবং জুমআর দিনে ফয়েজ ও বরকত দ্বারা তারা খুশি হতে পারতো না। বরং তাদের সমস্ত খুশি ঐ বিশিষ্ট খাদ্যের জন্য হতো, যা ঐ বৃদ্ধা জুমআর দিনে রান্না করতো। যদি আজকের দিনে কোন মুসলমান বলে যে, জুমআর দিনে খাদ্যই তার আনন্দের মূল কারণ, তাহলে তাকে অভাগা বলা হবে।

আমরা যখন আরো সন্ধান চালাবো, খোজ-খবর নিব তখন জানা যাবে যে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে কোরআন প্রশংসা করেছে যাদের সংখ্যা মাত্র ১২, যারা নামাজ ছেড়ে আনন্দ ফূর্তির জন্য পালিয়ে যায়নি এবং এরাই সেই ব্যক্তি যারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে ছিলেন এবং বাকীরা পিছন থেকে পালিয়ে যায়।

বুখারী, বাররা ইবনে আজীব হতে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ ওহুদ যুদ্ধে রসুল (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের-এর নেতৃত্বে ৫০ জন লোককে একটি টিলার উপর পাহারায়

---

১ সূরা জুমু'আ ঃ ১১

কখ্‌খোন না! তারা তওবা তো করেন নাই বরং **'হুনাইনের যুদ্ধে'** এর চেয়েও বড় অপরাধ করেছেন। এ যুদ্ধটি নবীর (সাঃ) জীবনের শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছে। ইতিহাস বেত্তারা বলেন, এই যুদ্ধে ১২,০০০ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এতো বড় সংখ্যা থাকা সত্বেও নিজেদের অভ্যাস বশতঃ রাসুল (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌র দুশমন মুশরিকদের আক্রমনের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যান এবং রাসুল (সাঃ)-এর সংগে বনী হাশিমের কেবল মাত্র ৯/১০ জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এখানেও হযরত আলী (আঃ)-ই প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন -এ সম্পর্কে ইয়াকুবী এবং অন্যান্য ইতিহাস বেত্তাগণও লিখেছেন।[১]

'ওহুদ যুদ্ধ' থেকে তাদের পলায়ন যদি **'জঘন্য অপরাধ'** হয়ে থাকে তাহলে হুনাইনের যুদ্ধ হতে তাদের পলায়নকে **'জঘন্যতম অপরাধ'** বলা হবে। কারণ ওহুদ যুদ্ধে রাসুল (সাঃ)-এর পাশে মাত্র ৪ জন ধৈর্যশীল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ প্রতি ২৫০ জনের মধ্য হতে একজন। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধে ১২ হাজার মুসলমানের মধ্য হতে মাত্র ১০ জন সাহাবী নবীর (সাঃ) পাশে উপস্থিত ছিলেন বাকী সবাই পলায়ন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতি ১২০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন।

ওহুদের যুদ্ধ যদিও ইসলামের প্রথম দিকে সংঘটিত হয়েছিল। তখন মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল এবং যুগটিও জাহেলিয়াতের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধ ৮ম হিজরী অর্থাৎ নবুয়াতের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারপর নবী (সাঃ) মাত্র ২ বৎসর বেঁচে ছিলেন। অতএব, এতো বিপুল সংখ্যা এবং লোকবল থাকা সত্বেও এমন কি মুসিবত এসে হাজির হলো যে তারা রাসুল (সাঃ)-কে শত্রুদের বেষ্টনীতে ফেলে রেখে এমন ভাবে পলায়ন করেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর জীবনেরও কোন চিন্তা করেননি। কোরআন মজিদ তাদের এই নীচ কর্মকান্ড এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকে বিস্ত ারিত বয়ান করেছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমরাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফিরদের কর্মফল"**।[২]

আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন যে, **"আমি আমার রাসুল (সাঃ) এবং ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি শান্তি বর্ষন করে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেছি, তারপর ফেরেশ্‌তাদের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছি এবং তারা মুখোমুখি যুদ্ধ করে কাফিরদের উপর বিজয় অর্জন করলো"**। সুতরাং ঐ মুরতাদ লোকদের প্রয়োজন নাই যারা মৃত্যু ভয়ে শত্রুর সম্মুখ থেকে পলায়ন করে এবং এভাবে তারা আল্লাহ্‌ ও রাসুল

---

১ মাহমুদ আক্কাস -আক্কাদে আবক্করিয়াহ্‌ খালিদ ঃ পৃঃ ৬৮

২ সূরা তাওবা ঃ ২৫-২৬

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না; সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল"। [১]

সুতরাং ঐসমস্ত সাহাবাদের মান-মর্যাদা কোথায়, যারা খেল-তামাশা ও ব্যবসার জন্য নামায ফেলে ছুটে যান এবং মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে রাসুল (সাঃ)-কে দুশমনদের আক্রমনের মাঝে ফেলে রেখে পলায়ন করেন। এ দুই সময়ই সাহাবারা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যান এবং রাসুল (সাঃ)-এর সাথে খুব বেশী ১২ জন টিকে থাকেন -**হে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা! ঐ সাহাবারা কোথায়?**

হতে পারে সত্যসন্ধানীগণ এই ঘটনাগুলো অধ্যয়নকালে খুবই হালকাভাবে দেখেন এবং চিন্তা করেন যে, এরূপ হওয়া কি কখনও সম্ভব? আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু সাহাবারা অনুরূপ ঘটনা যদি পুনঃরায় না ঘটিয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো ক্ষমার প্রশ্ন আছে।

অসম্ভব ব্যাপার! নিঃসন্দেহে কোরআন মজিদ এ ধরণের নীচ প্রকৃতির কর্মকান্ডের কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে। **'তাফসীর-এ-তাবারী'**-তে এভাবেই লিখিত আছে এবং একই বিষয় বুখারীও তার ৫ম খন্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ পাক **'ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্র'** থেকে তাদের পলায়নকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ **"আল্লাহ্ তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিল, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারাও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না, আর রাসূল তোমাদিগকে পিছন দিকে হইতে আহ্বান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদিগকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত"।** [২]

এই আয়াত সমূহ **'ওহুদ যুদ্ধে'**-র পরে নাযিল হয়েছে। আর ঐ সময় এই পরাজয়ের কারণ হলো, দুনিয়ার মালের প্রতি লোভ লালসা। তারা যখন দেখলো যে নারীরা তাদের পোষাক এমনভাবে সংকুচিত করে পালাচ্ছে যে তাদের হাটুর নীচ পর্যন্ত উস্মুক্ত হয়ে পড়েছে, যেমনটি বুখারী লিখেছেন এবং কোরআনের দৃষ্টিতে তারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করেছেন। **সাহাবারা কি এই ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দিয়েছেন? আর এটাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্‌র দরবারে 'তওবা ইস্তিগফার' করেছিলেন কি? এবং পরবর্তীতে অনুরূপ ঘটনা কি আর ঘটান নি?**

---

১ সূরা আনফাল ঃ ১৫-১৬

২ আলে-ইমরান ঃ ১৫৩

দিয়েছিলেন যে, **"আসলে ইহা আল্লাহ্‌র হুকুমেই সংঘটিত হয়েছে"**। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে, **স্বয়ং আল্লাহ্ কি উমরকে (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন? নাকি আল্লাহ্ পাক তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থেকে ধৈর্য এবং সাহসের সাথে টিকে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন?** আল্লাহ্ তাকে এবং তার সংগী-সাথীদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন ঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না"**। [১] অথচ তারা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ লংঘন করেছিলেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাক তাকে এবং তার সংগীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না পালানোর জন্য এভাবে অংগীকার নিয়েছিলেন ঃ **"ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে"**। [২]

হায় আফসোস! কিভাবে উমর (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছেন এবং এই পালিয়ে বেড়ানোকে আল্লাহ্‌র হুকুম বলে ধোকা দিচ্ছেন? এই সমস্ত স্পষ্ট আয়াত সমূহ কি তাদের (আহলে সুন্নাতের) দৃষ্টি গোচর হয় না? নাকি তাদের হৃদয়ের উপর মোহর মারা হয়েগেছে?

এই মুহূর্তে আমি উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। বরং এই বিষয়ের উপর আলাদা একটি অধ্যায় রচনা করব। কিন্তু বুখারীর এই হাদীসটি আরো ব্যাখ্যার দাবী রাখে। শুধু একটি হাদীস মনে করে হালকা ভাবে চোখ বোলালে চলবে না। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, বুখারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রচুর সংখ্যক সাহাবী থাকা সত্বেও তারা হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। আর যিনি এই বিষয়টিকে ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে অধ্যয়ন করবেন, আরো অনেক আশ্চর্য ঘটনাবলী তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আর বেশীরভাগ সাহাবারা যখন আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য করতেন না, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বেকার আলোচনালয় লক্ষ্য করেছি -তাহলে রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর হুকুম অমান্য করা কোন বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর পর তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম সমূহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন এবং তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। এ সম্পর্কে এবার কিছু নমুনা পেশ করা হচ্ছে ।

(সাঃ)-এর অবাধ্য হয়ে গেল, আর যখনই আল্লাহ্ তাদের পরীক্ষা নিয়েছেন তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

এরচেয়ে বেশী ব্যাখ্যা দানের চেয়ে এটাই শ্রেয় হবে যে, হুনাইন যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ বুখারী যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেটাই হুবহু তুলে ধরি ঃ বুখারী, আল্লাহ্‌র ঐ বানী সম্পর্কে (**ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন ইযা আ'জাবাতকুম কাসারাতকুম ফালাম তুগনে আনকুম শাইয়া**) ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ *হুনাইন যুদ্ধে আমি যখন একজন মুসলমানকে একজন মুশরেকের সাথে যুদ্ধরত দেখলাম এবং ঐ মুশরেকের পিছনে আর একজন মুশরেক লুকিয়ে ছিল, সে ধোকা দিয়ে মুসলমানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমি দ্রুত ঐ ধোকাবাজের দিকে অগ্রসর হলাম -সে আমাকে আঘাত করার জন্য হাত উত্তোলন করলো, আমিও তার হাতের উপর আঘাত করি এবং তার হাত কেটে যায়। কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত কঠিনভাবে চাপ সৃষ্টি করল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যখন তার বেষ্টনিতে একটু ঢিল পড়লো তখন আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে তারপর তাকে হত্যা করি। পরে মুসলমানরা পরাজিত হয়, তখন আমিও পরাজিত হই। উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, "**লোকজনার কি হয়েছে**"? তখন উমর বলেন, "**এটা তো আল্লাহ্‌রই হুকুম**"।* [১]

আল্লাহ্‌র কসম, হযরত উমরের (রাঃ) প্রতি আমি অনেক আশ্চর্যানিত হই। কারণ তিনি আহলে সুন্নাতের কাছে সমস্ত সাহাবাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত -যদিও তিনি অন্যান্য সাহাবাদের তুলনায় বীর ছিলেন না -আহলে সুন্নাতগণ রেওয়ায়েত করেন যে, **'আল্লাহ্ উমরের (রাঃ) মাধ্যমে ইসলামের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করা মাত্র মুসলমানরা প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার শুরু করে দেয়'**। অথচ সত্য ও প্রকৃত ইতিহাস আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, **তিনি 'ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্র' থেকে পলায়ন করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে 'খায়বার' অভিযানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে অ-সফল হয়ে ফেরৎ এসেছিলেন, সৈন্যরা তাকে (উমর) এবং তার সৈন্যদলকে ভীতু বলে আখ্যায়িত করেছেন**। [২]

উমর (রাঃ) হুনাইন যুদ্ধের অন্যান্য ফেরারীদের সাথেই পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম পলায়ন করেছিলেন এবং তাকে পালাতে দেখে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করেছিলেন। কারণ (আহলে সুন্নাতের কথা মোতাবেক তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর) যেখানে বীরশ্রেষ্ঠই পালিয়ে যাচ্ছে সেখানে আর কে দাঁড়াতে পারে!! সেকারনেই পলায়নকারীদের মধ্য হতে আবু কোতাদাহ্-কে উমরের (রাঃ) সাথে কথা বলতে দেখা যায় -ক্বোতাদাহ্ আশ্চর্য হয়ে উমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন যে, "**লোকজনের কি হয়েছে!**"। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন ও রাসুল (সাঃ)-কে শত্রুদের বেষ্টনীতে ছেড়ে দেয়ার মত অপরাধই করেন নি, বরং তিনি আবু ক্বোতাদাহ্-কে এই কথা বলে প্রবোধ

৬

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ১০১, -**'কিতাবুল মাগাযী'** অধ্যায়।

২ **মুসতাদরাক আল হাকিম**, খঃ ৩, পৃঃ ৩৭ এবং যাহবী তার **তালখীসে** লিখেছেন।

যখন উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাঃ) সাহাবাদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবাদের সঙ্গে আলী (আঃ)-কে গণ্য করেননি। কারণ তিনি রাসুল (সাঃ)-এর এতোই নিকটবর্তী ছিলেন ঠিক যেমন মুসার (আঃ) নিকট হারুন (আঃ)। আপনারা কি লক্ষ্য করেন না যে, **'রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি যখন দরূদ পাঠ করা হয় তখন তাঁর আলকে (বংশধরকে) সংযুক্ত না করলে দরূদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়'**। আর এতে কারোর দ্বিমত নাই যে, আলী (আঃ) হলেন আলে মুহাম্মদের সরদার। সুতরাং আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাদের প্রতি দরূদ পাঠানো বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু দরূদের মধ্যে আলী ইবনে আবি তালিব এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র যিকির আসে।

দ্বিতীয়ত ঃ রাসুল (সাঃ) সব সময়ই তাঁর ভাই আলী (আঃ)-কে হাদীয়ার মধ্যে শরীক করতেন। যেমন **'বিদায় হজ্জ'** এই ব্যাপারে একটি জলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে। হযরত আলী (আঃ) যখন **'ইয়ামেন'** হতে হজ্জের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, **"হে আলী! তুমি কোন নিয়্যতে এহরাম বেঁধেছ"**? আলী (আঃ) উত্তর দিলেন, **"রাসুল (সাঃ)-এর যে নিয়্যত আমারও একই নিয়্যত"**। অতঃপর রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ)-কে নিজের হাদীয়ায় শরীক করেন। এই ঘটনাটি প্রত্যেক মুহাদ্দেসীন ও ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন। সুতরাং **'হুদায়বিয়ার সন্ধি'**-র দিনেও আলী (আঃ) রাসুল (সাঃ)-এর শরীক ছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ হুদায়বিয়াতে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আলীই (আঃ) সন্ধি লিখেছিলেন এবং তিনি তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তেও রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে কোন আপত্তি করেন নি; না হুদায়বিয়ার সন্ধি আর না অন্য কোন বিষয়ে। আর না ইতিহাসের কোন পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় যে, আলী (আঃ) রাসুল (সাঃ)-এর কোন আদেশ পালন করতে সামান্যতম বিলম্ব করেছেন বা কোন হুকুম অমান্য করেছেন। কখ্খনোই না! আবার এক মুহূর্তের জন্যও কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাসুল (সাঃ)-কে একা ফেলে রেখে পলায়ন করেছেন। বরং প্রতি মুহূর্তেই রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি নিজেকে কুরবান (উৎসর্গ) করে দিতেন। সারসংক্ষেপ এটাই যে, আলী (আঃ) ছিলেন রাসুল (সাঃ)-এর নফ্‌স। সেকারণেই রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, **"আমি ও আলী ব্যতীত আর কেউ মসজিদে জুনুব অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে না"**। [১]

আমি আমার বেশীর ভাগ বন্ধুদের এই কথা স্বীকার করাতে সফল হয়েছি যে, **"হযরত আলী (আঃ) তাঁর জীবনের একটি মুহূর্তেও রাসুল (সাঃ)-এর অবাধ্য হোন নি"**।

বুখারী তাঁর সহীহ্-র ৮ম খন্ডের **'কিতবিুল এ'তেসাম বিল কিতাব ওয়াল সুন্নাহ্'**-অধ্যায়ে আব্দুলা ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন যে ঃ রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলা তখন সাহাবীদের দ্বারা আপনার গৃহ পরিপূর্ণ

---

১ **সহীহ্ তিরমিজি**, খঃ ৫, পৃঃ ৩০৪, **তারিখুল খোলাফা**, পৃঃ ১৭৩, **সোওয়ায়েকে মুহরেকা** -ইবনে হাজর, পৃঃ ১২১

সাহাবা এবং রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য ঃ

আমরা নবী (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত আদেশ নিষেধ দিয়ে শুরু করছি, যেগুলি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবাদের প্রতি জারি করেন, অথচ সাহাবারা সেগুলি অমান্য এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন।

আমরা সংক্ষিপ্ততার কারণে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য সহীহ্ হাদীস গ্রন্থাবলীকে চোখের আড়ালে রেখে কেবল বুখারীর রেওয়ায়েতগুলির উপর ইতি টানবো। যদিও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাদিতে প্রচুর রেওয়ায়েত আছে এবং আরো স্পষ্টাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

বুখারী তার সহীহ্র ৩য় খন্ডে **'হুদায়বিয়া সন্ধির'** ঘটনা এবং রাসুল (সাঃ)-এর সাথে উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) বে-আদবীমূলক কথা-বার্তার পরেও সন্ধির পক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর দৃঢ়তা দেখে তিনি সন্দেহ এতো দূর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল যে তিনি (উমর) এক পর্যায়ে বলেই ফেল্লেন, **"আপনি কি আল্লাহ্র নবী নন"?** এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে ঃ নবী (সাঃ) যখন সন্ধী সম্পাদন করার পর সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, **"ওঠো, স্ব স্ব কোরবানী দাও এবং মাথার চুল মুন্ডন করো"**। বুখারী লিখেছেন যে ঃ সাহাবাদের মধ্য হতে কেহই উঠলোনা, এমনকি উক্ত নির্দেশ রাসুল (সাঃ) তিন বার উচ্চারণ করেন, তার পরেও কেউ ওঠলো না। তারপর তিনি (সাঃ) উম্মে সালমার কাছে এসে সাহাবীদের এই উদ্ধত্য প্রদর্শণের কথা জানান।[১]

সুধী পাঠকমন্ডলী! আপনারা কি নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের প্রতি সাহাবাদের হটকারিতা দেখে আশ্চর্য বোধ করছেন না? নবী (সাঃ) যদিও তিনবার নির্দেশটি দিয়েছিলেন অথচ কেহই তাঁর নির্দেশ পালন করেন নি?

আমি এই স্থানে আমার ঐ কথোপকথন তুলে ধরা জরুরী মনে করছি, যেটা আমার বই **"অবশেষে আমি সত্য পেলাম"** প্রকাশ হওয়ার পর আমার এবং তিউনিসের কিছু ওলামাদের মাঝে হয়েছিল। কারণ তারা **'হুদায়বিয়াহ্ সন্ধি'** সম্পর্কে আমার মন্তব্য পাঠ করে ছিলেন। তারা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ঐ কথার প্রতি যে, **"সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করেছেন"** -এভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, **"সাহাবাদের মধ্যে তো হযরত আলীও অন্তর্ভূক্ত"**। সুতরাং তিনিও তো রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করেন নি। আমি তাদের জবাবে বলেছিলাম ঃ

প্রথমত ঃ আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত নন। কারণ তিনি রাসুল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই, তাঁর কন্যার স্বামী এবং তাঁর সন্তানদের পিতা। রাসুল (সাঃ)-এর সাথে একদিকে আলী (আঃ), অপর দিকে অন্যান্য সাহাবাগণ। সুতরাং রাবী

---

১ **সহীহ্ বুখারী,** খঃ ৩, পৃঃ ১৮২

আমরা যদি ঐ দৃশ্যপট কল্পনা করি, যখন রাসুল (সাঃ)-এর গৃহে বিভেদ সৃষ্টি হলো, কথা কাটা-কাটি হলো এবং কেমন ধরণের বে-আদবী হয়েছিল, যদিও ইতিহাসের বইগুলিতে সেটা বর্ণনা করা হয়েছে, তবে ঐ দৃশ্যপটের সামান্য একটা ঝলক মাত্র। (কারণ সত্য অবস্থা দেখলেই বুঝা যায়) উদাহরণ স্বরূপ বই-পুস্তকে আমরা মূসা (আঃ)-এর ঘটানাবলী অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনাবলীকে যদি ছায়াছবির মত করে দেখানো হয় তাহলে আরো স্পষ্ট হতো (শোনা কথা আর স্বচক্ষে দেখা এক নয়)।

বুখারী তার সহীহ্-র ৭ম খন্ডের **'কিতাবুল আদব'**-এ রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ রাসুল (সাঃ) একটি পাটী তৈরী করেন এবং সেটার উপর নামাজের জন্য দাঁড়ালে অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সাথে নামাজ আদায় করলো। রাত্রে তারা সবাই আবার জমায়েত হলো, কিন্তু রাসুল (সাঃ) তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন বিধায় নিজ গৃহেই অবস্থান করে থাকলেন এবং তাদের সাথে যোগ দিলেন না। কিন্তু তারা চেঁচামেচী শুরু করে দেয় এবং রাসুল (সাঃ)-এর দরজায় আঘাত করতে থাকে। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বাহিরে এসে বলেন, **"তোমরা নিজেদের বিদআতের উপর টিকে আছো -মনে হচ্ছে তোমরা শীঘ্রই উক্ত নামাজকে ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করবে -ওয়াজিব নামাজ ব্যতীরেকে অন্যান্য নামাজের জন্য ঘরই হচ্ছে উত্তম জায়গা"**। [১]

আফসোস উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রসুল (সাঃ)-এর হুকুম অমান্য করে নিজের খেলাফত আমলে নফল নামাজের জন্য লোজকনকে জমায়েত করে বলেন যে, **'ইহা একটি বিদআত, তবে বিদআতে হাসানাহ্'**। [২]

আর এই বিদআতে ঐ সমস্ত সাহাবাগণ উমরের (রাঃ) আনুগত্য করেন, যারা উমরের (রাঃ) সিদ্ধান্তকেই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করতেন এবং তার সমস্ত কথা ও কাজে সমর্থন যোগাতেন। কিন্তু হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) এবং আহলে বাইতগণ, যারা একমাত্র রাসুল (সাঃ)-এর আদেশের উপর আমল করতেন -তারা উমরের (রাঃ) এই 'বিদআত'-এর বিরোধিতা করেন। **আর প্রত্যেক বিদআত যখন গোমরাহী এবং জাহান্নামের কারণ বলে বিবেচিত, তাহলে আপনারা (আহলে সুন্নাতগণ) ঐ বিদআত সম্পর্কে কি বলবেন -যেগুলো রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশের বিপক্ষে জন্ম লাভ করেছে?**

বুখারী তার সহীহ্-র ৫ম খন্ডের **'কিতাবুল মাগাজীত'**-এ ইবনে উমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে উমর বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) হযরত উসামাকে একটি দলের নেতা নিযুক্ত করলেন, লোকজন তার নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি জানায়। তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, **"তোমরা যদি তার নেতৃত্বের প্রতি সন্তুষ্ট নও, তাহলে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ৯৯ ও খঃ ২, পৃঃ ২৫২ এবং খঃ ৪, পৃঃ ১৬৮

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ২৫২ -**'কিতাবে সালাতুত তারাবীহ'** অধ্যায়।

ছিল, তাদের মাঝে উমর ইবনে খাত্তাবও (রাঃ) ছিলেন। রাসুল (সাঃ) বলেন, "*লেখার উপকরণ নিয়ে এসো, একটি ওসিয়াত লিখে দেই যাতে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না*"। উমর বলেন, "*নিঃসন্দেহে নবীর মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তোমাদের মাঝে তো কোরআন আছেই (আমাদের কাছে কোরআন তো আছেই), আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট*"। এই কথা শুনে উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হলো এবং চেঁচামেচী তুংগে উঠলো। কেউ বললো, '*নবী (সাঃ)-কে ওসিয়াত লিখতে দাও, যেন আমরা গোমরাহ না হয়ে পড়ি*'। আবার কেউ কেউ উমরের কথার সাথে তাল মিলাল। নবীর (সাঃ) সম্মুখে যখন হট্টগোল তুংগে উঠে গেল তখন তিনি (সাঃ) বলেন, "*তোমরা আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাও*"। ইবনে আব্বাস বলেন যে, এটাই হলো সবচেয়ে বড় মুসিবাত যে, রাসুল (সাঃ)-কে ঐ ওসিয়াতটি লিখতে দেয়া হয়নি।[১]

সাহাবাদের উদ্দেশ্যে নবীর (সাঃ) এটাই ছিল দ্বিতীয় নির্দেশ যেটাকে সাহাবারা তাঁর সম্মুখেই অস্বীকার করে নবীর (সাঃ) অসম্মান করেছিলেন।

এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নবীর (সাঃ) লেখার উপকরন নিয়ে আসার নির্দেশকে দুঃসাহসিকতার সাথে নিষেধ করেন এবং বলেন (মায়াজালাহ্), "**রাসুল প্রলাপ বকছেন**"।[২]

কিন্তু বুখারী এই কথাটিকে খুবই চতুরতার সাথে পরিবর্তন করে ফেলেছন এবং "**হিযইয়ান**" (প্রলাপ বকা) শব্দটিকে "**সালাবাল ওয়াজাআ**" (মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্ত) দ্বারা বদলে দিয়েছেন, কেননা এই বাক্যের উচ্চারণকারী হলেন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, বুখারী সাহেব রেওয়ায়েত হতে যেখানে উমরের (রাঃ) নামকে গায়েব করেছেন সেখানে '**জামায়ার সীগা**' (বহু বচন) ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ লোকেরা বললো, "**রাসুল প্রলাপ বকছেন**"। হাদীস বর্ণনায় এটাই হলো বুখারী সাহেবের মারাত্মক বৈশিষ্ট। (এই ব্যাপারে শীঘ্রই আমরা একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করবো)।

যাহোক, অনেক হাদীস বেত্তা ও ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর সামনে বলেছেন, "**রসুল প্রলাপ বকছেন**" (মায়াজালাহ্) এবং বেশীরভাগ সাহাবাই তার আনুগত্য করে নবীর (সাঃ) সামনে সেই কথাই বলেন যা উমর (রাঃ) বলেছিলেন।

---

১ **সহীহ্ বুখারী,** খঃ ৮, পৃঃ ১৬১, খঃ ১, পৃঃ ৩৭ এবং খঃ ৫, পৃঃ ১৩৮

২ [**অনুবাদকের মন্তব্য ঃ** অথচ রাসুল (সাঃ) তাদেরকে যখন তাঁর সম্মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন, তখন সবাই সুর সুর করে বেরিয়ে গেল ... কই তখন তো রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাকে উমর (রাঃ) বা তার সংগী-সাথীরা প্রলাপ বলে মনে করেন নি? রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাকে একজন সুস্থ্য মানুষের কথা মনে করেই তো গৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশটি সাথে সাথেই পালন করলেন। রাসুল (সাঃ)-এর প্রথম কথা যদি প্রলাপ হবে তাহলে পরের কথাটি প্রলাপ হবে না কেন? সুতরাং তাদের তো উচিৎ ছিল, রাসুল (সাঃ)-এর পরের কথাটিকেও প্রলাপ বলে, অন্ততঃ তাঁকে ভালবাসার কারণে তাঁর সম্মুখে উপস্থিথ থেকে তাঁর মৃত্যু অবলোকন করা। তাই নয় কি?]

নারীর সাথে বিবাহ্‌-কেও হারাম গণ্য করতেন যেন তারা ঐ নারীদের সাথে সহবাস না করেন। তারা ঐ কাজগুলি থেকে বিরত থাকতেন যে কাজ স্বয়ং রাসুল (সাঃ) আঞ্জাম দিয়েছেন। যেমনটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বুখারী তার সহীহ্‌র ৫ম খন্ডের **'কিতাবুল মাগাজীত'**-এ জুহ্‌রী হতে, তিনি সালেম হতে এবং তিনি তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) খালিদ বিন ওয়ালিদকে বনী জাযিমা গোত্রের নিকট পাঠালেন যেন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা **'আসলামনা'** (আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম) বলা পছন্দ করেনি বরং বল্লো, **"আমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়েছি"**। অতঃপর খালিদ তাদের কিছু লোককে হত্যা করে দেন, অনেককে বন্দী করেন এবং আমাদের প্রত্যেকের হাওয়ালায় একটি করে কয়েদী দিলেন। এমনকি একদিন খালিদ ঐ বন্দীদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন -তখন আমি বল্লাম, **"আল্লাহ্‌র কসম আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না"**। আর না আমার সংগীরা তাদের বন্দীকে হত্যা করল। অতঃপর আমরা রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসুল (সাঃ) তখন নিজের হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বলেন, **"পারওয়ারদিগার, আমি খালিদের এই জুলুম থেকে মুক্ত"**। [১]

ইতিহাসবিদগণ উক্ত ঘটনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যা, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং তার আনুগত্যকারী সংগীরা কেন এই অপরাধ করলো? আর **"মুসলমানদের হত্যা করা হারাম"**, রাসুল (সাঃ)-এর এই হুকুমকে মান্য করেনি। ঐ হত্যা হলো সবচাইতে বড় অপরাধ যাঁর মাধ্যমে নেক বান্দাদের রক্ত ঝরানো হয়ে থাকে। **নবী (সাঃ) তো ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন, নাকি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?**

কিন্তু খালিদের উপর জাহেলিয়াত যুগের শত্রুতা এবং শয়তান ভর করেছিল। তার কারণ হলো যে বনী জাযিমা জাহেলিয়াতের যুগে খালিদের চাচা আল ফাকা ইবনুল মুগীরাহকে হত্যা করেছিল, সে কারণেই খালিদ তাদেরকে ধোকা দেন এবং নিজ বাহিনীর লোকজনকে বলেন যে, **"তোমরা অস্ত্র রেখে দাও কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে"**। তারপর হুকুম দিলেন যে, সবার হাত পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেল এবং তাদের মধ্য হতে অনেককেই হত্যা করলেন।

কিছু সাহাবী যখন খালিদের এই শত্রুতাকে বুঝতে পারলেন তখন তারা খালিদের বাহিনী থেকে পালিয়ে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তখন রাসুল (সাঃ) খালিদের এই অপকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং আলী (আঃ)-কে পাঠিয়ে তাদের জান-মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করেন।

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ১০৭ এবং খঃ ৮, পৃঃ ১১৮

প্রতিও সন্তুষ্ট ছিলে না -আল্লাহ্‌র কসম তারাই নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং তাদের পরে এই (উসামা) আমার নিকট প্রিয়"। [১]

উক্ত ঘটনাকে ইতিহাসবিদগণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-কে এতো পরিমানে রাগান্বিত করেছিলেন যে, তিনি (সাঃ) তাঁর বিরোধিতাকারীদের প্রতি লানত করেছেন। উসামা হচ্ছে সেই যুবক নেতা যার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বৎসর। রাসুল (সাঃ) তাকে যে বাহিনীর নেতা বানিয়েছিলেন সেই বাহিনীতে আবু বকর, উমর, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং কোরায়েশের আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও আছেন। কিন্তু ঐ বাহিনীতে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) ছিলেন না, আর না তাঁর অনুসারীদের মধ্য হতে কাউকে রাসুল (সাঃ) ঐ বাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বুখারী সাহেব সব সময়ই **'সাহাবায়ে সুফ্‌ফাদের'** সম্মান রক্ষা করার জন্যে ঘটনাবলীকে সংক্ষিপ্তাকারে এবং হাদীসগুলিতে কাটছাঁট করে লিখে থাকেন। এতদসত্ত্বেও তার লিখিত হাদীস সমূহে অনেক কিছুই নিহিত আছে যা সত্য সন্ধানীদের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

বুখারী তার সহীহ্‌-র ২য় খন্ডের **'কিতাবুস সাওম'**-এ আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) রোজা অবস্থায় সহবাস হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে একজন বলে উঠলো, **"ইয়া রাসুল্লাহ্! আপনিও তো সহবাস করেন"**। রাসুল (সাঃ) তখন বলেন, **"তোমাদের মাঝে আমার মত কে আছে? আমাকে আমার প্রতিপালক পরিতৃপ্ত করেছেন"**। সাহাবারা যখন সহবাস হতে বিরত থাকাকে অস্বীকার করে বসেন এবং প্রায়শই সহবাস হতে থাকে -এবং হতে হতে একসময় সহবাস হালাল হয়ে গেল। তারা যদি এভাবেই করতে থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে ঘৃণা করতাম।

ঐ সমস্ত সাহাবাদের ব্যবহার কি চমৎকার ছিল! রাসুল (সাঃ) তাদের কোন কিছু করা থেকে নিষেধ করলেও তারা তা থেকে তারা কিছুতেই বিরত থাকতেন না। রাসুল (সাঃ) বার বার নিষেধ করতেন কিন্তু তারা শুনতোই না। তারা কি আল্লাহ্‌র এই বাক্যটি পাঠ করিনি ঃ **"রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করে নাও এবং যা থেকে নিষেধ করেন সেটা বর্জন কর, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠিন আযাব দানকারী"**।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করার জন্য কঠিন আযাবের হুমকি দেয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু সাহাবা আল্লাহ্ কর্তৃক আযাবের হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞাকে কোন আমলই দিতেন না। তাদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য যখন বিদ্যমান ছিলই তখন তাদের মুনাফেকীতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও তারা প্রকাশ্যে বেশী বেশী নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন, দ্বীনের হুকুম আহ্‌কামের প্রতি এতই কঠিন ছিলন যে, নিজেদের

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ৮৪

আউফ তো পরিস্কার ভাষায় বলেই ফেল্লেন, **"খালিদ ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে হত্যা করেছে -যেন তার চাচার প্রতিশোধ নিতে পারে"**।

এটাই হচ্ছে আক্কাদ সাহেবের ভাষ্য যা তিনি তার বই **"আবক্বারিয়ায়ে খালিদ"**-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আক্কাদও আহলে সুন্নাতের আন্যান্য চিন্তাবিদগনের মত উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর খালিদকে নির্দোশ বলেছেন। কিন্তু তার এই কথায় কোন জোর নাই, আর না বুদ্ধি-বিবেক তার নির্দোশ হওয়াকে গ্রহন করে। আক্কাদ সাহেবের কাছে **'আবক্বারিয়াতুল খালিদ'** লেখা ছাড়া অন্য কোন বিকল্পই ছিল না।

অথচ এই ওজরের স্বরুপ **"তার-এ-আনকাবুত"**-এর চাইতে বেশী নয়। যারাই অধ্যয়ন করবে তাদের কাছে এই অযথা পক্ষপাত স্পষ্টাকারে ধরা পড়বে।

তিনি কিভাবে যে খালিদের প্রতি ওজর তুলে ধরেছেন, তা আমাদের জানা নেই। তিনি যখন নিজেই লিখেছেন যে, নবী (সাঃ) খালিদকে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, হত্যা করার জন্য পাঠান নি। আক্কাদ এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, বনী জাযিমাগণ অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু খালিদ যখন তার লোকজনকে অস্ত্র রেখে দিতে বলে এবং বলে যে, **"তারা ঈমান গ্রহণ করেছে"**, তখন বনী জাযিমার লোকেরা তার ধোকাবাজীর শিকার হয়েগেল। আক্কাদ সাহেব ইহাও স্বীকার করেছেন যে, হাজদাম অস্ত্র রাখতে নিষেধ করে নিজ গোত্রের লোকগুলিকে বলেছিল, **"তোমরা খালিদের ধোকাবাজীর শিকার হতে যাচ্ছ। অভিশাপ হোক তোমাদের প্রতি হে বনী জাযিমা, এই খালিদ অস্ত্র রাখানোর পর তোমাদেরকে বন্দী করে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ্‌র কসম আমি কখনোই অস্ত্র রাখব না"**। আক্কাদ সাহেব ইহাও বলেছেন যে, বনী জাযিমাগণ অনুনয় বিনয় করে হাজদামকেও অস্ত্র মুক্ত করেছিল। তাদের এই আচরণ থেকেই তাদের ইসলাম গ্রহণ ও উত্তম নিয়্যতের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সুতরাং রসুল (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং হত্যা যজ্ঞের নির্দেশ দেননি, যে কথাটি জনাব আক্কাদ নিজেই উল্লেখ করেছেন, **তাহলে নবী (সাঃ) হুকুমের বিরোধিতা করার জন্য খালিদের কাছে এমন কি ওজর থাকতে পারে?** আক্কাদ সাহেব এমনই একটি ধাঁধা যার সমাধান করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়!!

আবার বনী জাযিমা যখন অস্ত্র রেখেই দিয়েছিল, নিজেদের ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়েছিল এবং নিজেদের ঐ সংগীকেও মানিয়ে নিয়েছিল যে সংগী অস্ত্র না রাখার জন্য কসম খেয়েছিল **-হে আক্কাদ সাহেব, এই কথা তো আপনিও স্বীকার করেছেন, তাহলে বনী জাযিমাকে ধোকায় ফেলে অস্ত্র মুক্ত করার পর তাদের হত্যা সম্পর্কে খালিদের কাছে কোন ধরণের ওজর আছে?**

আক্কাদ সাহেব ইহাও বলেছেন যে, **'খালিদ প্রথমে হাত বাঁধার নির্দেশ দেয়, তারপর হত্যা করে ফেলে'**। এটা দ্বিতীয় রহস্য -যার সমাধান আপনি (আক্কাদ সাহেব)

উক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানার জন্য আব্বাস মাহমুদুল আক্কাদের **"আবৃক্কারিয়ায়-এ-খালিদ"** নামক বইটি অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট হবে। আক্কাদ উক্ত বইয়ের ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে ঃ "মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সাঃ) গ্রামগুলিকে মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত করার দিকে নজর দিলেন। সেখানে বসবাসকারী গোত্রদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ছোট ছোট বাহিনী পাঠালেন। উক্ত বাহিনীর মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বেও একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন নি। জাহেলিয়াতের যুগে জাযিমা গোত্র অনেক ঝগড়াটে ছিল। তাদেরকে মানুষ **'রক্তপিন্ড'** বলে ডাকতো, তাদের হত্যাজজ্ঞে যারা নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে খালিদের চাচা আল ফাকা ইবনুল মুগীরা, তার চাচাতো ভাই এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফের পিতাও অন্তর্ভূক্ত। এবং বনী সালিম গোত্রের মালিক ইবনে শরীদ ও তার তিন ভাই এবং আরো অনেক গোত্রও অন্তর্ভূক্ত।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন তাদের নিকটবর্তী হল এবং তারাও যখন খবর পেল যে খালিদের সাথে **'বনি সালিম'**ও আছে তখন **'বনী জাযিমা'** অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো এবং খালিদকে সেখানে অবতরণ করতে নিষেধ করে। তখন খালিদ জিজ্ঞাসা করলো, "*তোমরা কি মুসলমান*"? অনেকে বললো, "*হ্যাঁ*", আবার অনেকে বললো, "*আমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছি*"। খালিদ পুনঃরায় বল, "*তোমরা যদি মুসলমান হয়ে থাক তাহলে অস্ত্র কেন ধরে আছো*"? তারা বল, "*আমাদের এবং আরব গোত্রদের মাঝে শত্রুতা আছে এবং আমাদের ভয় হচ্ছিল, তোমরা হয়তো সেই শত্রুপক্ষ হবে তাই আমরা অস্ত্র ধারণ করেছি*"। অতঃপর খালিদ নিজের বাহিনীর লোকজনকে বললো, "*তোমরা অস্ত্র রেখে দাও এরা ইসলাম গ্রহণ করেছে*"। জাযিমাদের মধ্য হতে হাজদাম নামীয় একজন চেঁচিয়ে বললো, "*হে জাযিমার সন্তানেরা, তোমাদের কি হলো? আল্লাহ্‌র কসম, অস্ত্র রাখানোর পর খালিদ তোমাদেরকে বন্দী করবে, তারপর তোমাদের গর্দান নিবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি আমার অস্ত্র কখনোই রাখব না*" -কিন্তু তার দলের লোকজন জোর করে তার অস্ত্রও নামিয়ে রাখে এবং কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তারপর খালিদ তাদেরকে আটক করার নির্দেশ দেয়, অতঃপর হত্যা করার নির্দেশ দেয়। বনি সালিম তার নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে হত্যা করল কিন্তু আনছার ও মোহাজের তার নির্দেশ অমান্য করে বলে, **"রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য পাঠান নি"**। উক্ত ঘটনার সংবাদ যখন নবী (সাঃ) পেলেন তখন নিজ হস্তদ্বয় আকাশ পানে উত্তোলন করে তিন বার বল্লেন, **"পারওয়ারদিগার, খালিদ বিন ওয়ালিদ যা কিছু করেছে তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত"**। অতঃপর তিনি (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে বনী জাযিমার কাছে পাঠিয়ে তাদের জান-মালের ক্ষতিপূরণ দেন।"

এ ঘটনার পর ঐ সমস্ত **'জলিলুল ক্বদর সাহাবা'** যারা উক্ত অভিযানে শরীক ছিলেন বা ছিলেন না তাদের সকলের মাঝে বিতৃষ্ণা জন্ম নেয়। আব্দুর রহমান ইবনে

- আক্কাদ সাহেব কি তার (ইবনে আউফের) চেয়েও বেশী খালিদকে জানেন ও বোঝেন? যিনি খালিদকে এই বলে দোষারোপ করেন যে, "খালিদ নিজের চাচার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সবাইকে হত্যা করেছে"?

আল্লাহ্ পাক এই অন্ধ বিদ্বেষ ও জাহেলিয়াতের বিবাদকে ধ্বংস করুক, যেটা আক্কাদ সাহেবকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তিনি উক্ত ঘটনাকে মাত্র চারটি সারিতে বর্ণনা করেছেন -কিন্তু বুখারী যতটুকু লিখেছেন, তাতেই খালিদের এবং ঐ সমস্ত সাহাবাদের প্রতি লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট, যারা খালিদের নেতৃত্বে নেক মুসলমানদের উপর হত্যা যজ্ঞ চালিয়েছেন। যেমনটি আক্কাদ সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, **'বনী সালিম এই অভিযানে খালিদের আনুগত্য করেছে এবং আন্যান্য আরবরাও তাদের সাথে শরীক ছিল'**। কিন্তু বুখারী খালিদের আনুগত্যকরীদের মধ্যে দুই বা তিন জনকে চিহ্নিত করেছেন এবং তারাও বাহিনী থেকে পালিয়ে এসে নবী (সাঃ)-কে খালিদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। জনাব আক্কাদ, এটা আপনার সাধ্যের বাহিরে যে, এই বিষয়ে আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। কারণ আপনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে **'আনছার'** ও **'মুহাজের'** মিলিয়ে মোট সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন, যারা খালিদের এই হত্যাযজ্ঞতে আনুগত্য করেন নি এবং সবাই বাহিনী ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ঐ কথার প্রতি কোন সত্যসন্ধানী সত্য বলে আস্থা রাখবে না।

কিন্তু আপনি (আক্কাদ সাহেব) নিজের সাহাবাদের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য বিভিন্নভাবে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন পরদা সরিয়ে ফেলার এবং সত্যের স্বরুপকে প্রকাশ করে দেয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।

খালিদ বিন ওয়ালিদের আরও না জানি কত সব জঘন্য অপরাধ আছে, যেগুলি সম্পর্কে ইতিহাস আমাদেরকে অবগত করিয়েছে। বিশেষ করে **'বাত্বাহ'** দিনের ঘটনা -যে দিনে আবু বকর (রাঃ), খালিদকে ঐ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন যার মধ্যে প্রথম সারির সাহাবারা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। উক্ত সময়েও খালিদ, মালিক ইবনে নুওয়ায়রা ও তার বংশের লোকজনকে ধোকা দিয়েছিল। তারা যখন অস্ত্র রেখে দেয় তখন তাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দেয় এবং মজলুম অবস্থায় হত্যা করে ফেলে এবং নিজে উক্ত ঘটনার পর রাতে মালিকের স্ত্রী লায়লা ইরম তামীমের সাথে জেনা করে। অতঃপর উমর (রাঃ) যখন খালিদের কাছ থেকে উক্ত হত্যাকান্ডের জন্য **'কেসাস'** নিতে চাইলেন এবং বল্লেন, **"তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মারবো"**। (তার এই অগ্নিমূর্তি দেখে) আবু বকর (রাঃ) খালিদের পক্ষ অবলম্বন করে উমরকে (রাঃ) বল্লেন, **"খালিদকে কিছুই বল না, কারণ সে এই বলে নতি স্বীকার করেছে যে, তার দ্বারা ভুল হয়েগেছে"**।

এটা হলো আর একটি ঘটনা যার বর্ণনা অনেক লম্বা এবং তার পুনঃরাবৃত্তি করা আরো ঘৃনিত হবে। কতই না মজলুম মানুষের হক নষ্ট করা হয়েছে, কারণ তাদের হক

দিতে পারেন নি। **যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র সমর্পন করে -ইসলাম কি ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে?** এটা যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বনী জাযিমার লোকেরা মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেয় নাই -**তবুও কি আত্ম সমর্পনকারীকে হত্যা করা জায়েজ হয়েছে?** অথচ এই কথাকেই আজ ইসলাম দুশমনরা দোষী ব্যক্তির জন্য হুজ্জাত বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

একদিকে আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, **'নবী (সাঃ) তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নি'**। যেমনটি আপনি লিখেছেন যে, মুহাজের ও আনছারগণ খালিদের হুকুম পালন করেন নি এবং বন্দীদেরকে এজন্য হত্যা করেন নি, কারণ নবী (সাঃ) হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ দেন নাই। সুতরাং **হে আক্কাদ সাহেব! খালিদের পক্ষে আপনি যে ওজর উপস্থাপন করছেন তার হেতু কি?**

আক্কাদ সাহেবের বক্তব্যকে রদ করার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি নিজেই নিজের প্রদত্ত ওজরকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। এবং এতকিছু করার পর এই কথা বলে সবটুকুই বরবাদ করে দিয়েছেন, **'উক্ত অভিযানে উপস্থিত অনুপস্থিত বুজুর্গ সাহাবাদের মাঝে খালিদের এহেন কর্মকে কেন্দ্র করে মনমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়, পরবর্তীতে এটাই শত্রুতার রূপ ধারণ করে'**। জলিলুল ক্বদর সাহাবীরাই যখন খালিদের শত্রু হয়ে যান এবং বাহিনী থেকে পলায়ন করে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ খালিদের প্রতি দোষারোপ করেন যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে খালিদ তাদেরকে হত্যা করেছে -যেন তার চাচার প্রতিশোধ নিতে পারে। এটা তো আক্কাদ সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন।

আর নবী (সাঃ) যখন আসমানের দিকে দু'হাত তুলে বল্লেন, **"পারওয়ার দিগার, খালিদ যে কর্মকান্ড ঘটিয়েছে, সেটা থেকে আমি মুক্ত"**। আবার নবী (সাঃ) যখন হযরত আলী (আঃ)-কে ধন-সম্পদ দিয়ে এজন্য পাঠালেন যেন তাদের জান-মালের কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যায় এবং তারা রাজি হয়ে যায়। কথাটি স্বয়ং আক্কাদ সাহেবই বয়ান করেছেন। এর দ্বারা তো ইহাই প্রমান হয় যে, বনী জাযিমার লোকজন মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খালিদ তাদের প্রতি জুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছে। খালিদের পক্ষ অবলম্বনকারী এমন কেউ আছে যে, আক্কাদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে,

- আপনি কি জানতেন না যে, নবী (সাঃ) তিনবার আল্লাহ্‌র কাছে খালিদের কর্মকান্ড থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষনা দিয়েছেন?
- আপনি কি জানতেন না যে, জলিলুল ক্বদর সাহাবীরা খালিদের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করেছিলেন?
- অথবা ঐসমস্ত সাহাবা যারা তার জঘন্য কার্যকলাপ দেখে পালিয়ে যান?
- অথবা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) যিনি খালিদ বাহিনীতে ছিলেন?

তিনি আরো বলেন যে, আমি জুহুরীকে বলতে শুনেছি যে ঃ আমি আনাস ইবনে মালিকের কাছে দামেশকে গেলাম। দেখলাম তিনি কান্না-কাটি করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, **"আপনার কান্নার কারণ কি"**? তিনি বলেন, **"আমি নামাজ ব্যতীত আর কোন জিনিষই দেখতে পাচ্ছি না আর (এখন) তাতেও কাট-ছাঁট করা হয়েছে"**। [১]

অনুরূপভাবে বুখারী তার প্রথম খন্ডের **"ফজরের নামাজের ফজিলত"** অধ্যায়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমাকে আমিশ বয়ান করেছেন যে, আমি সালিম হতে শুনেছি যে তিনি বলেন, আমি উম্মে দরদা হতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন যে, একদিন আবু দারদা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার কাছে আসেন, তখন আমি বলি, **"কোন জিনিষ আপনাকে এত রাগান্বিত করেছে"**। তিনি বল্লেন, **"আজ আমি উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তারা একমাত্র নামাজটাই জামায়াতে পড়ছে"**। [২]

বুখারী তার সহীহ্-র ২য় খন্ডের **"আল খুরুজ ইলাল মুসালা বিগাইরে মিম্বর"** অধ্যায়ে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রাসুল (সাঃ) যখন মুসাল্লায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন নামাজের পরে খোৎবা দিতেন এবং ওয়াজ ও নসীহাত করতেন। এই নিয়মটি ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু একদিন যখন এক ঈদের নামাজে আমি মারওয়ানের সাথে বের হলাম, তখন খেয়াল করলাম যে, মারওয়ান নামাজের পূর্বেই মিম্বরে যেতে চায়। আমি তার জামা টেনে ধরি। কিন্তু সে কাপড় ছাড়িয়ে নেয় এবং মিম্বরে উঠে নামাজের পূর্বেই খোৎবা দেয়। আমি বল্লাম, **"আল্লাহ্‌র কসম, তুমি শরীয়ত পরিবর্তন করেছ"**। মারওয়ান বললো, **"হে আবু সাঈদ তুমি যা জানো তা শেষ হয়ে গেছে"**। আমি বল্লাম, **"আল্লাহ্‌র কসম আমি যা জানি, সেটা তার চেয়ে অনেক উত্তম যা জানি না"**। মারওয়ান বললো, **"নামাজের পরে লোকজন আমার জন্যে বসে থাকবে না, তাই আমি খোৎবাকে নামাজের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি"**। [৩]

সাহাবা আনাস ইবনে মালিক, আবু দারদা এবং মারওয়ান ইবনে হাকামের যুগে, (যে যুগটি নবী (সাঃ)-এর যুগের কাছাকাছি যুগ ছিল) রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত পরিবর্তন করা হচ্ছিল। এমন কি নামাজও পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসুলের (সাঃ) সুন্নাতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছিল। বনী উমাইয়াদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে তারা প্রত্যেক খোৎবার পরে মিম্বর হতে আলী (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি লানত করা কে একটি সুন্নাত বানিয়ে নিয়েছিল। সেকারণেই **'ঈদুল ফিতর'** বা **'ঈদুল আযহার'** নামাজের পরে অনেক মানুষের মন খারাপ হয়ে যেত। কারণ তারা চাইতেন না যে জামায়াতের ইমাম আলী (আঃ) এবং তাঁর সন্ত

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১৩৪

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১৫৯

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ৪

নষ্টকারীরা তখনকার আমলে শক্তিশালী এবং সম্মানিত বলে গণ্য হতো। অনেক জালেমদেরকে সাহায্য করা হতো, কারণ তারা ছিল ধনাঢ্য এবং তখনকার শাসকদের নৈকট্য প্রাপ্ত ছিল। বুখারী সাহেবকে লক্ষ্য করুন। তিনি কি ভাবে বনী জাযিমার ঘটনাকে কাট-ছাঁট করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "নবী (সাঃ) খালিদকে বনু জাযিমার কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু তারা **'আসলামনা'** বলেনি বরং বলেছিল যে, "**আমরা মূর্তি পূজা ত্যাগ করেছি**"।

জনাব বুখারী সাহেব, বনু জাযিমার লোকেরা কি পারস্য, তুর্কি অথবা হনুদের অধিবাসী ছিল যে তারা **'আসলামনা'** বলতে পারলো না। তারা তো বৃহত্তর আরবেরই একটি গোত্র ছিল এবং যাদের ভাষায় আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মজিদ নাযিল করেছেন। কিন্তু অন্ধ বিদ্বেষ ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের কারণে বুখারী ঐভাবেই লিখতে বাধ্য হয়েছেন যেন সাহাবাদের মান-সম্মান রক্ষা হয়। তাই তো বুখারী খালিদকে নির্দোষ প্রমান করার জন্য নিজের মত চেষ্টা চালিয়েছেন। অপরদিকে আক্কাদ সাহেবকে প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি বলেন যে, খালিদ যখন জিজ্ঞাসা করল, "**তোমরা কি মুসলমান**"? তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু বল্ল, "**হ্যাঁ আমরা মুসলমান**", আর কিছু বললো, "**আমরা মূর্তি পূজা ত্যাগ করেছি**"।

এই শব্দটি স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, তারা অন্য কিছুর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল এবং তা'দ্বারা লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল, যেন খালিদের পক্ষে ওজর পেশ করতে পারে। কারণ খালিদ **'খেলাফত হরণকারী শাসকের একটি নাংগা তরবারী'** ছিল এবং হরণকৃত খেলাফতের রক্ষক সেজে বসেছিল। তার সংগী-সাথীরা তাদের শক্তি প্রর্দশন করছিল, যেন কারোর মস্তিস্কে এই চিন্তা না ঢোকে যে, রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর **'সকীফার সিদ্ধান্ত'** সঠিক হয়নি -তাহলে তারা আমাদের শক্তি দেখে উচ্চ-বাচ্য করবে না।[১] **লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ্।**

রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবারা তাঁর সুন্নাতকে রদ-বদল করেছেন ঃ

বুখারী তার প্রথম খন্ডের **"তাযিউস সালাত"** অধ্যায়ে গীলান হতে রেওয়ায়েত করেছন যে, মালিক ইবনে আনাস বলেন, "**নবীর (সাঃ) জামানার কোন কিছুই আমার চোখে ধরা পড়ছে না**"। লোকেরা বললো, "**নামাজ তো আছে**"। তিনি বল্লেন, "**তোমরা কি তারও চেহারা পাল্টে দাওনি, তাতে বিকৃতি আনয়ন করনি?**"।

---

১ [**অনুবাদকের মন্তব্য ঃ** তাহলে জাযিমার লোকেরা কি খলিদের এই কথা যে, "তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে" বুঝতে পারেনি? কখখোন না! তারা ভাল করেই বুঝেছিল যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দলপতি খালিদ যখন দিচ্ছে তখন তারা অস্ত্র রেখে দেয়, কারণ তারা চাইনি যে মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হোক।]

থাকেন যে, **"তারা হলেন রাসুলের (সাঃ) সাহাবী, তাদের অধিকার আছে যার ক্ষেত্রে যা খুশি তা বলতে পারেন, আর আমরা তো তাদের পর্যায়ের লোক নই সুতরাং আমরা তাদের সমালোচনা করতে পানি না"** ।

হে পারওয়ারদিগার! তুমি পুতঃপবিত্র। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্যে নির্ধারিত। তোমার পাক কালাম কোরআন মজিদ আমাকে বাস্তবতা বুঝার তৌফিক দান করেছে। যেগুলি বুঝতে আমার অনেক কষ্ট হতো এবং যেগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে কষ্ট হতো -যখন আমি এই আয়াতিট তেলাওয়াত করতাম ঃ **"আমি তো বহু জিন্ন ও মনবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। উহারাই গাফিল (অমনোযোগী)"** । [১]

তখন আমি খুবই আশ্চর্য বোধ করতাম এবং নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম এটা কি করে সম্ভব? পশুরা কি মানব জাতির চেয়েও বেশী হেদায়েত প্রাপ্ত? ইহাও কি সম্ভব যে মানুষ পাথরের সামনে মাথা নত করে, তার পূজা করে এবং তার কাছে রিযিক প্রার্থনা করে? কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ্ আমার এই সংশয় তখনই দূর হয়ে যায় যখন আমি তাদেরকে স্ব-চক্ষে দেখলাম। আমি হিন্দুস্তান ভ্রমনকালে সেখানে আশ্চর্য সব জিনিষ দেখেছি -সেখানে আমি দেখলাম যে তারা মানুষের সৃষ্টি রহস্য জানে, ইলম এবং তার ব্যাখ্যা দানে ওস্তাদ, কিন্তু গরুর পূজা করে। এই পাপ যদি শুধু মুর্খ হিন্দুরা করতো তাহলে তাদের ওজর মেনে নেয়া যেত। কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজনও, গরু, পাথর, সমুদ্র, চাঁদ-সূর্য ইত্যাদির পূজা করে থাকে। এরপরে আপনি কোরআনের এই দলিলকে বুঝতে পারবেন এবং এটা সম্ভব বলে স্বীকার করে নিবেন। বিশেষতঃ এই যে **মানুষ পশুর চেয়েও বেশী গোমরাহ**।

আবু যার গিফারীর (রাঃ) দৃষ্টিতে সাহাবা ঃ

বুখারী তার সহীহ্-র ২য় খন্ডে আহনাফ ইবনে কায়েস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমি কোরায়েশদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝে বসা ছিলাম -সেখানে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মোটা পোষাক পরিহিত একজন লোক আসলো এবং বসা লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বললো, "*ধন-সম্পদ জমাকারীদের গরম পাথরের সংবাদ দিয়ে দাও, যেটা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং একপাশের পৃষ্ঠ দেশে লাগানো হবে সেটা ঘাড়ের হাড়-গোড় ভেঙে বেরিয়ে যাবে। তারপর অন্য পাশের ঘাড়ের উপর লাগানো হবে তখন পিঠের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে*" । অতঃপর লোকটি তাদের দিকে পিছন ফিরে হাটা ধরলো এবং একটি টুলের উপর যেয়ে বসে পড়লো। আমিও তাকে

---

১ সুরা আ'রাফ ঃ ১৭৯

ানদের প্রতি লানত করুক। আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বনী উমাইয়ারা নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত পরিবর্তন করে **'ঈদাইন'**-এর নামাজের পূর্বেই খোৎবা চালু করে দিয়েছিল, যেন উপস্থিত লোকজনের মাঝে আলী (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের প্রতি লানত করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদের সম্মান হানী করা যায়। এই বিকৃত সুন্নাতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে বনী উমাইয়ার কর্ণধার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। তাদের কাছে এই সুন্নাতটি নামাজের (যেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল হয়) চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, একদিন এক পেশ ইমাম যুম'আ নামাজের খোৎবা শেষ করে দিলেন, কিন্তু আলীর (আঃ) প্রতি লানত পাঠাতে ভুলে যান। তখন চারি দিক থেকে লোকজন এই বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে যে, **"তুমি সুন্নাত পালন করনি, তুমি সুন্নাতকে ভুলে গেছ"**। সুধীবৃন্দ, চিন্তা করুন! এটা সুন্নাত ছিলই বা কখন? অথচ আফসোস মুয়াবিয়া ইনবে আবি সুফিয়ানের এই বিদআতের উপর ৮০ বৎসর পর্যন্ত আমল হতে থাকে -এবং আজ অবধি এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এতো কিছুর পরেও আহলে সুন্নাতগণ মুয়াবিয়ার প্রতি রাজি ও খুশি আছেন (মুয়াবিয়া কর্তৃক পরিবর্তিত বিধান সমূহের উপর আমল করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকেন) এবং মুয়াবিয়ার সমালোচনা করার মত সাহস কারোর নেই -কারণ মুয়াবিয়া সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত!!

আলহামদু লিল্লাহ্ -ইসলামে মুখলেছ সত্যসন্ধানীগণ **'হক'** ও **'বাতিল'**-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা শুরু করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই সাহাবাদের ঐসমস্ত আক্বিদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে বুঝতে পেরেছেন, যেগুলি মুয়াবিয়া ও তার অনুসারীরা সৃষ্টি করে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। আহলে সুন্নাতগণও এই সমস্ত জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত হচ্ছেন। যদিও তাদের একটি বৃহত অংশ সমস্ত সাহাবাদের সম্মান রক্ষা করে চলেন, আর কেউ যদি সাহাবাদের সমালোচনা করে তখন তার প্রতি লানত করে থাকেন। আপনি যখন তাদের কাছে বলবেন যে, **"মুয়াবিয়া কর্তৃক চালু করা লানতের মধ্যে রাসুলও (সাঃ) গণ্য হোন"** -যেহেতু মুয়াবিয়া উত্তম সাহাবার প্রতি লানত করেছে, সেহেতু এই লানত রাসুল (সাঃ)-এর প্রতিও বর্তায়। কারণ তিনি (সাঃ) নিজেই বলেছেন যে, **"যে আলীকে লানত দিল সে আমাকেই লানত দিল আর যে আমাকে লানত দিল সে আল্লাহ্‌কেই লানত দিল"**। [১]

ঐ সময় তাদের জিহ্বা থমকে যায়, কথায় কম্পন ধরে যায় এবং উত্তরে এমন সব কথা উপস্থাপন করে, যেগুলির কোন দলিল-প্রমান নাই। সেগুলি নির্বুদ্ধিতা এবং অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল মাত্র। তাদের অনেকেই বলে থাকেন যে, এই সমস্ত হলো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা, যা শিয়াদের পক্ষ থেকে রচনা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে

---

১ **মুস্তাদরাকে হাকিম**, খঃ ৩, পৃঃ ১২১ এবং হাকিম শায়খাইনদের শর্ত সাপেক্ষে উক্ত হাদীসকে সহীহ্ বলে গণ্য করেছেন। অনুরূপ ভাবে যাহ্বীও তাঁর **তাখলীস**-এ উক্ত হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর **মুসনাদের** ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, **নাসায়ী** এবং অন্যান্যরাও এটাকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন।

ভাগ্যবান। কারণ আপনী নবীর (সাঃ) সোহবত পেয়েছেন এবং বৃক্ষের নীচে তাঁর বায়াত গ্রহণ করেছেন" । তিনি উত্তরে বল্লেন, **"ভাতিজা তুমি জান না, আমরা রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে কত কিছুই না পরিবর্তন করেছি"** ।

ইহা হলো একজন বুজুর্গ সাহাবীর পক্ষ হতে একটি বিরাট সাক্ষ্য, যে তিনি নিজের এবং লোকজনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এবং তার এই সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র এই বানির সাথে মিলে যায় -**"আফা ইম মাতা আউ কুতিলা আন ক্বালাবতুম আলা আক্বাবিকুম"** এবং নবীর (সাঃ) এই কথার প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করে যে, **"আমাকে বলা হল যে এরা আপনার পরে কুফুরের দিকে ফিরতি পথ ধরে ছিল"** ।

বাররা ইবনে আযিব হলেন একজন জলিলুলক্বদর সাহাবী। প্রাথমিক এবং প্রথম সারির সাহাবাদের মধ্যে গণ্য যারা বৃক্ষের নীচে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন -তিনি নিজের ও আন্যান্য সাহাবাদের বিপক্ষে উক্ত কথা যে, **"আমরা নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর বিদআত সৃষ্টি করেছি"** -এজন্য বলেছিলেন যেন লোকেরা সাহাবী ভেবে ধোকা না খায় এবং তিনি ইহাও পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, নবীর (সাঃ) সংস্পর্শে থেকে এবং বৃক্ষের নীচে বায়াত গ্রহণ করা (যা **'বায়াত-এ-রিদওয়ান'** নামে পরিচিত) -এই দুই বিষয়ও নবীর (সাঃ) পরে সাহাবাদের গোমরাহ হওয়াকে ঠেকাতে পারবে না।

বুখারী তার সহীহ্‌-র ৮ম খন্ডের **১৫১** পৃষ্ঠায় আতা ইবনে ইয়াসার হতে এবং তিনি আবু সাঈদ খুদরী হতে এবং তিনি নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আপনি (সাঃ) বলেন, **"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রতি ধাপে ধাপে আনুগত্য করবে -তারা যদি সাপের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলেও তোমরা উক্ত গর্তে ঢুকে পড়বে"** । আমরা বল্লাম, **"ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌, 'তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা"**? তিনি (সাঃ) বলেন, **"যে কেউ হোক না কেন?"**

বিভিন্ন সাহাবা সম্পর্কে ইতিহাসের স্বাক্ষ্য ঃ

কোরআন ও হাদীসের পরে ইতিহাসই আমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান। কারণ, মানুষের পরিবেশ, কার্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, ঘটনা-অঘটনগুলি যখন লিপিবদ্ধ হয় তখন সেটা ইতিহাস হয়ে যায়।

আমরা যখন আহলে সুন্নাতের ইতিহাসের বইগুলি, যেমন ঃ তারিখে তাবারী, তারিখে কামিল, তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, আবুল ফিদা এবং ইবনে ক্বোতাইবাহ্‌ অধ্যয়ন করবো তখন অনেক সব আশ্চর্য বিষয়-আশয় সম্পর্কে জানা যাবে। এবং সাহাবাদের বাছ-বিচার ও তাদের সমালোচনা না করার জন্য -আহলে সুন্নাতগণ যা বলেছেন, সেটা বুঝতে পারব। এ এমনই একটি কথা যার কোন দলীল-প্রমান নাই, আর না বুদ্ধি-বিবেক এটাকে স্বীকার করে। এটার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পূর্ণ ঐ মানুষটিই একাত্মতা পোষন করবে,

অনুসরণ করে তার পাশে গিয়ে বসলাম। তার পরিচয় আমার জানা ছিল না। আমি তাকে বল্লাম, "*আমি আপনার কথায় ঐ লোকগুলিকে খুশি হতে দেখিনি*"। তিনি বল্লেন, "*তারা জানে না, উক্ত কথাটি আমার বন্ধু আমাকে বলেছে*"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "*কে আপনার বন্ধু*"? তিনি বল্লেন, "*নবী (সাঃ) আমাকে বলেছেন যে, 'হে আবু যার তুমি ওহুদ পাহাড়কে দেখতে পাও*"। আবু যার বল্লেন, আমি সূর্যের পানে তাকালাম কিন্তু সেটার অস্ত ঘটেছে এবং রাসুল (সাঃ) কোন কাজের জন্য আমাকে পাঠাতে চান, আমি বল্লাম, "*জ্বি হ্যাঁ*"। তখন রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*ওহুদের সমান সোনা-রুপা জমাকারী আমার বন্ধু নয় - তবে তিন দীনার ওয়ালা লোকটি আমার বন্ধু*"। যেহেতু এই সমস্ত লোক এটার কোন খবরই রাখেনা, সেহেতু একমাত্র দুনিয়াকেই সংগ্রহ করার তালে ব্যস্ত। আল্লাহ্‌র কসম আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য আমি কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো না"। [১]

বুখারী তার সহীহ্-র ৭ম খন্ডের **"আল-হাউজ"** অধ্যায়ে এবং আল্লাহ্‌র বাণী "**ইন্না আতাইনা কাল-কাউসার**"-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ আতা ইবনে ইয়াসার এবং তিনি আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি হাউজে কাউসারের সন্মুখে দাঁড়িয়ে থাকব, একটি দল আসবে আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং একজন আমার ও তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলবে যে, '**এদেরকে যেতে দিন**'। আমি জিজ্ঞাসা করবো, '**কোথায়**'? সে বলবে, '**জাহান্নামে**'। আল্লাহ্‌র কসম আমি তখন জিজ্ঞাসা করব যে, '**এদের দোষ কি**'? সে বলবে যে, '**এরা আপনার পরে মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল এবং কুফুরের দিকে ফেরৎ চলে গিয়েছিল**'।

এরপর দ্বিতীয় দল আসবে। তাদেরও আমি চিনতে পারবো। একজন আমার এবং তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলবে যে, '**এদরে যেতে দিন**'। আমি জিজ্ঞাসা করব, '**কোথায়**'? সে বলবে, '**জাহান্নামে**'। আমি জিজ্ঞাসা করবো, '**তাদের দোষ কি**'? সে বলবে, '**তারা আপনার পরে কুফুরের দিকে ফিরতি পথ ধরে ছিল**'। এদেরকেই আমি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় দেখতে পাই।

আবু সাঈদ খুদরী হতে রেওয়ায়েত হয়েছে যে, "রাসুল (সাঃ)-কে বলা হবে যে, '**আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কত কিছু না করেছে -বিদআত করেছে**'। তখন আমি বলবো, '**যে আমার পরে (দ্বীনের মধ্যে) পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে আল্লাহ্ যেন তাকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করেন**"। [২]

অনুরূপভাবে বুখারী ৫ম খন্ডের ৬৬ পৃষ্ঠায় **"সাজওয়াতুল হুদায়বিয়াহ্"** অধ্যায়ে এবং আল্লাহ্‌র এই বাণী, **"লাক্বাদ রাদি আলাহু আনিল্লি মুমেনীনা ইজ ইফবায়িউনাকা তাহতাশ্ শাজারাহ"**-এর ব্যাখ্যায় আলাউদ্দিন ইবনে মাসাব এবং তিনি তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ আমি বাররা ইবনে আযিবের সাথে সাক্ষাৎ করে বলি, **"আপনি বড়ই**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ২, পৃঃ ১১২

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ২০৯

আমার কথা শুনে লোকটি নির্দ্বিধায় বলে ফেললো যে, "**উমর হকের উপর কায়েম ছিলেন। কারণ তিনি যদি আলীর সাথে এই রূপ ব্যবহার না করতেন তাহলে অনেক সাহাবা তার থেকে বিমুখ হয়ে আলীর সংগে যোগ দিত -তাতে ফেতনা সৃষ্টি হতো**"।

এ ধরণের মানুষের সাথে বিতর্ক করাটাই অর্থহীন। অনেক পরিতাপের বিষয় যে, আহলে সুন্নাতের অধিককাংশ লোকেরা এই ধরণের আকিদাই পোষন করে থাকেন। যেহেতু তারা সত্য জানেন না এবং সত্য একমাত্র উমরের (রাঃ) সাথে সম্পৃক্ত আছে মর্মে বিশ্বাস করেন। তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে এবং মানুষের কাছ থেকে হকের বুঝ নিচ্ছে, অথচ হক দ্বারাই মানুষকে পরখ করা উচিৎ। এ প্রসংগে আলী (আঃ) বলেছেন, "**হক চিনে নাও, তাহলে হকপন্থীদেরও চিনতে পারবে**"।

অতএব, আহলে সুন্নাতদের মধ্যে এই আকিদা এমনভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে যে, তারা উমর ইবনে খাত্তবকে (রাঃ) কেন্দ্র করে প্রত্যেক সাহাবাকেই আদেল (ন্যায় পরায়ন) গণ্য করে থাকেন। এখন আর কেউ কোন সাহাবীকে লানত দানের দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। আর না তাদের প্রতি কোন সন্দেহ পোষন করতে পারবে। সুতরাং এই ভাবেই প্রত্যেক সত্যসন্ধানী মানুষের মাঝে কঠিন বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন যে, একটা জট থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আরো অনেকগুলি জট সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায়। এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পূর্বেই আরো অসংখ্য বিপদ পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কোন দূর্বল চিত্তের মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে না। বরং সেই মানুষই সত্যের সন্ধান লাভ করবে, যে হবে ধৈর্যশীল, সাহসী ও নিষ্ঠাবান।

আমরা যখন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন বেশ কিছু সাহাবার হাকিকাত উন্মুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে এবং তাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে যায়। তাদের ঐ সমস্ত কালিমাযুক্ত কার্য-কলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেগুলিকে মুসলমাদের নিকট গোপন রাখার আপ্রান চেষ্টা চালানো হয়েছে। আর এই গোপন রাখার কাজটি করেছেন, ঐ সমস্ত সাহাবাদেরই ভক্ত ও সাহায্যকারীগণ অথবা ক্ষমতাসীন শাসকরা অথবা তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।

যে ঘটনাটি সব চাইতে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাহলো রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবাদের ভূমিকা ও আচরণ। তারা কেমন করে রাসুল (সাঃ)-এর জানাজা বাদ দিয়ে, তাঁর (সাঃ) গোসল ও কাফন-দাফনের বিষয়ে কিছুই না করে, **'সাকিফায়ে বনু সায়েদা'**-তে গিয়ে মিটিং বসালো এবং খেলাফত নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লো। অথচ তারা খেলাফতের হকদার কে চিনতো ও জানতো, কারণ তারা নবীর (সাঃ) উপস্থিতিতেই তার খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেছিল।

যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী পীড়াদায়ক, তা এই যে, আলী ও বনী হাশিমের লোকজন তাদের উত্তম চরিত্র এবং ভালবাসার কারণে রাসুল (সাঃ)-এর জানাজা ছেড়ে

যাদেরকে অন্ধকার, আলো থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ), যিনি মাসুম, ওহী ছাড়া কোন কিছুই বলতেন না, হক ব্যতীত অন্য কিছুই করতেন না -তাঁর (সাঃ) এবং সাহাবাদের মাঝে পার্থক্য করতে চান না -যদিও সাহাবাদের মিথ্যাবাদিতা ও নেফাকের বিষয়ে কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে -আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আহলে সুন্নাতগণ রাসুল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী সাহাবাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং সর্বক্ষন সাহাবাদের প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে আমি একটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ

আপনি যখন কাউকে বলবেন যে, "সূরা **'আ'বাসা ওয়াতাওয়াল্লা'**-তে রাসুল (সাঃ) বুঝানো হয় নি বরং এর দ্বারা বড় বড় সাহাবীদের মধ্য হতে কোন একজনকে বুঝানো হয়েছে -যার প্রতি আল্লাহ্ এ কারণে র্ভৎসনা করলেন যেহেতু সে একজন অন্ধ সাহাবীকে দেখে অহংকার প্রর্দশন করেছিল"। তখন দেখবেন যে, সে ব্যক্তি আপনার এই কথাকে স্বীকার করবে না বরং বলবে যে, **'মুহাম্মদও (সাঃ) মানুষ ছিলেন, তাঁর দ্বারাও অনেক ভূল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং পারওয়ারদিগারও সেকারণে তাকে র্ভৎসনা করেছে। তিনি মাসুম ছিলেন না। তবে হ্যাঁ কেবল কোরআন প্রচারের সময় তিনি মাসুম থাকতেন'** (নাউজুবিল্লাহ্)। রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের এটাই হলো প্রধান দৃষ্টি ভংগী।

আবার আপনি যদি বলেন যে, "হযরত উমর (রাঃ) **'তারাবিহ্ নামাজের বিদআত'** চালু করে ভুল করেছেন, কেননা রাসুল (সাঃ) এই আমল হতে লোকজনকে নিষেধ করেছেন এবং নফল নামাজগুলো একা এবং গৃহের মধ্যে পড়ার হুকুম করেছিলেন"। তখন অনুমান করতে পাবেন যে, তারা কিভাবে উমরের (রাঃ) পক্ষাবলম্বন করবে এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে নির্দোষ প্রমান করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবে এবং বলবে যে, এটা কোন বিদআত নয় বরং **'বিদআতে হাসানাহ্'** -যদিও কোন সত্যাবলম্বী মানুষ তাদের এই কথাকে কবুল করতে পারবে না। কারণ এই **'তারাবিহ্ নামাজ'**-এর জন্য রাসুল (সাঃ) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।

আর আপনি যখন বলবেন যে, "উমর (রাঃ) **'মুয়ালেফাতুল কুলুব'**-এর হক কুক্ষিগত করেছেন, যার হক আদায় করার হুকুম আল্লাহ্ পাক কোরআনে দিয়েছেন" -তখন তারা বলবে যে, **"সৈয়েদেনা উমর (রাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলাম এখন অনেক শক্তিশালী হয়েছে বিধায় তাদের আর আমাদের প্রয়োজন নেই -তাই তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমাদের নিকট তোমাদের কোন আবশ্যকতা নেই'**।" এবং তিনি নাকি সকলের চেয়ে উত্তম কোরআন বুঝতে পারতেন। **এটা কি আপনাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয় না?**

আর তখন তো সমস্ত সীমাই ছাড়িয়ে গেল যখন সুন্নীদের একজনকে বল্লাম যে, "**বিদাআতে হাসনা'**র কথা বাদ দেন এবং **মুয়াল্লেফাতুল কুলুব**-এর ঘটনা থেকেও চোখ বন্ধ করে ফেলেন -তবুও আপনি এই ঘটনায় উমরের (রাঃ) পক্ষে কোন ওজর পেশ করবেন -যখন তিনি ফাতিমা (আঃ)-এর গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, **'ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বায়াত গ্রহণ কর অন্যথায় ঘরটি জালিয়ে ছারখার করে দেব"?**

যেমন ঃ ইজ্জত-আব্রু হনন, নেক মুসলমানদেরকে হত্যা করে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সীমালংঘন এবং ইদ্দাত পূরণের পূর্বেই তার স্ত্রীর সাথে জেনা করা (যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ মালিক ইবনে নুওয়ায়রাকে হত্যা করার পর তার স্ত্রী লায়লার সাথে জেনা করেছিল)।

যেমন ঃ আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর বিধি-বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা। যেগুলি কোরআন ও হাদীসের উপর নির্ভরশীল সেগুলিতে নিজেদের সুবিধামত ইজতেহাদের নাম দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলা (যেমন, ফাতিমা (আঃ)-কে **'মীরাস'** থেকে বঞ্চিত করেছিল, **'যুল কুরবার'** হক কুক্ষিগত করেছিল, **'মুয়াল্লিফাতুল কুলুব'**-এর হক মেরে দিয়েছিল এবং **মোতা' বিবাহ** ও **মোতা' হজ্জ**-কে হারাম করে দিয়েছিল)।

যেমন ঃ সাহাবাদের মধ্যে অনেকের মদ্যপান ও জেনা করা -যদিও তারা মুসলমানদের ওলি এবং শাসক ছিলেন (যেমন মুগীরা ইবনে শো'বার ঘটনা -সে উম্মে জামিলের সাথে জেনা করেছিল)।

যেমন ঃ নির্দোষ আবু যার গিফারী (রাঃ)-কে মদীনা হতে বের করে দেয়া -যার কারণে দরিদ্রাবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আম্মার ইবনে ইয়াস্‌সার (রাঃ)-কে এমন মারই না মারলো যে তিনি **'ফতক'** রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে এত প্রহার করল যে তার পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়। মুখলেছ সাহাবাদের বিভিন্ন পদ হতে সরিয়ে দেয়া এবং তাদের স্থলে **'ফাসেক'** ও **'মুনাফেক'** ও ইসলামের দুশমন বনী উমাইয়াদের নিযুক্ত করা।

যেমন ঃ আহলে বাইতগণের -"যাঁদেরকে আল্লাহ্ সমস্ত রিজস হতে মুক্ত রেখে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করেছিলেন যেমনটি পবিত্রতার হক আছে" উপর লানত করা এবং আহলে বাইতের অনুগত ও অনুসরণকারী নেক সাহাবাদেরকে হত্যা করা।

যেমন ঃ মুয়াবিয়া হযজর ইবনে আদীর মত জলিলুল ক্বদর সাহাবী ও তার বন্ধুদেরকে হত্যা করেছিল -তাদের দোষ কেবল এতটুকুই যে তারা আলী ইবনে আবু তালিবের (আঃ) প্রতি লানত করতে চাইনি।

যেমন ঃ বল পূর্বক অবৈধভাবে খেলাফতের আসন দখল করে নেয়া -যারা এটার বিরোধিতা করল, তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া -যেমন খাদ্য-খাবারে বিষ প্রয়োগ করা। ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে মুয়াবিয়া তার বিরুদ্ধাচারীগণকে প্রহার করতো এবং বিষ মিশ্রিত মধু খাওয়াতো, যার ফলে তার দরবার হতে ফিরতি পথেই তারা মারা যেত এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া।

যেমন ঃ ইয়াজিদ কর্তৃক তার সেনা বাহিনীর জন্য রাসুল (সাঃ)-এর মদীনাকে **'মোবাহ্'** ঘোষণা করা -যার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। অথচ রাসুল (সাঃ)-এর বাণী

নড়তে চাননি, তাঁদের অনুপস্থিতিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে তথাকথিত সাহাবারা সকীফা-তে জমায়েত হলেন, যেন বনি হাশিম কর্তৃক রাসুল (সাঃ)-এর কাফন-দাফন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তারা খেলাফতের ফয়সালা করে নিতে পারে এবং ঐ খেলাফতকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বনি হাশিমের উপর চাপ প্রয়োগ করা যায়। তখন বনি হাশিমদের আর কিছুই করার থাকবে না, কেননা সকীফা-তে জমায়েতকারীগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে, যারা তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে তাদের হত্যা করে দেয়া হবে এবং এ অজুহাত যে এরা ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

ইতিহাস বেত্তাগণ অনেক আজব আজব আর অনাকাঙ্খিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐসমস্ত ঘটনাবলী রাসুল (সাঃ)-এর বিদায়ের পর তৎকালীন সাহাবাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। যেমন ঃ

- তারা রাসুল (সাঃ)-এর খলিফা এবং আমিরুল মুমেনীন সেজে বসলেন।
- হুমকি প্রদর্শন এবং বল প্রয়োগ করে জনগণকে বায়াত গ্রহণে বাধ্য করা।
- ফাতিমার (সাঃআঃ) গৃহের দরজায় উপস্থিত হয়ে দরজা ভেঙে ফেলা যেটা তাঁর দেহের উপর আছড়ে পড়ে এবং ঐ আঘাতে তার গর্ভেই সন্তান নষ্ট হয়ে।
- হযরত আলী (আঃ)-কে দড়িতে বেঁধে কয়েদীর মত করে নিয়ে যাওয়া এবং বায়াত গ্রহণ না করলে হত্যা করার হুমকি দেয়া।
- ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর **'মীরাস'** ও **'ফিদাক'** সম্পত্তিসহ অন্যান্য হক কেড়ে নেয়া এবং **"যিল কুরবার"** হককে কুক্ষিগত করা। ঐ অবস্থাতেই ফাতিমা (সাঃআঃ) ইন্তেকাল করলেন। ইন্তেকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ সমস্ত সাহাবাদের প্রতি তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রত্যেক নামাজের পর তাদের জন্য বদ-দোয়া করতেন। হযরত আবু বকর ও উমরের (রাঃ) সালামের উত্তর দিতেন না। রাতের অন্ধকারে অতি গোপনে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। কোন জলিলুল কদর সাহাবাই তার জানাজায় শরীক হতে পারেন নি।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আহলে সুন্নাতগন যে সমস্ত সাহাবাদেরকে ইসলামের জন্য মানদন্ড বানিয়েছেন অথচ দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য তারাই রাসুলে পাক (সাঃ)-এর জানাজায় শরীক হতে পারেন নি আর না জান্নাত নেত্রী ফাতিমা (আঃ)-এর জানাজাতে শরীক হতে পেরেছেন।

তারা ঐ সমস্ত সাহাবাদের হত্যা করেছিলেন যারা আবু বকরকে (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন (ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে মালিক ইবনে নুওয়ায়রার হত্যার ঘটনা বহুল আলোচিত)। কারণ তারা জানতেন যে, আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, অথচ তারা বিদায় হজ্জে **'গাদীর-এ-খুমে'** নবীর (সাঃ) উপস্থিতিতে হযরত আলী (আঃ)-এর বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে -যেগুলি ভদ্রতায় পরিপূর্ণ, আল্লাহ্‌র ভয়, বীরত্ব এবং তাকওয়াহ্‌র অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাঁরাই ভাগ্যবান -তাঁদের জন্যই জান্নাতে আদলের (ন্যায়পরায়নতার) দরজা উন্মুক্ত হয়ে আছে। এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই হচ্ছে উত্তম পুরস্কার। তবে স্মরণ থাকা উচিৎ যে, কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা অতি নগণ্য।

কিন্তু যে সমস্ত সাহাবীরা স্বার্থ সিদ্ধির ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুসলমান সেজে ছিলেন এবং ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামেনি -তারা রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি রাজি-খুশি ছিলেন না বরং নিজেদের স্বার্থের কারণে রাসুল (সাঃ)-এর সাঙ্গে থাকতেন। তাইতো কোরআন তাদেরকে ধমক দিয়েছে। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি এবং তারাও রাসুল (সাঃ)-কে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। রাসুল (সাঃ) অনেক সময় তাদের প্রতি লানত করেছেন। ইতিহাস তাদের সমস্ত বদ আমলকে সংগ্রহ করে রেখেছে ...এরা বিন্দু পরিমানও সম্মান পাওয়ার জোগ্য নন ...আমরাও তাদের প্রতি খুশি হতে পারি না, আর না তাদেরকে **'আম্বেয়া'**, **'শোহাদা'** ও **'সালেহীন'**-দের সমকক্ষ মনে করতে পারি।

আমার জীবনের কসম! এগুলোই হচ্ছে প্রকৃত হক (সত্য)। যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে এবং আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত বানির বিরোধিতা করে না যেগুলি আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য পাঠিয়েছেন -যেন তারা মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং মুনাফেকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শত্রুতা পোষন করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন, **"তুমি কি তাহদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা, আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে, তাহাদের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ! উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে; অতএব উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদয়ক শাস্তি। আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকাবিলায় উহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদের কোন কাজে আসিবে না; উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে। যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্‌র নিকট সেইরূপে শপথ করিবে যেইরূপে শপথ তোমাদের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা ভাল কিছুর উপর রহিয়াছে। সাবধান! উহারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী। শয়তান উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ফলে উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁরার রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হইব এবং আমরা রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে –হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্‌র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হইবে।**[১]

---

১ সূরা মুজাদালা : ১৪-২২

হচ্ছে যে, **"মদীনা হচ্ছে আমার হেরেম, যে এখানে কোন মন্দ কাজ করবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত"**।

যেমন ঃ তাদের কর্তৃক আল্লাহ্‌র ঘর **'ক্বাবা'**-র উপর **'মিনজানিক'** দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা, হেরেম শরীফকে জালিয়ে দেওয়া এবং হেরেমে অবস্থানকারী সাহাবাদেরকে হত্যা করা।

যেমন ঃ তারা এই তুচ্ছ ও নশ্বর দুনিয়ার লোভ লালসায় -আমীরুল মুমেনীন, সৈয়্যেদুল ওয়াসিয়্যিন, পবিত্র বংশধরদের নেতা হযরত আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে জংগ-এ-জামল, জংগ-এ-সিফ্‌ফিন ও জংগ-এ-নাহারওয়ানে যুদ্ধ করা। রাসুল (সাঃ)-এর সাথে যার সম্পর্ক এমন ছিল ঠিক যেমন মূসার (আঃ) সাথে হারুনের (আঃ)।

যেমন ঃ তারা **'সৈয়্যেদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ্‌'** 'জান্নাতে যুবকদের সরদার' ইমাম হাসান (আঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা এবং ইমাম হুসাইন (আঃ)-কে তরবারী দ্বারা হত্যা করা এবং আলী ইবনুল হুসাইন জয়নুল আবেদীন (আঃ) ছাড়া রাসুল (সাঃ)-এর সকল বংশধরকে কারবালার মরু প্রান্তরে হত্যা করা।

তাদের আরো এমন অনেক সব জঘন্য কার্যকলাপ আছে যেগুলি মানবতার ললাটে কলংকের টিপ হয়ে আছে। সেগুলি লিখতে আমার কলমও বিরক্তি প্রকাশ করে। ঐগুলির মধ্য হতে বেশীর ভাগ ঘটনাবলীই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের গুরুরা জানেন, তাই তারা মুসলমানদেরকে ইতিহাস পড়া এবং সাহাবাদের জীবনী পর্যালোচনা করাকে নিষেধ করে থাকেন।

আর ইদানিং কালে যতসব জঘন্যতম অপরাধের কথা বই-পুস্তকে পাওয়া যায়, সেগুলো নিঃসন্দেহে সাহাবাদেরই কার্যকলাপ। সেগুলি অধ্যয়নের পর একজন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে সে সকল সাহাবাকে নির্দোষ গণ্য করবে, তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে এবং তাদের সমালোচনা করবে না। এমনটি তো সেই ব্যক্তি করবে, যার বিবেক-বুদ্ধি ভোঁতা হয়েগেছে।

বিশেষ করে আমরা কতিপয় সাহাবার ন্যায়-নীতি এবং পবিত্রতা ও তাকওয়াহ্‌ সম্পর্কে শুনে থাকি এবং আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি তাদের যে কি পরিমান ভালবাসা ছিল তাও জানি। তাঁরা রসুল (সাঃ)-এর যুগে ইমানে দৃঢ় ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক তাদেরই প্রতি রাজি ও খুশি হয়েছেন এবং একমাত্র তাদেরকেই তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোলে স্থান দিয়েছেন।

তাঁরা সবকিছু থেকে মুক্ত এবং মর্যাদাবান, তাঁদের সম্পর্কে কেউ কোন কালে মন্ত ব্য করতে পারবে না, দোষ-ত্রুটি সন্ধানকারী তাঁদের কোন দোষ-ত্রুটি খুজে পাবে না। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর পবিত্র কিতাবে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের প্রশংসা করেছেন -যেমন আল্লাহ্‌, বার বার নবীর প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রশংসা করেছে এবং ইতিহাসও ঐ

আমি যদি কোন বিষয়ের প্রতি সন্দেহ পোষণ করি তাহলে সেই বিষয়ের উপর আমার কোন আস্থা থাকবে না। তবে এই বিষয়ে আমার কোন ক্রমেই সন্দেহ হবে না যে আল্লাহ্ মুমিনদের কাছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আত্মীয়দের (ক্বোরবা) ভালবাসা দাবী করেছেন। এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আত্মীয়রা হলেন একমাত্র তাঁর আহলে বাইতগণ এবং তাঁদের ভালবাসাকে আল্লাহ্ ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালাতের পারিশ্রমিক বাবদ তাঁর উম্মতের নিকট তাঁদের প্রতি ভালবাসা দাবী করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ **"কুল লা আস আলুকুম আলাইহে আজরান ইল্লাল মুওয়াদ্দাতা ফিল ক্বোরবা"** অর্থাৎ **"বলে দাও (হে মুহাম্মাদ), এ নবুয়্যাতী কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাই না; কেবল আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি (আনুগত্যপূর্ণ) ভালবাসা ছাড়া"**। [১]

আহলে বাইত (আঃ)-এর বিষয়ে সমস্ত মুসলমানই একমত। কিন্তু যারা আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত নন তাদের বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন, **"যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সেটাকে পরিত্যাগ কর এবং যে বিষয়টি সন্দেহ মুক্ত সেটাকে গ্রহণ করে নাও"**।

আহলে বাইত (আঃ)-দের ভালবাসার বিষয়ে শিয়াদের দৃষ্টিভংগীতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সাহাবাদের ভালবাসার বিষয়ে আহলে সুন্নাতগণের দৃষ্টিভংগীতে অনেক সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। আর **একজন মুসলমান আহলে বাইতের শত্রু এবং তাঁদের হত্যাকারীদেরকে কিভাবে ভালবাসতে পারে -কিভাবে তাদের প্রতি রাজি থাকতে পারে - এটা অযৌক্তিক নয় কি?**

সুফী এবং পীরদের কথা বলাই বাহুল্য। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে মানুষের অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্কার হতে পারে না এবং ঈমান তার অন্তরে জাগ্রত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার অন্তর সমস্ত আল্লাহ্‌র বান্দা, ইয়াহুদ ও নাসারা, মুশরিক ও পাপীদের শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে তারা এমন সব আজগুবী কথা-বার্তা বলে থাকেন, যা খ্রীস্টান পাদ্রীদের কথার সাথে অনেকাংশে মিল খায়। তাদের ভ্রম হচ্ছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছে ভালবাসা, দ্বীনও হচ্ছে ভালবাসা -সুতরাং যে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসবে তার জন্য নামাজ পড়া, রোজা রাখা বা হজ্জ ইত্যাদী করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমার প্রাণের কসম! এগুলি হচ্ছে কেবল মনকে সান্তনা দেয়ার কলা-কৌশল। বাস্তবে কোরআন ও হাদীসে এ কথার কোন অস্তিত্ব নেই। বিবেক-বুদ্ধিও এটাকে সত্য বলে স্বীকার করে না। কোরআন বলছে ঃ **"তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে -হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র।"**। [২]

---

১ সূরা শূরা ঃ ২৩

২ সূরা মুজাদালা ঃ ২২

এখানে আমি অবশ্যই লিখতে চাই যে, শিয়াগণই **'হকের'** উপর কায়েম আছেন। কেননা তারা রাসুল (সাঃ), তাঁর আহলে বাইত এবং ঐসমস্ত সাহাবাদেরকে ভালবাসেন যারা আহলে বাইতের পথ (তরিকা) অনুসরণ করেছেন এবং ঐসমস্ত মোমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইমাম (আঃ)-গণের তরিকার আনুগত্য করতে থাকবেন। শিয়া ব্যতীত অনান্য সকল মাযহাবের মুসলমান এক বাক্যে সকল সাহাবাকেই ভালবাসেন এবং এই মর্মে কোন বাছ-বিচারই করেন না যে, তারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-কে কতই না রাগান্বিত করেছেন। তারা নিজেদের পক্ষে যুক্তি হিসাবে আল্লাহ্‌র এই বাণীকে উপস্থাপন করে থাকেন ঃ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু"**।[১]

এই জন্যই আপনি লক্ষ্য করবেন যে, **তারা আলীর (আঃ) প্রতিও রাজি এবং মুয়াবিয়ার প্রতিও সন্তুষ্ট। তারা এ বিষয়ে মোটেই পরোয়া করেন না যে মুয়াবিয়া কি করেছে? কত রকম জঘন্য সব অপরাধ করেছে? মুয়াবিয়াকে অন্ততঃ মুনাফেক, গোমরাহ এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী তো বলা যেতে পারে!!** এই আজব কথাটি তো আমি পূর্বেও বলেছি তবুও পুনঃরাবৃত্তি করাতে কোন দোষ নেই যে, একজন নেক বান্দা জলিলুল ক্বদর সাহাবী হাজর ইবনে আ'দির কবর জিয়ারতে গেলেন। সেখানে গিয়ে একজনকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান, যার আহাজারী ক্রমন্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি ভাবলেন লোকটি হয়তো শিয়া হবে -তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "*তুমি কেন কাঁদছো*"? লোকটি বললো, "*আমি আমার সরদার ও সৈয়দ হাজর ইবনে আ'দির (রাঃ) জন্য কাঁদছি*"। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "*তাঁর কি হয়েছে*"? লোকটি উত্তরে বল্ল, "*আমাদের সৈয়দ ও সরদারকে মুয়াবিয়া হত্যা করিয়েছে*"। ঐ নেক লোকটি পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "*মুয়াবিয়া তাঁকে কেন হত্যা করালো*"? ঐ লোকটি বললো, "*জনাব হাজর সৈয়্যেদেনা আলীর (আঃ) প্রতি লানত করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই*"। তখন ঐ নেক লোকটি বললেন, "*এখন আমি তোমার জন্য কাঁদছি, যেন আল্লাহ্ তোমার প্রতি রাজি হয়ে যান*"।

সকল সাহাবাকে ভালবাসার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের এতো আগ্রহ বা এতো জেদ কেন? তারা শুধু মুহাম্মদ ও তাঁর আলের (বংশধরদের) প্রতি দরূদ পাঠাতেও নারাজ বরং ঐ দরূদে **"ওয়া আসহাবেহি আজমাঈন"** যুক্ত করে পাঠ করেন। অথচ না কোরআন এটার হুকুম দিয়েছে আর না রাসুল (সাঃ) এর জন্য দাবী জানিয়েছেন এমন কি, না কোন সাহাবীও নিজেদেরকে দরূদের মধ্যে যোগ করতে বলেছেন। কেননা, সালাওয়াত তো কেবল মুহাম্মাদ (সাঃ) ও আলে মুহাম্মদের জন্য নির্দিষ্ট -যার নির্দেশ কোরআনে নাযিল হয়েছে এবং যার তালিম (শিক্ষা) স্বয়ং রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের দিয়েছিলেন।

---

১ সূরা হাশর ঃ ১০

আর আমরা কিছু কিছু সাহাবাদের প্রতি এ কারনেই ক্ষুব্ধ যে, তারা তাঁদের খেলাফতের অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও পূর্বে তাঁদের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ এবং ইতিহাস ও আকল আমাদের সম্মুখে তাদের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

আর এর পাশাপাশি রাসুল (সাঃ)-ও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ "দা' মা ইউরিবুকা ইলা মালা ইউরিবুকা" সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য সঠিক নয় যে সে কোন সন্দেহভাজন আদেশের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবকে ছেড়ে দিবে যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।

যেমন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটাই ওয়াজিব, সে যেন নিজেকে সমস্ত প্রকার বন্দী ও দাসত্বের শিকল থেকে মুক্ত করে নেয় এবং নিজের বিবেককে পূর্বের চিন্তা-চেতনা ও হিংসা-বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত হতে না দেয়। কেননা নাফস্ ও শয়তান উভয়েই মানুষের বড় শত্রু, তারা মানুষের সামনে খারাপ আমলগুলিকে সুন্দর রূপে সাজিয়ে উপস্থাপন করে এবং মানুষ সেগুলোকেই ভাল বলে গ্রহন করে নেয়। ইমাম বুসীরি **'কাসিদা আল-বারজাহ্'**-তে খুব সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

ওয়া খালেফুন নাফসা ওয়াশ্ শাইত্বানু ওয়া'সিমুহা
ওয়া ইন হুমা মুহাদ্দাকান নাসেহ্ ফাত্তাহুম

নাফস্ এবং শয়তান উভয়েরই বিরোধিতা করো এবং তাদের থেকে বেঁচে চলো
যদিও তারা তোমাকে খুব আন্তরিকভাবে উপদেশ করে তবুও তুমি তার নিন্দা কর

নেক বান্দাদের বিষয়ে মুসলমানদের উচিৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করা। কিন্তু যারা মুত্তাকী নয় তাদের কোন ইজ্জতও নেই। রাসুল (সাঃ) বলেন ঃ "**ফাসেকের নিন্দা করাতে কোন দোষ নেই। কারন এর দ্বারা মুসলমানগণ তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তার ধোকায় পড়ে তাকে যেন ভাল না বাসে**"।

আজ মুসলমানদের উচিৎ একে অপরকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করা, একে অপরের দুঃখ-বেদনাকে উপলব্ধী করা। গর্ব ও অহংকারের জন্য তাদের নেতা ও বুজুর্গরাই যথেষ্ট। সুতরাং আমাদের বুজুর্গরা যদি হকের উপরেই ছিলেন -যেমনটি আজ আমরা ধারণা পোষণ করি। তাহলে আজ আমরা এই সিদ্ধান্তে কেন উপনীত হই। এই বিষয় তো ঐ আন্দোলনেরই ফল যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সৃষ্টি হয়েছে।

"হে মু'মিনগণ। তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"।[১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ "হে মু'মিনরগণ তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তাহারাই যালিম"।[২]

আরো বলা হচ্ছে ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা, তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে"।[৩]

রাসুলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, **"কোন মোমিনের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ না তার ভালবাসা ও শত্রুতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে"।**

তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, **"কোন মোমিনের ক্বলবের মধ্যে আল্লাহ্ এবং তার শত্রুর ভালবাসা একত্রে স্থান পেতে পারে না"।**

উক্ত বিষয় বস্তুর উপর অনেক হাদীস আছে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ মোমিনদের জন্য ঈমানকে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ক্বলবসমূহকে তাঁর দ্বারাই সৌন্দর্য দান করেছেন এবং তাদের জন্য কুফুর, গোনাহ ও ফিস্‌ককে অপছন্দ করেছেন। মানুষ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে নিজের পিতা-পুত্র অথবা ভাই-বন্ধুদের প্রতি ঘৃনা করতে থাকে, কারণ সে শয়তানের পথের উপর চলতে থাকে এবং কখনো আগন্তুকের সাথে মুসলমান মনে করে ভালবাসা প্রদর্শন করে।

এই সমস্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়, যেন আমাদের ভালবাসা এবং মোওয়াদ্দাত ও বন্ধুত্ব তাদের প্রতি হয়, যাদের সাথে মোওয়াদ্দাত অর্থাৎ আনুগত্যপূর্ন ভালবাসা স্থাপন করার জন্য আল্লাহ্ পাক হুকুম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতি আরো ওয়াজিব যেন আমাদের ঘৃনা-বিদ্বেশ ও শত্রুতা ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি হওয়া উচিৎ যাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেশ ও শত্রুতা করার হুকুম আল্লাহ্ দিয়েছেন।

সে কারণেই আমরা আলী (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতে ইমাম (আঃ)-দের ভালবাসী। যদিও তাঁদের ভালবাসার সংস্পর্শে আমরা আসি না -কিন্তু কোরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না।

---

১ সূরা মায়িদা ঃ ৫১

২ সূরা তাওবা ঃ ২৩

৩ সূরা মুম্‌তাহিনা ঃ ১

রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করে, আর যখন কারোর আমানত রাখে তখন তাতে খেয়ানত করে"** ।

আর এ সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট বরং এর চেয়েও জঘন্য প্রকৃতির বৈশিষ্টাবলী আমর ইবনে আসের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

হযরত আবু যর (রাঃ)-কে যখন 'যাবদাহ্‌র' দিকে নির্বাসন দেয়া হলো তখন তাঁর প্রশংসা করে এবং উসমান ও তার সংগীদের ধিক্কার দিয়ে এবং আবু যরের একাকিত্বের জন্য হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ **"হে আবু যর! তুমি আল্লাহ্‌র নামে ক্রোধ দেখিয়েছিলে। সুতরাং যার ওপরে রাগান্বিত হয়েছিলে তার বিষয়ে আল্লাহ্‌তে আশা রেখো। মানুষ তাদের জাগতিক বিষয়ের জন্য তোমাকে ভয় করতো, আর তুমি তোমার ঈমানের জন্য তাদেরকে ভয় করতে। কাজেই তারা যেজন্য তোমাকে ভয় করে তা তাদের কাছে রেখে দাও এবং তুমি যে জন্য তাদেরকে ভয় কর তা নিয়ে বেরিয়ে পড়। যে বিষয় থেকে তুমি তাদেরকে বিরত করতে চেয়েছিলে তাতে তারা কতই না আসক্ত এবং যে বিষয়ে তারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তার প্রতি তুমি কতই না নির্লিপ্ত। অল্পকাল পরেই তুমি জানতে পারবে আগামীকাল (পরকালে) কে বেশি লাভবান এবং কে বেশি ঈর্ষনীয়। এমনকি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যদি কারো জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য তা খুলে দিতে পারেন। শুধু ন্যায়পরায়ণতা তোমাকে আকর্ষণ করে এবং অন্যায় তোমাকে বিকর্ষণ করে। যদি তুমি তাদের জাগতিক বিষয়ের প্রীতি গ্রহণ করতে তাহলে তারা তোমাকে ভালোবাসতো এবং যদি তুমি তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে তবে তারা তোমাকে আশ্রয় দিত"**। [১]

মুগীরাহ্ ইবনে আখনাস-এর মত বুজোর্গ সাহাবী সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ **"ওহে অভিশপ্ত ব্যক্তি ও অপুত্রকের পুত্র, তোমার সাজারায় না আছে শিকড় আর না আছে শাখা। তুমি আমার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে? আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যাদের সমর্থন করবে আল্লাহ্ তাকে জয়যুক্ত করবে না এবং তুমি যাদেরকে উত্তেজিত করে তুলবে তারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের দু'জনের মধ্য থেকে সরে পড়। আল্লাহ্ তোমার উদ্দেশ্য সফল হতে দেবেন না। এরপর যা খুশি কর। আমার প্রতি দয়াদ্র হলেও আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না"**। [২]

হযরত আলী (আঃ) দু'জন প্রখ্যাত সাহাবা তালহা ও জুবায়র (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, যারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন পরে বায়াত ভঙ্গ করে তাঁর মুখোমুখী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ঃ **"আল্লাহ্‌র কসম, তারা মর্যাদাহানিকর কোন কিছু আমার মধ্যে দেখতে**

---

১ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, খোৎবা ঃ ১২৯

২ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, খোৎবা ঃ ১৩৪

তোমরা পেঁচালো কথা অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন"। [১]

বিভিন্ন সাহাবা সম্পর্কে আহলে যিক্‌রের ধারণা ঃ

হযরত আলী (আঃ) প্রাথমিক যুগের কিছু সাহাবাদের চরিত্র সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ "**যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করেছিলাম তখন একদল কেটে পড়লো, আরেকদল বিদ্রোহী হয়ে গেলো এবং অন্যরা এমন অন্যায়ভাবে ক্রিয়াকলাপ করতে লাগলো যেন তারা আল্লাহ্‌র এই বাণী কখনো শুনতেই পায় নি- "এ হলো আখিরাতের সেই আবাস যা আমরা তাদের জন্যই অবধারিত করেছি যারা পৃথিবীতে অযথা উন্নতি কামনা এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই"। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনেছিল এবং তাদের স্মরনও ছিল, কিন্তু দুনিয়ার চাকচিক্য তাদের চোখে অধিক প্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং দুনিয়ার জাক-জমক ও বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করে পথভ্রষ্ট করেছিল।** [২]

তিনি তাদের বিষয়ে আরো বলেছেন ঃ "**তারা শয়তানকে তাদের কর্মকান্ডের বিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং শয়তানও তাদেরকে তার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের বক্ষেই শয়তান ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটায়। তাদের কোলেই শয়তান হামাগুড়ি দিয়ে চলে। সে তাদের চোখ দিয়েই দেখে এবং তাদের জিহ্বা দিয়েই কথা বলে। এভাবেই সে তাদেরকে পাপের পথে পরিচালিত করেছে এবং ক্লেশপূর্ণ জিনিস তাদের জন্য সুসজ্জিত করেছে। তাদের কর্মকান্ড সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান তার রাজ্যে অংশীদার করে এবং যার জবানে সে কথা বলে**"। [৩]

হযরত আলী (আঃ) আমর ইবনে আ'স সম্পর্কে বলেছেন ঃ "**নাবিয়ার পুত্রের কথা শুনে আমার বিস্ময় লাগলো। সে শ্যামবাসীদের কাছে আমার সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমি একজন ভাঁড় এবং আমি কৌতুক আর ঠাট্টা বিদ্রুপে নিয়োজিত। সে ভুল বলছে এবং পাপ-কথা বলছে। সাবধান, সেটাই নিকৃষ্টতম কথা যা অসত্য। সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। সে যখন যাচ্‌না করে তখন তাতে লেগেই থাকে, কিন্তু তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কৃপণের মত হাত গুটায়**"। [৪]

---

১ সূরা নিসা ঃ ১৩৫

২ **নাহ্‌জুল বালাগা**, খোৎবা ঃ ৩

৩ **নাহ্‌জুল বালাগা**, খোৎবা ঃ ৭

৪ **নাহ্‌জুল বালাগা**, খোৎবা ঃ ৮৩

আলী (আঃ) ঐ সমস্ত সাহাবাদের সম্পর্কে বলেন, যারা আয়শার (রাঃ) সাথে **'বসরার'** দিকে যাত্রা করেছিলেন, তাদের সংগে তালহা ও জুবায়রও (রাঃ) ছিলেন ঃ **"তারা (তালহা, জুবায়র ও তাদের সমর্থকগণ) আল্লাহ্‌র রাসুলের স্ত্রীকে এমনভাবে হেঁচড়ে বের করে এনেছিল যেন কোন ক্রীতদাসীকে বিক্রির জন্য নেয়া হচ্ছিলো। তারা তাকে 'বসরা' নিয়ে গিয়েছিল যেখানে ওদুটোর (তালহা ও জুবায়র) স্ত্রীরা ঘরের মধ্যে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসুলের স্ত্রীকে তাদের ও সৈন্যদের মাঝে প্রকাশ্যভাবে নিয়ে এলো। অথচ এদের মধ্যে একজন লোকও ছিল না যারা স্বেচ্ছায় ও বিনা বাধ্যবাধকতায় আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেনি। 'বসরায়' এসে তারা আমার গভর্নর, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধিবাসীকে আমার বিরোধিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তারা কতেক লোককে আটক করে এবং কতেক লোককে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তারা বিনা দোষে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলিমকেও হত্যা করে থাকে তবে তাদের সকল সৈন্যকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ হবে। কারণ, তারা বিনা দোষে হত্যায় উপস্থিত ছিল কিন্তু দ্বিমত পোষণ করেনি এবং মুখে অথবা হাতে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেনি। বিনা দোষে মুসলিমগণকে হত্যা করার জন্য যে সংখ্যক লোক এগিয়ে এসেছিল তাদের কথা বলাই বাহুল্য"**। [১]

সাহাবাদের মধ্য হতে **'জংগ-এ-জমল'**-এ যারা আয়শার (রাঃ) আনুগত্য করেছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ **"তোমরা একজন মহিলার সৈন্য এবং এক চতুষ্পদের অনুগত ছিলে। তার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়ে অগ্রসর হলে, আর সে যখন জখম হলো তখন তোমরা তাকে ছেড়ে পালালে। তোমরা হলে নীচ প্রকৃতির মানুষ এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী। দ্বীনের বিষয়ে তোমরা প্রকাশ্যে একরকম এবং গোপনে আর একরকম।**

থাকলো একজন বিশেষ মহিলা, তার সম্পর্কে বলছি, সে তার নারীসুলভ অভিমতের আওতাধীন এবং কামারের চুল্লির মত তার বুকে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। সে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করছে, অন্যদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করতে বলা হলে কখনো তা করবে না। আমার দিক থেকে এরূপরও সে যথার্থ সম্মান পাবে, তবে তার কুকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে"। [২]

কুরাইশ সম্পর্কে যারা নিঃসন্দেহে সাহাবা ছিলেন, (বনী আসাদ গোত্রের একজন অনুচর আমীরুল মোমেনিনকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "এটা কেমন কথা যে, আপনার গোত্র (কুরাইশ) আপনাকে পদমর্যাদা (খেলাফত) থেকে বঞ্চিত করেছিল? অথচ খেলাফতের জন্য আপনি সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত"। হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ **"যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস**

---

১ **নাহ্‌জুল আল-বালাঘা**, খোৎবা ঃ ১৭১

২ **নাহ্‌জুল আল-বালাঘা**, খোৎবা ঃ ১৫৫

পায়নি এবং তারা আমার ও তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেনি। নিশ্চয়ই, তারা এখন এমন এক অধিকার দাবি করছে যা তারা পরিত্যাগ করেছে এবং এমন এক রক্তের বদলা দাবি করছে যে রক্তপাত তারা নিজেরাই ঘটিয়েছে।

এবং নিশ্চয়ই এদলটি বিদ্রোহী যাদের মধ্যে রয়েছে নিকটজন (জুবায়র), বৃশ্চিকের বিষ (আয়শা) এবং সংশয় যা সত্যকে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং অন্যায়ের ভিত কেঁপে উঠেছে। এর জিহ্বা ফেতনার প্রচারণা বন্ধ করেছে।

'বায়াত', 'বায়াত' বলে তোমরা আমার দিকে এমনভাবে দৌড়ে এসেছো যেন উষ্ট্রী তার নব প্রসবিত শাবকের দিকে দৌড়ে যায়। আমি আমার হাত গুটিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু তোমরা তা তোমাদের দিকে টেনে নিয়েছো। আমি আমার হাত আবার টেনে গুটিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা আবার জোরে আকর্ষণ করেছো।

হায় আল্লাহ্! এরা দু'জন আমার অধিকার উপেক্ষা করে আমার প্রতি অবিচার করলো। তারা উভয়ে বায়াত ভঙ্গ করেছে এবং জনগণকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারা যা বন্ধন করছে তুমি তা মুক্ত কর; তারা যে মিথ্যার জাল বুনছে তুমি তা দুর্বল কর। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করছে তার কুফল তাদেরকে দেখিয়ে দাও। যুদ্ধের পূর্বে আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম তাদের বায়াতে দৃঢ় থাকতে এবং আমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা এ আশীর্বাদ খাটো করে দেখলো এবং নিরাপত্তার পথ অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানালো"। [১]

এবং নিজের একটি চিঠিতে তালহা ও জোবায়র (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ) বলেছেন ঃ **"তোমরা যে পথ ধরেছ তা পরিহার কর। মনে রেখো, আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে; সে দিন লজ্জাবনত হয়ে পড়বে এবং দোযখের আগুনের জ্বালা পোহাতে হবে। ওয়াস্‌সালাম"**। [২]

আবার মারওয়ান ইবনে হাকাম সম্পর্কে হযরত আলী (আঃ) বলেন -যাকে **'জংগ-এ-জামল'**-এ বন্দী করা হয়েছিল পরে মুক্ত করে দেয়া হয় -সেও ঐসমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত যারা বায়াত করার পর বায়াত ভঙ্গ করেছে ঃ **"এখন আর তার বায়াতের কোন প্রয়োজন আমার নেই, কারণ তার হাত হলো ইহুদির হাত। যদি সে আমার হাত ধরেও বায়াত গ্রহণ করে তবুও সে কিছুক্ষণ পরে তা ভঙ্গ করবে। সে একদিন ক্ষমতা পাবে তবে ততক্ষণ টিকে থাকবে যতক্ষণ কুকুর নিজের নাক চাটে (স্বল্পক্ষণের জন্য)। সে চারটি ভেড়ার পিতা হবে (তারাও শাসন করবে)। সে এবং তার পুত্রদের দ্বারা জনগণ লাল দিবসের (দুঃখ কষ্ট) পোহাবে"**। [৩]

---

১ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, খোৎবা ঃ ১৩৬

২ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, পত্র নং ঃ ৫৪

৩ **নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, খোতবা ঃ ৭২

বাসনার তাড়নায় আরো অধিক তাড়িত হও এবং তোমার বাতেন ও জাহের যেন ভিন্নধরণের না থাকে।

তুমি আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছো। জনগণকে এক দিকে সরিয়ে রেখে তুমি নিজে আমার মোকাবেলা করলে ভালো হয়। উভয় পক্ষের জনগণকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমার সম্মুখে চলে আসো। তোমার ও আমার যুদ্ধেই প্রমাণিত হবে কার হৃদয় মরচে পড়া এবং কার চোখ অজ্ঞতায় ঢাকা। মনে রেখো, আমি আবুল হাসান যে তোমার পিতামহকে (উৎবা ইবনে রাবিআহ্‌), তোমার ভ্রাতাকে (হানযালাহ্‌ ইবনে আবি সুফিয়ান), তোমার চাচাকে (অলিদ ইবনে উৎবা) বদরের যুদ্ধে খন্ড বিখন্ড করে হত্যা করেছিলো। সে-ই তরবারিটি এখনো আমার কাছে আছে এবং আমি এখনো সে দিনের মতো একই মনোভাব নিয়ে শত্রুর মোবাবেলা করি। আমি দ্বীনের কোন কিছুই পরিবর্তন করিনি এবং আমি কোন নতুন নবী নির্বাচন করিনি। নিশ্চয়ই, আমি দ্বীনের রাজপথে চলছি যা তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করেছো এবং জোর জবরদস্তির পথ বেছে নিয়েছো। [১]

মুয়াবিয়ার একটি পত্রের প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ "তুমি লেখেছো যে, আমরা উভয়েই আবদ মানাফের বংশধর। তোমার একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু উমাইয়া কোন ক্রমেই হাশিমের সমতুল্য নয়; হারব কোন দিক দিয়েই আবদাল মুত্তালিবের সমতুল্য নয় এবং আবু সুফিয়ান কখনো আবু তালিবের সমতুল্য নয়। সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তগণ (মক্কা বিজয়ের পর) কোন অবস্থাতেই মুহাজিরগণের সমতুল্য হতে পারে না। একজন দত্তশপুত্র (পালিতপুত্র) কখনো একজন বিশুদ্ধ বংশধরের সমতুল্য হতে পারে না। কোন বিপদগামী একজন সত্যের অনুসারীর সমতুল্য হতে পারে না এবং কোন মোনাফিক ঈমানদারের সমতুল্য হতে পারে না। যারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদের অনুসরণকারী উত্তরসূরীগণ কতই না মন্দ উত্তরাধিকারী।

এছাড়াও আমাদের বংশ নবুয়তের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এবং এ বৈশিষ্ট্য বলে আমরা পরাক্রান্তগণকে পরাভূত করেছি ও পদদলিতগণকে ওপরে তুলে এনেছি। যখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌, আরবকে তাঁর দ্বীনের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাতে আত্মসমর্পন করেছিলো তখন তুমি তাদেরই একজন ছিলে যারা লোভে অথবা ভয়ে দ্বীনে প্রবেশ করেছিলে। তুমি এমন এক সময়ে দ্বীনে প্রবেশ করেছো যখন তোমার পূর্ববর্তীগণ অনেক এগিয়ে গেছে এবং মুহাজিরগণ একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ফেলেছে। [২]

অপর একটি চিঠিতে তিনি মুয়াবিয়াকে লিখেছেন ঃ "তুমি আমাদেরকে আহ্বান করেছো কোরআনের মাধ্যমে একটা সমঝোতা করতে অথচ তুমি কোরআন মান্যকারী

---

১ নাহ্‌জুল বালাঘা, পত্র ঃ ১০

২ নাহ্‌জুল বালাঘা, পত্র ঃ ১৭

করেছ, তাই শোন ঃ যদিও আমরা আল্লাহ্‌র রাসুলের সর্বোচ্চ উত্তরাধিকারী এবং সবচাইতে নিকটতম আত্মীয় তবুও খেলাফত বিষয়ে আমরা বেশি অত্যাচারিত। এটা কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকের কাজ যাতে তাদের হৃদয় লোভাতুর হয়ে পড়েছিল; যদিও কিছু লোক এর পরোয়া করে নি। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক এবং বিচার দিনে সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

এখন সেই ধ্বংসযজ্ঞের কেচ্ছা ছাড় যা নিয়ে চতুর্দিকে হৈ চৈ হচ্ছে।

এখন আবু সুফিয়ানের পুত্রের (মুয়াবিয়া) দিকে তাকাও। কান্নার পর সময় এখন আমাকে হাসাচ্ছে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, আল্লাহ্‌র কসম, তার কর্মকান্ড সকল বিস্ময়কে ছাড়িয়ে গেছে এবং সব রকম অবৈধতাকে বৃদ্ধি করেছে। এসব লোক আল্লাহ্‌র প্রদীপের আলো-শিখা নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর ঝরনাকে তার উৎসস্থলে বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। তারা মহামারী উৎপাদক পানি আমার ও তাদের মধ্যে মিশ্রিত করতে চেয়েছিল। যদি পরীক্ষামূলক দুঃখ-দুর্দশা আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে তাদেরকে আমি সত্যবাদিতার পথে নিয়ে যেতে পারতাম। অন্যথায় ঃ "সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সম্যক জানেন যা ওরা করছে"। [১] (সূরা ঃ সোয়াদ - ৮)

একই অর্থবোধক বাক্য হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর দাফন করার সময় রাসুল (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ "নিশ্চয়ই, আপনার কন্যা সাক্ষাত লাভ করেই আপনাকে বিস্তারিত বলেছেন যে, আপনার উম্মাহ তাঁর প্রতি কতই না অত্যাচার করেছে। আপনি দয়া করে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বিস্তারিত খবর জেনে নেবেন। এসব ঘটনা এত অল্পকালের মধ্যে ঘটেছে যে, লোকেরা এখনো আপনাকে স্মরণ করে এবং আপনার কথা বলাবলি করে"। [২]

মুয়াবিয়ার একটি চিঠিতে হযরত আলী (আঃ) বলেন ঃ "তোমার আরাম-আয়েশ ও বিলাসবহুল জীবন যাপনের ফলে তুমি যা ভুলে গেছ আমি শুধু তা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শয়তান তার দৃঢ় মুষ্ঠিতে তোমাকে এঁটে ধরেছে, তোমার মাধ্যমে তার আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করছে এবং তোমার আত্মা ও রক্তের যেরূপ নিয়ন্ত্রণ তোমার ওপর রয়েছে শয়তান তোমাকে তদ্রূপ নিয়ন্ত্রণ করছে।

হে মুয়াবিয়া, কোন প্রকার অগ্রণী ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য ছাড়াই তুমি কখন জনগণের রক্ষাকর্তা ও তাদের কর্মকান্ডের অভিভাবক বনেছো? অতীতে দুর্ভাগ্যজনক ধ্বংস থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমাকে সতর্ক করছি পাছে তুমি কামনা-

---

১ নাহ্জ আল-বালাঘা, খোৎবা ঃ ১৬১

২ নাহ্জ আল-বালাঘা, খোৎবা ঃ ২০১

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম তিন খলিফা-এ-মুসলেমিন সম্পর্কে ঃ

ইতিপূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসুল (সাঃ)-এর কোন সাহাবীরই সমালোচনা বরদাশ্ত করতে চান না বরং সকল সাহাবীকে তারা আদেল (ন্যায় পরায়ন) বলে মান্য করেন। যদি কোন স্বাধীন চেতা মানুষ কোন সাহাবীর কর্মকান্ডকে সমালোচনা করে, আর সে যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদেরই দলভূক্ত হয়, তবুও আহলে সুন্নাতগণ তার প্রতি লানত করেন এমন কি তাকে কাফেরও বলে থাকেন। যেমনটি মিসরের কিছু স্বাধীন চেতা আলেমদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঃ শেখ মাহমুদ আবু রাইয়া সাহেবের **"আযৃয়ু আলাস সুন্নাতুল মুহাম্মদিয়া"** এবং **"শেখ মোযীরাহ্"** কাজী শেখ মুহাম্মদ আমীন আন্তাকী সাহেবের **"লিমাযা উখতিরাত মাযহাবে আহলে বাইত"** এবং সৈয়্যেদ মুহাম্মদ ইবন আকীল হাসানের বই **"আন্নাসায়েহ্ আল কাফিয়া লিমাঈ ইতাওয়াল্লা মুয়াবিয়া"** এমন কি মিসরের কিছু বিজ্ঞ লেখকবৃন্দ জামেয়া আজহারের ভাইস চ্যান্সেলর শেখ মাহমুদ সালতুতকেউ তখন কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে **"জাফরী মাযহাব"**-কে গ্রহণ করা জায়েজ। যে মাযহাবটি ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

যখন **'জামেয়া আজহার'**-এর ভাইস চ্যান্সেলর এবং সেখানকার মুফতির প্রতি এই কথার জন্য লানত দেয়া হতে পারে যে তাঁরা শিয়া মাযহাবকে সত্য বলেছেন তাহলে ঐ শিয়ার অবস্থা কি হবে যে, বাপ দাদার ধর্মের প্রতি গভীর সমালোচনা এবং অনেক সন্ধান চালানোর পর যেটাকে গ্রহণ করেছে। নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাতগণ সেটা বরদাশ্ত করবেন না বরং তাকে দ্বীন থেকে খারিজ এবং ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করবেন। তাদের দৃষ্টিতে এই চারটি মাযহাবই ইসলাম -এগুলো ছাড়া বাকী সব বাতিল আর বাতিল।

ঐসমস্ত মানুষের বিবেক মরে গেছে, তাদের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। এগুলি হচ্ছে সেই বিবেক, যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, নবী (সাঃ) যখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তারা তাঁর সাথে কঠিন ভাবে যুদ্ধ করে। কেননা নবী (সাঃ) তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলেন এবং একাধিক আল্লাহ্র পূজা করা থেকে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"আর তারা আশ্চার্যান্বিত হয় যে, তাদের মধ্য হতে ভয় প্রদর্শনকারী কিভাবে এলো। এবং কাফেরগণ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল যে, এ হচ্ছে যাদুকর এবং মিথ্যুক, সে কি সমস্ত আল্লাহ্কে একত্র করে একটি আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে। এটা তো অনেক আশ্চর্যের ব্যাপার"**। [১]

---

১ সূরা ছোয়াদ ঃ ৪

লোক নও। আমরা কোরআনের রায়ের প্রতি সাড়া দিয়েছি। আমাদের সে সাড়া কোন অর্থেই তোমার প্রতি নয়।[১]

"ওয়াকুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুক্বা" অর্থাৎ 'এবং বল সত্য আসিয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই"।[২]

১ নাহ্জ আল-বালাঘা, পত্র ঃ ৪৮

২ সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৮১

বরং রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর ইসমাতের প্রতিরক্ষা করা এবং ঐ সমস্ত সন্দেহ গুলিকে দূরীভূত করা, যেগুলিকে উমাইয়া এবং আব্বাসীয়রা, প্রাথমিক যুগে ইসলাম এবং নবী (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যারা বল পূর্বক মুসলমানদের হাকিম সেজে বসেছিল, যারা নিজেদের গোপন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে রদ-বদল করে দিয়েছে। তাদের এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রভাব মুসলমানদের উপর খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুসলমানগণ ভাল নিয়তেই উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের আনুগত্য করে, তাদের রেওয়ায়েতকৃত হাদীস সমূহ বিনা বাক্য ব্যয়ে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং চিন্তা করে যে এটাই হচ্ছে **'ইসলাম'**। সুতরাং এটাকে কবুল করে নেয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং এর সত্যতা যাচাই করা জায়েজ হবে না।

মুসলমানরা যদি সত্য জানতে পারতেন তাহলে কস্মিনকালেও তাদের আনুগত্য করতেন না, আর না তাদের কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত কোন হাদীসই গ্রহণ করতেন। আর যদি ইতিহাস আমাদের জানাতো যে, সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ-নির্দেশ মান্য করে চলেছেন, তাঁর হুকুমের প্রতি কোন রকম আপত্তি অভিযোক করেন নি এবং শেষ মুহূর্তে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করেন নি, তাহলে আমরা তাদের সবাইকে আদেল (ন্যায় পরায়ন) বলে মেনে নিতাম এবং তাদের নিয়ে কোন রকম সমালোচনাই হতো না। কিন্তু কোরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মিথ্যাবাদী, কেউ কেউ মুনাফিক আবার কেউ কেউ ফাসিকের অন্তর্ভূক্ত।

সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর উপস্থিতিতেই পরস্পর বিরোধ করেছেন, তাঁর আদেশের বিরোধিতা করেছেন, এমনকি তাঁর (সাঃ) প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অভিযোগ চাপিয়েছেন, **'শেষ ওসিয়াত'** লিখতে দেন নি। ওসামার সেনাবাহিনীতে যোগদান না করে সরাসরি রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য করেছেন। নবীর (সাঃ) খলিফা হওয়ার জন্য তারা এতো হট্টগোল করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত গোসল ও কাফন ছাড়াই তাঁর পবিত্র দেহকে ফেলে চলে যান এবং খেলাফতের জন্য ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দেন। কেউ বা তাতে রাজি হন আবার কেউ অস্বীকার করেন। রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর প্রত্যেক বিষয়েই বিরোধ সৃষ্টি করেন। এমনকি একে অপরকে কাফির বলা শুরু করে দেন। পরস্পর লানত দেয়া শুরু করে দেন, একে অপরকে হত্যাও করেছেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং আল্লাহ্‌র একমাত্র দ্বীন বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, এর কারণ খুজে দেখি এবং ইহাও খুজে দেখতে হবে যে, সবচেয়ে উত্তম উম্মত কি কারণে এক গভীর খাদে পতিত হলো। নীচ, হীন এবং একটি জাহেল (মূর্খ) উম্মত বলে বিবেচিত হতে লাগলো। যার পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে, যার পবিত্র স্থান সমুহকে পদদলিত করা হচ্ছে। যার গত্রোগুলোকে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, যাকে দেশ থেকে দেশান্তর করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার মত শক্তি টুকুও কারোর নেই। আর না এই নোংরা কালিমাকে ললাট থেকে মুছে ফেলার যোগ্যতা আছে।

আমার বিশ্বাস হয় যে, আমাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে যা ঐসমস্ত হিংসুটে লোকদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হবে। যারা নিজেদেরকে অপরের হাকিম বানিয়ে রেখে এবং কারোর সাহস নাই যে তাদের সম্মুখে কোন সাহাবীর প্রশংসার স্থলে তার সমালোচনা করবে -অথচ **সাহাবার প্রশংসা দ্বীনের অংশ নয়। আর বিষয়টা যখন দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তখন সাহাবাদের সমালোচনাকারী ব্যক্তিকে কোন আলেম দ্বীন হতে খারিজ বলে ঘোষণা দিতে পারে না, আর না তাকে কাফের গণ্য করতে পারবে। করাণ দ্বীনের 'উসূল' ও 'ফুরুয়'-এর মধ্যে সাহাবার কোন নাম গন্ধ নাই।**

কতক বিদ্বেষীগণ নিজেদের মাঝে এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন যে, আমার বই **"অবশেষে আমি সত্য পেলাম"** ঠিক তেমনই একটি বই যেমন সালমান রুশদীর **"স্যাটানিক ভার্স"** উক্ত গুজব (প্রপাগান্ডা) দ্বারা তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো এই যে, লোকেরা যেন আমার বই পড়া থেকে বিরত থাকে এবং আমার প্রতি লানত তথা গালিগালাজ করুক।

যদিও এটা কঠিন ধোকাবাজী এবং বিরাট দোষারোপ। অতি শীঘ্রই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হিসাব নিবেন। তারা কিভাবে আমার **"অবশেষে আমি সত্য পেলাম"** বইটিকে সালমান রুশদীর **"শয়তানের আয়াত"** নামক বইয়ের সাথে তুলনা করলেন? আমার বইতে রাসুল (সাঃ)-এর ইসমাত (নিষ্পাপতা)-কে ক্ববুল করা হয়েছে এবং আহলে বাইতের ইমামদের (আঃ) নেতৃত্বের দিকে আহ্বান করা হয়েছে -যাদেরকে আল্লাহ্ পাক সমস্ত প্রকার রিজস্ হতে মুক্ত রেখে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছেন। অথচ সালমান রুশদীর বইতে ইসলাম এবং ইসলামের নবী (সাঃ)-এর প্রতি গালিগালাজ করা হয়েছে এবং লেখক ইসলামকে **'শয়তানের ফুতকার'** বলে আখ্যায়িত করেছে !!!

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না"**। [১]

উক্ত আয়াতের উপর বিশ্বাস রেখেই আমি কোন কিছুর পরোওয়া করি না। আমি তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লানতকারীর লানতকে পরোওয়া করি না, যতক্ষণ আমি সঠিক ও শুদ্ধ ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং নবী (সাঃ)-কে সমস্ত ভুল-ক্রটি থেকে মুক্ত প্রমান করে যাচ্ছি। যদিও কাজটি করার জন্য কোন সাহাবার সমালোচনা হয়ে যায়, এমনকি উক্ত সাহাবা **'খোলাফায়-এ-রাশেদীন'**-এর অন্তর্ভূক্ত হন না কেন, তাতেও কোন পরওয়া নেই। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর সমস্ত ভুল-ক্রুটি মুক্ত হওয়াই শ্রেয়। আমার প্রিয় এবং জ্ঞানী-গুণি পাঠকগণ, আমার লেখনী দ্বারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, আমার উদ্দেশ্য কি? আমার উদ্দেশ্য সাহাবাদের সম্মান বৃদ্ধি বা সম্মান হনন করা নয়,

---

১ সূরা নিসা ঃ ১৩৫

রাসুলের (সাঃ) স্ত্রী, আবু বকরের কন্যা আয়শার (রাঃ) বিষয়ে যেসমস্ত তথ্য আমরা আহলে সুন্নাতের সহীহ্ গ্রন্থসমূহ থেকে উপস্থাপন করেছি, সেগুলিকে তারা কিভাবে সহ্য করবে?

এতক্ষণে প্রথম তিন খলিফার চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। প্রথমতঃ আমরা বলতে চাই যে, **'প্রত্যেক সাহাবীর ত্রুটি মুক্ত হওয়ার আকিদাটি সঠিক নয়'** -কারণ অনেক ঘনিষ্ট সাহাবাদের মধ্যেও ন্যায়-নীতির যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমরা আমাদের সুন্নি ভাইদের কাছে প্রমান করব যে এই সমালোচনার অর্থ গালি-গালাজ নয় বরং হাকিকাত পর্যন্ত পৌছানোর জন্য চোখের সামনে থেকে পর্দাকে সরিয়ে দেয়া মাত্র। তবে এ কথাগুলি শিয়াদের মনগড়া বা তাদের নিজস্ব সৃষ্ট কিছু নয় -যেটা সাধারণভাবে রটানো হয়ে থাকে। অথচ সমস্ত কথা আহলে সুন্নাতের ঐ সমস্ত বই থেকে সংগৃহীত, যে বইগুলিকে সুন্নিরা সহীহ্-শুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে আনুগত্য ও অনুসরণ করা নিজেদের জন্য ওয়াজিব মনে করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ঃ

বুখারী তার সহীহ্র ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় **"কিতাবে তাফসীরুল কোরআন"**-এ সূরা হুজরাতের শানে নাজুলে লিখেছেন যে ঃ আমাকে নাফে ইবনে উমর এবং তার কাছে ইবনে আবি মালিকা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আবু বকর ও উমর তো তখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন যখন রাসুল (সাঃ)-এর উপস্থিতিতেই উভয়ের মাঝে বাক-বিতন্ডতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন রাসুল (সাঃ)-এর নিকট বনী তামিম গোত্রের একটি দল এসে উপস্থিত হয়। তখন উভয়ের মধ্য হতে একজন আকরা ইবনে হাদিসকে উক্ত গোত্রের আমির নিযুক্ত করতে অনুরোধ জানায় এবং অপরজন অন্য এক ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে। নাফে বলেন যে সেই ব্যক্তির নাম তার মনে নাই। আবু বকর উমরকে বলেন, **"তুমি সব সময় আমার বিপক্ষে চিন্তাভাবনা কর"**। উমর বলেন, **"না"**। কথা কাটাকাটির সময় উভয়ের কন্ঠস্বর উচু হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই আয়াত নাযিল করলেন, **"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠেস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উঁচু করিও না"**। [১] ইবনে যুবায়ের বলেন যে, উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর উমর চুপ হয়ে যান, এমন কি তিনি আর কোন প্রশ্ন তুলেনি, আর না আবু বকরের সাথে কোন আলোচনা করলেন।

বুখারী তার সহীহ্র ৮ম খন্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় **"কিতাবুল এ'তেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ"**-তে ওয়াকি হতে এবং তিনি উমর ইনবে আবি মালিকা হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ উক্ত দুই বুজুর্গ, আবু বকর ও উমর তখন তো প্রায় ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিলেন যখন বনী তামীম গোত্রের একটি দল নবীর (সাঃ) নিকট আসে এবং উভয়ের মধ্যে হতে একজন আকরা ইবনে হাবিস তামীমি হানজালি-কে উক্ত গোত্রের আমীর নিযুক্ত করতে বলেন এবং

---

১ সূরা হুজুরাত ঃ ২

আমার মত অনুযায়ী এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো, ব্যক্তিগত সমালোচনা করা এবং মানুষের উচিৎ হবে নিজের অন্তরে উঁকি মেরে দেখা, বাপ দাদার অন্ধ অনুকরনে গর্ববোধ না করা। সত্যিকার মাসুমীন (আঃ) আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, আমরা যেন আমাদের রোগ, দলাদলি, অযোগ্যতা এবং অসফলতার কারণ খুজে দেখি। আর রোগ যখন ধরে ফেলবো তখন সেটা থেকে শেফা (মুক্তি) পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ঔষধ নির্ণয় করে নেব -নিজেদের বিদায় নেয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মের আগমনের পূর্বেই।

এটাই হলো আসল উদ্দেশ্য। আর একমাত্র আল্লাহ্ হচ্ছে উপাসনার যোগ্য, তিনিই তাঁর বান্দাদের সোজা পথের হেদায়েত দান করে থাকেন।

আর যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সঠিক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপত্তিকারীদের আপত্তি এবং ঐ সমস্ত বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গ যারা সাহাবাদের প্রতিরক্ষা করার নামে অন্যদেরকে গালি-গালাজ করা ছাড়া কিছুই জানে না -তাদের কোন মূল্যই থাকবে না। আমরা কিন্তু তাদের নিন্দা করি না, আর তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষও পোষণ করি না, বরং তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কান্না-কাটি করি। কারণ তারা অসহায়, সাহাবাদের প্রতি অন্ধ ভালবাসা, তাদের বাস্তবতার ধারে কাছেও ভিড়তে দেয় না। তাদের উদাহরণ তো ঐসমস্ত ইয়াহুদ ও নাসারাদের মত যারা নিজেদের বাপ-দাদার অনুসরণকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতো। আর নিজেদের নফসের্ প্রতি ইসলামের জন্য চিন্তা-ফিকির করার কষ্ট দিতে চায় না। নিজেদের পূর্ব পুরুষদের ঐসমস্ত কথার প্রতি আকিদা পোষন করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) (মায়াজালাহ্) হলেন মিথ্যুক এবং তিনি নবী নন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ **"যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিবক্ত হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর"**। [১]

শত শত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে ইয়াহুদ ও নাসারাদের ইসলামের আকিদা দ্বারা সন্তুষ্ট করা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। ঐ ব্যক্তির দোষ কোথায় যে বলে, **'তোমরা যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের উপর অটল আছো সেটাতো পরিবর্তিত'** এবং নিজের এই কথার পক্ষে কোরআনকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে। তাহলে এই দলিল উপস্থাপনকারী মুসলমান কি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে?

অবিকল দশা হচ্ছে ঐ মুসলমানের, যে মনে করে যে সমস্ত সাহাবারা হলেন পাপমুক্ত। সুতরাং আর কেউ তাকে এই কথা বলে সন্তুষ্ট করতে পারবে না যে সমস্ত সাহাবা দোষ-ত্রুটি মুক্ত নন। কারণ তারা যখন মুয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াজিদের (যারা তাদের কুকর্ম দ্বারা ইসলামকে কলংকিত করেছে) সমালোচনাকে সহ্য করতে পারে না -তখন তারা আবু বকর, উমর, উসমান (যারা সিদ্দিক, ফারুক ও যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পেত) তাদের সম্পর্কে কোন কু-কর্মের কথাকে কিভাবে বরদাশ্‌ত করবে? অথবা উম্মুল মুমেনীন,

---

১ সূরা বায়্যিনা ঃ ৩

উক্ত ঘটনা যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘটতো তাহলেও আমরা আবু বকর ও উমরকে (রাঃ) নির্দোষ গণ্য করে নিতাম এবং তাদের জন্য সুপারিশ করতাম। কিন্তু রেওয়াতেটি সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেনি। উক্ত ঘটনা নবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষের দিকে ঘটে ছিল, যখন বনী তামিমের একটি দল নবম হিজরীতে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল। উক্ত ঘটনার পর রাসুল (সাঃ) মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন। যেমনটি ইতিহাস ও হাদীস বেত্তাগণ লিখেছেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর নিকট বনী তামিম দলের আমগনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর কোরআন মজিদের শেষের দিকের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"ইজা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্‌হু, ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা"** অর্থাৎ **'যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে'**। [১]

আর যখন ইহাই বাস্তব সত্য, তখন আবু বকর ও উমরের (রাঃ) বে-আদবীর জন্য (যা নবীর সামনে অনুষ্ঠিত হতো) এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমার পথ খুজে বেড়ায়। আর উক্ত ঘটনা যদি কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হতো তাহলে কিছু বলার থাকতো না এবং আমাদের পক্ষে সমালোচনা করার সাহসও হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ পাক সত্য বয়ান করতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন না। তিনি উক্ত ঘটনাটি কোরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন, যেন আবু বকর ও উমরের (রাঃ) গরম মেজাজ ও তাদের প্রকৃত চরিত্রের কথা পড়া যেতে পারে। এরপর যদি তারা এমনটি করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে দিবেন !!

এই ঘটনার পর রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চান যে, উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর (যা হযরত উমরের মর্যাদায় নাযিল হয়েছে!) তিনি যখন রাসুল (সাঃ)-এর সাথে কথা বলতেন তখন এতোই আসতে বলতেন যে কথা শুনাই যেত না তবে বুঝা যেত। অপর দিকে ইবনে যুবায়ের তার দাদা আবু বকরের (রাঃ) কোন কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ ইতিহাস ও হাদীস বেত্তাদের লিখিত ঘটনাবলী ইহার বিপরীত স্বাক্ষ্য বহন করে। এই ব্যাপারে **"বাজিয়ায়ে ইয়াওমুল খামিস"**-এর বর্ণনাটাই যাথেষ্ট হবে, তা হলো এই যে ঃ নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে, বৃহস্পতিবারে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি নবীর (সাঃ) প্রতি একটি মারাত্মক দোষ চাপিয়েছেন। তিনি বলেন যে, **"রাসুল প্রলাপ বকছেন এবং আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট"**। তারপর পরই উপস্থিত সাহাবাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। কেউ বলে দোওয়াত-কলম নিয়ে আস যেন রাসুল (সাঃ) ওসিয়াত লিখে যেতে পারেন, আবার কেউ কেউ উমরের (রাঃ) কথার পুনঃরাবৃত্তি করছেন।[২] চেচমেচী যখন চরমে পৌছালো তখন রাসুল (সাঃ) বলেন ঃ **"আমার সামনে থেকে চলে যাও, কারণ আমার সামনে তোমাদের ঝগড়া করা উচিৎ নয়"** [৩]

---

১ সূরা নাস্‌র ঃ ১-২

২ **সহীহ্ বুখারী**, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ১৩৮, **"মারাযুন্নবী ওয়া ওয়াফাতুহু"**-অধ্যায়ে।

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩৭, **"কিতাবুল ইলম"**-অধ্যায়ে।

অপরজন অন্য একজন লোকের নাম প্রস্তাব করেন। তখন আবু কবর উমরকে বলেন, **"তুমি আমার বিরোধিতা করেছ"**। উমর বলেন, **"না, আমি তোমার বিরোধিতা করিনি"**। কথোপকথনের সময় উভয়ের কণ্ঠস্বর রাসুল (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঠে যায়, ফলে আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।** [১]

ইবনে মালিকা বলেন যে, ইবনে যুবায়েরের ভাষ্য হচ্ছে যে, এরপর উমর (রাঃ) নিশ্চুপ হয়ে যান এবং এ বিষয়ে কোন আলোচনা আবু বকরের (রাঃ) সাথেও করলেন না। নবীর (সাঃ) সাথেও যখন কোন কথা বলতেন মনে হতো কোন গোপনীয় কথা বলছেন এবং কোন প্রশ্নও করতেন না।

বুখারী তার সহীহ্‌র ৫ম খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় **'বনী তামিমের গোত্র'** এবং নির্বাচনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমাকে হাশ্‌শাম ইবনে ইউসুফ বলেছে যে তাকে জারীহ, জারীহকে ইবনে মালিকা বলেছেন যে তাকে আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের খবর দেন যে, নবীর (সাঃ) নিকট বনী তামিমের একটি দল আসলে আবু বকর বলেন যে *'কাকা ইবনে মা'বদ ইবনে জারারাহকে আমীর নিযুক্ত করা হোক'*। উমর বলেন, *'না! বরং আকরা ইবনে হাবিসকে আমীর বানানো হোক'*। আবু বকর বলেন, *"তুমি আমার বিরোধিতা করছো"*। উমর বলেন, *"আমি মোটেই তোমার বিরোধিতা করিনি"*। কথা কাটাকাটিতে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেলে এই আয়াতটি নাযিল হয়, **"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।** [২]

উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর মাঝে ইসলামী আদব-কায়েদার কোন গুরুত্বই ছিল না। নিজেদের নাফসানিয়াতকে আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)-এর উপরে প্রাধান্য দিতেন। কেননা রাসুল (সাঃ) না তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন আর না বনী তামিমের বিষয়ে তাদের কোন মতামত প্রকাশ করতে বলে ছিলেন। তারপর তারা তাতেই বিরত হোন নি বরং নবীর সামনেই ঝগড়া বাধিয়ে দেন এবং তাঁর সামনে বে-আদবের ন্যায় চেঁচামেচী শুরু করে দেন এবং নিজেদের ভদ্রতা ও আদব-আখলাকের কথা বেমালুম ভুলে যান। নবীর (সাঃ) শিক্ষা দানের পর কোন সাহাবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে সে ঐ সমস্ত আদব কায়দাকে ভুলে যাবে !!

---

১ সূরা হুজুরাত ঃ ২-৩

২ সূরা হুজরাত ঃ ৩

যেহেতু আল্লাহ্ পাক নিজেই রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি খুলুকুন আযীমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁর লজ্জা একজন পর্দানশীন মহিলার চেয়েও বেশী, যেমনটি বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন। [১] এবং দু'জনই বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) দুঃশ্চরিত্র ছিলেন না, আর না তিনি কোন বেহুদা কথা-বার্তা বলতেন। রাসুল (সাঃ) বলতেন ঃ **"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র ভাল"**। [২] তাহলে **ঐ সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবাদের কি হয়েছিল যে তারা 'খুলুকুন আযীম' দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন নি?**

এই সমস্ত বিষয় ছাড়াও আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আবু বকর (রাঃ), রাসুল (সাঃ)-এর ঐ আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি, যে আদেশ বলে উসামাকে সেনা দলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাকে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে সেই দলে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। উসামার সেনাবাহিনীতে যারা যোগদান করেনি তাদের প্রতি রাসুল (সাঃ) কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। এমন কি তিনি বলেছিলেন যে, **"ওসামার সেনাবাহিনী ত্যাগকারীকে প্রতি আল্লাহ্ লানত করুক"**। [৩] ইতিহাস বেত্তা এবং নবী (সাঃ)-এর জীবনী লেখকগণ লিখেছেন যে, নবী (সাঃ) উক্ত বাক্যটি তখন উচ্চারণ করেছিলেন যখন তাঁর কাছে সংবাদ এসেছিল যে, লোকেরা উসামাকে আমীর নিযুক্ত করার কারণে খারাপ মন্তব্য করছে।

এভাবেই আবু বকর (রাঃ) তাড়াতাড়ি **'সকীফা'**-তে পৌছে যান এবং হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে দুরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দেন। এমনকি রাসুল (সাঃ)-এর গোসল, কাফন-দাফান ও জানাজার কোন পরোওয়াহ করেন নি। বরং সব কাজ বাদ দিয়ে খেলাফতের আসন দখল করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। **যে ঘনিষ্টতম সোহবতের কথা তিনি ঘাড় উচু করে বলতেন, সে সোহবতের কি হলো? ঐ বন্ধুত্ব কোথায় গেল? মনুষত্ব কোথায় গেল? ঐ সমস্ত সাহাবাদের ব্যবহারে আমি আশ্চার্যান্বিত হই যে, নবী (সাঃ) নিজের সমগ্র জীবন যাদেরকে হেদায়েত ও শিক্ষা এবং উপদেশ দেয়ার কাজেই নিঃশেষ করেছেন।** (**"আজিজুন আলাইহে মা আনিত্তুম হারীসুন আলাইকুম বিল মু'মেনীনা রাউফুর রাহিম"** অর্থাৎ **তাঁকে তোমাদের সমস্ত মুসিবত কষ্ট দেয়, তিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্যে লোভী এবং মু'মিনদের অবস্থার জন্য দয়ালু ও মেহেরবান**) -অথচ তারাই তাঁর (সাঃ) দেহ মোবারককে বিনা কাফন-দাফনে ফেলে রেখে খলিফা নির্বাচনের জন্য **'সকিফা'**-র দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। আমরা যদিও আজ বিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছি -যে শতাব্দীকে সবচেয়ে খারাপ শতাব্দী বলা হয়ে থাকে -যেখানে ভদ্রতা নামক কোন জিনিস নেই -মান সম্মান বাতাসে মিশে গেছে, এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তখন তার

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, -**কিতাবুল মানাকিব-সিফাতুন নবী**-অধ্যায়ে এবং **সহীহ্ মুসলিম**, -**কিতাবুল ফাজায়েল-কাসরাতু হায়াহিহি**-অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্ মুসলিম**, -**কিতাবুল ফাজায়েল-কাসরাতু হায়াতুন্নবী** অধ্যায়ে এবং **সহীহ্ বুখারী**, -**আল মানাকিব-সিফাতুন্নবী**-অধ্যায়ে।

৩ **মুলাল ও নাহাল শাহরশেস্তানী**, ৪র্থ অধ্যায়, কিতাবুস সাকিফা ঃ লেখক আবু বকর আহমদ ইবনুল আজিজ জাওহারী

এই চেচামেচী এবং মৃত্যু সজ্জায় সাহাবাদের বিরোধের বাক্যাবলী দ্বারা যা কিছু বুঝা যায় তাতে প্রমান হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ঐ সীমাকে লংঘন করেছেন যা সূরা হুজরাতে আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আমাদেরকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারবে না যে, ঐ সমস্ত সাহাবাদের চেচামেচী ও বিরোধিতা -রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যুসজ্জায় থাকার কথা চিন্তা করে ধীর লয়ে বা শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বরং উক্ত ঘটনা দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা গলা ছেড়ে চিৎকার দিচ্ছিলেন -এমনকি পর্দ্দার আড়ালে বসা মহিলারাও এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে বলেছিলেন যে, **'রাসুল-কে দোওয়াত-কলম এনে দাও যেন তোমাদের জন্য ওয়াসিয়ত লিখে যেতে পারেন'**। তখন উমর (রাঃ) মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে ছিলেন, **"তোমাদের মত মহিলারাই ইউসুফের সাথে ছিল যখন তিনি অসুস্থ হতেন, তখন তাদের চোখ অশ্রু জলে ভিজে যেত এবং যখন রোগ হতে মুক্তি লাভ করতেন তখন তাকে বিরক্ত করতো"**। উমরের (রাঃ) কথা শুনে রাসুল (সাঃ) বলেন, **"মহিলাদেরকে কিছু বল না, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম"**। [১]

এই সমস্ত ঘটণাবলী দ্বারা আমরা এতটুকুই বুঝতে পারি যে, সাহাবারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই কথার মর্যাদা রক্ষা বা আনুগত্য করেন নি ঃ **"হে মু'মিনগণ আল্লাহ্ ও রাসুলের অগ্রগামী হয়ো না এবং নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উচু করবে না"**। [২]

এবং সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদা মোটেই রক্ষা করেন নি। এমনকি কোন একটি মানুষ, ঐ মুহূর্তে না উমরকে (রাঃ) শাসন করলেন না বাধা সৃষ্টি করলেন, যখন তিনি রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অভিযোগ উত্থাপন করেন।

আর আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে তো ইতিপূর্বেই বয়ান হয়েছে যে, তিনি রাসুল (সাঃ)-এর সামনে বেহুদা কথা বলেছেন এবং ঘটনাটি তখন ঘটেছিল যখন তিনি উরওয়াহ্ ইবনে মাসউদকে বলেছিলেন, **"নমসাসু বেনাজ্‌রুল আদাব"** [৩]

কাস্তালানী, শারেহ বুখারী (বুখারী ব্যাখ্যাকারী) উক্ত বাক্যের 'হাশিয়া'তে লিখেছেন যে, হাশফা চোষন করাকে আরবরা জঘন্যতম গালী বলে জ্ঞান করে। সুতরাং রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে যখন এমন কথা বলা হলো তখন আল্লাহ্‌র এই কথার, **"এবং তাঁর সাথে সেরূপ উচু স্বরে কথা বল না যেরূপ উচুস্বরে একে অপরের সাথে বল"**। [৪] কোন মূল্য থাকলো কি?

---

১ **কানযুল উম্মাল**, খঃ ৩, পৃঃ ১৩৮

২ সূরা হুজরাত ঃ ১-৩

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ১৭৯

৪ সূরা হুজরাত ঃ ৩

ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন লোকজনার মুখ বন্ধ করার জন্য আবু বকরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন -কিন্তু ফাতিমার জীবদ্দশায় তা করেন নি।[১]

মুসলিম আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ, রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকরকে বলেন যে, আমার পিতার ঐসমস্ত মীরাসগুলো আমাকে দেয়া হোক যা রাসুল (সাঃ) ফাই ইত্যাদি রূপে রেখে গেছেন। তখন আবু বকর বল্লেন-যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, **"আমরা কাউকে ওয়ারেশ বানাই না, যা কিছু রেখে যাই তা হয় সাদকা"**। ইহা শুনার পর ফাতিমা রাগান্বিত হলেন এবং আবু বকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে ছয় মাস বেঁচে ছিলেন। আয়শা বলেন যে, ফাতিমা আবু বকরের কাছে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক রেখে যাওয়া 'খায়বার' ও 'ফিদাকের' হক দাবী করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর ফাতিমাকে কোন কিছুই দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, **"আমি তাই করবো যা রাসুল (সাঃ) করতেন, আমার ভয় হয়, আমার দ্বারা তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন হয়ে যেতে পারে এবং আমি গোমরাহ হয়ে যেতে পারি"**। কিন্তু যতদুর মদীনার সাদকার কথা বলা হয়ে থাকে সেটাতো তিনি (আবু বকর) উমর, আলী ও আব্বাসকে পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু **'ফিদাক'** ও **'খায়বার'** দেয়ার সময় হযরত উমর বাধা প্রদান করে বলেছিলেন ঃ **"এ দু'টোই হলো রাসুল (সাঃ)-এর সাদকা এবং তারই হক যা তিনি (সাঃ) দরিদ্রদের জন্য খরচ করতেন। আর এখন 'ওলিয়ে আমর'-এর উপর এটার অধিকার ন্যস্ত যা আজও অপরিবর্তিত"**।[২]

এতদসত্যেও বুখারী ও মুসলিম উক্ত রেওয়ায়েতকে কাঁট-ছাঁট করে এবং ক্ষুদ্রাকারে বর্ণনা করেছেন যেন সত্য সন্ধানীর চোখে বাস্তবতা ধরা না পড়ে। তিনজন খলিফার ইজ্জত রক্ষা করার বিষয়ে উভয়েই এই কাজে বিশেষ পারদর্শী। (এ বিষয়ের উপর ইনশাহ্ আল্লাহ দু'জনার সাথেই আলোচনা করবো)।

তদুপরি উপরোক্ত রেওয়ায়েত আবু বকরের (রাঃ) উদ্দেশ্যকে ফাঁস করার জন্য যথেষ্ট। তিনি ফাতিমার (সাঃআঃ) দাবীকে নাকচ করে তাঁকে রাগান্বিত করেছেন -যার কারণে ফাতিমা (সাঃআঃ) আবু বকরের (রাঃ) সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং তাঁর ওয়াসিয়াত মোতাবেক তাঁর স্বামী রাতের অন্ধকারে তাঁকে দাফন করেন এবং আবু বকরকে (রাঃ) জানাজা ও দাফনে শরীক হওয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি। বিষয়টি আমরা উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, ফাতেমার (সাঃআঃ) জীবদ্দশায় হযরত আলী (আঃ), আবু বকরের (রাঃ) বায়াত গ্রহণ

---

১ **সহীহ্ বুখারী,** ৫ম খন্ডের ৮২ পৃঃ **'কিতাবুল মাগাজী'**, গাজওয়ায়ে খায়বার অধ্যায়ে এবং **সহীহ্ মুসলিম**, 'কিতাবুল জিহাদ', **কাওলুন্নবী ঃ লা নুরেসু মা তারাকনা ফাহুওয়া সাদাকাহ্**- অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্ মুসলিম,** খঃ ২, -**'কিতাবুল জিহাদ'** ঃ কাওলুন্নবী **'লা নুরেসু মা তারাকনা ফাহুওয়া সাদকা'** অধ্যায়ে এবং **সহীহ্ বুখারী** এই হাদীসটি **'কারযুল খোমস্'** অধ্যায়ে নকল করেছেন।

প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীগণ যতদ্রুত সম্ভব তার গোসল ও কাফন-দাফনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং রাসুল (সাঃ)-এর সেই কথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন যে, **"মৃতদেহের সম্মান কর এবং দ্রুত দাফন করে মাটির কোলে হস্তান্তর কর"**।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) তাঁর এই কথা দ্বারা সত্যতা প্রকাশ করেছেন যে, **"আল্লাহ্‌র কসম কোহাফার পুত্র খেলাফতের জামা জোর পূর্বক পরিধান করেছে অথচ সে জানে যে, খেলাফতে আমার অবস্থানটি এমন, যাঁতা কলে খুটির অবস্থানটি যেমন"**। [১]

এরপর আবু বকর (রাঃ), ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর গৃহের নিকট লোকজনার সমাগম হওয়াকে **'মোবাহ্'** করে দিলেন এবং তাদেরকে এই বলে হুমকি দিতে থাকেন যে, **"বায়াত অস্বীকারকারীরা যদি গৃহ ছেড়ে বাহিরে না আসে তাহলে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে"**। এই বিষয়ে ইতিহাস বেত্তাগণ এবং রাবীগণ বংশানুক্রমে যত কথা বর্ণনা করেছেন আমরা সেগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিব না। বিস্তারিত জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ রইল।

রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর ফাতিমা (সাঃআঃ)-র সাথে আবু বকরের (রাঃ) ব্যবহার ও আচরণ ঃ

বুখারী আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ ফাতিমা বিনতে রাসুল, একজনকে তাঁর পিতার মীরাস, মদীনায় ফাই এবং ফিদাক ও খোমসের দাবীতে আবু বকরের নিকট পাঠান। কিন্তু আবু বকর তাঁর দাবী এই কথা বলে অস্বীকার করেন যে, **"নবীরা কাউকে ওয়ারেস বানান না, যা কিছু রেখে যান সেগুলি সাদকা হিসাবে গণ্য হয়। আলে মুহাম্মদ (সাঃ) উক্ত মাল হতে খাচ্ছেন এবং আল্লাহ্‌র কসম আমি রাসুল (সাঃ)-এর সদকার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করবো না। বরং এটাকে সেই অবস্থায় রাখবো যেমনটি রাসুল (সাঃ)-এর জামানায় ছিল। এবং ঠিক ঐভাবেই খরচ করবো যেমনটি রাসুল (সাঃ) করতেন"**। সুতরাং আবু বকর ফাতিমাকে কোন জিনিস দিতে অস্বীকার করেন। সে কারণে ফাতিমা আবু বকরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যান এবং তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবু বকরের সাথে কোন কথাও বলেন নি। তিনি নবীর (সাঃ) পরে ছয় মাস বেঁচে ছিলেন। যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর স্বামী হযরত আলী জানাজা পড়ে রাতের অন্ধকারে দাফন করেন এবং আবু বকরকে জানাজা বা দাফণ অনুষ্ঠানে শরীক হতে দেয়া হয়নি। ফাতিমার জীবিত অবস্থায় আলীর জন্য ওজর ছিল। কিন্তু তাঁর যখন

---

১ নাহ্জুল বালাঘা, -'খোতবায়ে শাকশাকিয়্যাহ্'

হযরত আলী ও উম্মে আইমন-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি। উক্ত ঘটনাকে **সীরাতে হালবিয়্যার** লেখক ইবনে তায়ীমায়া এবং তীম জরযী ইত্যাদীগণও লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু বুখারী ও মুসলিম সেটাকে সংক্ষিপ্তাকারে দায়সারা ভাবে লিখেছেন। তারা শুধু এতটুকুই লিখেছেন যে, **"ফাতিমা নিজের মীরাসের দাবী করেছিলেন"**-কথাটির দ্বারা বুখারী ও মুসলিম পাঠকগণকে ইহাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ফাতিমার (সাঃআঃ) রাগান্বিত হওয়া অযথাই ছিল। অতএব (মায়াজালাহ্) হযরত ফাতিমা হচ্ছেন **'জালিম'** এবং আবু বকর **'মাজলুম'** সাব্যস্ত হলেন। বুখারী ও মুসলিমের এই সমস্ত চেষ্টা তদবীর হচ্ছে আবু বকরের (রাঃ) সম্মান রক্ষা করার জন্যে -তাই তো তারা ঘটনাবলীকে বয়ান করার সময় আমানতদারী প্রদর্শন করেন নি। আর না ঐ সমস্ত হাদীসকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন যেগুলি দ্বারা খলিফাদের সত্যিকারের চরিত্র প্রকাশ হয়ে যায় এবং চোখের সম্মুখ হতে সমস্ত পর্দা সরে যায়, যেগুলি খেলাফতে রাশেদা, উমাইয়াদের নিমক হালালরা ঢেকে রেখেছে। যদিও তা নবী (সাঃ)-এর বিপক্ষে হোক বা তাঁর কলিজার টুকরা ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর বিরুদ্ধে হোক না কেন? সে কারণেই তো বুখারী ও মুসলিম আহলে সুন্নাতগণের নিকট **'মুহাদ্দেসীনদের সম্রাট'** বলে বিবেচিত হন এবং আহলে সুন্নাতগণ উভয়ের হাদীস গ্রন্থগুলিকে **'আল্লাহ্‌র কিতাব'**-এর পরে সম্পূর্ণ রূপে সহীহ্ শুদ্ধ বলে মান্য করে থাকেন। অথচ ব্যপারটি হলো সত্য হতে এমনই বিমুখতা যা কোন জ্ঞান ভিত্তিক দলিলের উপর নির্ভরশীল নয়। শীঘ্রই আমরা একটি অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করবো, যেন সত্যসন্ধানী ও সত্য প্রিয় মানুষের কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়।

তা ছাড়াও মুসলিম ও বুখারীর প্রতি আমাদের আরো অভিযোগ আছে যে, তারা উভয়েই ফাতেমা (সাঃআঃ)-এর ফাজায়েলকে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবুও তাদের বইগুলিতে ঐ সব কিছুই মজুদ আছে, যেগুলি আবু বকরকে (রাঃ) খাটো করার জন্য অকাট্য দলিল প্রমান হয়ে আছে। আবু বকর (রাঃ), বুখারী ও মুসলিমের চেয়েও শতগুণ বেশী ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর মান-মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তা জানা সত্ত্বেও তিনি ফাতিমার স্বামী হযরত আলীর (আঃ) স্বাক্ষ্যকে কবুল করেন নি। অথচ হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"আলী সত্যের সাথে এবং সত্য আলীর সাথে এবং আলী যে দিকে যায় সত্যও সেদিকেই যায়"**। [১]

আপাততঃ আমরা বুখারী ও মুসলিমের স্বাক্ষর উপরেই নির্ভর করতে চাই যে, রাসুল (সাঃ) ফাতেমা যাহরা (সাঃআঃ)-এর ফাযায়েল সম্পর্কে কি কি কথা বলেছেন ঃ

---

১ **তারিখে বাগদাদ**, খঃ ১৪, পৃঃ ৩২১, **তারিখে ইবনে আসাকির**, খঃ ৩, পৃঃ ১১৯ এবং **কানজুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ৩০

করেন নি, কিন্তু পরবর্তীতে সাহাবাদের ব্যবহারের সামনে বাধ্য হয়েই বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম যে সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন সেটা হলো এই যে, ফাতিমা (সাঃআঃ) দাবী করেছিলেন, **"যেহেতু আমার পিতা তাঁর জীবদ্দশাতেই ফিদাক সম্পত্তি আমাকে দান করেছিলেন, সেহেতু ওটা মীরাস হতে পারে না"**। এই কথাটা যদি মেনে নেয়া হয় যে, **'নবীদের ওয়ারেশ হয় না'**, যেমনটি আবু বকর নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন এবং তিনি ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। তদুপরি রেওয়ায়েতটি কোরআনের নির্দেশনার বিপক্ষে অবস্থান করে। কারণ কোরআন ঘোষণা দিচ্ছে যে, **"সোলেমান দাউদ -এর ওয়ারেশ বলে গণ্য হন"**। সুতরাং এই জ্বাল রেওয়ায়েতটি-তে ফিদাককে সংযুক্ত করা যাবে না। কারণ 'ফিদাক' রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে দান করা হয়েছিল। ওটা '**মীরাস**' নয়।

সে কারণে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, সমস্ত ইতিহাস বেত্তা, মুফাসসেরীন এবং হাদীস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, ফাতিমা (সাঃআঃ) যখন '**ফিদাক**'-কে নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁর দাবীকে নাকচ করে দিয়ে স্বাক্ষী-সাবুত উপস্থাপন করতে বলেছিলেন। ফাতেমা (সাঃআঃ) হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আইমনকে স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করেন, কিন্তু আবু বকর তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি এবং তাঁদের সাক্ষকে যথেষ্ট বলে মেনে নেন নি। **ইবনে হাজর** উক্ত ঘটনাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, **"ফাতিমা দাবী উপস্থাপন করে ছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) তাঁকে ফিদাক দান করেছেন, কিন্তু ফাতিমা তার পক্ষে আলী এবং উম্মে আইমন ব্যতীত অন্য কাউকে স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করতে পারেন নি এবং নিয়মানুসারে স্বাক্ষ্য অসম্পূর্ন থেকে যায়"**। [১]

ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজি তার তফসীরে লিখেছেন যে, "রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল করার পর ফাতিমা দাবী উপস্থাপন করেছিলেন যে, নবী (সাঃ) তাঁকে ফিদাক দান করে দিয়েছেন। আবু বকর বলেন, **'ফকীরী হালতে আপনি সবার চেয়ে প্রিয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র। কিন্তু আমি আপনার দাবীর সত্যতা জানি না, তাই আমি আপনার পক্ষে রায় দিতে পারছি না।'** ফখরে রাজি বলেন যে, **'রাসুল (সাঃ)-এর দাসী উম্মে আইমন ফাতিমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু আবু বকর বলেন যে এমন স্বাক্ষী নিয়ে আসেন যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে'**। ফাতিমা স্বাক্ষী আনতে পারেন নাই। [২]

হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) এই দাবী করেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) আমাকে '**ফিদাক**' দান করে গিয়েছেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে

---

১ **সোওয়ায়েকে মুহরেকা**, ইবনে হাজর হায়সামী, পৃঃ ২১

২ **তফসীরে মাফাতিহুল গায়েব**, রাজি ঃ খঃ ৮ পৃঃ ১২৫ ঃ সূরা হাশরের তাফসীরে।

বৎসর জিব্রাইল দু'বার কোরআন নিয়ে নাযিল হয়েছেন অথচ প্রতি বছর একবার নাযিল হতেন, এতে ইহা বুঝা যায় যে আমার সময় নিকটবর্তী। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়াহ্‌ অবলম্বন কর এবং সবর কর। নিঃসন্দেহে আমি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ -এ জন্যই আমি কান্না জুড়ে দিয়েছিলাম, যা তোমরা লক্ষ্য করেছ। আমাকে কাঁদতে দেখে রাসুল (সাঃ) খুব ধীরে বললেন, **'ফাতিমা তুমি কি এ কথা দ্বারা সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জগতে সমগ্র মুমিন নারীর সমরাজ্ঞী"** ।[১]

রাসুল (সাঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) সমস্ত মুমিন নারীদের সমরাজ্ঞী। অথচ আবু বকর (রাঃ) **'ফিদাক-এর ব্যাপারে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং তাঁর আনিত কোন স্বাক্ষই গ্রহণ করেন নি'**, তাহলে তার কাছে আর কার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে??

হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) বেহেশতে নারীদের সমরাজ্ঞী ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র ৪র্থ খন্ডের **"বাদাল খালক্‌"** কিতাবের **"মানাকিবে কুরবাতুর রাসুল"**-এর অধ্যায়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"ফাতিমা বেহেশতে নারীদের সরদার"** । অতএব ফাতিমা যখন বেহেশতে নারীদের সর্দার অর্থাৎ সমগ্র জগতের নারীদের সর্দার কারণ বেহেশতে কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর নারীগণ থাকবেন না, অন্যান্য নবীর উম্মতগণও থাকবেন, তাহলে আবু বকর (রাঃ) কিসের ভিত্তিতে তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন? আহলে সুন্নাতগণ দাবী করে থাকেন যে, আবু বকর (রাঃ) নবীর (সাঃ) সমস্ত কথাকের সত্য জ্ঞান করতেন এবং সে কারণেই তাকে সিদ্দিক উপাধি দেয়া হয়েছে - ইহাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আবু বকর (রাঃ) ফাতিমা (সাঃআঃ) সম্পর্কে রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাকে কেন অস্বীকার করে মিথ্যা সাব্যস্ত করলেন যে, **"ফাতেমা আমারই টুকরো"**? আসলে বিষয়টি ফিদাক, সাদকা এবং দানের সাথে ততটা সম্পৃক্ত ছিল না, যতটা সম্পৃক্ত ছিল খেলাফতের সাথে, যেটার প্রতি ফাতিমার (সাঃআঃ) স্বামী হযরত আলীর (আঃ) অধিকার ছিল। সুতরাং দান সম্পর্কে ফাতিমা (সাঃআঃ) এবং তাঁর স্বামীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা আবু বকরের (রাঃ) জন্য সহজ ছিল, যার দ্বারা দু'টো দাবীই নাকচ করে দেয়া হয়েছিল। এটা এমনই একটি সাংঘাতিক প্রতারনা বা প্রবঞ্চনা ছিল যার কারণে পাহাড় পর্যন্ত নড়বড়ে বা স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৬, -**'কিতাবুল ইসতায়িজান'** অধ্যায়

কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) হচ্ছেন মাসুম ঃ

মুসলিম তার সহীহ্‌তে আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) সকালে বের হলেন তখন তাঁর গায়ে একটি কালো উলের চাদর ছিল, ঐ সময় হাসান ইবনে আলী আসলেন, রাসুল (সাঃ) তাঁকে চাদরের মধ্যে নিয়ে নেন। তারপর হুসাইন আসলেন তাঁকেও রাসুল (সাঃ) চাদরের মধ্যে নিয়ে নেন। তারপর ফাতিমা আসেন, তিনিও চাদরের মধ্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর আলী আসলেন তাঁকেও রাসুল (সাঃ) চাদরের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, **"হে (পয়গম্বরের) আহলে বাইত! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন যে তোমাদেরকে সমস্ত পাপ হতে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং এমনভাবে পুতঃপবিত্র করে দিতে চান যতটুকু পুতঃপবিত্রতার হক আছে"।** [১]

সুতরাং এই উম্মতের মধ্যে একমাত্র মহিলার উদহরণ হলেন ফাতিমা (সাঃআঃ) যার নিকট হতে আল্লাহ্ সমস্ত প্রকার রিজসকে দূর করে দিয়ে পুতঃপবিত্র রেখেছেন, তাহলে আবু বকরের (রাঃ) কি হয়েছিল যে, তিনি ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তার কাছে স্বাক্ষী উপস্থাপনের দাবী জানালেন।

হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) সমগ্র জগতের মহিলাদের সমরাজ্ঞী ঃ

বুখারী ও মুসলিম **'কিতাবুল ফাযায়েল'**-এ উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সাঃ) সমস্ত স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ফাতেমা সামনে অগ্রসর হলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গী অবিকল রাসুলের (সাঃ) মত মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাঁকে দেখে বললেন, "মারহাবা! হে আমার কলিজার টুকরা"। তারপর তাঁকে নিজের ডান অথবা বাম পার্শ্বে বসিয়ে তাঁর কানে কিছু বললেন। কথাটি শুনে ফাতিমার কাপুনি শুরু হয়ে গেল। তাঁকে ভারাক্রান্ত দেখে রাসুল (সাঃ) তাঁকে ধীরে ধীরে কিছু বললেন, কথা শুনে ফাতিমা মুচকি হাসতে লাগলেন। আয়েশা বললেন, আমি ফাতিমাকে বল্লাম যে, "আমি নবীর (সাঃ) স্ত্রী অথচ তিনি (সাঃ) আপনাকে নিজের হামরাজ (রহস্য বিশ্বাসী) বানিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আপনি কাঁদতে লাগলেন"। রাসুল (সাঃ) বিদায় নিলে আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের মাঝে কি এমন গোপন কথা হলো"? ফাতিমা বলেন, "আমি রাসুল (সাঃ)-এর গোপনীয়তা ফাঁস করবো না"। আয়েশা বলেন, রাসুল (সাঃ)-এর যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন আমি ফাতিমার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম ঃ "আপনার প্রতি আমার হক আছে, তখন আপনি গোপন কথাটি বলেন নি"? ফাতিমা বলেন, "হ্যাঁ, এখন আমি সে কথাটি বলতে পারি"। তিনি বলেন, "প্রথমবার রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন যে, এই

---

১ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৬, -**'ফাযায়েলে আহলে বাইত'** অধ্যায়ে।

শুরুই করা হয়েছে আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে দুরে সরিয়ে রেখে এবং ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তাঁর সম্মানহানী করে এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার (মীরাস) থেকে বঞ্চিত করে। এবং তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে রাসুল (সাঃ) বিদায় নেয়ার পর সাহাবীদের নিকট তাদের কোন মান-মর্যাদা অবশিষ্ট নাই এবং এই ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে আলীর (আঃ) শাহাদাত, হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ)-এর হত্যা যজ্ঞের পরে রাসুল পরিবারের মহিলাদের পর্দা হনন করে। তাঁদের শিয়া (অনুসারীগণ), তাঁদেও প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হতে থাকে। সম্ভবতঃ ঐ ষড়যন্ত্রেরই জের আজ অবধি চলে আসছে। কারণ আজও ঐ ধরণেরই কর্মকান্ড বা কর্মকান্ডের ফলাফলের চিহ্ন পাওয়া যায়।

নিঃসন্দেহে একজন স্বাধীন চেতা ও সত্য সন্ধানী মানুষ এই সত্যাবলী তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন সে ইতিহাসের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করবে এবং এভাবেই বাতিলকে হক থেকে পৃথক করতে পারবে যে আহলে বাইত (আঃ)-এর প্রতি সবচাইতে বেশী জুলুম আবু বকর (রাঃ) করেছেন। এই সম্বন্ধে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের অধ্যয়নই যথেষ্ট হবে। সে যদি প্রকৃতই সত্য সন্ধানী হয়ে থাকে তাহলে সত্য স্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হবেই হবে।

এবার আসুন, বুখারী ও মুসলিম দু'জনই স্বীকার করেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) সাধারণ সাহাবাদের দাবীকে সত্য বলে গণ্য করেছেন। অথচ এই আবু বকর (রাঃ) ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ), জান্নাতে নারীদের সমরাজ্ঞী -যার পক্ষে আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে আমি তাঁর নিকট হতে সমস্ত প্রকার রিজস্-কে দূর করে দিয়ে সমস্ত রকমের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছি, তাঁর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং উম্মে আইমনের সাক্ষ্যকেও অগ্রাহ্য করেছেন। এখন আপনারা এ সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারীর কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঃ

বুখারী ও মুসলিম উভয়েই জাবির ইবনে আব্দুলাহ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, "রাসুল (সাঃ)-এর যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন আ'লা ইবনে হাজরামীর পক্ষ থেকে আবু বকরের নিকট কিছু ধন-সম্পদ এলো। আবু বকর বলেন, "নবীর (সাঃ) উপর যদি কারোর পাওনা থাকে বা তিনি (সাঃ) কারোর কাছে যদি কিছু ওয়াদা করে থাকেন তাহলে সে এসে বলুক"। জাবির বলেন, আমি বল্লাম, "রাসুল (সাঃ) আমার সাথে অনুরূপ ওয়াদা করেছিলেন"। অতঃপর আবু বকর আমার দিকে তিন বার হাত প্রসারিত করেন। জাবির বলেন যে, আমি যখন গণনা করলাম তখন দেখলাম যে আমার কাছে ১৫০০টি মুদ্রা আছে।[১]

---

১ সহীহ্ বুখারী, খঃ ৩, 'কিতাবুস শাহাদাত' এবং সহীহ্ মুসলিম, 'কিতাবুল ফাযায়েলে'।

হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ), রাসুল (সাঃ)-এর টুকরা ঃ তিনি অসন্তুষ্ট হলে রাসুল (সাঃ) রাগান্বিত হতেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌তে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমাকে আবুল ওয়ালিদ ইবনে আইনাহ্‌ হতে এবং তিনি আমরু ইনবে দীনার হতে এবং তিনি ইবনে আবি মালিকা হতে এবং তিনি মাসুর ইবনে মাখরামা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"ফাতিমা আমার টুকরো, যে তাঁকে রাগান্বিত করলো সে আমাকেই রাগান্বিত করলো"**। তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, **"ফাতেমা আমার টুকরো, যে তাঁকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল"**।

সুতরাং রাসুল (সাঃ) তাঁর কলিজার টুকরাকে রাগান্বিত করার কারণে নিজেও রাগান্বিত হন এবং তাঁকে কষ্ট বা পীড়া দানের কারণে রাসুল (সাঃ)-কেই কষ্ট দেওয়ার সমতুল্য হয়। কথাটির অর্থ হলো যে ফাতিমা হলেন নিষ্পাপ ও ভূল-ক্রটি মুক্ত, অন্যথায় নবী (সাঃ) কর্তৃক এভাবে ঘোষনা দেয়া জায়েজ হতো না। কারণ যিনি মাসুম তাঁকে কষ্ট বা পীড়া দেয়া জায়েজ নয়। কষ্ট দানকারী ব্যক্তি যতই মর্যদাবান হোক না কেন। ইসলামী শরীয়াতে আপন পর বলতে কোন তফাৎ নেই, আর না ধনি বা গরীবের কোন ভেদাভেদ আছে। এতদসত্বেও আবু বকর ফাতিমাকে কষ্ট দিয়েছেন এবং তাঁর রাগান্বিত হওয়াকে কোন পাত্তাই দেন নাই। বরং মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তাঁকে রাগান্বিতই রেখেছেন এবং ফাতিমা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আবু বকরের সাথে কথা বলেন নি এবং প্রত্যেক নামাজের পর আবু বকরের জন্য বদদোয়া করেছেন।[১]

হ্যাঁ, এটা হলো এমনই কঠিন ও বেদনাদায়ক সত্য, যার দ্বারা আরকান (স্তম্ভ) সমুহ নিষ্প্রভ ও ঈমান নড়বড় হয়ে যায়। কেননা **'সত্য'** ও **'সত্যের সন্ধানী'**, ইনসাফ পছন্দ মানুষের জন্য স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন অযুহাত অবশিষ্ট্য থাকে না যে, আবু বকর (রাঃ) ফাতিমার (সাঃআঃ) প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছেন। তাঁকে তাঁর প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করেছেন। আবু বকর (রাঃ) মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন, তাঁর হক তাঁকে দিয়ে দিতেন, কারণ ফাতিমার (সাঃআঃ) সততায় কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর সততার সাক্ষ্য তো স্বয়ং আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ) দিয়েছেন এবং আবু বকর (রাঃ)-সহ সমস্ত মুসলমানগণ তাঁর সততার বাস্তবাতাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু রাজনীতি সমস্ত সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে দেয়, ফলশ্রুতিতে **'সত্যবাদী'** মিথ্যাবাদী এবং **'মিথ্যাবাদী'** সত্যবাদী বলে বিবেচিত হয়।

জি হ্যাঁ, এটা হলো সেই ষড়যন্ত্রেরই একটি গিঁট, যেটা পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-কে শাসন যন্ত্র হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য পাকানো হয়েছিল। আর ঐ ষড়যন্ত্র

---

১ **তারিখে ইবনে কোতাইবাহ্‌** ইত্যাদী দ্রষ্টব্য।

কোরআনের পরিপন্থী। অথচ কোরআন হলো এমনই একটি হুজ্জাত বা দলিল যা কখনই বাতিল হতে পারে না, সেটা তো নবী (সাঃ) তাঁর এই কথা দ্বারা সত্য বলেছেন যে ঃ **"যখন তোমাদের কাছে আমার কোন হাদীস উপস্থাপিত হয় তখন সেটাকে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা যাচাই করে নিও -যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে মিল থাকে তাহলে গ্রহণ কর অন্যথায় সেটাকে দেয়ালে ছুড়ে মারো"**।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতের পরিপন্থী। কেউ কি আছে যে আবু বকর (রাঃ) এবং সমগ্র মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করবে যে, এই হাদীসের রেওয়ায়েত যেটা বুদ্ধি-বিবেক ও কোরআনের পরিপন্থি, **একমাত্র আবু বকরের (রাঃ) স্বাক্ষী কেমন করে গ্রহণ করা হলো যেটা না তো বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ছিল আর না কেরাআনেরই স্বপক্ষে ছিল? এবং ফাতিমা (সাঃআঃ) ও আলী (আঃ)-এর স্বাক্ষ্যকে কেন কবুল করা হয় নি?**

এখানে আমি আরো একটি কথা সংযোজন করতে চাই যে, আবু বকরের (রাঃ) মর্যাদা যতই সমুন্নত হোক না কেন, আর যত মানুষই তার পক্ষ্য অবলম্বন করুক না কেন, তিনি সৈয়্যেদাতুন নিসায়িল আলামিন ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ) এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর মর্যাদা এবং ফজিলাতের ধারে কাছেও পৌছাতে পারবেন না - কারণ স্বয়ং রাসুল (সাঃ) তাঁদেরকে সমস্ত সাহাবাদের উর্ধ্বে ফজিলাত দান করেছেন। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে, রাসুল (সাঃ) যখন আলী (আঃ)-র হাতে ইসলামের পতাকা দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ **"এই পতাকা আমি তাঁকেই দিব, যে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসুলের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং আল্লাহ্‌ ও রাসুলও তাকে বন্ধু গণ্য করেন"**। এই কথা শোনার পর সমস্ত সাহাবাদের মনে আকাংখ্যা জন্মালো যেন পতাকা তার হাতেই দেয়া হোক। কিন্তু উক্ত পতাকা রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ)-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন।[১]

রাসুল (সাঃ) আলী (আঃ) সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ **"আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে এবং আমার পরে আলী হচ্ছে সমস্ত মুমিনীনদের অভিভাবক"**।[২]

বিদ্বেষী লোকেরা যদিও উক্ত হাদীসে সন্দেহ পোষণ করে তবুও ঐ সমস্ত হাদীসগুলিতে কিছুতেই সন্দেহ পোষণ করতে পারবে না যেগুলি আলী ও ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর প্রতি অবিকল নবীর (সাঃ) মতই দরূদ পাঠের কথা বলা আছে। সুতরাং আবু বকর, উমর, উসমান (রাঃ) এবং ঐ সমস্ত সাহাবা যাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে **"তাদের নামাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হবে না যতক্ষণ না তারা মুহাম্মদ ও**

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ৫ এবং খঃ ৪, পৃঃ ২০

২ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ৭, পৃঃ ১২১ -**'ফাযায়েলে আলী ইবনে আবি তালিব'** অধ্যায়ে।

এখন কেউ আবু বকরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনি (আবু বকর) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র কথাকে কিভাবে সত্য বলে মেনে নিলেন যে, নবী (সাঃ) তাকে কিছু দান করার ওয়াদা করেছিলেন -আবু বকর তিন বার মুঠ ভর্তি করে ১৫০০টি মুদ্রা দান করলেন। অথচ **জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে উক্ত বিষয়ে কোন স্বাক্ষীও দাবী করলেন না? জাবির ইবনে আব্দুলল্লাহ আনসারী কি ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর চাইতে অধিক মুত্তাকী ছিলেন এবং সৈয়্যেদাতুন নেসায়িল আলামীনের চেয়েও কি বেশী আমলদার ছিলেন?** এর চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, ফাতিমার (সাঃআঃ) স্বামী হযরত আলীর (আঃ) স্বাক্ষ্যকেও আবু বকর (রাঃ) নাকচ করে দিয়েছিলেন -যার নিকট হতে আল্লাহ্ সমস্ত রিজসকে দূর করে দিয়ে পুতঃপবিত্র করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি একই ভাবে দরূদ পাঠানো ওয়াজিব করেছেন যেভাবে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠানো ওয়াজিব। যাঁর প্রতি ভালবাসা পোষন করা রাসুল (সাঃ) **'ঈমান'** বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করাকে **'মুনাফেকী'** বলে সাব্যস্ত করেছেন। [১]

বুখারী তার সহীহ্‌র ৩য় খন্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ "বনী সোহায়েব মাওলা ইবনে জুযআ'ন দু'টি ঘর এবং একটি হুজরার দাবী করলেন, যে রাসুল (সাঃ) ঐ ঘর সোহায়েবকে দিয়ে দিয়েছেন। মারওয়ান বললা, "এই সম্মন্ধে কে স্বাক্ষী দিয়েছে"। তিনি বলেন, "ইবনে উমর"। ইবনে উমরকে ডাকা হলো, তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসুল (সাঃ) সোহায়েবকে দু'টি ঘর এবং একটি হুজরা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং মারওয়ানও তার পক্ষে রায় ঘোষণা করলো"।

হে মুসলমান ! এই দান খয়রাত ও হুকুম আহ্‌কামের অসামঞ্জস্যতার প্রতি লক্ষ্য করুন! এটা কি জুলুম নয়? এটা কি আফসোসের বিষয় নয় যে, খলিফা শুধু ইবনে উমরের স্বাক্ষীকে যথেষ্ট মনে করে দাবীদারের পক্ষে রায় ঘোষণা করে দিলেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কি এই প্রশ্ন করার অধিকার নাই যে, **তাহলে আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ) এবং উম্মে আইমনের স্বাক্ষ্যকে কেন প্রত্যাখ্যান করা হলো?** অথচ একজন পুরুষ ও তার সাথে একজন নারীর স্বাক্ষ্য মাত্র একজন পুরুষের স্বাক্ষীর চাইতে বেশী মজবুত ও শক্তিশালী। যা আমরা পবিত্র কোরআন মজিদে স্বাক্ষীর নেসাবে সংক্রান্ত আয়াতে দেখতে পাই। **তাহলে সোহায়েবের সন্তানরা কি নবী (সাঃ)-এর কন্যার চেয়েও অধিক নিজেদের দাবীর জন্য সত্যবাদী ছিলেন?** আসলে ক্ষমাতাসীনদের কাছে ইবনে উমর সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে বিবেচিত হয়েছেন, অথচ হযরত আলী (আঃ)-কে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী বলে মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মোতাবেক যে দাবী করা হয়েছে যে, **"রাসুল (সাঃ) কাউকে ওয়ারেশ নিযুক্ত করে যান নি"** এবং আবু বকরের ঐ দাবী দ্বারা ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, অথচ আবু বকর (রাঃ) নিজের ঐ কথার স্বপক্ষে কোন স্বাক্ষী পেশ করেন নাই। এটাতো সম্পূর্ণ

---

১ **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ৬১ ও **সহীহ্ তিরমিজি**, খঃ ৫, পৃঃ ৩০৬ এবং **নাসায়ী**, খঃ ৮, পৃঃ ১১৬

উমর যখন খাইবার সম্পত্তি বন্টন করলেন তখন তিনি নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণের মাঝে জমি এবং পানিও বন্টন করলেন এবং বলেন যে, এটা হতে যার যেমন ইচ্ছা গ্রহণ করে নিক। অতঃপর স্ত্রীগণের মধ্য হতে কেহ জমি নিলেন আর কেহ ওয়াসাক নিলেন, আয়েশা কিন্তু জমি নিয়েছিলেন।[১]

উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফাতিমা (সাঃআঃ) খাইবার-কে তাঁর অংশ বলে দাবী করেছিলেন এবং সেটাকেই পিতার মীরাস বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) তাঁর দাবীকে এই কথা বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন যে, **"নবীগণ কাউকে ওয়ারেশ নিযুক্ত করে যান না"**। এই রেওয়ায়েত উপরন্তু এ কাথাও বলে দিচ্ছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব তার খেলাফত আমলে নবী পত্নীগনের মাঝে খাইবার সম্পত্তি বন্টন করেছিলেন এবং তাদেরকে এমন অধিকার দিয়েছিলেন যে, যার যেমন ইচ্ছা জমি অথবা ওয়াসাক নিয়ে নিতে পারেন এবং আয়েশা (রাঃ) জমিন নিয়ে ছিলেন। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, **নবী (সাঃ) যখন কাউকে ওয়ারেশ নিযুক্ত করেই যান নি তাহলে আয়েশাকে (রাঃ) স্ত্রী হওয়ার কারণে 'মীরাস' কেন দেয়া হলো? আর ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে সন্তান হওয়ার কারণে 'মীরাস' হতে কেন বঞ্চিত করা হলো? প্রথম তিন খলিফা-এ-মুসলেমিন ও সাহাবা ভক্ত আহলে সুন্নাতের পন্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?**

উক্ত বিষয়ে জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতগণ আমাদের ফতোয়া দিলে, অবশ্য অবশ্যই তার প্রতিদান বা সোওয়াব পাবেন।

এখানে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে, নবীর (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আয়েশা বিনতে আবু বকর নবীর (সাঃ) সমস্ত গৃহের উপর কবজা করে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য স্ত্রীগনকে কোন হিস্‌সাই দেন নাই। আয়েশা (রাঃ) তার পিতা আবু বকর এবং উমরকে (রাঃ) তাঁর (সাঃ) পাশেই দাফন করিয়েছিলেন এবং ইমাম হুসাইন (আঃ) যখন ইমাম হাসানের (আঃ) জানাজা তাঁর নানার পাশে দাফন করতে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন আয়েশা (রাঃ) বাধা প্রদান করে দাফন করতে দেন নি। ঐ মুহূর্তে ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, **"তুমি উটের উপর বসেছো, গাধার উপরেও বসেছো -বেঁচে থাকলে হাতীর উপরেও বসতে পারবে -এখানে আট ভাগের এক ভাগ মাত্র তোমার অংশ -অথচ সম্পূর্নটার মালিক সেজে বসে আছো"**।

যাহোক, বিষয়টিকে দীর্ঘায়ীত করতে চাই না -সত্য সন্ধানীগণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই সত্য অবশ্যই জানতে পারবেন। কিন্তু এখানে ফাতিমার (সাঃআঃ) ঐ খোৎবা যা তিনি আবু বকরসহ (রাঃ) সমস্ত বড় বড় সাহাবাদের উদ্দেশ্যে রেখেছিলেন -সেটার কিছু অংশ উপস্থাপন করতে চাই। এর দ্বারা কেউ যদি **'হালাক'** হয় তো হোক, আর

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৩, পৃঃ ৬৮

আলে মুহাম্মদের প্রতি দরূদ পাঠ করেন" -যে কথাটি আহলে সুন্নাতের হাদীস সমুহেও সংগৃহীত হয়েছে। [১]

এমনকি ইমাম শাফেয়ীও আহলে বাইত (আঃ)-এর শানে বলেছেন ঃ **"মান লামইউসাল্লে আলাইকুম লা সালাতা লাহু"** অর্থাৎ **"যে আপনাদের প্রতি দুরূদ পাঠ করবে না তার নামাজ হবে না"**।

অতএব তাদের মিথ্যা দাবী ও বাতিল কর্ম-কান্ডগুলি যখন জায়েজ হয়ে যাবে তখন একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ইসলামের উপর শান্তি বর্ষন এবং দুনিয়াকে ধুলিস্যাৎ করতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন প্রশ্ন করবেন যে, আবু বকরের স্বাক্ষ্যকে কেন কবুল করা হলো এবং আহলে বাইত (আঃ)-দের স্বাক্ষ্যকে কেন নাকচ করে দেওয়া হলো? তখন উত্তর দেয়া হয়ে থাকে যে, **"তারা শাসক ছিলেন, আর শাসকের অধিকার আছে যেমন খুশি তেমন বিচার করবে। কেননা হক (সত্য) সর্বাবস্থায় শাসকের পক্ষেই অবস্থান করে"**। এবং শক্তিশালীরা অবিকল হিংস্র পশুর মতই দাবী করে থাকে -**'জোর যার মুল্লুক তার'**।

সুধী পাঠক মন্ডলী, আমার সাথে আপনারাও এই কথার সত্যতার জন্য 'নবীর মীরাস' সম্পর্কে বুখারীর পক্ষপতিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক কথিত এই হাদীস যে, **"নাহনু মা'শেরাল আম্বিয়াউ লা নূরেসু মা তারাক্না সাদাকাতু"** সমগ্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এই হাদীসকে সহীহ্ শুদ্ধ বলে মান্য করে থাকেন এবং এটাকেই দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে বলেন যে এই কারণে আবু বকর (রাঃ) ফাতিমা যাহরার (সাঃআঃ) দাবীকে কবুল করেন নাই।

যে বিষয়টি উক্ত হাদীসকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করে তা হলো এই যে, উক্ত ঘটনার পরবর্তী সময়ে এই হাদীসের বিপরীতে আমল করা হয়েছে। ফাতিমা যেভাবে নিজের **'মীরাস'** দাবী করেছিলেন ঠিক সেভাবেই নবী পত্নী উম্মুল মু'মনীনগণও তাঁদের মীরাসের ব্যাপারে আবু বকরের কাছে কাউকে পাঠিয়ে ছিলেন। [২]

বুখারীর কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীরা কাউকে ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান না। কিন্তু অন্যত্র বুখারী নিজেই উক্ত কথার বিপরীতে লিখেছেন যে, "উমর ইবনে খাত্তাব নবীর (সাঃ) স্ত্রীগণের মাঝে মীরাস বন্টন করেছিলেন"। বুখারী কিতাবুল ওয়াকালাহ্ -**'আল মাজারেআহ্ বিশ্শাতরু ওয়া গাইরু'** অধ্যায়ে নাফে হতে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ নবী (সাঃ) খাইবারের ক্ষেত-খামার এবং ফলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আ'মিল (রক্ষক) নিয়োগ করে ছিলেন। সুতরাং স্ত্রীগণের মাঝে ১০০ ওয়াসাক (একটি পরিমাপ, প্রায় ১৮০ কেজি পরিমান ওজন সমতুল্য)-এর মধ্য ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক জব বন্টন করতেন।

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ২৭ **'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নবী'** অধ্যায়ে।

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ২৪, -**'কিতাবুল মাগাজী'**।

কসম যারা রাসুল (সাঃ)-কে যাকাত দিয়েছে তারা যদি আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো"। উমর বললেন, "খোদার কসম আমি দেখলাম যে যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্ আবু বকরের বক্ষ বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তখন আমি বুঝে ফেলাম যে এটাই হচ্ছে হক"।

আবু বকর ও উমরের (রাঃ) জন্য এটা কোন নতুন বিষয় ছিল না। এ দু'জনই তখন ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর ঘর পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, যখন বায়াত অস্বীকারকারীরা তাঁর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।[১] তারা (আবু বকর ও উমর) যখন আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং ঐ সমস্ত বুযুর্গ সাহাবাদের পুড়িয়ে মারার জন্য তৈরী ছিলেন যারা বায়াত অস্বীকার করেছিলেন, তখন যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যা করা তো তাদের জন্য খুবই সহজ বিষয় ছিল। অতএব, রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্র বংশধর এবং উত্তম সাহাবাদের তুলনায়, দূর-দুরান্তে বসবাসকারীদের মান-মর্যাদার কি কোন মূল্য ছিল? এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বায়াত অস্বীকারকারী লোকজন, রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তানুযায়ী '**খেলাফত**'-কে নিজেদের হক বলে গণ্য করতেন। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাদের জন্য খেলাফতের সিদ্ধান্ত রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ছিল না, তবুও 'শোরা'র সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের আপত্তি ও সমালোচনা করার অধিকার ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁদেরকে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রমাণিত হয়েছে। আর আলী (আঃ) নিজে ধৈর্য ধারণ পূর্বক শান্ত হয়ে মুসলমানদের রক্তের হেফাজত এবং ইসলামের ঐক্যের খাতিরে তাদের বায়াত করার অনুরোধ না করতেন তাহলে আবু বকর ও উমর (রাঃ) সবাইকে পুড়িয়ে মারতেন।

তখন সমস্ত বিষয়-আশয় তাদেরই মর্জি মোতাবেক চলছিল, তাদের অবস্থান দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। ফাতিমার (সাঃআঃ) ইন্তেকাল এবং আলীর (আঃ) সমঝোতা করে নেয়ার পর আর কে ছিল যে, তাদের কোন ব্যাপারে নাক গলাবে। এমতাবস্থায় তারা ঐ সমস্ত গোত্রগুলিকে কেন ক্ষমা করবে যারা এই কথা বলে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল যে, **'খেলাফতের বিষয়টা পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাউকেই যাকাত দিব না'**। রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে 'খেলাফত' নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে সে সম্পর্কে উমর (রাঃ) নিজেই স্বীকার করে বলেছেন ঃ **"আবু বকরের বায়াত ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র"**।[২]

অতঃপর আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক নেক মুসলমানদের হত্যা করা, তাদের বেইজ্জতি করা, তাদের মহিলাদেরকে বেপরদা করে দেয়া ইত্যাদী বিষয়াবলী ইতিহাসে স্বাক্ষী হয়ে আছে। ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, **"আবু বকর খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে**

---

১ **আল ইমামাত ওয়াল সিয়াসাত**, ইবনে কুতাইবাহ, আল আকদুল ফারিদ, খঃ ২, **হাদীসুস সাকিফা** এবং তাবারী ও মাসউদী নিজেদেও ইতিহাস গ্রন্থে এবং আবুল ফিদায়ে শাহার শেতানী লিপিবদ্ধ করেছেন।

২ **সহীহ্ বুখারী** ঃ কিতাবুল মহারেবীন মিন আহলিল কুফুর ওয়ার রাদ্দাতু এর **রজমুল হাবলী মিনাজ** যেনা- অধ্যায়ে।

যদি কেউ **'নাজাত'** পেয়ে যায় তো যাক -দলিল-প্রমাণই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং ফাতিমা (সাঃআঃ) তাঁর খোৎবাতে বলেছিলেন ঃ

"তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্‌র কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছ এবং সেটাকে পিছনে ফেলে রেখেছ। অথচ কোরআন বলছে যে, সোলাইমান (আঃ) তাঁর পিতা দাউদ (আঃ)-এর ওয়ারেশ হয়ে ছিলেন, এবং ইয়হ্ইয়া (আঃ)-এর ঘটনায় জাকারিয়া (আঃ)-এর এই দোয়া মজুদ আছে, **হে আল্লাহ্ তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন ওয়ারেশ দান কর, যে আমার মীরাস পাবে এবং আলে ইয়াকুবের ওয়ারেসও গণ্য হবে'**। *অত্র কিতাবেই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে,* **'তোমার রব তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ওসিয়াত করছে যে মীরাস বন্টন করার সময় পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দিও'**। *আরো ইরশাদ হচ্ছে,* **'কেহ যদি মৃত্যুর সময় কিছু সম্পদ রেখে যায় তাহলে যেন পিতা-মাতা অথবা নিকট আত্মীয়ের নিকট ওসিয়াত করে যায়'**। *এবং তোমরা ধরেই নিয়েছ যে, আমার কোন হকই নাই। আমি আমার পিতার মীরাস পেতে পারি না এবং আমাদের মাঝে যেন কোন নৈকট্যই নাই। আল্লাহ্ পাক কি তোমাদেরকে মীরাস সম্পর্কে কোন আয়াতের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন, যার ক্ষমতা বলে আমার প্রিয় পিতাকে বঞ্চিত করছো? কোরআনের সাধারণ ও বিশেষ বিষয়গুলিকে তোমরা কি আমার পিতা এবং তাঁর চাচাতো ভাইয়ের চাইতেও বেশী বোঝো? অথবা তোমরা বলতে চাও যে, ভিন্ন সম্প্রদায় ভূক্তরা মীরাস পেতে পারে না -তাহলে আমি এবং আমার পিতা কি একই সম্প্রদায় ভুক্ত নই? ঠিক আছে আজ ফিদাককে এমনভাবে কবজা করে নাও যেমন করে মাহার (হাতী) ও পালান শুতর (মন্থর ভারবাহী উট)-কে কবজা করা হয়ে থাকে। আবু বকর কিয়ামত দিবসে এর ফল ভোগ করবেন, আর সেদিন উত্তম বিচারক হবেন আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আমার যামিন হবেন। (হে আবু বকর) আমার আর তোমার প্রতিজ্ঞা স্থান হলো কিয়ামত এবং স্মরণ রেখ! কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।*

হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলমানদের হত্যা করেছেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'ইস্ততাবাতুল মুরতাদীন'** কিতাবের **'ক্বাতালু মান আবি ক্ববুলুল ফারায়েজ'** অধ্যায়ে এবং মুসলিম **'কিতাবুল ঈমান'**-এর **'আল আমরু বেক্বেতালিন্নাস'** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন যে, নবীর (সাঃ) যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং আরবের কিছু লোক কাফের হয়ে গেল। তখন উমর বললেন ঃ হে আবু বকর তুমি মানুষের সাথে কেমন করে যুদ্ধ করবে, কারণ নবী (সাঃ) বলেছেন, **"ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কলেমা পাঠ না করে। সুতরাং যে লা ইলাহা ইল্লালাহু বলবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে এবং তার হিসাব-কিতাব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত"?** আবু বকর বললেন, "খোদার কসম আমি অবশ্যই অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করবো যে নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কারণ যাকাত বায়তুল মালের হক -খোদার

(সাঃ)-এর আনিত হুকুম-আহ্‌কাম সমুহের বিরোধিতা করছিলেন? অথচ আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে বলেছেন যে, **"যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে তাদের হত্যা করা হারাম, তার হিসাব আমার জিম্মায় থাকবে"**। অতঃপর তাদের হত্যা করার জন্য আবু বকর ও উমরের (রাঃ) বুককে প্রশস্ত করে দিলেন। অথবা এটা কি সেই ইজতিহাদ যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম সমূহকে দেয়ালে ছুড়ে মারা হয়েছিল।

আবু বকরের (রাঃ) পক্ষ অবলম্বনকারীগণ দাবী করে থাকেন যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের হত্যা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ যারা ইতিহাস গ্রন্থ্যসমূহ সামান্যতমও পর্যালোচনা করেছেন, তারা স্পষ্ট রূপেই জানেন যে, **"যাকাত দানে অস্বিকারকারীকে মুরতাদ বলা হবে না"** -আর কিভাবেই বা **'মুরতাদ'** বলা হবে -তারা তো খালিদ কর্তৃক হত্যাযজ্ঞের পূর্বেও তার পিছনে নামাজ পড়েছে? এবং আবু বকর (রাঃ) তো নিজেই তার পক্ষ অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এভাবে যে, তাদের হত্যাযজ্ঞের পর ক্ষমা চেয়ে বাইতুল মাল থেকে **'কেসাস'** দিয়ে ছিলেন। অথচ কোন **'মুরতাদ'**-কে হত্যা করার পর কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, আর না তার ওয়ারেশ বা আত্মীয়স্বজনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন হয়। আর না কোন ছালেহীন ব্যক্তি, যাকাত প্রদানে অসম্মতি প্রদানকারীকে মুরর্তাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ পরবর্তী যুগে যখন বিভিন্ন ফেরকা-মাযহাব জন্ম নিল, তখন আহলে সুন্নাত ফেরকাবাজ লোকেরা অযথা আবু বকরের (রাঃ) কার্যকলাপের উপর পর্দা ফেলে দেয়ার চেষ্ট করতে থাকেন। কিন্তু কোন কুল-কিনারা না করতে পেরে, যারাই আবু বকরকে (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে **'মুরতাদ'** বলা শুরু করে দেয়। কারণ তারা ভালো করেই জানেন যে একজন মুসলমানকে গালমন্দ করা ফাসেকের কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফুরের সমতুল্য। আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাদীতে উক্ত মাসয়ালাটি আজও বিদ্যমান। [১]

কিন্তু বুখারী যে স্থানে এই হাদীস এবং আবু বকরের (রাঃ) এই উক্তি **"আল্লাহ্‌র কসম আমি অবশ্যই অবশ্য নামায ও যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে জেহাদ করবো, যারা ফরজকে অস্বীকার করলো লোকেরা তাদেরকে মুরতাদ বল্লো"** -শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সুতরাং এটাও একটি দলিল যে, বুখারী নিজেও আবু বকরের (রাঃ) কর্মকান্ডকে সমর্থন করেন নি।

আরো কিছু মানুষ উক্ত হাদীসটিতে তাবিল (ব্যাখ্য-বিশ্লেষন) করার চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন ঃ আবু বকর (রাঃ) ওজর পেশ করে বলেছিলেন যে, **'যাকাত বাইতুল মালের হক'**। যদিও এই ওজর কয়েকটি কারণে সঠিক নয় যেমন ঃ

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, কিতাবুল ঈমানে এবং **সহীহ্‌ মুসলিম**, কিতাবুল ঈমানে

পাঠিয়ে বনি সলম গোত্রকে পুড়িয়ে দিয়ে ছিলেন"। [১] তারপর খালিদকে ইয়ামামাহ ও বনী তামীম এর উদ্দেশ্যে পাঠালে, খালিদ তাদেরকে ধোকা দিয়ে হত্যা করে ফেলে এবং মালিক নওয়ারার মত জলিলুলকদ্দর সাহাবী যাকে রাসুল (সাঃ) তাঁর গোত্রের পক্ষে যাকাত আদায়কারীর দায়ীত্বে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে হত্যা করে এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে -**"লাহওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম"**।

মালিক এবং তার গোত্রের কেবল এতটুকুই দোষ ছিল যে, তারা নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর সংঘটিত ঘটনাবলী যেমন ঃ আঁলী (আঃ)-কে খেলাফত হতে দূরে সরিয়ে রাখা, ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর প্রতি এতো পরিমানে জুলুম ও অত্যাচার করা যে দুঃখ ও ক্ষোভের মাঝেই তাঁর মৃত্যুবরণ করা এবং আনসার সরদারগণ কর্তৃক আবু বকর ও উমরের বায়াতের বিরুদ্ধাচারণ করা, ইত্যাদি শ্রবণ করেছিলেন -তাই মালিক ও তার গোত্র যাকাত সংগ্রহ করছিলেন। এমনই মুহূর্তে খলিফা ও খলিফার সাহায্যকারীগণ তাদের হত্যা করা, তাদের মহিলাদের বেপরদা করা এবং তাদের বেইজ্জতি করার আদেশ জারি করে দিল। এবং তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চুপ করে দেয়া হলো যে, এই ঘটনার পর '**খেলাফত**' সম্পর্কিত বিষয়ে সমগ্র আরবে আর কারোর কিছু বলার সাহস কখনো হয় নি।

ঐ ব্যক্তির প্রতি আফসোস হয়, যে আবু বকর (রাঃ) ও তার শাসন ব্যবস্থার পক্ষ অবলম্বন করে, এমন কি তার ঐ সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে উল্টা তার প্রাপ্য বলে আখ্যায়িত করে থাকেন -অথচ আবু বকর (রাঃ) নিজেই তার ভূল স্বীকার করেছিলেন, যেমন ঃ তিনি মালিকের ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাইতুল মাল হতে মালিকের জন্য '**কেসাস**' দিয়ে বলেছিলেন যে, "খালিদ অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে এবং তার দ্বারা ভূল হয়ে গেছে"। আর উমর (রাঃ) বলে ছিলেন ঃ "খোদার কসম আমি দেখলাম যে, আল্লাহ্ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হচ্ছে হক"।

আমরা কি উমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, তিনি ঐ সমস্ত মুসলমানের হত্যাযজ্ঞতে কিভাবে সন্তুষ্ট হলেন? যাদের ক্ষেত্রে উমর (রাঃ) নিজেই রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে, '**যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছে তাদের হত্যা করা মহা পাপ**'। এবং উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই তিনি আবু বকরের (রাঃ) সাথে বিতর্কও করেছিলেন, তাহলে তার মধ্যে এই পরিবর্তন কেমন করে সংঘটিত হলো যে **তিনি কলেমা পাঠকারীদের হত্যাযজ্ঞের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন? উমর (রাঃ), আবু বকরের (রাঃ) বক্ষ প্রশস্ত হওয়া দ্বারা কিভাবে বুঝলেন যে তিনিই হক? আবু বকরের (রাঃ) বুকের অপারেশন কখন হলো যে, উমর (রাঃ) ব্যতিত অন্য কেউ তা দেখতে পারলো না? আবু বকরের (রাঃ) বুক প্রশস্ত হওয়া কি হাকিকাত না কি বানোওয়াট? যদি সত্য সত্যই প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল, তাহলে আল্লাহ্ ঐ সমস্ত মানুষেরও বুক কেন প্রশস্ত করে দেন নি যারা রাসুল**

---

১ **রিয়াজুন নাজারাহ্**, লেখক -মুহিবুদ্দীন তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ১০০

হে আহলে সুন্নাত! আপনারা কোন পথের যাত্রী? আর কোনটাকেই বা অজুহাত বলছেন?

(খ) বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল মাগাযী'**-তে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ঈমান'**-এ উসামা ইবনে যায়দ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) আমাদের **'হারকাহ্‌'**-র দিকে রওয়ানা করালেন। ঐ গোত্রের সাথে মুখোমুখী যুদ্ধে আমরা জয়ী হলাম। আনসারদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি 'হারকার'-র এক ব্যক্তির নিকটবর্তী হলো, আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেল্লাম, তখন সে কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** পড়ে নেয়। আনসার লোকটি তাকে কিছুই বল্লো না, কিন্তু আমি লোকটিকে বল্লামের আঘাতে হত্যা করে ফেলি। অভিযান থেকে ফেরৎ এসে আমরা যখন ঘটনাটি রাসুল (সাঃ)-কে বল্লাম, তখন তিনি (সাঃ) বললেন, "হে উসামা! তুমি তাকে কলেমা পাঠের পরও হত্যা করলে"? আমি বল্লাম, "সে কলেমার আশ্রয় নিচ্ছিল"। কিন্তু তিনি (সাঃ) তার পূর্ববর্তী কলেমা এত বেশী পুনঃরাবৃত্তি করতে থাকেন যে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আফসোস! ইতিপূর্বে যদি আমি ঈমান গ্রহণ না করতাম?

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এই কথা স্পষ্ট রূপেই বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** পাঠ করে নিবে তাকে হত্যা হারাম হয়ে। যেমনটি উক্ত ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসুল (সাঃ) উসামার প্রতি এতোই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, উসামা বলতে বাধ্য হলেন যে, **"আফসোস! ইতিপূর্বে যদি আমি ঈমান গ্রহণ না করতাম?"** যেন এই হাদীসও সংযুক্ত হয়ে যেত যে 'ইসলাম পূর্বের গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়'। এবং উসামা এই কঠিন গোনাহের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ্‌গুলোতে আবুজার হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবীর (সাঃ) কাছে গেলাম, দেখলাম যে তিনি (সাঃ) গায়ে সাদা চাদর দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার গেলাম, ততক্ষণে দেখি নবী (সাঃ) জেগে উঠেছেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে নিবে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার উপর দৃঢ় থাকবে, তাহলে সে বেহেশ্‌তবাসী হবে*"। আমি বল্লাম, "*সে যদি জেনা বা চুরি করে থাকে*"? তিনি (সাঃ) বলেন, "*যদিও সে জেনা ও চুরি করে থাকে*"। আমি আবার বল্লাম, "*সে যদি জেনা ও চুরি করে থাকে*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*যদিও সে জেনা ও চুরি করে থাকে"। আমি আবারও বল্লাম, "সে যদি জেনা ও চুরি করে থাকে*"? তিনি আবারও বলেন, "*যদিও সে জেনা ও চুরি করে থাকে এবং সে কারণে আবুজারকেই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হোক না কেন*"? [১]

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, কিতাবুল লিবাসে এবং **সহীহ্‌ মুসলিম** কিতাবুল ঈমানে।

- রাসুল (সাঃ) কলেমা পাঠকরীদের হত্যাকে হারাম বলেছেন। এই সম্মন্ধে অনেক হাদীস আছে, যেগুলি আহলে সুন্নাতগণ তাদের সহীহ্‌তে উল্লেখ করেছেন -ইনশা আল্লাহ্‌ সেগুলি আলোচনা করবো।
- যাকাত যদি বাইতুল মালের হক হতো তাহলে হাদীসে রক্তপাত ছাড়াই জোরপূর্বক যাকাত আদায় করার জন্য শাসকের প্রতি 'মোবাহ্‌' করে দেওয়া হতো।
- এই তাবিল (ব্যাখ্য-বিশ্লেষন) যদি সত্য হতো তাহলে রাসুলও (সাঃ) সা'লেবা-কে হত্যা করতেন, কারণ সেও যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল [ঘটনাটি বহুল পরিচিত, তাই পুনঃরাবৃত্তি করলাম না -'**অবশেষে আমি সত্য পেলাম**' -কিতাবে দ্রষ্টব্য]।

সংক্ষিপ্ততার জন্য কলেমা পাঠকারীদের মর্যাদা ও সম্মানকে কেন্দ্র করে বুখারী ও মুসলিম হতে কিছু হাদীস তুলে ধরলাম ঃ

(ক) বুখারী মেকদাদ ইনবে আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসুল (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দিবেন যে, আমি একজন কাফেরের মুখোমুখি হয়ে যাই এবং এক পর্যায়ে আমাদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাফেরটি তার তরবারী দ্বারা আমার হাত কেটে ফেলে দেয় তারপর সে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি। ইয়া রাসুলুলাহ! এই কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করতে পারবো"? রাসুল (সাঃ) বললেন, "না"। মেকদাদ বলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে আমার হাত কেটে ফেলেছে তারপর বলছে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি"। রাসুল (সাঃ) আবারও বলেন, "তাকে হত্যা কর না, আর তুমি যদি তাকে হত্যা কর তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থান হবে হত্যার পূর্বে তুমি যে অবস্থানে ছিলে, আর তোমার অবস্থান ঐ জায়গায় হবে, কলেমা পড়ার পূর্বে ঐ ব্যক্তি যে অবস্থানে ছিল"। [১]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, কাফের যদি অন্যায় অত্যাচার করার পর যদি কলেমাপাঠ করে নেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হারাম -যদিও সে কলেমাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের কথা স্বীকার করিনি, আর না নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া বা রোজা রাখার কথা স্বীকার করেছে, আর না হজ্জ্ব পালনের কথা স্বীকার করেছে।

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযীতে এবং **সহীহ্‌ মুসলিম**, কিতাবুল ঈমানে।

তাদের মুসলেহাতের (যুক্তিসিদ্ধতার) বিপরীত অবস্থান নিবে এবং তাদের ঐ সমস্ত কর্মকান্ড ও হুকুম আহ্‌কামের ছল-চাতুরী প্রকাশ করে দিবে, যেগুলি তাদের বাহানা বাজী ও ইজতিহাদের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্মরণ রাখা উচিৎ যে হাদীস হলো ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস, বরং এ কথা বলাই সত্য হবে যে কোরআন হলো মূল উৎস এবং এই প্রথম মূল উৎসের তাফসীর ও ব্যাখ্যাকারী হচ্ছে হাদীসে রাসুল (সাঃ)। তাদের আমলে হাদীস বয়ান করা হারাম ছিল। সে কারণেই ইতিহাস বেত্তা ও হাদীস বেত্তাগণ প্রথম সুযোগেই উমর বিন আব্দুল আজিজের যুগে এবং তার কিছু পরেই হাদীস সংকলন ও সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেন। বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ইলম'**-এর **"কাইফা ইশবিযুল ইলম"** অধ্যায়ে লিখেছেন যে, উমর ইবনুল আজিজ, আবু বকর ইবনে হাজ্জাজকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন যে, '*তুমি যেখানেই রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস পাও সাথে সাথে লিখে নাও, কারণ আমার ভয় হচ্ছে যে উলামাদের মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে ইলম (জ্ঞান) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে*'।

এবার আসুন! আবু বকর (রাঃ) নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর সাহাবাদের উদ্দেশ্যে খোৎবা দিয়ে বলেন, "*তোমরা রাসুল (সাঃ) হতে হাদীস বয়ান কর, আর তাতে ভ্রান্তি সৃষ্টি কর, তোমাদের পরে পরবর্তী লোকেরা আরো বিভ্রান্তি ছড়াবে। সুতরাং তোমরা রাসুল (সাঃ)-এর কোন হাদীস বয়ান করবে না। আর যদি কেউ রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলে দিও যে আমাদের মাঝে তো আল্লাহ্‌র কালাম আছেই, তাতে বর্ণিত হালালকে 'হালাল' এবং হারামকে 'হারাম' জ্ঞান করলেই হবে*"। [১]

আল্লাহ্‌র কসম আবু বকরের (রাঃ) এই কর্মকান্ড অনেক আশ্চর্যজনক বটে। ঐ জঘন্যতম দিবসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, যেটাকে **'ইয়াওমুল খামিস'** বলা হয়েছে। আবু বকরও (রাঃ) তার বন্ধু উমরের (রাঃ) মত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, **'আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট, রাসুলুল্লাহ্ তো প্রলাপ বকছেন'**।

আজ আবু বকর (রাঃ) বলছেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর কোন হাদীস বয়ান করবে না এবং যদি কেউ তোমাকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন বলে দিও যে, **"আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব উপস্থিত আছে -সেখানে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম গণ্য কর"**। আলহামদুলিল্লাহ্, আবু বকরের (রাঃ) এই কথা দ্বারা তারই স্বীকারোক্তি মিলে যায় যে, তিনি রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

এখন আবু বকর ও উমরের (রাঃ) পক্ষাবলম্বনকারী এবং রাসুল (সাঃ)-এর পরে তাদেরকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বলছেন তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে ঃ আপনারা যখন নিজেদের সহীহ্ গ্রন্থ সমুহে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস মোতাবেক বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি অতিব ভারি বস্তু**

---

১ **তাজকেরাতুল খাওয়াস**, খঃ ১, পৃঃ ৩

আবুজার যখনই হাদীসটি বয়ান করতেন তখনই বলতেন যে, এটা আবুজারকে যতই খারাপ লাগুক।

এ হল দ্বিতীয় হাদীস, যা কলেমা পাঠকারীকে বেহেশতে প্রবেশের কথা বয়ান করেছে এবং তাকে হত্যা করা জায়েজ নয়। এর দ্বারা হয় আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও তাদের জন্য অজুহাত তালাশকারী সাহাবা বা আনছারগণ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত আহ্‌কামের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছেন তাদের যত নিন্দাই হোক না কেন?

নিঃসন্দেহে আবু বকর ও উমর (রাঃ) এই সমস্ত আহ্‌কাম হতে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কারণ তারা রাসুল (সাঃ)-এর খুব কাছাকাছিই থাকতেন এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আহ্‌কাম সমুহের খবরা-খবর রাখতেন। কিন্তু উক্ত দু'জনই খেলাফতের লালসায় রাসুল (সাঃ)-এর হুকুম আহ্‌কামের মধ্যে সুবিধামত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছেন। এবং সবকিছুরই চাক্ষুস প্রমাণ আছে।

আবু বকর (রাঃ) যখন যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের হত্যার সংকল্প করেন এবং উমর (রাঃ) তাকে রাসুল (সাঃ)-এর ঐ হাদীস স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাদের হত্যা করা হারাম হবে। তখন হয়তো আবু বকর (রাঃ) উমরকে (রাঃ) পাল্টা এই কথা বলে সন্তুষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, **"তুমি যখন ফাতেমার (সাঃআঃ) ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য কাঠ জড় করতে পারো, অথচ ফাতেমাও কলেমা পাঠ করতেন, তাহলে আমার অপরাধ তো তোমার চেয়ে বড় নয়"**। অপর দিকে উমর (রাঃ) হয়তো আবু বকরকে (রাঃ) এই কথা বলে সন্তুষ্ট করেছিলেন, "যেহেতু এখন রাজধানীতে আলী ও ফাতেমার মান-মর্যাদা বলতে কিছু নেই, সেহেতু দুর-দুরান্তে বসবাসকারী এবং যাকাত দিতে অস্বীকাকারী ঐ সমস্ত গোত্রগুলোর কতটুকুই বা গুরুত্ব। আমরা যদি তাদের বিষয়ে অবহেলা করে তাদেরকে ছেড়ে দেই তাহলে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে এই ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়বে এবং অতি দ্রুত খেলাফতের কেন্দ্র স্থলে এর প্রভাব বিস্তার করবে"। সে কারণেই উমর (রাঃ) হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, **"আল্লাহ্ আবু বকরের বক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সেটাই হচ্ছে হক"**।

হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন ঃ

সত্য সন্ধানী যখন ইতিহাসের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করবে তখন উপলব্ধী করতে পারবে যে, প্রথম তিন খলিফা তাদের শাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন। এবং সে স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে, উক্ত তিন খলিফা কেবল রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লেখার ব্যাপারেই নয় বরং হাদীস বয়ান করাতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। কারণ তারা ভাল করেই উপলব্ধী করতে পেরেছিলেন যে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সমুহ

গ্রহণ করেন নি বা সেগুলির প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি। বরং কোরআনের উক্ত আয়াত সমুহকে নিজের রচিত হাদীস দ্বারা **'মানসুখ'** বা রহিত করে দিলেন। অপর দিকে, আবার নিজেই অন্য সাহাবীদের বলছেন যে, **"তোমরা রাসুলের হাদীস বয়ান কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর এবং তোমাদের পরের প্রজন্ম আরো বিরোধ সৃষ্টি করবে, সুতরাং তোমরা রাসুলের কোন হাদীস বর্ণনা করবে না। কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলে দিও 'তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব উপস্থিত আছেই, সেখানে যা হালাল করা হয়ে ছে সেটাকে হালাল আর যা হারাম করা হয়েছে সেটাকে হারাম বলে গণ্য কর"**। অথচ তিনি এই কথাগুলো তখন কেন বলেন নি যখন রাসুল (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা ফাতিমা (আঃসাঃ) তার সাথে ঐ হাদীস সম্পর্কে বিরোধ করেছিলেন, **'যে আমরা নবীরা কারোর ওয়ারেশ হই না এবং কাউকে ওয়ারেশও বানাই না'**। তখন ঐ ফায়সালা কেন দিলেন না যে, **"তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব আছে তার হালালকে 'হালাল' এবং হারামকে 'হারাম' গণ্য কর"**? এমন পরিস্থিতির জন্য তো অত্যন্ত বিখ্যাত জবাব আছেই। শীঘ্রই আপনাদের কাছে আবু বকরের (রাঃ) কোরআন বিরোধী হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফাতেমা (সাঃআঃ) নিজের দাবীর পক্ষে আবু বকরকে (রাঃ) পরাজিত করার পর যখন আলীর (আঃ) জন্য নির্দিষ্ট খেলাফতের পক্ষে জোর দাবী জানালেন। ঐ মুহুর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য আবু বকর (রাঃ) কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। এমনই পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ **"হে ঈমানদারগণ তোমরা এমন কথা কেন বল যার প্রতি আমল কর না। আল্লাহ্‌র কাছে এটা খুবই ক্ষোভের বিষয় যে তোমরা যা বল তার উপর আমল কর না"**।

জি হ্যাঁ, আবু বকর (রাঃ) তখন মোটেই সুখী হতে পারতেন না যদি মানুষের মুখে মুখে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা হতে থাকতো। এক শহর থেকে অন্য শহর, গ্রাম থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো এবং তাদ্বারা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক খেলাফতের নির্দিষ্ট করার বিষয়টি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো এবং খেলাফতের ঐ মুখোশ খুলে দিত যা আবু বকরের (রাঃ) শাসনের উৎস ছিল। সুতরাং আবু বকরের (রাঃ) কাছে একমাত্র উপায় ছিল -যেভাবেই হোক নবীর (সাঃ) হাদীসগুলিকে স্তব্ধ করে দিয়ে সেগুলির উপর পর্দা ফেলে দেয়া অথবা জালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে ফেলা।[১]

আর এক দিকে দেখুন! তাঁরই মেয়ে আয়েশা (রাঃ) স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলেন ঃ "আমার পিতা রাসুল (সাঃ)-এর ৫০০ হাদীস সংরক্ষণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলেন। আমি বল্লাম কি কারণে অর সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হলো? অতঃপর সকালে তিনি বল্লেন, 'মা ঐ হাদীসগুলো নিয়ে আস যেগুলি তোমার কাছে জমা রেখেছি'। **আমি হাদীসগুলো এনে দিলে তিনি তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন"**।[২]

---

১ **কানজুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ২৩৭, **ইবনে কাসির**, মুসনাদে সিদ্দিকে এবং **জাহবী তাজকিরাতুল হুফ্ফাজের** ৫ম খন্ডের ৫ম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

২ **কানজুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ২৩৭, **ইবনে কাসির** মুসনাদে সিদ্দিকে এবং **জাহবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজের'** ৫ম খন্ডের ৫ম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

রেখে যাচ্ছি, আমার পরে তোমরা যতদিন পর্যন্ত এ দু'য়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে ততক্ষন পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার সুন্নাত"।

আমরা যদি হাদীসটিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেও নি -তবুও আপনাদের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের (আবু বকর ও উমর) কি হয়েছিল যে তারা রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে অস্বীকার করে বসলেন এবং তার কোন মর্যাদাই রক্ষা করেন নি। উপরন্তু সাহাবীরা তা লিখে রাখা বা বয়ান করা থেকেও নিষেধ করেছেন। **আপনারা কেউ আবু বকরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করতে পারবেন, যে তিনি কোরআনের কোন আয়াতের উপর ভিত্তি করে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীকে হত্যা করালেন এবং তাদের মহিলাদের ইজ্জত-আব্রু হনন করালেন?**

সুতরাং আমাদের আর আবু বকরের (রাঃ) মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাবই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলছে ঃ **"উহাদের মাঝে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হইব। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পন্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল। পরিনামে তিনি উহাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করিলেন আল্লাহ্ সহিত উহাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল এবং কারণ উহারা ছিল মিথ্যাচারী"।** [১]

এই বিষয়ে সমস্ত মুফাসসেরীন ঐক্যমত আছেন যে, উক্ত আয়াত সমুহ বিশেষ করে **'সা'লেবা'** সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যে রাসুল (সাঃ)-কে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আমি এখানে আরো একটি কথা সংযোগ করতে চাই, সেটা হলো এই যে, সালেবা রাসুল (সাঃ)-কে এজন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, কারণ সে যাকাতকে **'জিজিয়া'** মনে করতো। যেমন আল্লাহ্ তার নিফাককে এই আয়াত সমূহে বর্ণনা করেছেন। এতদসত্বেও নবী (সাঃ) তার সাথে যুদ্ধ করেন নি বা শক্তি সামর্থ প্রয়োগ করে তার ধন-সম্পদ কেড়ে নেন নি, যদিও সেটা করার ক্ষমতা তাঁর (সাঃ) ছিল। কিন্তু মালিক ইবনে নুওয়ায়রা এবং তাঁর গোত্রের লোকেরা তো যাকাত দিতে অস্বীকার করিনি বরং তারা যাকাতকেও দ্বীনের অন্যান্য ফরজের মতই জ্ঞান করতেন। তবে হ্যাঁ তারা ঐ খলিফাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন যিনি রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর জোর পূর্বক খেলাফতের আসন দখল করে বসেছিল।

অতএব, আবু বকরের (রাঃ) এই আমলটি তো আরো আজব বিষয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিলেন। যেমন ফাতিমা যাহ্‌রা (সাঃআঃ) যখন কোরআন থেকে দলিল উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার সম্মুখে আল্লাহ্‌র কিতাবের ঐ সমস্ত নির্দেশিত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেছিলেন, যেগুলি আম্বিয়াদের ওয়েরাসাত (উত্তরাধিকার) প্রমান করেছে। কিন্তু আশ্চর্য আবু বকর (রাঃ) কোন একটি আয়াতকেও

---

১ সুরা তাওবা ঃ ৭৫-৭৭

আবু সাঈদ খুদরী বলেন যে ঃ একদিন আমরা উবাই ইবনে কা'বের নিকটে বসে ছিলাম। ঐ সময় অনেক রাগান্বিত অবস্থায় আবু মুসা আশআরী সেখানে হাজির হন এবং দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, "আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে যে রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছে যে, 'তিন বার অনুমতি চাইবে, যদি অনুমতি পাও তো 'ফাব্বেহা' অন্যথায় ফেরৎ চলে যাবে'। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, 'ঘটনাটা কি, কি হয়েছে'? আশআরী বলেন, 'গতকাল আমি উমরের কাছে গিয়েছিলাম তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য, তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নি, বিধায় ফেরৎ চলে এলাম। আজ আবারো তার কাছে গিয়েছিলাম এবং তাকে বল্লাম যে, আমি গতকালও এসেছিলাম। কিন্তু তিন বার অনুমতি প্রার্থনা করেও অনুমতি পাইনি, বিধায় ফেরৎ চলে গিয়েছিলাম'। তখন উমর বলেন, 'আমি তোমার ডাক শুনেছিলাম, কিন্তু তখন একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তুমি ওভাবেই যদি অনুমতি চাইতে থাকতে তাহলে অনুমতি পেয়ে যেতে'। আমি বল্লাম যে আমি রাসুল (সাঃ)-এর কথা মত আমল করেছি। উমর বলেন, 'খোদার কসম, তুমি যদি এই হাদীসের পক্ষে স্বাক্ষী না আনতে পার তাহলে তোমার পেটে ও পিঠে আমি কষ্ট দিব'। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার সাথে তোমারই সমবয়সীকে পাঠাচ্ছি'। আবু সাঈদ বলেন, উবাই ইবনে কা'ব বলেন, 'হে আবু সাঈদ ওঠো'। সুতরাং আমি উঠলাম এবং উমরের কাছে গিয়ে বল্লাম যে, 'আমি রাসুল (সাঃ) হতে এই হাদীস শুনেছি"।

বুখারীও উক্ত হাদীসকে নিজের অভ্যাসমত কিছুটা কাট-ছাঁট করে বর্ণনা করেছেন এবং উমরের (রাঃ) ইজ্জত রক্ষা করার জন্য ঐ হুমকিকে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যে হুমকিটি উমর, আবু মুসা আশআরীকে দিয়েছিলেন যে, **'যদি কোন স্বাক্ষী উপস্থিত না করতে পার তাহলে তোমার খবর আছে**!"। [১] অথচ মুসলিম তার সহীহ্‌তে উমর সম্পর্কে আবু মুসা আশআরীর উক্ত কথাকে উল্লেখ করেছেন যে, "হে খাত্তাবের পুত্র আসহাবে রাসুলের জন্য ওজর হয়ো না"।

যাহবী আবু সালমাহ্ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ "আমি আবু হুরায়রা-কে বল্লাম, 'আপনি কি উমরের যুগে এই হাদীস বয়ান করতেন'? আবু হুরায়রা বলেন, 'আমি যদি উমরের আমলে এই ধরণের হাদীস বয়ান করতাম তাহলে তিনি দোর্‌রা দ্বারা আমার খবর নিতেন!'। উমর যেমন রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মার-ধর করার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি তিনিও হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যে রাসুল (সাঃ)-এর জমাকৃত হাদীসকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। একদা সাহাবীদের মাঝে খোৎবা দিতে দিতে বল্লেন, 'হে লোক সকল! আমি খবর পেয়েছি যে, তোমাদের নিকট কিছু বই পুস্তক আছে। আমার ইচ্ছা হয় যে সবকটাকে একত্র করে একটি বৃহৎ আকারের বইয়ের রূপ দান করি। সুতরাং যার যার কাছে বই আছে আমার কাছে জমা করে দাও আমি সেগুলো পর্যবেক্ষণ

---

১ **সহীহ্ বুখারী,** কিতাবুল উসতায়িজানের **'আত্তাসলিম ওয়াল উসতায়িজানে সালাসা'** অধ্যায়ে।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হাদীস সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন ঃ

হাদীসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা আবু বকরের (রাঃ) রাজনীতি অবলোকন করেছি। এমন কি তার নিজের সংগ্রহ করা ৫০০ হাদীসের সংকলনকে নিজেই আগুনের নিকট সোপর্দ করেছেন। উক্ত অপকর্মের উদ্দেশ্যই ছিল যেন অন্যান্য সাহাবা ও মুসলমান যারা রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তাদেরকে হাদীস সমুহ থেকে অজ্ঞ রেখে দেয়া। হযরত উমর (রাঃ) যখন আবু বকরের (রাঃ) আসন অলংকৃত করলেন তখন তিনিও বন্ধুর প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ করে তারই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আবলম্বন করলেন। কিন্তু উমরের (রাঃ) পদ্ধতি আরো কঠিন ছিল। তিনি হাদীস সংকলনে কেবল নিষেধাজ্ঞাই আরোপ করেন নি বরং উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সাহাবীদের অনেক ভয়-ভীতি প্রদর্শণ করেছিলেন, শাস্তি দিয়েছিলেন এমন কি গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন।

ইবনে মাজা কারজা ইবনে কা'ব হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "উমর আমাদের কুফায় পাঠালেন এবং 'সেরার' (স্থানের নাম) পর্যন্ত নিজেও আমাদের সংগে ছিলেন। পথিমধ্যে বলতে থাকেন, 'তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সাথে আছি'? আমরা বল্লাম, 'রাসুল (সাঃ)-এর সোহবতের জন্য এবং আনসারদের হক আদায় করার জন্য'। তিনি প্রতি উত্তরে বলেন, 'না, সে কারনে নয়। আমি এজন্য এসেছি যে, একটি হাদীস তোমাদের কাছে বয়ান করবো, যেটাকে তোমরা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। কারণ তোমরা এমন জাতীর দিকে যাচ্ছ যারা কোরআন শ্রবণ করে অনেক আনন্দ পায়। তারা যখন তোমাদের দেখবে তখন নিশ্চয়ই তারা তোমাদের কাছে এসে বলবে, হে আসহাবে মুহাম্মদ -তখন তোমরা রাসুল (সাঃ) হতে খুব কমই রেওয়ায়েত করবে, তাহলে আমিও তোমাদের দলভূক্ত থাকবো"। [১]

যখন ক্বারজা ইবনে কা'ব এলেন তখন তারা বললো যে, আমাদের কাছে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বয়ান করুন। তখন ইবনে কা'ব বলেন, "**উমর, আমাদের হাদীস বয়ান করতে নিষেধ করেছেন**"। [২]

অনুরূপভাবে মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল আদব'**-এর **'আল ইসতাইজান'** অধ্যায়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ উমর আবু মুসা আশআরীকে বলেন, "**তুমি যদি রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বয়ান কর তাহলে তোমার খবর আছে!**"।

---

১ **মুসনাদে ইবনে মাজা**, খঃ ১, পৃঃ ৫০৪

২ জাহবী, **তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজের** ৫০৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

কেবল মাত্র ঐ সমস্ত হাদীসগুলোই বয়ান করতে পার যেগুলি উমরের আমলে বয়ানকরা হতো। কেননা উমর লোকজনকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতেন"। [১]

আর বনী উমাইয়ার সমস্ত শাসকদের তো এই একই পদ্ধতি ছিল, তারাও রাসুল (সাঃ)-এর সহীহ্ হাদীস বয়ান করা থেকে লোকজনকে বিরত রাখতো, এবং নিজেরা মিথ্যা হাদীস রচনা করে রাসুল (সাঃ)-এর নামে চালিয়ে দিত। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক যুগের মুসলমানরা, দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়লো, এবং কিস্‌সা-কাহিনীর এমন চোরাবালিতে হাবুডুবু খেতে লাগলো, যেগুলির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই ছিল না।

আমি আপনাদের সামনে **'মাদায়েনী'**-র উক্ত বাক্য নকল করতে চাই, যেটা তিনি তার **"আল-আহদাস"** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আ'মুল জামায়াতের পর মুয়াবিয়া তার সহচরদের কাছে এভাবে চিঠি লিখে পাঠালেন যে, **'ঐ ব্যক্তির জীবন ও সম্পদের কোন জিম্মাদারী নাই, যে আবু তোরাব আলী ইবনে আবি তালিবের ফযিলাত সম্বলিত কোন হাদীস বয়ান করবে'**। এর প্রতিফল এমন হলো যে, প্রত্যেক জেলার খতিবগণ মিম্বরে বসে আলী (আঃ)-এর প্রতি লানত পাঠ ও ঘৃণা প্রকাশ শুরু করে দিলো।

এরপর মুয়াবিয়া সমগ্র পৃথিবীময় যেখানে যেখানে তার সহচররা ছিল সবাইকে লিখে পাঠায় যে, **"আলীর বন্ধু-বান্ধব এবং আহলে বাইতের ভক্তবৃন্দের কোন স্বাক্ষ্যই গ্রহণ করা যাবে না"**। তারপর আরো লিখে পাঠায় যে, "উসমানের ভক্তবৃন্দ এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে এবং যারা উসমানের ফজিলাত সম্পর্কে হাদীস বয়ান করবে তাদের সাথে ওঠা বসা শুরু করে দাও। তাদের বুকে টেনে নাও এবং সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাদের মধ্যে যারা উসমান সম্পর্কে কোন ফজিলত বর্ণনা করবে, তার এবং তার বংশের লোকজনার নাম বংশ পরিচয়সহ আমার কাছে প্রেরণ কর"।

সুতরাং তার সহচররা সেটাই করলো। অতঃপর উসমানের (রাঃ) প্রচুর ফাযায়েল সংগৃহিত হয়ে গেল। যেহেতু উসমান (রাঃ) সম্পর্কে হাদীস রচনাকারীদের মুয়াবিয়া দান-দক্ষিণা পাঠিয়ে দিত এবং এই কথাটি সমগ্র আরবময় ছড়িয়ে পড়ে। সেহেতু এধরণের লোকের সংখ্যা প্রত্যেক শহরেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দুনিয়ার প্রাচুর্য হাসিলের জন্য একে অপরকে অতিক্রম করার জন্য প্রতিযোগিতা মূলক হাদীস রচনা শুরু করে দেয়। এমনকি কোন জঘন্যতম ব্যক্তিও যদি উসমানের (রাঃ) মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুয়াবিয়ার সামনে হাদীস বয়ান করতো, তখন তার নাম নোট করে নেয়া হতো, তাকে বুকে টেনে নেয়া হতো এবং তার শাফায়াত করা হতো। ব্যাস, এক যুগ ধরে মানুষের আচরণ এভাবেই চলতে থাকে। অতঃপর মুয়াবিয়া তার সহচরদের আবার লিখে পাঠায় যে, *'উসমান সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে হাদীস সংগৃহিত হয়েছে এবং সর্বত্রই ইহার প্রচারও ঘটেছে। অতএব, তোমরা আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র অন্যান্য সাহাবাদের এবং পূর্ববর্তী দুই খলিফার শানে হাদীস*

---

১ **সহীহ্ মুসলিম ঃ** কিতাবুজ যাকাতে

করবো'। লোকেরা চিন্তা করলো উমর হয়তো হাদীসগুলি দেখে শুনে একত্র করবেন, যেন কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। তাই তারা তাদের হাদীস গ্রন্থগুলি উমরের কাছে নিয়ে আসেন। অতঃপর **উমর সবকটাকে জমা করে সেগুলিতে আগুণ ধরিয়ে দিলেন**।[১]

অনুরুপ ভাবে ইবনে আব্দুল বর তার **'জামেয়াত'**-এ ইলমের ফজিলতের ব্যাপারে এভাবে লিখেছেন যে ঃ "উমর সুন্নাতকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু তার জন্য বাধা সৃষ্টি হয়, তাই তিনি লিখলেন না এবং অন্যান্য শহরগুলিতে লিখে পাঠালেন যে, **"যার কাছে যা আছে (অর্থাৎ হাদীস) সেগুলি যেন মুছে ফেলা হয়"**।

হাদীস **'রায়েজ'** হওয়ার মত যতগুলি পথ ছিল, হুম্বী-তম্বী, মার-ধর, ভয়-ভীতি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং হাদীসের বইগুলিকে পুড়িয়ে দিয়ে সবকটি পথকেই রুদ্ধ করে দেয়া হলো। অল্প কিছু সাহাবা যারা মদীনার বাহিরে সফরে ছিলেন তারা লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ কালে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু উমর (রাঃ) যখন এই সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন ঐ সমস্ত সাহাবাকে মদীনায় নজরবন্দী করে রাখেন এবং বাহিরে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিলেন। ইবনে ইসহাক আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র কসম! উমর মৃত্যুর পূর্বে আনাচে কানাচে সর্বত্র রাসুলের (সাঃ) সাহাবাদের সংবাদ পাঠিয়ে সমস্ত হাদীসকে জমা করলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে হাজীফা, আবু দারদা, আবু যার গিফারী এবং উক্ববা ইবনে আমির এর সম্মুখে বল্লেন, 'এগুলি হাদীস নয় যেগুলি তোমরা রাসুল (সাঃ) হতে নকল করে লোকজনার মাঝে ছড়াচ্ছো'। তারা বল্লেন, 'আপনিই তো আমাদের নকল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন'। উমর বল্লেন, **'তোমরা আমার কাছেই থাকবে এবং যতদিন আমি বেঁচে আছি আমার কাছ থেকে দূরে যাবে না"**।[২]

উমরের (রাঃ) পরে উসমান (রাঃ) তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হয়ে আসলেন। তিনিও সেই একই পথ অনুসরণ এবং একই নীতি অবলম্বন করলেন যা তার পূর্বের দুই বন্ধু অবলম্বন করেছিলেন। মিম্বরের উপরে উঠে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, **"কারোর পক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ হবে না যেগুলি আবু বকর এবং উমরের আমলে বর্ণনা করা হয় নি।"**[৩]

এভাবেই চক্রান্তের ধারাবাহিকতা তিন খলিফার ২৫ বৎসরের সময়কাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এই চক্রান্ত যদি তাদের আমল পর্যন্তই থাকতো তাহলেও যথেষ্ট হতো। কিন্তু এর পরেও এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে এবং মুয়াবিয়া যখন নিজেকে আমিরুল মুমেনিন বলে ঘোষনা করলো তখন সেও মিম্বরের উপর উঠে বল্লো, **"খবরদার! তোমরা**

---

১ **তাবাকাতুল কুবরা**, লেখক ঃ ইবনে সা'দ, খঃ ৫, পৃঃ ১৮৮ এবং খতিবে বাগদাদী তার **তাকসীদুল ইলমে** লিপিবদ্ধ করেছেন।

২ **কানজুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ২৩৯

৩ **মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল**, খঃ ১, পৃঃ ৩৬৩

তাহলে সেগুলিকে কখনো বয়ান করতো না এবং সেগুলির প্রতি ঈমানও পোষণ করতো না। [১]

আমি তো বলতে চাই যে, এই সমস্ত কর্মকান্ডের দায় দায়ীত্ব আবু বকর, উমর ও উসমানের (রাঃ) উপর বর্তায় যারা রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লেখা ও সংরক্ষণ করা হতে সাহাবাদের বিরত রেখেছিলেন। তাদের ভক্তবৃন্দ বলে থাকেন যে, তারা সাহাবীদের হাদীস লেখা থেকে এজন্য বিরত রেখেছিলেন যেন কোরআন ও হাদীসের মধ্যে গরমিল সৃষ্টি না হয়ে যায়। এটা এমনই একটি অজুহাত যেটা শুনলে পরে পাগলরাও হাসবে। কোরআন ও হাদীস কি 'চিনি' আর 'লবন'-এর মত যে দু'টো মিশেগেলে পরে পৃথক করা মুশকিল হয়ে যাবে। বরং চিনি ও লবন দুটোকেই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা হয়ে থাকে যেন মিশে না যায়। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে সাহাবারা কি এই কথা ভূলে গিয়েছিলেন যে 'কোরআন' বিশেষ সহিফাতে লেখা হবে আর 'হাদীস' অপর এক বিশেষ কিতাবে লিখা হবে -যেমনটি আজকের যুগে কোরআন ও হাদীসকে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব আকারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। **উমর ইনবে আব্দুল আজিজর যুগ থেকেই হাদীস সংকলন শুরু হয়েছে, তাহলে আজ পর্যন্ত হাদীস ও কোরআনে কেন সংমিশ্রন ঘটেনি?** যদিও হাদীসের শত শত বই সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়নি। অনুরূপভাবে মুসলিম, মুসনাদে আহমদ এবং মুয়াত্তায়ে মালিকের মধ্যেও কোন সংমিশ্রণ চোখে পড়ে না। আর কোরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ হওয়া তো অনেক দূরের কথা!

উক্ত দলিলে কোন প্রাণ নেই, অবিকল **'বাইতে আনকাবুত'**-এর মত যার ভিত্তির পক্ষে কোন দলিল নেই। বরং দলিলটি সম্পূর্ন রূপে এর বিপরিতে যায়। সত্য তো ইহাই যে যুহুরী উরওয়াহ্ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ উমর ইবনে খাত্তাব **'সুনান'** লিখাতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য সাহাবাদের সাথে পরামর্শও করেছিলেন। তারাও লিখে রাখার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুতরাং উমর এই ব্যাপারে একমাস পর্যন্ত আল্লাহ্‌র **'ইস্তেখারা'** হতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অতঃপর একদিন বলতে আরম্ভ করলেন যে আমি সুনান (হাদীস সমুহ) লিখতে চেয়েছিলাম এবং ইতিপূর্বেই তোমাদের কিছু লোকজনের সাথে কথাও বলেছিলাম, কিন্তু তারা ঐ কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুব দিল যে তারা **'আল্লাহ্‌র কিতাব'**-ই ছেড়ে দিল। **আল্লাহ্‌র কসম আমি কোরআনকে অন্য কোন জিনিষের সাথে সংমিশ্রণ করবো না।** [২]

সুধী পাঠক মন্ডলী! উক্ত রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঃ রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবারা উমরকে (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যে **'সুনান'** লিপিবদ্ধ করা হোক, কিন্তু তিনি (উমর) সমস্ত সাহাবার পরামর্শ কিভাবে বিরোধিতা করলেন এবং তাদের রায়কে এই বলে

---

১ **শারহে নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, খঃ ১১, পৃঃ ৪৬

২ **কানযুল উম্মাল**, খঃ ৫, পৃঃ ২৩৯ এবং ইবনে সা'দ যুহুরীর পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুল বর তার জামেয়া কিতাবের **'বায়ানুল ইলম ও ফাযলেহি'**-তে লিখেছেন।

রচনার লোভ প্রদর্শন কর এবং আবু তুরাবের শানে বর্ণিত হাদীস সমুহে এমন কোন সূত্র না থাকে বা বুঝতে পারা না যায় যে, এটা কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশেষ শান্তিদায়ক। আবু তুরাব এবং তাঁর শিয়াদের (অনুসারীদের) কথাগুলোকে দলিল দ্বারা বাতিল করে দাও এবং তার উপরে উসমানের ফাযায়েলকে বিজয়ী করে দাও" ।

মুয়াবিয়ার চিঠি, জনগণের সম্মুখে পাঠ করা হলো। ফলশ্রুতিতে সাহাবাদের সম্মানে এমন সব হাদীস জন্ম লাভ করলো, যেগুলির কোন ভিত্তিই ছিল না। মানুষ যখন এধরণের হাদীস পেয়ে যেত তখন তারা মিম্বরে বসে বয়ান শুরু করে দিত এবং মক্তব গুলিতে শিক্ষকদের বলে দেয়া হতো তারা যেন এই সমস্ত হাদীস বাচ্চাদের তালিম দেয়, যেন বাচ্চারা উক্ত রেওয়ায়েতগুলো বয়ান করতে পারে। উক্ত বিষয়টি তাদেরকে কোরআনের মত শিক্ষা দেয়া হলো। এমনকি মেয়ে, মহিলা, ভৃত্য সবাইকে শিখিয়ে দেয়া হলো, আর এই অপকর্মের ধারাবাহিকতা যুগের পর যুগ চলতে থাকে।

অতঃপর মুয়াবিয়া তার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এভাবে চিঠি লিখে পাঠায় ঃ *"লক্ষ্য রেখ আলীর প্রতি কারা ভালবাসা প্রদর্শন করে, সরকারী রেজিষ্টার হতে তাদের নাম কর্তন করে দাও এবং তাদের সমস্ত প্রকার ওয়াজিফা ও বখ্‌শিশ বন্ধ করে দাও"*।

উপরোক্ত চিঠির গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবারো লিখে পাঠালো যে, *"যাদেরকেই ঐ কওমের (আহলে বাইতের) প্রতি আসক্ত পাও তাদের উপর মুসিবত চাপিয়ে দাও এবং তাদের ঘর-বাড়ী ধুলিস্যাৎ করে ফেল"*।

ইরাক ও কুফার জন্য এর চাইতে বড় বালা-মুসিবাত আর কি হতে পারে? অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে, আলীর অনুসারীর মধ্যেকার একজন অপর এক বিশ্বস্ত জনের কাছে গিয়ে, তার গৃহে প্রবেশ করে মনের কথা গোপনে বলতো, কিন্তু তার ভক্ত এবং চাকর-বাকরকে ভয় পেত এবং তার কাছ থেকে কঠিন কসম আদায় করার পর তবে মনের কথা বলতো এবং কঠিন ওয়াদা নিত যেন সে কথাটি প্রকাশ না করে। সুতরাং উক্ত চক্রান্তের ফলে অনেক জাল হাদীসের প্রকাশ ঘটে এবং সেগুলির উপরই সমস্ত ফকীহ্‌, আলেম ও শাসকগণ আমল করতে থাকেন। বেশীর ভাগ মানুষই উক্ত মুসিবাতের শিকার হয়েছিলেন। কিছু দূর্বল চিত্তের মানুষ যারা খুশু ও খুজু এবং ইবাদত-বন্দেগীর প্রদর্শনী করতো তারা জাল হাদীস এজন্য বর্ণনা করতো, যেন এর বিনিময়ে শাসকদের কাছ থেকে কিছু উপঢৌকন নিতে পারে ও তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাদের নেক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং কিছু ধন-সম্পদ ও মর্যাদা হাসিল করতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে কিছু দ্বীনদার মানুষ যারা মিথ্যা ও গীবাতকে সম্পূর্ণরূপে হারাম গণ্য করতো, তারাও জাল হাদীস বয়ান করতে আরম্ভ করে দিল -তারা যদি সেগুলিকে বাতিলই গণ্য করতো,

এবং সেগুলির মধ্যে কোন ওজর-অজুহাত খুজতেন না অথবা সেগুলির মধ্যে কাঁটা খুজে বেড়াতেন না। [১]

হায় আফসোস! উমর (রাঃ) যদি কোরআনকে বুঝতেন বা বুঝার চেষ্টা করতেন এবং তাতে নির্দেশিত আহ্‌কাম সমুহের শিক্ষাকে গ্রহণ করতেন যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জানতে পারেন নি। অথচ নিজের খেলাফত আমলে অনেক বিচার-আচার করেছেন।

হায় আফসোস! উমর (রাঃ) যদি আল্লাহ্‌র কিতাবকে বুঝতেন বা বোঝার চেষ্টা করতেন এবং সেখান থেকে **'তায়াম্মুম'**-এর হুকুমকে জেনে নিতেন যা তিনি তাঁর খেলাফত কালে জানতেন না। এই অজ্ঞতার কারণে পানি পাপ্ত না হলে যারা তাঁর স্মরণাপন্ন হতো তখন তিনি তাদেরকে নামাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে দিতেন। [২]

হায় আফসোস! উমর (রাঃ) যদি আল্লাহ্‌র কিতাবকে বুঝতে পারতেন এবং তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি জোর দিতেন এবং সেটা থেকে **'তালাক'**-এর হুকুমকে বুঝতে পারতেন। তালাক তো দু'টাই, এরপর হয় কাছে রেখে দাও, না হয় আজাদ করে দাও। কিন্তু উমর এক বৈঠকেই তিন তালাককে জায়েজ করে দিলেন। [৩] এবং তিনি নিজের মত ও ইজতিহাদকে আল্লাহ্‌র হুকুমের উপরে প্রাধান্য দিয়ে সেটাকে দেয়ালে ছুড়ে মারেছেন।

অনস্বীকার্য সত্য তো এটাই যে, খলিফাগণ হাদীসের প্রচারকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং হাদীস প্রচারকারীকে শাস্তির হুমকি দিয়েছিলেন। তারা হাদীসের উপর এজন্য পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন যেন তাদের ভুল-ক্রটি এবং ষড়যন্ত্রগুলি প্রকাশ না পেয়ে যায় এবং কোরআনের মত তারা হাদীসও বিশ্লেষণ করতে পারতেন না, কারণ কোরআন হচ্ছে **'ছামেত'** এবং অসংখ্য কারণ বা যুক্তি সম্বলিত, কিন্তু হাদিসে রাসুল (সাঃ) তো হলো রাসুল (সাঃ)-এর কথা এবং আমলের নাম। এই কথাটিকে কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। সে কারণেই তো হযরত আলী (আঃ) ইবনে অব্বাসকে খারেজীদের সাথে বাহাস (বিতর্ক) করার জন্য পাঠানোর সময় বলেছিলেন ঃ **"তুমি তাদের প্রতি কোরআন দ্বারা হুজ্জাত (যুক্তি বা দলিল) প্রতিষ্ঠা করবে না, কারণ কোরআনে অনেক এহতেমাল (ধারণা বা অনুমান বা সন্দেহ) আয়াত আছে যার প্রতি তুমি এবং তারা উভয়েই বিশ্বাস রাখ। সুতরাং তাদের প্রতি সুন্নাত দ্বারা হুজ্জাত কায়েম কোরবে তা'হলে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না"**। [৪]

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৩৭, **কিতাবুল ইলম** এবং খঃ ৫, পৃঃ ১৩৮

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৯০ এবং **সহীহ্ মুসলিম**, খঃ ১, পৃঃ ১৯৩ -**'তায়াম্মুম'** অধ্যায়ে।

৩ **সহীহ্ মুসলিম**, **'কিতাবুত তালাক'** অধ্যায়।

৪ **নাহ্জুল আল-বালাঘা**, খঃ ১, পৃঃ ৭৭, ইবনে আব্বাসের নামে চিঠি।

প্রত্যাখ্যান করলেন যে, **'আমি তোমাদের পূর্বেও লোকজনের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম তারা বই লিখেছিল এবং উক্ত কাজেই ডুবে রইল এবং আল্লাহ্র কিতাবকে ভুল গেল'**। এখানে 'শোরা'-র দাবী কোথায় হারিয়ে গেল? যে 'শোরা'-কে আহলে সুন্নাতগণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে জ্ঞান করে থাকেন। ঐ কসম কোথায় গেল যারা হাদীস সংকলনের কাজে এমই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ্র কিতাবকেই ভুলতে বসেছিল? উক্ত বিষয়ে তো আমরা উমর ইবনে খাত্তাব ব্যতীত আর কারোর কাছেই শুনিনি। উক্ত কওমের যদি অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে তো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তারা আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে **'তাহরিফ'** (পরিবর্তন ও পরিবর্ধন) করে নিজেদের পক্ষ্য থেকে আরেকটি কিতাবের জন্ম দিয়েছিল। এই বিষয়ে আল্লাহ্ পাক কোরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ **"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।"** [১]

কিন্তু **'সুনান'** লিখতে কোন মুশকিল নয়, কারণ এটাতো ঐ মাসুম নবীর কথা যিনি নিজের ইচ্ছায় তো কিছু বলেন না, তিনি তো ওহির মারফত কথা বলেন এবং **'সুনান'** হলো কোরআনের তাফসীর। সুতরাং আল্লাহ্ বলছেন ঃ **"এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে"**। [২]

আর রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, "আমাকে কোরআন দান করা হয়েছে এবং তার উদাহরণ তার সাথেই আছে এবং এটাতো কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী কাছে স্পষ্ট হয়েই আছে কেননা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, যাকাত এবং সেগুলির 'রাকয়াত' ও 'পরিমানের' কথা কোরআনে উল্লেখ নাই। আর না রোজার আহ্কাম এবং হজ্বের পদ্ধতি কোরআনে বয়ান হয়েছে বরং অধিকাংশ আহ্কাম রাসুল (সাঃ) বয়ান করেছেন। সেকারণেই তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ **"রাসুল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।"** [৩]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন ঃ **"(হে রাসুল) বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন"**।

হায় আফসোস! উমর (রাঃ) যদি আল্লাহ্র কিতাবকে বুঝতে পারতেন এবং তাতেই আত্মনিয়োগ করতেন, তদ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশাবলীকে আনুগত্য করতেন

---

১ সূরা বাকারাহ্ ঃ ৭৯

২ সূরা নাহ্ল ঃ ৪৪

৩ সূরা হাশর ঃ ৭

বিশেষ করে আবু বকর ও উমর (রাঃ) তো বিষয়টি খুব ভাল করেই জানতেন।[১] সে কারণেই আলী (আঃ) বলেছেন ঃ "*সে (আবু বকর) নিশ্চিতভাবেই জ্ঞাত ছিল যে, খেলাফতের জন্য আমার অবস্থান এমন যেন যাঁতার কেন্দ্রিয় শলাকা।*"

হয়তো সে কারণেই আবু বকর ও উমর (রাঃ) নবীর (সাঃ) হাদীসকে বর্ণনা করাকে সাহাবীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে ছিলেন।

যে কথাটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এবং কোরআন হতে প্রমান উপস্থাপন করেছি। যদিও কোরআনে সরাসরি আলী (আঃ)-এর নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু কোরআনে 'বেলায়েতর আয়াত' মজুদ আছে। এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসে আলী (আঃ)-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

- *"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা"*
- *"আমার সাথে আলীর এমনই সম্পর্ক, মূসার সাথে হারুনের সম্পর্ক যেমন ছিল"*
- *"আমার পর আলী আমার ভাই, আমার ওয়াসী ও আমার খলিফা হবেন"*
- *"আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে"*
- *"সে আমার পর সমস্ত মোমিনের ওয়ালি হবে"*

উক্ত হাদীস সমূহ ধারাবাহিকভাবে তাবারী তার '**রিয়াসুন্নাজারাত**'-এ, নেসায়ী তার '**খাসায়েস**'-এ এবং আহমদ ইবনে হাম্বলও লিপিবদ্ধ করেছেন।

এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ) নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং সেগুলিকে পুড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত সফল হয়েছেন যে, হাদীস মুখ থেকে উচ্চারণও হতে পারিনি, সাহাবারা বয়ানও করতে পারেন নি -যা আমরা ক্বারজাহ্ ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে বয়ান করেছি এবং এই নিষেধাজ্ঞা সিকি শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল। যখন আলী (আঃ) খেলাফতের মসনদে উপবিষ্ট হলেন তখন সাহাবাদের "**রাহবাহ্**"-এর ময়দানে জমায়েত করেছিলেন এবং তাদের কাছে '**গাদীর-এ-খুম**'-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ৩০ জন সাহাবা দাঁড়িয়ে 'হাদীসটি সত্য' স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন এবং ঐ স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের মধ্যে ১৬ জন বদরী সাহাবী ছিলেন।[২]

উক্ত বিষয়াবলী স্পষ্টতঃ প্রমাণ দিচ্ছে যে, হযরত আলীর (আঃ) তা শুনে ৩০ জন সাহাবা হাদীসটি বয়ান করেছিলেন। আলী (আঃ) যদি খলিফা না হতেন এবং তাঁর কাছে শক্তি না থাকতো তাহলে ঐ সাহাবারা ভয়ের কারণে চুপচাপ বসে থাকতেন। অথচ তখনও কয়েকজন সাহাবী হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে চুপ করেই বসে ছিলেন। যেমন আনাস ইবনে

---

১ **সিররুল আলামী**, -ইমাম গাজ্জালী

২ **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ১, পৃঃ ১১৯ এবং **ইবনে আসাকির**, খঃ ২, পৃঃ ৭

হযরত আবু বকরকে (রাঃ) খলিফা বনিয়ে আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে ঃ

এ বিষয়ে হযরত আলী (আঃ) বয়ান করেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌র কসম, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) নিজে নিজেই খেলাফতের জামা পরিধান করে নিয়েছিল। সে নিশ্চিতভাবেই জ্ঞাত ছিল যে, খেলাফতের জন্য আমার অবস্থান এমন যেন যাঁতার কেন্দ্রিয় শলাকা। বন্যার পানি আমার কাছ থেকে প্রবাহিত হয় এবং পাখী আমার কাছ পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না। আমি খেলাফতের সামনে একটা পর্দা টেনে দিলাম এবং নিজেকে সেটা থেকে নির্লিপ্ত রাখলাম।

এরপর আমি প্রবল বেগে আক্রমণ করা অথবা ধৈর্য সহকারে চোখ বন্ধ করে অন্ধকারের সকল দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে বয়স্কগণ দূর্বল হয়ে পড়লো, যুবকেরা বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং মোমেনগণ চাপের মুখে আমরণ কষ্ট করে কাজ করছিলো। আমি দেখলাম এ অবস্থায় ধৈর্য ঘারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং আমি ধৈর্য ধারণ করলাম যদিও তাদের কর্মকান্ড কাঁটার মতো চোখে বিধছিলো এবং সামগ্রিক অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে পড়েছিলো। প্রথম জনের মৃত্যু পর্যন্ত আমার লুণ্ঠিত উত্তরাধিকারের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সে তা ইবনে খাত্তাবের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এরপর আমার দিন উটের পিঠে (অতি দুঃখে-কষ্টে) কাটতে লাগল। শুধুমাত্র জাবিরের ভ্রাতা হাইয়ানের সহচার্যে ক'টি দিন ভালো গেল।

এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, জীবদ্দশায় সে খেলাফত থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে সে তা অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা দু'জনই পরিকল্পিতভাবে একই স্তনের বাঁটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এ জন (উমর) খেলাফতকে একটা শক্ত বেষ্টনীর মধ্যে রাখলো, যেখানে কথা-বার্তা ছিল উদ্ধত এবং স্পর্শ ছিল রূঢ়; অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং তদ্রুপ ওজরও দেখানো হতো। খেলাফতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি মাত্রই অবাধ্য উটের সওয়ারের মতো হয়ে যেতো—লাগাম টেনে ধরলে নাসারন্ধ্র কেটে যায়, আবার টেনে না ধরলে সওয়ার নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র কসম, ফলত, মানুষ বলগাহীনতা, ভিন্নরূপিতা, অদৃঢ়তা ও পথভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছিল। [১]

প্রত্যেক সত্যপন্থী ও সত্য সন্ধানী এ কথা ভাল করেই জানেন যে, রাসুল (সাঃ) নিজের ইন্তেকালের পূর্বে মনোনয়ন বা স্থলাভিষিক্ত দ্বারা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে খলিফা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন এবং বিষয়টি অধিকাংশ সাহাবার জানা ছিল,

---

১ নাহ্‌জ আল-বালাঘা, খোৎবা ঃ ৩

মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা হুজ্জাত কায়েম করতে চান [অর্থাৎ ঐ সমস্ত হাদীস যেগুলি দ্বারা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক আলীর (আঃ) খেলাফতের মনোনয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়] তখন তারা বলবে যে, **"নবীর (সাঃ) হাদীসকে বাদ দাও সেগুলিতে অনেক মতভেদ আছে, আমাদের জন্য তো আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট।"** এবং উক্ত কিতাবে আলী যে নবীর খলিফা হবেন তার কোন বর্ণনা নেই বরং কোরআন তো খেলাফতের বিষয়কে 'শোরা'-র উপর ন্যস্ত করেছে। এই হলো তাদের দলিল, আমি যখনই আহলে সুন্নাতের কোন আলেমের সাথে আলোচনা করেছি, তখন তারা সর্বক্ষণ 'শোরা'-রই গুণ-কীর্তন করেছেন।

তারা এই কথা বেমালুম ভুলে যান যে, **"আবু বকরের বায়াত বিনা চিন্তা-ভাবনাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল"**। তারা আরো বলেন যে, **"আল্লাহ্‌ পাক মুসলমানদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন।"** [১] সেটাও তো বিনা পরামর্শে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বরং অজ্ঞতা, জোর জবরদস্তী এবং হুমকির ফলে কার্যকরী হয়েছিল। [২]

অথচ অনেক নেক ও ছালেহ্‌ সাহাবাগণ উক্ত বায়াতের প্রতি ঘোর আপত্তি করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত সাহাবাদের সরদার আলী ইবনে আবি তালিব এবং সা'দ ইবনে উবাদা, আম্মার ইবনে ইয়াস্‌সীর, সালমান ফারসী, মেকদাদ, জোবায়ের এবং ইবনে আব্বাস ইত্যাদীগণ ঘোর আপত্তি করেছিলেন। বিষয়টি বিশ্বস্ত ইতিহাস বেত্তাগণ তাদের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই আমি এই মুহূর্তে উক্ত বিষয়ের পুনঃরাবৃত্তি করতে চাই না। আবু বকর (রাঃ) তাঁর পরে উমরকে (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন -আমি এই বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই এবং আহলে সুন্নাত ও 'শোরা' ভক্তবৃন্দকে প্রশ্ন করতে চাই যে, **দ্বিতীয় খলিফার বিষয়টি আবু বকর (রাঃ) 'শোরা'-র উপর দায়ীত্ব কেন দিলেন না? এবং উমরকে (রাঃ) একমাত্র নিজের সিদ্ধান্তানুযায়ী খলিফা বানিয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে কেন চাপিয়ে দিলেন?**

উক্ত ব্যাপারেও আমি অভ্যাসবশতঃ আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য আহলে সুন্নাতেরই বই-পুস্তক দ্বারা দলিল উপস্থাপন করবো এবং ইহাও প্রমান যে, **আবু বকর (রাঃ) কেমন করে তাঁর বন্ধু উমরকে (রাঃ) খলিফা বানিয়ে ছিলেন?**

ইবনে ক্বোতায়বাহ্‌ 'তারিখুল খোলাফা'-র **"মারজে আবু বকর ওয়া ইসতেখলাফায়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু"** অধ্যায়ে বয়ান করেন যে, ... অতঃপর উসমানকে ডেকে বললেন যে, "আমার ওসিয়াত নামা লেখ"। উসমান লিখলেন ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটা হলো আবু বকর ইবনে কোহাফার ওসিয়াত নামা, যা তিনি মৃত্যুর সময় এবং আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন কালে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের সাথে

---

১ **সহীহ্‌ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ২৬, -**'কিতাবুল মোহারেবীন'**

২ **আল-ইমামত ওয়াস সিয়াসাত**, ইবনে ক্বোতায়বাহ্‌ ঃ **ইসতেখলাফে আবি বকর**।

মালিক, বররা ইবনে আ'জিব, জায়েদ ইবনে আরকাম এবং জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বিজলী। তারা সকলেই আলীর (আঃ) বদ-দোয়ায় অভিশপ্ত হয়েছিলেন। [1]

উক্ত খেলাফত হযরত আলীর (আঃ) কোন উপকারেই আসেনি। কারণ তাঁর খেলাফত আমলের পুরো সময়টাই উত্থান-পতন, ফেৎনা-ফ্যাসাদ, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহতেই শেষ হয়ে যায়। বদর, হুনাইন এবং খায়বারের শত্রুতার কারণে হিংসা-বিদ্বেশে লোকজন কেটে পড়েছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে। তিনি নাকেসীন (নীচ ও হীন প্রকৃতির মানুষ), ক্বাসেতীন এবং মারেকীনদের মাঝে উক্ত হাদীস স্বীকারকারীদের চিহ্নিত করতে পারতেন না। তারা তো উসমানের (রাঃ) আমল থেকেই ফেৎনা-ফ্যাসাদ, ঘুষ এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ছিল। আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর পক্ষে বিগত সিকি শতাব্দী ধরে চলমান ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও অরাজকতার সমাধান (ইসলাহ্) করা সম্ভব ছিল না। তবে হ্যাঁ, সম্ভবপর হতো তিনিও যদি ফ্যাসাদ করতেন, কিন্তু তিনি তো এই জঘন্য কাজ করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ***"আল্লাহ্ কসম আমি ভাল করেই জানি যে তোমাদের ইসলাহ্ কোন জিনিস দ্বারা সম্ভব হবে, কিন্তু আমি আমার নফসকে বরবাদ করে তোমাদের ইসলাহ্ করবো না"।***

কিছু দিন পরেই মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান খেলাফতের মসনদে আসীন হলো এবং হাদীস বর্ণনার প্রতি আবারও নিষেধাজ্ঞা চালু হয়ে গেল। সুতরাং মুয়াবিয়াও হাদীস সংকলনের বিষয়ে বললো ঃ "**ঐ সমস্ত হাদীস সংকলন করা হোক যেগুলি প্রথম দিকে উমরের আমলে বয়ান করা হতো**"। এখন তো অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়ালো এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের হাদীস রচনা করার কাজে নিয়োজিত করা হলো এবং সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) মিথ্যার চোরাবালীতে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

এমনই অবস্থার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের উপর দিয়ে একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয় এবং সাধারণ মানুষ মুয়াবিয়ার সুন্নাতের আনুগত্য করতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের কথা **"সুন্নাত-এ-মুয়াবিয়া"**-এর অর্থ হলো এই যে, প্রথম তিন খলিফা আবু বকর, উমর ও উসমানের (রাঃ) কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা যেগুলি মুয়াবিয়ার প্রিয় ছিল এবং স্বয়ং মুয়াবিয়া ও তার সহচরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সেগুলির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের সুন্নাতের একটি উদাহরণ হলো এই যে, তারা আলী (আঃ), আহলে বাইত এবং তাঁদের শিয়াদের (অনুসারীদের) প্রতি লানত ও গালিগালাজ করতো।

এজন্য আমি আবার নিজের বিষয় বস্তুর দিকে ফিরে যাচ্ছি এবং পুরাবৃত্তি করছি যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ) তাদের পরিকল্পনায় সফল হয়েছিলেন এবং কোরআনের দিকে রুজু হওয়ার নাটক সাজিয়ে নবীর (সাঃ) সুন্নাতকে নিঃশ্চিহ্ন করে ফেলেন। সুতরাং আজ ১৪০০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আপনারা যখন তাদের প্রতি রাসুল (সাঃ)-এর

---

১ **আনসাবুল আশরাফ**, খঃ ২, পৃঃ ১৫৬ এবং **আল মায়ারেফ**, ইবনে ক্বোতায়বাহ্, পৃঃ ১৯৪

আগামীর জন্য আমাকে ভয় প্রদর্শন করছো? আল্লাহ্ যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে, কাকে খলিফা বানিয়ে এসেছো, তখন আমি বলবো যে, ***সব চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে'*** । [১]

আর এই বিষয়ে সমস্ত ইতিহাস বেত্তাগণেরই ঐক্যমত আছে যে, আবু বকর (রাঃ) সাহাবাদের সাথে কোন পরামর্শ ছাড়াই উমরকে (রাঃ) খলিফা বানিয়ে দিয়েছিলেন তখন আমরা কি করে বলতে পারি যে, তিনি সাহাবাদের খাটো করার জন্য উমরকে (রাঃ) খলিফা বানিয়েছিলেন। কারণ সাহাবারা উমরকে পছন্দ করতেন না। যদিও ইবনে কোতায়বার উক্ত কথাকে প্রধান্য দেয়া হয়ে থাকে যে, "আনসার ও মুহাজিরগণ আবু বকরের কাছে এসে বল্লেন, **"আপনি আমাদেরকে তার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন"** । অথবা তাবারীর দৃষ্টিভংগীকে মেনে নেয়া যায়, যিনি লিখেছেন যে, **"সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু লোক যার মধ্যে তালহাও ছিলেন, আবু বকরের নিকট গিয়ে বল্লেন, 'আপনি পারওয়ারদিগারকে কি জবাব দিবেন? কারণ আপনি আমাদের উপর একজন বদ-মেজাজী ও রাগী মানুষকে হাকিম নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যার ভয়ে মানুষের অন্তর কাঁপে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পেয়ে যায়"** ।

অতএব উক্ত দুই বাক্যেরই ফলাফল একই রকম দাঁড়াবে -সেটা হলো এই যে, খেলাফতের দায় দায়িত্ব 'শোরা'-র প্রতি ন্যস্ত করা হয় নি এবং সাহাবারা উমরের (রাঃ) খলিফা হওয়াতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এবং আবু বকর (রাঃ) কোন সলা-পরামর্শ না করেই উমরকে (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত করে সাহাবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটাতো সে ঘটনারই ফসল যার সম্পর্কে আলী (আঃ) ঐ মুহূর্তে বলেছিলেন যখন আবু বকর ও উমর (রাঃ) বায়াতের জন্য অনান্য সাহাবীদের প্রতি বল প্রয়োগ করছিলেন। আলী (আঃ) উমরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ **"খুব ভালো করে খাতির-যত্ন কর, কারণ এতে তো তোমারও অংশ আছে। আজ তুমি তার পক্ষে খেলাফতকে শক্তিশালী করছো, কালকে সে তা তোমাকেই ফিরিয়ে দিবে"** ।

আর এটাই হলো সেই বাক্য, যা একজন সাহাবী উমরকে (রাঃ) তখন বলেছিলেন যখন তিনি **'ওসিয়াত নামা'** নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন। যেটাতে তার খেলাফত সম্পর্কে ওসিয়াত লিখিত ছিল। তখন সাহাবীটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "*হে আবু হাফসা এই পত্রে কি লেখা আছে*"? উত্তরে উমর বলেছিলেন, "*আমি জানি না তবে সবার আগে আমি এটা শুনেছি এবং অনুগত্য করেছি*" । ঐ সাহাবী বল্লেন, **"খোদার কসম, আমি জানি এতে কি লেখা আছে। প্রথমে তুমি তার খেলাফতকে শক্তিশালী করেছিলে তারই প্রতিদান স্বরূপ তিনি আজ তোমাকে খলিফা নিযুক্ত করে দিয়েছেন।"** [২]

---

১ **শারহে নাহ্‌জ আল-বালাঘা**, ইবনে আবিল হাদীদ, **খোতবায়ে শাকশাকিয়াহ্**

২ **আল ইমামত ওয়াস সিয়াসাত**, ইবনে কোতায়বা, খঃ ১, **"ইসতেখলাতে আবি বকর লি উমর"**অধ্যায়ে।

তাকে (উমরকে) ন্যায় করতে দেখ তাহলে আমি তার সম্পর্কে সেরকমই আশাবাদী, আর যদি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে দেখ, তাহলেও আমি আমার দৃষ্টিতে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গায়েবের ইলম আমার নেই **"ওয়ামা ইয়া'লামুল্লাজিনা জুলামু আইয়্যু মুনকুলেবিন ইয়ানকলিবুন"**।

এখানেই ওয়াসিয়াত নামা শেষ এবং সেটা উমরকে (রাঃ) সোপর্দ করে দেওয়া হলো। মোহাজিরগণ যখন জানতে পারলেন যে, আবু বকর (রাঃ) উমরকে (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত করে ফেলেছেন, তখন তারা আবু বকরের (রাঃ) নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন ঃ "*আমরা শুনেছি যে, আপনি উমরকে আমাদের হাকিম নিযুক্ত করেছেন, অথচ আপনি তাকে (উমরকে) ভাল করেই চিনেন এবং অবগত আছেন যে সে (উমর) আপনার উপস্থিতিতেই আমাদের সাথে কেমন আচরণ করতো। অতএব আপনি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন তখন কি হবে? আপনি যখন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছাবেন তখন নিশ্চয়ই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, তখন আপনি কি জবাব দিবেন"?* তাদের প্রশ্নের জবাবে আবু বকর বলেন, **"আল্লাহ্‌ যদি আমাকে প্রশ্ন করে তখন আমি জবাব দিব যে, আমি তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে খলিফা বানিয়েছি"**। [১]

তাবারী এবং ইবনে কাসির ইত্যাদীগণ লিখেছেন যে, "আবু বকর যখন উসমানকে ডেকে ওসিয়াত নামা লিখতে বললেন এবং উসমান লেখা আরম্ভ করলেন, তখন বিষয়বস্তু লিখার মাঝ খানেই আবু বকর বেহুশ হয়ে যান এবং সেই ফাঁকে উসমান উমর ইবনে খাত্তাবের নাম লিখে ফেলেন। আবু বকর যখন হুশ ফিরে পেলেন, তখন উসমানকে তার লেখা ওসিয়াতটি পড়ে শুনাতে বললেন। উসমান যখন ওসিয়াত পাঠ করলেন, সেখানে উমরের নাম লেখা ছিল। তখন আবু বকর উসমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"তুমি কি এটা তোমার ইচ্ছামত সংযোজন করেছ"?* উসমান বললেন, *"আপনার কি এরকমই ইচ্ছা ছিল না"?* আবু বকর বলেন, *"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ"*।

ওসিয়াত নামা যখর লেখা হয়ে গেলে তখন কিছু লোকজন আবু বকরের কাছে এসে উপস্থিত হন, তাদের মধ্যে তালহাও ছিলেন -তালহা বল্লেন, *"আপনি পারওয়ারদিগারকে কি জবাব দিবেন? কারণ আপনি এমনই এক বদ-মেজাজী এবং রাগী ব্যক্তিকে আমাদের উপর হাকিম (শাসক) নিযুক্ত করে দিলেন, যার সংস্পর্শ থেকে মানুষ পালিয়ে বেড়ায়, যার আতংকে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়"?*

আবু বকর শায়িত অবস্থায় বললেন, "*আমাকে একটু বসতে সাহায্য কর*"। লোকেরা তাকে ধরা ধরি করে বসিয়ে দেয়। তারপর তিনি তালহাকে বল্লেন, *"তুমি কি*

---

১ **তারিখুল খোলাফা**, আল মারুফ এবং **ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত**, খঃ ১, পৃঃ ২৪

এতক্ষণে তাদের সর্দার আলেমটি কোন দিশা না পেয়ে বলতে বাধ্য হলো যে, "*রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই, আমরা আল্লাহ্‌র ঐ ঘরে বসেছি যেখানে তিনি যিকির ও নামাজকে কায়েম করার হুকুম দিয়েছেন*"।

আমি বল্লাম ঃ "*অনুরূপভাবে ইলম হাসিল করার হুকুমও দেয়া হয়েছে*"। তিনি বল্লেন, "*জি হ্যাঁ, ঠিকই আছে, আমরা এখানে যুবকদেরকে শিক্ষা দান করে থাকি*"। আমি বল্লাম ঃ "*আমিও ইলমী বিতর্ক করছি*"। তিনি বল্লেন, "*আপনি এটার মধ্যে রাজনীতি টেনে এনে সব শেষ করে দিয়েছেন*"।

আমি আমার সংগী সহ সেখান থেকে ঐ সমস্ত যুবকদের প্রতি আফসোস করতে করতে চলে এলাম। যাদের কলবের উপর ওয়াহিবিয়াতের আকীদা-বিশ্বাস-কে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল, যদিও তারা সকলে ইমাম শাফেয়ীর মুকাল্লিদ ছিল আমি মনে করি যে তাদের মাযহাব, **'মাযহাব-এ-আহলে বাইত'**-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে বুজুর্গদের প্রতি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকল শ্রেনীর যুবক সন্মান প্রদর্শন করতো কারন সাদাত বংশের সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। সুতরাং ওহাবীরা প্রথমে যুবকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাদের জন্য জিনিস-পত্র, খাদ্য-খাবার ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা দানের বিনিময়ে তাদের অন্তর থেকে সাদাত (সেই বংশ পরম্পরা যাহা হযরত ফাতিমা যাহরা সালামুলা আলাইহা হতে শুরু হয়েছে)-এর দিক থেকে দৃষ্টিভংগীকে সম্পূর্ন রূপে পাল্টে দিয়েছে। এবং তারা সাদাতের প্রতি ভক্তি-সম্মান প্রদর্শনকে **'শিরক'** বলে জ্ঞান করতে শুরু করে দিয়েছে। অতি দুঃখের বিষয় যে, আফ্রিকার বেশীর ভাগ দেশগুলিতেই এই একই অবস্থা বিরাজ করছে।

এখন আমরা আবার আবু বকরের (রাঃ) আলোচনায় ফিরে যাব, যেখানে আমরা জানতে পারবো যে মৃত্যুর পূর্বেই আবু বকর (রাঃ) তার কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত ছিলেন। ইবনে ক্বোতায়বাহ্ নিজের **'তারিখুল খোলাফা'**-তে লিখেছেন যে, "আল্লাহ্‌র কসম! আমার তিনটি কৃত কর্মের জন্য সবচেয়ে বেশী আফসোস হয় যে, সেগুলি আমি কেন করলাম? আফসোস! আমি যদি আলীর (আঃ) গৃহকে বাদ দিতাম"। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, "যদি তারা আমার সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণাও দিত, তবুও যেন আমি ফাতিমার গৃহের কোন জিনিসের ব্যাপারে নাক না গলাতাম। আফসোস! আমি যদি **'সকীফায়ে বনু সায়েদা'**-তে আবু ওবায়দাহ্ অথবা উমরের হাতে বায়াত গ্রহণ করে নিতাম, তারা আমীর হতো এবং আমি তাদের উজির হতাম। হায় আফসোস! আমার কাছে যখন **'জিলফেজাত'**-এর বন্দীগুলোকে আনা হয়েছিল তখন আমি যদি তাদের হত্যা করে ফেলতাম অথবা মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু আগুনে পোড়াতাম না"? [১]

---

১ **তারিখে তাবারী**, খঃ ৪, পৃঃ ৫৩, **আল-আকদুল ফরিদ**, খঃ ৩, পৃঃ ২৫৪, **মোরাওয়াজুজ জোহব**, খঃ ১, পৃঃ ৪১৪

এর দ্বারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহলে সুন্নাতগণ যে 'শোরা' সম্পর্কে গর্ব ও অহংকার কওে থাকেন, আবু বকর ও উমরের (রাঃ) সামনে উক্ত 'শোরা'-র কোন মূল্যই ছিল না। কথাটি অন্য ভাবেও বলা যেতে পারে যে, আবু বকরই (রাঃ) সর্ব প্রথম 'শোরা'-কে একটি ফালতু বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন এবং বনি উমাইয়ার শাসকদের জন্য খেলাফতকে **'রাজতন্ত্রে'** এবং পিতা কর্তৃক পুত্রকে রাজা বানানোর পথ পরিস্কার করে দিয়েছিলেন। অতঃপর বনী উমাইয়ার পরে বনী আব্বাসীয়ারাও এই পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং আহলে সুন্নাতের 'শোরা'-র দৃষ্টিভংগীকে কাঁচকলা দেখিয়ে নিরুত্তোর করে দিল। উক্ত 'শোরা'-র উপর নাতো অতীতের দিনগুলিতে আমল হয়েছে, না আজ হচ্ছে, আর না ভবিষ্যতেও কখনো আমল হবে।

এই মুহূর্তে আমার একটি কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটা হলো এই যে, নাইরোবীর (কেনিয়া) একটি মসজিদে সৌদী আরবের ওহাবী আলেমের সাথে খেলাফতের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি মনোনয়ন দ্বারা 'খেলাফত'-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম, আর ঐ আলেমটি বলছিলেন যে, খেলাফতের বিষয়টি সম্পূর্ন আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করে থাকেন, সেখানে বান্দাহর কোন দখল নেই।

তিনি 'খেলাফত'-কে শোরার অবদান বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং অযথা প্রতিরোধ করছিলেন। চারি দিক থেকে তার ছাত্রবৃন্দ সমর্থন জ্ঞাপন করছিল এবং দাবী করছিল যে তাদের ওস্তাদ কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছেন, তারা তার প্রত্যেক কথায় সমর্থন দিচ্ছিল। তিনি এই আয়াতগুলি উপস্থাপন করেছিলেন ঃ "**ওয়া শাওয়েরুহুম ফিল আমরে**" এবং "**ওয়া আমরুহুম শোরা বাইনাহুম**"।

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, এভাবে তো আমি পরাজিত হয়ে যাবো, কেননা ঐ ছাত্রবৃন্দর ওস্তাদের নিকট **'ওয়াহিবায়িাত'**-এর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছিল। আমি ইহাও বুঝে ফেল্লাম যে, তারা সহীহ্ হাদীসও শুনতে রাজি হবে না, কারণ তারা এমন সব হাদীসের ভক্ত হয়েগিয়েছিল, যার বেশীর ভাগই মনগড়া, বানোওয়াট ও জ্বাল হাদীস ছিল। তাই আমি বাধ্য হয়ে 'শোরা'-কে স্বীকার করে নিয়েই ছাত্রবৃন্দ এবং তাদের ওস্তাদকে প্রশ্ন করলাম ঃ "তাহলে কি তোমরা তোমাদের বাদশাহ্ কে এই কথা দ্বারা আশ্বস্ত করতে পারবে যে, সে যেন ক্ষমতার আসন থেকে নেমে এসে তোমাদের **'সুলফে ছালেহদের'** আনুগত্য করবে এবং **'জাজিরাতুল আরব'**-কে মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিবে, যেন মুসলমানরা তাদের পছন্দ মত লোককে দেশের শাসক নির্বাচিত করতে পারে? আমার ধারণা বাদশাহ্, কস্মিন কালেও এই কথাটি গ্রহণ করবে না, কারণ তার পূর্বপুরুষরা খেলাফতের অধিকারী ছিল না। কিন্তু তারা বাদশাহ্ হয়ে যাওয়ার পর আজ জাজিরাতুল আরবের **'হেজাজ'** অঞ্চলের মালিক হয়ে গেছে। এমন কি সমস্ত অঞ্চলকে **'আল মামলিকাতুস সৌদিয়া'** বলে দাবী করে"।

হযরত উমর (রাঃ) নিজ 'ইজতিহাদ' দ্বারা কোরআনের বিরোধিতা করেছেন ঃ

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রঃ) সম্পর্কে তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়েই আছে যে, তিনি কোরআন ও সুন্নহর নির্দেশ সমুহের বিপরীতে ইজতিহাদ করতেন। আর আহলে সুন্নাতগণ তার এই কাজ তারই অধিকার বলে মান্য করে থাকেন এবং উক্ত উজতিহাদের জন্য তারা উমরের (রঃ) অনেক প্রশংসাও করে থাকেন। তাদের কাছে যখন ইনসাফ দাবী করা হয় তখন তারা ওজর উপস্থাপন করে থাকেন এবং যতসব জঘন্য ওজর-অজুহাত পেশ করতে থাকেন যে, সেগুলিকে বিবেক গ্রহণ করতে পারে না, আর না যুক্তি-প্রমান গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরনকারী কেমন করে মুজতাহিদ হতে পারে, সেটা কারোর বুঝে আসে না।

যেহেতু আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ **"আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসুলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে"**। [১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে, **"আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ন করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির; ... আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ন করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম; ... আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ন করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক**। [২]

বুখারী তার সহীহ্র কিতাবুল **"এ'তেসাম বিল কিতাব ও সুন্নাহ্"**-র অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ নবী (সাঃ) বলেছেন যে, "আল্লাহ্ জ্ঞান দান করার পর তা ফেরৎ নেন না বরং উলামাদেরকে তাদের ইলমসহ তুলে নেন এবং লোকজন মুর্খতায় পতিত হয়ে যায়। তখন লোকজন ঐ মুর্খদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের 'কিয়াস' ও রায় অনুসারে ফতোয়া দিয়ে থাকে। সুতরাং তারা নিজেরা গোমরাহ হয় এবং অন্যদেরও গোমরাহ করে"। [৩]

বুখারী তাঁর উক্ত কিতাবের একই অধ্যায়ে আরো লিখেছেন যে ঃ যখন নবী (সাঃ)-কে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো যে বিষয়ে কোন ওহি নাযিল হয় নি তখন তিনি (সাঃ) বলতেন, **"আমি জানি না"** অথবা ওহি নাযিল না হওয়া পর্যন্ত উত্তর দিতেন না এবং নিজের মতে ও ইচ্ছায় কোন কিছুই বলতেন না। আল্লাহ্ বলেছেন, **"বিমা আরাকাল্লাহ্"** আল্লাহ্ যেমনটি চান তেমন ফয়সালা করুন।" [৪]

---

১ সূরা আহযাব ঃ ৩৬

২ সূরা মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭

৩ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ১৪৮

৪ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ১৪৮

এখানে আমি আরো একটু সংযোজন করছি ঃ "আফসোস! হে আবু বকর আপনি যদি ফাতিমা যাহরার উপর জুলুম না করতেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যদি নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে নিতেন এবং তাঁকে রাজি করিয়ে নিতেন এবং আলীর গৃহকে পুড়িয়ে দেয়াকে 'মোবাহ্' ঘোষনা না করতেন"?

কিন্তু খেলাফত? আফসোস! আপনি (আবু বকর) যদি নিজের বন্ধু তথা ডান হাত উমর ও আবু উবায়দাকে ছেড়ে দিয়ে খেলাফতের শরীয়াতি হকদারকে সোপর্দ করে দিতেন, কারন স্বয়ং রাসুর (সাঃ) তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং নেতৃত্ব যদি তাঁর (আলীর) হাতে থাকতো তাহলে আজকে পৃথিবীর চেহারাই অন্য রকম হতো এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন সমগ্র পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত -যে বিষয়ে জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা আছে এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাই সত্য।

এবং **'ফুজাতুস সালমা'** যাকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ঃ আফসোস! যদি নবীর (সাঃ) হাদীসকে পুড়িয়ে না ফেলতেন এবং তা'দ্বারা যদি শরীয়াতের সহীহ্ হুকুম-আহ্‌কাম সমূহ হাসিল করতেন এবং **'ইজতিহাদ বিল-রায়'**-এর উপর আমল না করতেন?

আফসোস! মৃত্যু সজ্জায় যখন শুয়ে ছিলেন, তখন যদি খলিফা বানানোর সময় একটু চিন্তা-ভাবনা করতেন, তাহলে **'হক'** তার মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিকে প্রত্যবর্তন করতো। খেলাফতের জন্য যাঁর অবদান যাঁতা কলের খুঁটির মত। হে আবু বকর! আপনি অন্যান্য সবার চেয়ে বেশী আলীর ফজিলাত, কামালিয়াত, পারহেজগারী, জ্ঞান ও তাকওয়াহ্ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি তো হুবহু নবীর (সাঃ) মত, বিশেষ করে তিনি ইসলামকে রক্ষার জন্যেই কেবল আপনার মোকাবেলা করেন নি এবং সমস্ত বিষয় আপনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক উত্তম হতো, যদি আপনি উম্মতে মুহাম্মদীকে নসীহাত করতেন এবং উপযুক্ত জনকে খলিফা নিয়োগ করে ইসলামকে ধ্বংসের কবল হতে নাজাত দিতেন এবং সেটাকে উন্নিতির চরম শিখরে উন্নত করে যেতেন।

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আপনার **'মাগফেরাত'** কামনা করে মোনাজাত করবো, তিনি যেন আপনার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ফাতিমা, তাঁর পিতা, তাঁর স্বামী এবং সন্তানগণ আপনার প্রতি রাজি হয়ে যান। যেহেতু আপনি মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) কলিজার টুকরাকে কষ্ট দিয়েছেন যাঁর কষ্টে স্বয়ং আল্লাহ্ রাগান্বিত হোন -যাঁর সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হোন -কথাটি হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, "যে ফাতিমাকে কষ্ট দিল সে তাঁর পিতাকে কষ্ট দিল এবং যে তাঁর পিতাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্‌কে রাগান্বিত করলো। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, **"ওয়াল্লাজিনা ইউযুনা রাসুলুল্লাহি লাহুম আযাবুন আলীম"** অর্থাৎ **'যারা রাসুলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক আযাব অপেক্ষা করছে'**।

আল্লাহ্ পাক কারোর প্রতি ক্ষুব্ধ হলে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করি এবং তাঁর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মুসলমানদের প্রতি রাজি ও খুশি হয়ে যান।

আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না –সে? তোমাদের কী হইয়াছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক? "।[১]

কিন্তু উমর (রাঃ) সিদ্ধান্তাবলী থেকে মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না বরং সবকিছুই অবশ্যই জানতেন এবং জেনে শুনেই স্বার্থোদ্ধারের জন্য ইজতিহাদ করতেন, কিন্তু সেটাকে কুফুর বা ইসলাম বহির্ভূত জ্ঞান করতেন না। এবং এ কথাটিও সঠিক যে, উমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তির উপস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং নিশ্চিত রূপে জানতেন যে, আলী (আঃ) আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন। যদি উমর (রাঃ) সেটা নাই জানতেন তাহলে বিভিন্ন কঠিন সমস্যা সম্বলিত বিষয়-আশয় নিয়ে আলীর (আঃ) দিকে কেন রুজু করতেন না? এবং এই কথা বলতেন না যে, "**আলী না থাকলে উমর হালাক (ধ্বংস) হয়ে যেত**"। অতএব উমর (রাঃ) ঐ সমস্ত বিষয়ে আলী (আঃ)-এর দিকে কেন রুজু করেন নি যেগুলি নিজের মত ও মর্জি মোতাবেক ইজতিহাদ করেছেন?

আমার আকীদা-বিশ্বাস তো এই যে, মুক্ত চিন্তা-চেতনার ব্যক্তিবর্গ আমার সাথে একমত পোষণ করবেন, কেননা এ ধরনের ইজতিহাদ আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহ্‌কাম সমুহকে ধ্বংস করে ফেলে এবং উম্মতের আলেমগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং এখান থেকেই শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতা আরম্ভ হয় এবং শান-শওকত বিলীন হতে থাকে, মান-মর্যাদা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এটাকে পরিহার করলে সবারই আকীদা-বিশ্বাস এক হতো এবং আজ আমাদের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াতো।

এমন চিন্তা করার অধিকার আমাদের আছে যে, আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের উপর জবরদস্তী কব্জ করেছিলেন। এবং খেলাফতের জন্য শারয়ী হকদারকে (আইনগত আধিকার) বঞ্চিত করেছিলেন। আমরা একথাও চিন্তা করতে পারি যে, আবু বকর এবং উমর (রাঃ) যদি হাদীসগুলোকে জমা করে বিশেষ কিতাবে লিখে রাখতেন তাহলে নিজেদের এবং উম্মতের জন্য একটি ভান্ডার বানিয়ে নিতেন এবং হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস সংমিশ্রন হতো না এবং সবার আকীদা-বিশ্বাস এক হতো এবং অবস্থা অন্য রকম দাড়াতো।

কিন্তু হাদীস সমূহ সংকলনও করা হলো আবার সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হলো। আবার হাদীস সংকলন ও প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। এমন কি একে অপরের কাছে বর্ণনা করতেও নিষেধ করে দেয়া হলো। এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় মুসিবত এবং কঠিন আযাব স্বরূপ। **লা হাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইলা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।**

আপনাদের সম্মুখে কোরআনের কিছু কিছু স্পষ্ট নির্দেশাবলী উত্থাপন করা হচ্ছে যেগুলি বিপরীতে উমর ইবনে খাত্তাব ইজতিহাদ করেছিলেন ঃ

---

১ সুরা ইউনুস ঃ ৩৫

অতীত এবং বর্তমান জামানার উলামাদেরও একই ভাষ্য, তা এই যে, **"যারা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে নিজের মত ও ইচ্ছানুসারে কিছু বলবে সে কুফুর করবে এবং উক্ত কথাটি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী এবং রাসুল (সাঃ)-এর কথা ও আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত"**।

কিন্তু যখন উমর ইবনে খাত্তাব অথবা অন্যান্য সাহাবা অথবা চারজন মাযহাবী ইমাম উক্ত পদ্ধতির আওতাভূক্ত হয়ে পড়েন তখন সেই পদ্ধতিকে কেন ভূলে যাওয়া হয়? তখন কেন আল্লাহ্‌র কথার বিরুদ্ধাচারণকে 'ইজতিহাদ' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু বলা হয়ে থাকে যে, **"মুজতাহিদ যদি হাকিকত (সত্য) পর্যন্ত পৌছাতে পারে তাহলে তার জন্য দু'টি সোওয়াব, আর যদি ভুল করে বসে তাহলেও একটি পুরস্কার অবশ্যই পাবে"**।

কেউ এই কথা বলার অধিকার রাখে না, কারণ এটার উপর সমস্ত উম্মতে ইসলাম তথা শিয়া ও সুন্নী সকলই ঐক্যমত আছে এবং কথাটি নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারাও প্রমানিত।

আমি তো বলি যে, কথাটি সত্য, কিন্তু ইজতিহাদের বিষয় বস্তুতে বিরোধ আছে। শিয়াগণ ঐ সমস্ত বিষয়ে ইজতিহাদ গ্রহণ করে থাকেন যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ)-এর কোন নির্দেশ নেই। কিন্তু আহলে সুন্নাতগণ তেমনটি করেন না এবং খলিফা ও সোলহে সালেহীনদের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ) কর্তৃক নির্দিষ্ট বিষয়াবলীতেও ইজতিহাদ করাতে ভুল মনে করেন না। আল্লামা সৈয়দ শারফুদ্দিন মুসাভী তাঁর "**আন্নাস ওয়াল ইজতিহাদ**" গ্রন্থে প্রায় ১০০ টিরও বেশী বিষয়ের উল্লেখ করেছেন -যে গুলিতে সাহাবা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ, প্রথম তিন খলিফা কোরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজতিহাদ করেছেন। সত্য সন্ধানীগণের প্রতি অনুরোধ উক্ত গ্রন্থটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

উক্ত বিষয় বস্তুর আলোকে কয়েকটি সিদ্ধান্তাবলী যা উমর (রাঃ) বিরোধিতা করেছেন, সেগুলি বর্ণনা করা অবশম্ভাবী মনে করছি, কেননা উমর (রাঃ) ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত াবলী হতে অজ্ঞ ছিলেন। যদিও কথাটি আজব বলে মনে হয়, কেননা কোন মুর্খের বা অজ্ঞ লোকের এই অধিকার নেই যে, সে কোন জিনিসের 'হালাল' বা 'হারাম' হওয়ার বিষয়ে নির্দেশ জারি করবে। আল্লাহ্‌ পাক বলেছেনঃ **"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম'। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না"**। [১]

আর মূর্খদের ক্ষেত্রে এই কথা শোভা পায় না যে, উম্মতের মাঝে **'ইনসানে কামেল'** থাকতে তারা উম্মতের নেতৃত্ব দানের জন্য খেলাফতের আসনে আসীন হয়ে যাবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"বল, তোমরা যহাদিগকে শরীক কর তাহাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বল, 'আল্লাহ্‌ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি**

---

১ সুরা নাহ্‌ল ঃ ১১৬

"তোমার জন্য এতটাই যথেষ্ট ছিল যে তুমি মাটির উপর দুই হাত দিয়ে আঘাত করতে তার পর তাতে ফু দিয়ে নিজের দুই হাত দ্বারা মুখমন্ডল ও হাতের উল্টো পিঠে মাসেহ করে নিতে"। আম্মারের উক্ত কথা শুনে উমর বল্লেন, *"হে আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় কর"*। তখন আম্মার বল্লেন, *"আপনি যদি চান তাহলে আমি এই কথা বয়ান করবো না"*।[১]

সুবহান আল্লাহ্‌! উমর (রাঃ) শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহর বিরোধিতা করেই ক্ষ্যান্ত হন নি বরং সাহাবাগণকে নিজের মতের ও রায়ের বিরুদ্ধে বলতেও নিষেধ করে দিলেন। এবং আম্মার (রাঃ) তার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়ে বলেছিলেন, **"আপনি যদি চান তাহলে আমি এই কথা কারোর কাছে বলবো না"**। উমর (রাঃ) তার এই ইজতিহাদ ও মতদ্বন্দের প্রতি সাহাবাদের কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান করা সত্বেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজের ইজতিহাদের উপরই আমল করতে থাকেন। তার এই সিদ্ধান্ত অনেক সাহাবাকে আকৃষ্ট করেছিল, সে কারণেই তারা উমরের (রাঃ) মত ও রায়কে রাসুল (সাঃ)-এর চাইতেও উত্তম মনে করতেন। মুসলিম, শফিক হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ এবং মূসার নিকট বসে ছিলাম। আবু মূসা বল্লেন, "*হে আবু আবদুর রহমান! এই বিষয়ে আপনার কি মত যে, কেহ যদি মুজনাব হয়ে যায় এবং এক মাস পর্যন্তও পানি না পায় তাহলে সে কি করবে*"? আব্দুল্লাহ বল্লেন, "*যদি এক মাস পর্যন্তও পানি না পায় তাহলেও তায়াম্মুম করবে না*"। তখন আবু মুসা বল্লেন, "তাহলে কোরআনের এই আয়াতের কি অর্থ হবে **'ফালাম তাজিদু মাউ ফাতায়াম্মামু সয়ীদান তাইয়্যেবান'**। আব্দুল্লাহ বল্লেন, যদিও এই আয়াতে তায়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি যে এটা তখন কার্যকর হবে যখন পানি অত্যান্ত ঠান্ডা থাকে তখন তায়াম্মুম করা যাবে"। আবু মূসা, আব্দুল্লাহকে বল্লেন, "তুমি কি আম্মারের এই কথা শুনো নি যে, 'রাসুল (সাঃ) আমাকে কোন কাজে পাঠালেন, তখন আমি মুজনাব হয়ে পড়ি এবং কোথাও যখন পানি পেলাম না তখন পশুর ন্যায় মাটিতে গড়া গড়ি দিলাম এবং রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে এসে ঘটনাটি বল্লাম। তখন রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে তুমি মাটিতে এভাবে দুই হাতের থাবা দ্বারা আঘাত করতে*"। অতঃপর রাসুল (সাঃ) নিজের দুই হাত দিয়ে মাটিতে একবার আঘাত করেন এবং হাত দু'টি নিজের চেহারা মোবারকে এবং দুই হাতের উল্টে পিঠে মাসেহ করলেন"। আব্দুল্লাহ বল্লেন, "*তুমি কি জান না যে, উমর আম্মারের এই কথা দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি*"।

আমরা যখন বুখারী ও মুসলিমের উপরে বর্ণিত রেওয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন এই কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে উমরের (রাঃ) দৃষ্টিভংগী অনেক সাহাবাকেই আকৃষ্ট করেছিল এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের বিরোধিতাও সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং উক্ত রেওয়ায়েতের দূর্বলতা ও গরমিলও প্রকাশ পেয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই বিষয়ই উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের ইসলামী আহ্‌কাম সমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করার সাহস যোগানের পক্ষে ব্যাখ্যা

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৮৭

পবিত্র কোরআন ঘোষণা দিচ্ছে, **"যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচাস্থান হইতে আগমন করে, আথবা তোমরা স্ত্রীর সাহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তাবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা তোমাদের মুখ মন্ডলে ও হাতে মাসেহ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না; বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর"** ।[১]

হাদীসে এই কথা স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের উমরের (রাঃ) সম্মুখেই তায়াম্মুম করা শিখিয়ে ছিলেন। বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তায়াম্মুম'**-এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, উমর (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবীর (সাঃ) সাথে সফরে ছিলাম। সময় তখন রাত্র এবং শেষ রাত্রির দিকে কাফেলা আরাম করার জন্য যাত্রা বিরতি করে, কারণ আরাম মুসাফিরের কাছে অত্যান্ত প্রিয় হয়ে থাকে। সূর্যের তাপে যখন আমাদের ঘুম ভাংল, তখন সবার আগে অমুক ব্যক্তি উঠে তারপর অমুক, যাকে লোকেরা আবুজার বলে থাকে। রাবী আউফের নাম ভুলে যান। এবং চতুর্থ জন উমর ইবনে খাত্তাব উঠেছিলেন। রাসুল (সাঃ)-কে ঘুম থেকে ডাকা হতো না, কারণ আমরা জানতাম না যে তিনি ঘুমের ঘোরে কোন হালতে থাকেন, বরং তিনি নিজেই নিজেই উঠে পড়তেন। উমর জেগে উঠে যখন লোকজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন তখন চালাকি করে তিনি তাড়া তাড়ি তাকবীর দিলেন। তাকবীর এখনো শেষ হয়নি এমন সময় নবী (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। লোকেরা যার যার কথা রাসুল (সাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলো। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "কোন ব্যাপার নয়, সম্মুখে অগ্রসর হও। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি দাঁড়ালেন এবং সবাইকে ওযু করতে নির্দেশ দিলেন। ওযু করা হলো এবং তাঁর (সাঃ) ইমামতিতে নামাজ আদায় করা হলো। এক ব্যক্তি সবার সাথে নামাজে অংশ গ্রহণ করেনি। রাসুল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"তুমি সবার সাথে নামাজ পড়লে না কেন"?* সে বললো, *"আমি মুজনাব হয়ে পড়েছিলাম এবং পানি পাই নি"*। তখন রাসুল (সাঃ) বল্লেন, *"মাটি তো আছেই -ওটাই তোমার জন্য যথেষ্ট"*।[২]

কিন্তু উমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, **"যে ব্যক্তি পানি পাবে না সে যেন নামাজ ছেড়ে দেয়"**। তার এই দৃষ্টিভংগীকে প্রায় সকল হাদীস বেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন। মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে ঃ একদা এক ব্যক্তি উমরের কাছে এস বলে, "*আমি মুজনাব হয়ে পড়েছি এবং পানি পাচ্ছি না*"। উমর বল্লেন, "*তাহলে নামাজ পড় না*"। আম্মার বল্লেন, "হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি সে ঘটনা ভুলে গেলেন যখন আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম এবং আমরা উভয়েই মুজনাব হয়ে পড়ি, তখন আপনি তো নামাজই পড়েন নি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নিলাম, তারপর নামাজ আদায় করলাম। তখন নবী (সাঃ) বল্লেন,

---

১ সূরা মায়েদা ঃ ৬

২ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৮৮

প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কি না বা কোরআনের আয়াত বা হাদীস শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বা তার অর্থ পরখ করার ব্যাপারে তারা উমরকেই (রাঃ) মানদন্ড জ্ঞান করতেন। সুতরাং একমাত্র এই কারণেই আজ আমরা অনেক মানুষের কাজ-কর্মকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত দেখতে পাই। কারণ, নির্ধারিত বিষয় বস্তুর বিপরীত উমরের (রাঃ) ইজতিহাদই আজকে এই সমস্ত মাযহাবের রূপ ধারণ করেছে এবং তারই আনুগত্য করা হচ্ছে। যদিও জ্ঞানী-গুণী ও ক্ষমতাবান লোকেরা এই কথা ভাল করেই জানেন যে, খলিফাদের শাষন আমলে হাদীস বয়ান করা এবং সংকলন করা নিষিদ্ধ ছিল -হাদীস তো অনেক পরে সংকলন হয়েছে। হাফেজ এবং রাবীগণ যা কিছু বয়ান করেছেন তাঁহাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সেগুলি উমরের মাযহাবের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। কিছু কিছু রাবী নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস রচনা করে রাসুল (সাঃ)-এর নামে চালিয়ে দিয়েছেন যেন উক্ত হাদীস দ্বারা উমরের (রাঃ) পক্ষপাত করা যায়। যেমনঃ- **'মোতা হজ্জ্ব'** ও **'মোতা বিবাহ'**-এর মাসয়ালা এবং **'তারাবিহ নামাজ'** ইত্যাদির ব্যাপারে বিপরীতমুখী হাদীস রচিত হয়েছে এবং সেকারণেই এই সমস্ত মাসয়ালাগুলি মুসলমানদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। এবং উমরের (রাঃ) আমলই আজ অবধি বিরাজমান। যত দিন পর্যন্ত উমরের (রাঃ) পক্ষাবলম্বনকারীগণ বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই বিভেদেও অস্তিত্ব থাকবে। কারণ তারা **'হকের'** জন্য কথা বলেন না, তারা কেবল উমরের বিষয়েই কথা বলে থাকেন। উমরকে কেউ বলতে পারবে না যে, "হে উমর আপনি ভূল করেছেন, কেননা পানির অভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়া যায় না, তার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে 'তায়াম্মুমের' আয়াত মজুদ আছে এবং হাদীসের কিতাব গুলিতেও এই বিষয়ে হাদীস বয়ান করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত দুই বিষয়ে আপনার (উমর) কোন জ্ঞান নাই সেহেতু আপনার মানুষের জন্য খেলাফতের আসনে আসীন হয়ে উম্মতের নেতৃত্ব দান করা শোভা পায় না। আর যদি এ বিষয়টি আপনার জ্ঞানে ছিল, তাহলে আপনার উক্ত জ্ঞান আপনাকে কাফের বলে ঘোষণা দিচ্ছে। কারণ আপনি কোরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করেছেন। আপনি যদি মু'মিন হতেন তাহলে এমনটি করতেন না। কেননা আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সাঃ) যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেন তখন আপনার কোন অধিকার নাই যে কোন ফয়সালাকে মান্য করবেন আর কোন ফয়সালাকে অমান্য করবেন। আর এই কথা তো আপনি আমাদের চাইতে অধিক ভালো জানেন যে ঃ **"মাই ইয়া'সিল্লাহা ওয়া রাসুলিহি ফাক্বাদ দ্বাল্লা দ্বালালাম মুবিনা"** অর্থাৎ **"কেহ আল্লাহ্‌ এবং রাসুলকে অমান্য করিল সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে"।** [১] আল্লাহ্‌ পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ **"সদকা ও খয়রাত তো কেবল ফকীর, মিসকিন ও ভৃত্য ও যাদের আর্থিক সংগতি করা হয়ে থাকে এবং গোলামের মুক্তিতে এবং দেনাদারদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে এবং গরীব মুসাফিরদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরজ এবং আল্লাহ্‌ যথেষ্ট জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান"।**

রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে কথাটি অনেক বিখ্যাত যে তিনি **'মুয়াল্লেফাতুল কুলুব'**-কে ঐ হক দান করতেন যেটা আল্লাহ্‌ ফরজ করেছেন। কিন্তু উমর (রাঃ) উক্ত হককে নিজ

১ সূরা আযহাব ঃ ৩৬

প্রদান করে। এবং এর সত্যতাও বাকী থাকে না। সে কারণেই একটি হুকুমকে ভিত্তি করে সমস্ত মাযহাব অবলম্বী এক কাতারে দাঁড়িয়েছেন। যদিও তারা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী হন না কেন। এখন আপনাদের (আহলে সুন্নাতগণ) অধিকার আছে নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। কারণ আপনাদের সৈয়্যেদ ও সরদার উমরও (রাঃ), কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত নিজের মত ও সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতেন, যা খুশি তাই বলতেন। আপনাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না, কারণ আপনারা হলেন **"আনুগত্যকারী, আপনারা আবিষ্কারক নন"**। [১]

এর তুলনায় তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের এই কথা আরো আশ্চর্যজনক যে, তিনি বলেন, **"এক মাস পর্যন্ত যদি পানি প্রাপ্ত না হয় তাহলেও মুসলমানরা তায়াম্মুম করবে না"**। আব্দুলাহ ইবনে মাসুদের মত একজন জলিলুল ক্বদর সাহাবী যখন বলতে পারেন যে, মুজনাব ব্যক্তি যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায় তাহলে এক মাস পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে দিবে তবুও **'তায়াম্মুম'** যেন না করে এবং তিনি (আব্দুল্লাহ) আবু মায়সাকে এই কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, **'সুরা মায়েদার'** উক্ত আয়াতটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। তাই উত্তরে বলেছিলেন, **"যদিও উক্ত আয়াতে তায়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু নির্দেশটি তখন কার্যকরী হবে যখন পানি ঠান্ডা থাকে।"**

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, তারা ইচ্ছামত কোরআনের নির্দেশাবলীর বিপরীতে কেমন করে ইজতিহাদ করতেন। আফসোসের বিষয় হলো এই যে, তারা উম্মতের ক্ষয় ক্ষতির কথা চিন্তা করতেন না। যদিও আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ **"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না"**। [২]

এই ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ্) বলেন যে, **"যদিও আয়াতে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু সেটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন পানি ঠান্ডা থাকবে"**। তিনি কি আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) হতে বিচ্ছিন্ন নিজেকে দ্বীনের মুবাল্লিগ জ্ঞান করেছেন? তিনি কি মানুষের প্রতি তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার চেয়েও বেশী মেহেরবান ও দয়ালু? অতঃপর আবু মূসা ঐ সুন্নাত দ্বারা আব্দুল্লাহ্-কে কাবু করার চেষ্টা করেছিলেন, যে সুন্নাতটি আম্মার বয়ান করেছিলেন। যেখানে রাসুল (সাঃ) তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ঐ বিখ্যাত হাদীস-কে এই বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন যে ঐ হাদীস দ্বারা উমর ইবনে খাত্তাব সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আবার এখানে এই কথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অধিকাংশ সাহাবার নিকট উমরের (রাঃ) কথাই সবকিছুর প্রতি হুজ্জাত বা দলিল বলে গৃহিত হতো। অথচ আয়াতের পক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর কথা ও আমল মজুদ থাকা সত্বেও, উমর (রাঃ) কোন হাদীসের

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ৯১, **'কিতাবুত তায়াম্মুম'**

২ সূরা বাকারা ঃ ১৮৫

পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারেন না। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"যখন আমার আয়াত, যাহা সুস্পষ্ট, তাহাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, 'অন্য এক কোরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও।' বল, 'নিজ হইতে ইহা বদলান আমরার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয়, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।** [১]

অপর দিকে রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহ ঘোষণা দিচ্ছে ঃ **"আমার কর্তৃক ঘোষিত 'হালাল' কিয়ামত পর্যন্ত হালাল এবং আমার কর্তৃক ঘোষিত হারাম কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বলে গণ্য হবে"**।

কিন্তু **দোয়ালীবি** এবং **ইজতিহাদের** ভক্তবৃন্দের ধৃষ্টতার কারণে যুগের পরিবর্তন অনুসারে আহ্‌কাম সমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। অথচ ঐ পরিবর্তিত আহ্‌কাম সমূহের কিছুতেই নিন্দা করা যাবে না। আল্লাহ্‌র আহ্‌কামকে সংস্কারের কারণে গোত্রীয় আহ্‌কাম দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলা হয় যদিও সেগুলি আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের (আহলে সুন্নাতের) মধ্য হতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, *"শত্রুর উপর বিজয় অর্জন করার লক্ষে রোযাকে ভেঙে ফেল। আর বর্তমান যুগে আমরা যখন দারিদ্রতা ও মূর্খতার সাথে যুদ্ধ করছি তখন রোযার কোন প্রয়োজন নেই। আর রোযা তো পরিনামে আমাদের স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পথে বাধা দান করে। কেননা রোযা (স্ত্রী সহবাসকে) নারীর অধিকারকে অবমাননাকর বলে ঘোষনা দেয়"*। কেউ কেউ বলে থাকে যে, *"মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে নারীকে প্রস্রাবের পাত্র বলে গণ্য করা হতো"*। আজ আমরা তাদের স্বাধীনতা দিয়েছি এবং তাদের পূর্ণ অধিকার দান করেছি।

উক্ত বিলাসবহুল সিদ্ধান্তের মধ্যে জাহেরী অর্থের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অর্ন্তনিহিত অর্থকে সরাসরি বাদ দেয়া হয়েছে, ঠিক যেমনটি উমর (রাঃ) করেছিলেন যে, **"আজ পুরুষ ও নারীকে সমান মীরাস দেয়া হবে"**। কেননা আল্লাহ্‌ পুরুষকে দ্বিগুণ অংশ দেয়ার হুকুম তখন দিয়েছিলেন যখন পুরুষ সংসারের রুজি-রুটির ব্যবস্থা করতো এবং নারীরা বেকার বসে থাকত। কিন্তু আজ অবস্থা আর তেমনটি নয়, আজকের নারীরাও সংসারের জন্য আয় করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ সে তাঁর স্ত্রীর কথা উপস্থাপন করেছেন যে, তার স্ত্রী তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং সে (স্ত্রীর ভাই) তারই (স্ত্রীর) দয়ায় উজির (মন্ত্রী) হতে পেরেছে। অনুরূপভাবে সে জেনাকে **'মোবাহ'** ঘোষণা করেছে এবং যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় তার জন্য জেনাকে তার অধিকার বলে ঘোষণা দিয়েছে। এবং ঐ **'জেনা'**-র দ্বারা জন্ম নেয়া বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য শিশু সদন তৈরী করেছে। লোকজন তার এই কাজের অর্ন্তনিহীত অর্থ এভাবে নিয়েছে যে, **'সে জেনা দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তানদের প্রতি দয়া করেছে'**। কারণ ইতিপূর্বে লোকে লজ্জা-শরমের ভয়ে শিশুদের জীবিত দাফন করে ফেলতো। ইহা ছাড়াও আরো কত রকম যে ইজতিহাদ আছে তার ইয়ত্তা নেই।

---

১ সূরা ইউনুস ঃ ১৫

খেলাফত আমলে বাতিল ঘোষণা করেন এবং শরীয়াতি আহ্কামের বিপরীত ইজতিহাদ করেন এবং **'মুয়াল্লেফাতুল কুলুবদের'** বলেন যে, **"আমাদের নিকট তোমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামকে আল্লাহ্ পাক ইজ্জত দান করেছেন এবং তোমাদের হতে মুক্ত করেছেন"**। আসলে উমর (রাঃ) তো উক্ত আদেশ আবু বকরের (রাঃ) আমলেই জারী করিয়ে ছিলেন। ঘটনাটি এভাবে ঘটে ছিল যে ঃ **'মুয়াল্লেফাতুল কুলুবগণ'** আবু বকরের (রাঃ) কাছে তাদের হক চাইতে গিয়েছিলেন। তখন আবু বকর, উমরকে (রাঃ) চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দিলেন যে তাদের হক আদায় করে দাও। তারা চিরকুট নিয়ে উমরের (রাঃ) কাছে আসলে উমর (রাঃ) উক্ত চিরকুটটি ছিড়ে ফেলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, *'তোমাদেরকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। ইসলামকে আল্লাহ্ ইজ্জত দান করেছেন এবং তোমাদের কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যদি ইসলাম কবুল কর তো ভালো কথা, অন্যথায় আমাদের আর তোমাদের মাঝে তরবারী তো আছেই'*। ঐ অসহায়বৃন্দ পুনঃরায় আবু বকরের (রাঃ) কাছে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলেন, **"আমরা বুঝতে পারছি না, খলিফা আপনি না সে (উমর)"**। আবু বকর বল্লেন, **"ইনশা আল্লাহ্ তিনিই (উমর)"** এবং উমরের রায় অনুসারে আবু বকরও আমল করলেন।[১]

অতীব আশ্চর্যের কথা তো এটাই যে, আজও উমরের (রাঃ) পক্ষাবলম্বনকারীগণ উক্ত ঘটনাকে তার প্রশংসা এবং বাহাদুরী হিসাবেই গণ্য করে থাকেন। তাদেরই মধ্য হতে একজন শেখ মোঃ আল মারূফ বেহ্ দোয়ালেবী। তিনি নিজের কিতাব **'ফসুলুল ফিকাহ্'**-এর ২৩৯ পৃষ্ঠায় এভাবে লিখেছেন ঃ "সম্ভবতঃ মুয়াল্লেফাতুল কুলুবের উক্ত হককে যা আল্লাহ্ পাক কোরআনে ফরজ করেছেন, সেটাকে রহিত করার জন্য উমরের ইজতিহাদ ঐ সমস্ত আহ্কামের জন্য সূচনা ছিল মাত্র, কোরআনের যে সমস্ত হুকুম-আহ্কাম বা সিদ্ধান্ত াবলীকে উমর সময়ের দাবীর অজুহাত দখিয়ে নিজ ইজতিহাদ দ্বারা পরিবর্তন করেছিলেন"।

এরপর উক্ত স্বনামধন্য লেখক উমরের (রাঃ) জন্য ওজর উপস্থাপন করে বলেন যে, *"উমর উক্ত সিদ্ধান্তাবলীর অন্তরনিহিত অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, জাহেরী অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি।"* ... অবশেষে এমন সব উদ্ভট উদ্ভট যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যেগুলিকে আকল তথা বিবেক গ্রহণ করতে অপারগ। আমরা তাদের এই কথা স্বীকার করছি যে, উমর (রাঃ) সময়ের দাবী অনুসারে কোরআনের সিদ্ধান্তাবলীকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন। কিন্তু তার এই কথা কিছুতেই মানতে পারছি না যে, **'উমর কোরআনের অন্তরনিহিত অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, জাহেরী অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি'**।

শেখ মুহাম্মদ এবং তার সহচরদের প্রতি আমাদের আরজ হচ্ছে এই যে, 'কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তাবলী সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল নয়। কেননা কোরআন দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে যে, স্বয়ং রাসুল (সাঃ)-ও সেগুলিতে কোন

---

১ **আল জাওয়াহিরুল নাইয়ারাহ ফিল ফিক্হুল হানাফী**, খঃ ১, পৃঃ ১৬৪

আর যা কিছু আমি বয়ান করলাম; ইসলামী আন্দোলনের কর্ণধরদেরকে বলেছি যে, আজ তোমরা তোমাদের রাষ্ট্রপতির এই কথার বিরুদ্ধে মারামারী করছো যে, সে ইসলামী শরীয়াহ্ ও কোরআন এবং সুন্নাহর আনুগত্য করছে না। সুতরাং তোমাদের উপর এটাও ওয়াজিব যে, ঐ ব্যাক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং তাকে ত্যাগ করা, যে ব্যক্তি কোরআন ও শরীয়াতি সিদ্ধান্তের বিপরীতে ইজতিহাদের ভিত্তি স্তম্ভ স্থাপন করেগেছে। তোমাদের যদি ন্যায় বিচার করার মত মন-মানসিকতা থাকে এবং হকের আনুগত্য করতে আগ্রহী থাক। যদিও লোকেরা আমার এই কথাকে স্বীকার করতে চায় না এবং আমাকে গালমন্দ করে থাকে যে, আমি আজকের আমীর উমরাহ্‌দের (শাসক ও শোষক গোষ্ঠী) খলিফাদের সাথে তুলনা করে থাকি। তাদের জন্য আমার জবাব হলো এই যে, আজকের এই রাজা-বাদশাহ্‌গণ হচ্ছেন সেই ইজতিহাদেরই ফসল। আর মুসলমানরা রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কত দিন স্বাধীন ছিলেন? তারা বলে যে, "*আপনারা শিয়ারা সাহাবাদের প্রতি বিদ্রুপ করে থাকেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করে থাকেন, আমরা যদি ক্ষমতা পাই তাহলে তোমাদের আগুণে পুড়িয়ে মারবো!*" জবাবে আমি বলতে চাই যে, **"ইনশাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্ পাক আপনাদের সে দিনটি দেখার সৌভাগ্য নসীব করবেন না"**।

অতএব আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন ঃ **"এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্যে হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে। অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এই সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা এই সব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই যালিম। অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয় তবে সে অহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন আপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহ্‌র বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেও এবং তাহারা 'ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে আথবা বিধিমতে মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নি'মত ও কিতাব এবং হিকমত যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।**[১]

নির্দ্বিধায় রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের তফসীর এভাবে হতে থাকে যে, স্ত্রী তিন তালাকের পর স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। আর স্বামী তখন রুজু করতে পারবে যখন ঐ তালাক প্রাপ্তার সাথে আর একজন নিকাহ্ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দিবে। আর যখন সে তালাক দিয়ে দিবে তখন পূর্বের স্বামী নতুন স্বামীর উপর প্রাধান্য পাবে। এবং স্ত্রীর অধিকার থাকবে যে ইচ্ছা করলে পূর্বের স্বামীকে কবুল করতে পারে আবার নাও পারে।

---

১ সূরা বাকারা ঃ ২২৯-২৩২

আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে, ঐ ব্যক্তি উমরের (রাঃ) ব্যক্তিত্ব দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত যে, সে অনেক বার বিশেষ সহকারে তার ইজতিহাদের স্বপক্ষে বিশেষ করে উমরের (রাঃ) বর্ণনা টেনেছেন এবং এক জায়গা তো বলেই ফেলেছে যে, *"উমর কেবল তার জীবদ্দশায় নয় বরং তার মৃত্যুর পরও তার খেলাফতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। যেহেতু এই ব্যক্তিটিও হচ্ছে একটি দেশের রাষ্টপতি, সেহেতু সেও তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর সমস্ত সমস্যার বোঝা বহন করবে। একদা সে যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানগণ তার ইজতিহাদের জন্য সমালোচনা করছে, তখন সে বল্লো, "উমর তাঁর যুগে সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ ছিলেন, সুতরাং আমাদের এই নব্য যুগে আমি কেন ইজতিহাদ করবো না? উমরও রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন এবং আমিও রাষ্ট্রপতি"*।

আফসোসের বিষয় হলো এই যে, উক্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথাকে অবজ্ঞা ও ঠাট্টার ছলে বলে। নিজের এক ভাষণে বলেছে যে, *"মুহাম্মদ (সাঃ) কিছুই জানতেন না। যেহেতু তিনি ভূগোল সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতেন না, সেহেতু তিনি বলেছিলেন যে, 'জ্ঞান অর্জন করো তার জন্য যদি চীনেও যাওয়ার প্রয়োজন হয় সেখানে যাও'। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধারণা ছিল যে, চীনই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ সীমানা। মুহাম্মদ (সাঃ) এই কথা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, একদিন পৃথিবী এতো উন্নতি করবে যে বাতাসে লোহা উড্ডয়ন করবে এবং পটাশিয়াম বা এ্যাটম সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না"*। (নাউজুবিল্লাহ্)।

আমি এই বিবেকহীন ব্যক্তির প্রতি কেন র্ভৎসনা করবো না, যে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। অথচ নিজের রাষ্ট্রকে **'ইসলামী রাষ্ট্রে'** বলে নামকরণ করেছে, আবার ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। এর পিছনে মূলতঃ পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি কল-কাঠি নাড়ছে এবং এই রাষ্ট্রকে ইউরোপের অংশে পরিনত করতে চায়। অনেক বাদশাহ্ ও আমীরগণ তাকে মোবারকবাদ সহ উপঢৌকনও পাঠিয়েছেন। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তাকে সমর্থন দেয়ার পাশাপাশি তার প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ। আমি তাতেও তাকে দোষারোপ করবো না। কারণ আজ আমরা তার যে ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি সেটাতো ঠিকই আছে, কেননা যে পাত্রে যা থাকবে তাইতো বেরিয়ে আসবে। আমি যখন ন্যায় বিচার করবো তখন প্রথমে আবু বকর, উমর ও উসমানকে (রাঃ) আমার লক্ষ্যে পরিনত করবো। কারণ তারাই তো নবীর (সাঃ) তিরোধানের দিন হতেই এই পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের ইজতিহাদের কারণও তারাই। তাদের তুলনায় অন্যরা বেশী কিছু করতে সক্ষম হয় নি। সাত শত বৎসরের দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত ইসলামের হাকীকত ও নির্দিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম-কে তাদের কর্তৃক লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আজকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একটি রাষ্টের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত মুসলিম সমাজের জনসমক্ষে নিজের ভাষণে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করেই চলেছে, কেউ তার প্রতিবাদ করছে না। আর না উক্ত রাষ্ট্রের জনগণ কোন আপত্তি করছে, আর না অন্য কোন মুসলিম দেশের কোন মাথা ব্যাথা আছে।

জানেন না'। তখন আলী (আঃ) বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ্ তাদের ভাল করুক, তাদের মধ্যে আমার চাইতে বেশী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এমন কেউ আছে কি এবং যুদ্ধের ময়দানে আমার অগ্রবর্তী হয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেছে কি? আমার বয়স যখন ২০ বৎসরও হয় নি তখনই আভ্যন্তরীন ও বহিরাগত যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। আর এখন তো ষাটের বেশী বয়স হয়েছে। কিন্তু **সেই ব্যক্তির মতের মূল্যই বা কতটুকু যার মতামতকে গ্রহণই করা হয় না**"।

জি হ্যাঁ, শিয়াদের ছাড়া (যারা তাঁর ইমামতে বিশ্বাসী) কোন মুসলমানই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তিনি **'মুতায়া'**-র মহত্ব হননের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। **'তারাবিহ্'**-র বিদয়াতের জন্য অভিযোগ করেছেন। এমনকি ঐ সমস্ত আহ্কামের জন্য প্রতিবাদ মুখর ছিলেন যেগুলি আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ ও রায় কেবল শিয়াদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং অন্যান্য মুসলামনগণ উল্টা তাঁর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে এবং তাঁর প্রতি **'লানত'** পাঠাতো। তাঁর নাম ও যিকিরকে মুছে ফেলার কাজে নিয়োজিত ছিল। তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তখন কেউ মূল্য দেয় নি বা বুঝার চেষ্টাও করে নি। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (উমরের মৃত্যুর পর ইসলামের শাসনভার যার উপর ন্যস্ত ছিল) তাঁকে ডেকে বলেছিল যে, **"আমি একটি শর্তসাপেক্ষে আপনাকে খলিফা নিযুক্ত করবো, সেটা এই যে, আপনি পূর্বের দুই খলিফা আবু বকর ও উমরের সুন্নাত ও পদাংক অনুসরণ করে বিচার-আচার করবেন এবং সে মতে শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন"**। তখন আলী (আঃ) এই বলে অস্বীকার করে ছিলেন যে, **"আমি আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করবো"**। এবং এই বাক্য শোনার পর হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত দেয়া হয় নি। অতঃপর উসমান (রাঃ) তাদের শর্ত মেনে নেন এবং তাকেই খেলাফত হস্তান্তর করা হলো। সুতরাং **হযরত আলী (আঃ) যখন আবু বকর ও উমরের (রাঃ) মৃত্যুর পরও তাদের সাথে আপোষ করেন নি তখন তাদের জীদ্দশায় কিভাবে সম্ভব ছিল?**

সেকারণেই আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে **'জ্ঞান নগরীর তোরণ'** এবং রাসুল (সাঃ)-এর পরে সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে আহলে সুন্নাতগণ কোন গুরুত্বই দেন না, আর না কোন বিষয়ে তার দিকে রুজু করেন। বরং আহলে সুন্নাতগণ, আবু হানিফার আনুগত্য করে থাকেন। কোন বিষয়েই আলীর (আঃ) দিকে রুজু করেন না। অনুরূপভাবে, আহলে সুন্নাতের হাদীসের ইমামগণ যেমন বুখারী ও মুসলিম এদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে তারাও আবু হুরায়রা, ইবনে উমর এবং প্রত্যেক অযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে শত শত হাদীস নকল করেছেন কিন্তু আলী (আঃ) হতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র হাদীস নকল করেছেন। অবার সেগুলিও হচ্ছে মিথ্যা ও বানোয়াট যার দ্বারা আহলে বাইত (রাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। তারা এই কাজটি করেই ক্ষান্ত হন নি বরং যারা আলীর (আঃ) আনুগত্য করেন তাদের **'কাফের'** বলে থাকেন এবং তাদের **'রাফেজী'** বলে ডাকা হয়ে থাকে।

কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব তার স্বভাব মতে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ঐ সীমারেখার মধ্যে ভুল করেন (যা জ্ঞান পিয়াসীদের জন্য পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং ঐ হুকুমটিও পাল্টে দিয়ে বলেন যে, তালাক মাত্র একটাই, কিন্তু তিন বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বামীর জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। এভাবেই উমর (রাঃ) কোরআন মজিদ ও সুন্নাতে রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন।

সহীহ্ মুসলিমের **'কিতাবুত তালাক'**-এর **"তালাকুস সালাসা"** অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন ঃ "রাসুল (সাঃ), আবু বকর এবং উমরের শাসন আমলের দুই বৎসর পর্যন্ত তালাকের সিদ্ধান্ত এই রকম ছিল। তারপর উমর এটাকে পরিবর্তন করে দিলেন এবং বল্লেন যে, লোকেরা এই বিষয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এটাই এদের জন্য সহজ। যদি আমি এটার সত্যতা স্বীকার করি তাহলে তা তাদের জন্য হুজ্জাত হয়ে যেত"।

আল্লাহ্র কসম! খুবই আশ্চর্য লাগে যে খলিফা কত সাহসের সাথে আল্লাহ্র হুকুমকে পরিবর্তন করে দিলেন এবং প্রত্যেক সাহাবা তার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, কেউ আপত্তি করলেন না, কোন বাধাও দিলেন না। এবং আমরাও গরীবদের এই বলে ধোকা দেই যে ঃ একজন সাহাবী উমরকে বল্লেন, **"আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি আপনার কোন ভুল-ত্রুটি পাই তাহলে তরবারীর আঘাতে খবর নেব"**। এই মিথ্যা কথাটির উপর এই জন্য জোর দেয়া হয়ে থাকে, যেন খেলাফতকে নির্দ্বিধায় **'স্বাধীন গণতন্ত্র'** বলে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যদিও ইতিহাস এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। আর কোন কথার তখন কোন মূল্যই থাকে না, যখন উক্ত কথার উপর আমল করা হয় না।

হয়তো বা তারা **'কিতাবুল্লাহ্'** ও **'সুন্নাতে রাসুলল্লাহ্'**-এর মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন, যেটাকে উমর (রাঃ) সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তাইতো সাহাবারা উমরের (রাঃ) প্রত্যেক কার্য-কলাপকে নিরবে সহ্য করেছেন। এই প্রলাপ থেকে আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি যখন **'কাফসা'** শহরে ছিলাম ঐ সমস্ত লোকজনকে ফতোয়া দিতাম যারা তাদের স্ত্রীকে **"আন্তা হারামুন বিস সালাসা"** দ্বারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিত। আমি যখন তাদের তালাকের সঠিক হুকুম বলে দিতাম তখন তারা অত্যন্ত খুশি হত, যা খলিফাগণ নিজের ইতিহাদ দ্বারা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যারা তাদের জ্ঞানের দিকে আহ্বান করে, তাদেরকে তারা এই বলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে যে, **"শিয়াদের কাছে তো সব বিষয়ই হালাল"**। একদা তাদের মধ্যেকার একজন আমার সাথে খুব সুন্দর ভাবে প্রতিযোগিতার ছলে জিজ্ঞাসা করলো যে, "*সৈয়্যেদেনা উমর ইবনে খাত্তাব যখন উক্ত বিষয় এবং আল্লাহ্র অন্যান্য আহ্কাম সমূহকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন এবং সাহাবারাও সেটা মান্য করে চলেছেন, তখন সৈয়্যেদেনা আলী তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নি কেন*"? আমি তাকে সেই উত্তরই দিলাম, যেটা আলী (আঃ) কোরাইশগণকে তখন দিয়েছিলেন যখন তারা বলে ছিল যে, *'তিনি বীর বটে কিন্তু যুদ্ধের কলা-কৌশল*

মুসলিম তার সহীর "**কিতাবুস সালালাতুল মুসাফেরীন ওয়া কাসারুহা**"-তে ইবনে আব্বাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, *"আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ (জিহ্বা) দ্বারা স্বদেশে বা বাসস্থানে চার রাকাত ও সফরে দু রাকাত এবং ভয়ভীতির অবস্থায় এক রাকাত ওয়াজিব করেছেন"*।

অনুরূপভাবে মুসলিম তার সহীহ্‌তে **আনাস ইবনে মালিক** হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, "*রাসুল (সাঃ) যখন তিন ফারসাখ সফর করতেন তখন দু'রাকাত নামাজ পড়তেন*"।

তার নিকট থেকে আরো রেওয়ায়েত হয়েছে যে, *"আমরা মদীনা হতে রাসুল (সাঃ)-এর সংগে মক্কায় গেলাম এবং ফেরৎ না আসা পর্যন্ত আমরা দু'রাকাত নামাজ পড়তে থাকি"*। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, *"মক্কায় কতদিন অবস্থান করা হয়েছিল"?* তিনি উত্তরে বল্লেন, *"১০ দিন"*।

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, '**কসর**'-এর আয়াত যখন রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হল তখন তিনি (সাঃ) তাঁর কথা ও আমল দ্বারা উক্ত আয়াতের তফসীর করে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এটাকে গ্রহণ করে নেয়া মুসলামদের জন্য ওয়াজিব। এর দ্বারা দোয়ালিবী এবং তারই মত উমরের (রাঃ) মত লোকের দোষ-ত্রুটিকে শুদ্ধ বলে উপস্থাপনকারী এবং তাদের জন্য ওজর উপস্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গের এই দাবী বাতিল হয়ে যায়, যেখানে তারা বলে থাকেন যে, **'উমর এই আয়াতের অন্তঃনিহিত অর্থকে বুঝেছেন এবং জাহেরী অর্থকে গ্রহণ করেন নি। কারণ রাসুল (সাঃ) উক্ত কসরের আয়াত নাযিল হওয়ার সময় উমরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রমানিত ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অন্তর্নিহিত অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়'**। সেকারণে সফর অবস্থায় নামাজ কসর হবে যদিও মানুষের জন্য কোন ভয়-ভীতি না থাকে। কিন্তু উমরের (রাঃ) দৃষ্টি ভংগীই আলাদা, যা দোয়ালিবী এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য উলামারা নিজেদের ভক্তির কারণে বয়ান করেছেন।

উসমান ইবনে আফ্‌ফানের (রাঃ) প্রতিও আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। তিনিও কোরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজতিহাদ করেছেন। তিনিও খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত -তিনিও সফরে সম্পূর্ণ নামাজ পড়েছেন অর্থাৎ দু রাকাতের স্থলে চার রাকাত।

আমি কি প্রশ্ন করতে পারি যে, এই ফরজের মধ্যে কমতি অথবা বৃদ্ধির কারণ কি? আমার ধারণা হচ্ছে যে, উসমান (রাঃ) জনগণকে বিশেষ করে বনী উমাইয়াদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি **"মুহাম্মদ (সাঃ), আবু বকর ও উমরের (রাঃ) তুলনায় অনেক বেশী মুত্তাকী বা খোদা ভীরু"**!!!

আসলে শিয়াদের একমাত্র দোষ হলো এই যে, তারা রাসুল (সাঃ)-এর পর আলী (আঃ)-কে আনুগত্য করেন, যাকে প্রথম তিনি খলিফার আমলে এক প্রকার নজর বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং ইসলামের মধ্যে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে। তারপর উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের যুগে তো তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি লানত দেয়া হয়েছে। যারা ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেন তারা দ্রুতই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সত্য অনুধাবন করতে পারবেন এবং আলী (আঃ), আহলে বাইত ও তাঁদের শিয়াদের (অনুসারীদের) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে স্পষ্টতঃই চিহ্নিত করতে পারবেন।

শারয়ী হুকুম-আহ্‌কাম ও সিদ্ধান্ত সমূহের ক্ষেত্রে হযরত উসমানও (রাঃ) তাঁর পূর্ববর্তী দুই বন্ধুকেই অনুসরণ করেছিলেন ঃ

সম্ভবতঃ উসমানও (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নিকট থেকে আবু বকর ও উমরের (রাঃ) আনুগত্যের শর্ত সাপেক্ষে খেলাফতের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনিও উক্ত দুই ব্যক্তির ন্যায় কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহর বিরুদ্ধে ইজতিহাদ করবেন। যে ব্যক্তি উসমানের (রাঃ) খেলাফত আমলের পর্যালোচনা করবে সে স্পষ্টতঃই বুঝতে পারবে যে, ইজতিহাদের ময়দানে উসমান (রাঃ), আবু বকর ও উমরকে (রাঃ) পিছনে ফেলে দিয়েছেন। আমি বিষয়টিকে দীর্ঘায়ীত করতে চাই না। কারণ প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ উসমানের (রাঃ) ঐ সমস্ত আজগুবী কর্মকান্ডগুলি দ্বারা ভরপুর হয়ে আছে যে গুলিই তার হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুধী পাঠক ও সত্যসন্ধানীদের জ্ঞাতার্থে অতি সংক্ষেপে **'দ্বীন-এ-মুহাম্মদী'**-তে ইজতিহাদের পক্ষাবলম্বনকারী ব্যক্তিদের জন্য কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছি ঃ

মুসলিম তার সহীহ্‌র **"সালাতুল মুসাফেরীন"** কিতাবে আয়েশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন যে, *"আল্লাহ্ দু'রাকাত নামাজ ফরজ করেছিলেন এবং স্বদেশ ভূমিতে সম্পূর্ন (অর্থাৎ চার রাকাত) ফরজ করেছেন এবং সফরে উক্ত দু'রাকাতই ওয়াজিব রয়েগেল"*।

মুসলিম তার সহীহ্‌র উক্ত কিতাবে **'ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া'** হতে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ তিনি বলেন যে, "আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে বল্লাম, 'যদি তুমি কাফেরদের আক্রমনের আশংকা কর তাহলে নামাজ **কসর** করতে কোন দোষ নাই। এভাবে লোকজন রক্ষা পাবে'। উমর বল্লেন, "বিষয়টিকে নিয়ে আমারও তাজ্জব লাগছে, সেই বিষয়ে তোমারও তাজ্জব হচ্ছো, সুতরাং আমি রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি (সাঃ) বলেছিলেন ঃ *"এটা হলো সাদকা যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দান করেছেন। অতঃপর তোমরা উক্ত সাদকা কবুল করে নাও"*।

লা রাইবা! এতে কোন সন্দেহ নাই যে, খলিফা উসমান (রাঃ) নিজের মতের উপরই দৃঢ় ছিলেন। যদিও হযরত আলী (আঃ), উসমানকে (রাঃ) নবীর সুন্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ছিলেন, কিন্তু উসমান (রাঃ), আলীর (আঃ) বিরোধিতা পূর্বক লোকজনকে হজ্ব এবং উমরাহ্ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অনুরূপ ভাবে উসমান (রাঃ) নামাজের আহ্কাম-আরকান সমূহে ইজতিহাদ করে নিয়েছিলেন, তিনি সেজদাতে যাওয়ার সময় এবং সেজদা হতে মাথা তুলার সময় তাকবীর দিতেন না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমরান ইবনে হাছীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বল্লেন ঃ "আমি আলীর ইমামতিতে নামাজ আদায় করলাম। তিনি (আলী) আমাকে রাসুল (সাঃ) ও পূর্ববর্তী দুই খলিফার নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর পিছনে গিয়ে নামাজ আদায় করলাম, তখন খেয়াল করলাম তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে সোজা হওয়ার সময় তকবীর বল্লেন। আমি বল্লাম ঃ *"হে আবু নজীদ! সবার প্রথম উক্ত তকবীর কে বাদ দিয়েছিল"*? তিনি বল্লেন, *"উসমান, যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তার কণ্ঠস্বর দূর্বল হয়ে যায় তখন থেকে তিনি বাদ দিয়ে ছিলেন।* [১]

জি হ্যাঁ! এ ভাবেই রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত বরবাদ হয়ে যায় এবং তদস্থলে খলিফাদের সুন্নাত, সাহাবাদের সুন্নাত, বাদশাহদের সুন্নাত এমনকি উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের সুন্নাতগুলি স্থান দখল করে নেয়। আর এ গুলিই হচ্ছে ইসলামের মধ্যে **'বিদআত'**। সুতরাং রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, **"প্রতিটি বিদআত হচ্ছে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা এবং গোমরাহীর বা পথভ্রষ্টতার ফল হচ্ছে জাহান্নাম"**।

সে কারণেই আজ মুসলমানদের নামাজের মধ্যে বিভিন্ন তরিকা দৃশ্যমান। আমরা প্রত্যেককে এক জাতি মনে করি, কিন্তু তাদের কৃলব বা অন্তর হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। তারা যখন এক কাতারে দাঁড়াবে তখন লক্ষ্য করবেন, কারোর হাত ছাড়া আছে, তো কারোর হাত বাঁধা, আবার হাত বাঁধার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি, কেউ নাভীর উপর হাত বাঁধে, কেউ আবার বুকে। কেউ দুই পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো কেউ দুই পা ফাক করে। অথচ প্রত্যেক ফিরকা বা মাযহাব নিজ নিজ আমলকে সহীহ্ শুদ্ধ বলে জ্ঞান করে। উক্ত বিষয়ে আপনি যখন তাদের প্রশ্ন করবেন তখন তারা উত্তর দিবে যে, **"আরে ভাই এগুলো হচ্ছে নামাজের পদ্ধতিগত ব্যাপার, এগুলোর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। যার যেমন ইচ্ছে তেমন পড়, আসল উদ্দেশ্য নামাজ পড়া"**।

হ্যাঁ! এক পর্যায়ে কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আসল উদ্দেশ্য নামাজ পড়া। কিন্তু নামাজের জন্য ওয়াজিব তো এটাই যে, ঐ নামাজটি যেন রাসুল (সাঃ)-এর নামাজের মত হয়। কারণ রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ **"নামাজ ঠিক ঐভাবে আদায় কর যেভাবে আমাকে**

---

১ **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**, খঃ ৪, পৃঃ ৪৪০

মুসলিম তার সহীহ্‌র **"কিতুবুস সালাতে মুসাফেরীন ওয়া কাসারুহা"**-এর অধ্যায়ে সালিম হতে এবং সালিম তার পিতা হতে এবং তিনি রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসুল (সাঃ) মিনাতে কসর নামাজ পড়তেন এবং আবু বকর ও উমর তাদের খেলাফতের প্রথম দিকে এভাবেই নামাজ পড়তেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা পুরো নামাজ অর্থাৎ চার রাকাত নামাজ পড়া শুরু করেদেন"।

মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যুহুরী বলেন যে, আমি উরওয়াহ্-কে বল্লাম, *"আয়েশার কি হয়েছে যে, তিনি সফরেও পুরো নামাজ পড়েন"?* তিনি উত্তর দিলেন যে, *"আয়েশাও, উসমানের মত নিজে নিজেই তাবিল (ব্যাখ্যা) করে নিয়েছেন"*।

এভাবেই আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম এবং সিদ্ধান্ত সমূহ মুফাসসেরীনগণের তাফসীর ও ব্যাখ্যাকারীদের বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলো।

অনুরূপ ভাবে উসমান (রাঃ), উমরের (রাঃ) পথ অবলম্বন করে ইজতিহাদ দ্বারা **'মোতয়া হজ্ব'**-এর মর্যাদা হানী করেছেন এবং **'মোতয়া উন্নেসা'** (নারীদের সাথে মোতয়া)-কে হারাম ঘোষণা করেছেন। বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল হজ্ব'**-এর **"তাত্তামাত্তায়ু ওয়াল কোরআন"** অধ্যায়ে মারওয়ান ইবনে হাকাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, সে বল্লো, "আমি উসমান ও আলী, দু'জনকেই দেখেছিলাম যে, উসমান মোতয়া করা থেকে নিষেধ করতেন এবং দুটোকেই একত্রে করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আলী উক্ত উমরাহ ও হজ্বের উপর আমল করেছেন এবং বলেন, **"আমি কোন এক ব্যক্তির কথা মত নবীর (সাঃ) সুন্নাতকে বাদ দিব না"**।

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল হজ্ব'**-এর **"জাওয়াযুজ তামাত্তাউ"** অধ্যায়ে সাঈদ ইবনে মসিব হতে রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেন ঃ "হযরত আলী ও হযরত উসমান **'আ'সফানে'** একত্রিত হলেন। উসমান মোতয়া অথবা উমরাহ্ করার বিষয়ে নিষেধ করছিলেন। আলী বল্লেনঃ *'আপনি কি ঐ কর্ম থেকে নিষেধ করছেন যেটার প্রতি রাসুল (সাঃ) আমল করেছেন'?* উসমান বল্লেন, *'বাদ দাও'*। আলী বল্লেন, *"আমি তোমার কথা মত সেটা বাদ দিতে পারি না"*। অতঃপর আলী দুটোর উপরই আমল করলেন।

জি হ্যাঁ! ইনি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব, যিনি আর একজনের কথার উপর ভিত্তি করে রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে ত্যাগ করেন না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, উসমান (রাঃ) এবং আলীর (আঃ) মাঝে উক্ত বিষয়ে মতভেদ ছিল। উসমান (রাঃ), আলী (আঃ)-কে বলতেন, **"দা'য়ানা মিনকা"** এতে প্রত্যেক জিনিসেরই বিরোধিতা আছে এবং উক্ত বিষয়ের প্রতি আনুগত্য বুঝায় না যে বিষয়টি হযরত আলী (আঃ) নিজ চাচাতো ভাই রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। যেমনটি উপরোক্ত রেওয়ায়েত সম্পর্কে আপনি যদি বলেন যে, আলী এটা বলেছেন, সুতরাং এটা যদি আলী (আঃ)-এর রায় হয়ে থাকে তাহলে তা আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি"?

উসমান (রাঃ) শুধু আম্মার (রাঃ)-কে গাল মন্দ করেই ক্ষান্ত হোন নি, বরং নিজের গোলামদের আম্মারের (রাঃ) প্রতি ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং গোলামরা আম্মারকে (রাঃ) লাথি আর ঘুশি মারতে থাকে এবং উসমান (রাঃ) নিজের নল লাগানো জুতা দিয়ে লাথি মারেন। ঐ আঘাতে আম্মার **'ফাতাক'** রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ আম্মার আঘাত সহ্য করতে না পেরে বেহুশ হয়ে যান। উক্ত ঘটনা ইতিহাস বেত্তাদের নিকট বহুল আলোচিত। [১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের সাথেও উসমান (রাঃ) অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদকে উসমানের (রাঃ) একজন সিপাহী ঘাড়ের উপর তুলে মসজিদ থেকে বাহিরে নিয়ে এসে মাটির উপর ছুড়ে মেরে ছিল, যার কারণে তার পাঁজড়ের হাড় ভেঙে যায়। [২] আব্দুলাহ ইবনে মাসুদের কেবল এতটুকুই দোষ ছিল, তিনি উসমানকে বলেছিলেন যে, **"তুমি উমাইয়ার একজন ফাসিক ব্যক্তিকে হিসাবের অতিরিক্ত মুসলমানদের সম্পদ দিও না"**।

অতঃপর উসমানের (রাঃ) বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তার হত্যা সংঘটিত হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ বিনা কাফন-দাফনে পড়ে থাকে। তারপর বনী উমাইয়ার চার জন লোক এসে হাজির হয় এবং জানাজা পড়তে চায়। কিন্তু সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ একজন বল্লেন, *"তার জানাজা পড়ার প্রয়োজন নেই, কারণ তার জানাজার নামাজ তো ফেরেশতারাই পড়েছে"*। অতঃপর লোকেরা বললো, *"আল্লাহ্‌র কসম তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করতে দেয়া হবে না"*। সুতরাং বিনা গোসল ও কাফনে **"হাশে কৌকব"** নামক ইয়াহুদীদের কবরস্থানে দাফন করা হলো। বনী উমাইয়ারা যখন ক্ষমতায় সমাসীন হলো তখন তারা ইয়াহুদীদের উক্ত **"হাশে কৌকব"** নামক গোরস্থানকে **'জান্নাতুল বাকী'**-তে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।

এই হচ্ছে প্রথম তিন খলিফা-এ-মুসলেমিনের ইতিহাস। যদিও আমরা সংক্ষিপ্ততার প্রতি দৃষ্টি রেখে অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বয়ান করেছি এবং মাত্র কয়েকটি উদাহরণই উপস্থাপন করেছি। যার মাধ্যমে ঐ সমস্ত মনগড়া ও ভূয়সী প্রশংসা ও ফজিলাত সমুহের পর্দা ছিন্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ এই ভূয়া ও মনগড়া ফজিলাত সম্পর্কে ঐ তিন খলিফা নিজেরাও কিছু জানতেন না। এমনকি তারা তাদের জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও ঐ সমস্ত ফজিলাতের অধিকারী ছিলেন না।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্নের জন্ম হয় যে, আহলে সুন্নাতগণ উক্ত হাকীকত (বাস্তবতা) সম্পর্কে কি বলে থাকেন? আহলে যিকিরের নিকট তাদের প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে ঃ

---

১ **ইনসাবুল আশরাফ**, খঃ ৫, পৃঃ ৪৯। **আল ইস্তিয়াব**, খঃ ২, পৃঃ ৪২২। **আল ইমামত ওয়াস্ সিয়াসাত**, খঃ ১, পৃঃ ২৯। **শারহে ইবনে আবিল হাদীদ**, খঃ ১, পৃঃ ২৩৯, **আল আব্দুল ফরিদ ইবনে আব্দারিয়াহ্**, খঃ ২, পৃঃ ২৭২

২ **ইনসাবুল আশরাফ**, ওয়াকাদী। **তারিখে ইয়াকুবী**, খঃ ২, পৃঃ ১৪৭ এবং **শারহে ইবনুল হাদীদ**, খঃ ১, পৃঃ ২৩৭

পড়তে দেখ"। সুতরাং রাসুল (সাঃ)-এর নামাজ সম্পর্কে আমাদের খোজ-খবর নেয়া উচিৎ, কারণ নামাজ হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ।

হযরত উসমানের (রাঃ) কাছে ফেরেশ্‌তারাও লজ্জা পান ঃ

বালাজারী বলেন যে, **'যোবদাহ্'**-তে আবু জার গিফারীর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার সংবাদটি যখন হযরত উসমান পেলেন তখন তিনি বলেন ঃ *"আল্লাহ্ তাঁর (আবু জারের) প্রতি রহম করুক"*। আম্মার ইয়াস্‌সার বলেন, *"হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাদের সকলের প্রতিই রহম করুক"*। উসমান, আম্মারকে একটি গালী দেয়ার পর বলেন, *"তুমি আমাকে আবু জারের সাথে কৃত ব্যবহারের জন্য লজ্জা দিতে চাও, যাও! তুমিও **'যোবদাহ্'** চলে যাও"*।[১]

আম্মার (রাঃ) যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন **'মাখজুম'** গোত্রের লোকজন হযরত আলী (আঃ)-এর নিকট এসে বল্লো, *"আপনিই উসমানের সাথে কথা বলুন"*। আলী (আঃ) উসমানকে (রাঃ) বল্লেন, *"হে উসমান! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি একজন ছালেহ (নেক) বান্দাকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছো, সে তো ঐ অবস্থাতেই বিদেশের মাটিতে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন আবার তাঁরই মত আর একজনকে নির্বাসন দিতে চাচ্ছো"*। দু'জনার মাঝে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উসমান (রাঃ), আলী (আঃ)-কে বল্লেন, *"নির্বাসিত হওয়ার জন্য তাদের চেয়ে বেশী তুমিই যোগ্য"*। উত্তরে আলী (আঃ) বল্লেন, "*যদি তুমি চাও তাহলে সে আকাঙ্খাও পূরন করে নাও*"। অতঃপর মোহাজেরগণ সমবেত হয়ে উসমানের (রাঃ) নিকট এলেন এবং বল্লেন, *"যাকিছু তুমি ঐ লোকটির ব্যাপারে বলেছ, যাকে তুমি নির্বাসিত করেছিলে, এটা কিন্তু তোমার পক্ষে ভাল ফল দিবে না"*। সুতরাং এই হুমকির কারণে উসমান (রাঃ), আম্মারকে নির্বাসন দান করা থেকে বিরত থাকলেন।

ইয়াকুবী লিখেছেন যে, "আম্মার ইয়াসসর মিক্বদাদের জানাজা পড়লেন ও দাফন করে দিলেন এবং মিক্বদাদের ওসিয়াত মোতাবেক উসমানকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন না, সে কারণে উসমান আম্মারের প্রতি খুবই রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ *"মুসিবত হোক ইবনে সাওদার প্রতি, আমি যদি সংবাদটা পেতাম!"*।[২]

উসমানের (রাঃ) মত লাজুক ব্যক্তির পক্ষে গালি-গালাজ করা কি উচিৎ হয়েছে? যার লজ্জা দেখে নাকি ফেরেশ্‌তারাও লজ্জা পেত? তাও আবার ভদ্র ও নেক মুমিন বান্দাদের গালি-গালাজ করা !!!

---

১ **ইনসাবুল আশরাফ**, খঃ ৫, পৃঃ ৫৪

২ **তারিখে ইয়াকুবী**, খঃ ২, পৃঃ ১৪৭

৬ষ্ঠ অধ্যায়

খেলাফত সম্পর্কে

'খেলাফত' -আপনারা কি জানেন, খেলাফত কি? ওটাকে আল্লাহ্ পাক উম্মতের জন্য আজমাইশ পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে ছিলেন। যেটাকে ক্ষমতা লোভী মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিল এবং এই খেলাফতেরই সুত্র ধরে অনেক নেক ও পরহেজগার মানুষের রক্তপাত ঘটানো হয়েছে। এই খেলাফত হচ্ছে সেই বস্তু যার জন্য অনেক মুসলমান কাফের হয়ে গিয়েছিল। এটাই হলো সেই বস্তু, যেটা মানুষকে **'সেরাতে মুস্তাকীম'** থেকে দুরে সরিয়ে রেখে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়েছে।

আমরা খেলাফতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ঐ সমস্ত বিষয়, যা রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পর সংঘটিত হয়েছে, তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। যার বদৌলতে খেলাফত সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর ও লুকানো বিষয়াবলী স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে।

সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো এই যে, নেতৃত্বকে আরববাসীরা প্রত্যেক জামানাতেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক (গোত্রীয়) শাসনের নিয়ম-নীতির উপরই নির্ভরশীল একটি বিষয় বলে বিবেচনা করতো। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, আরব গোত্রগুলোর গোত্রপতিরা ও সরদারগণ প্রত্যেক বিষয়েই নিজের নাফ্সকে প্রাধান্য দিতো। নাফ্সের খায়েশ ব্যতীত কোন কিছুই করতো না। যে সিদ্ধান্ত নিত তার সব কিছুই নফ্সের পরামর্শেই করতো, তার উপর অন্য কোন কিছুকেই প্রাধান্য দিত না।

তাদের এই গোত্রপতি বা সরদারদেরকে স্বভাবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ, শাসনকার্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং বংশীয় মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হতো। উক্ত গোত্রপতির চেয়েও যদি কেউ, বংশীয় মেধা, বুদ্ধি, বীরত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান, মেহমানদারীতে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমানিত হয় তখন সে ব্যক্তি উক্ত গোত্রের সরদার হয়ে যেত। কিন্তু বেশীর ভাগই উত্তরাধিকারবলে বংশের উত্তরসূরীদের হাতেই শাসনভার ন্যাস্ত হতো।

আবার এটাও পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন গোত্রে বংশীয় শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, অপর একটি সম্পদশালী ও জনবলে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের ছত্র ছায়ায় বসবাস করতো। যে রাষ্ট্রের কতিপয় বীর ও বাহাদুর লোকেরা অন্যান্য গোত্রগুলীকে রক্ষা ও তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতো। তাদেরই একটি উদাহরণ হচ্ছে কোরায়েশ, যারা আরবের অন্যান্য গোত্র সমূহকে নিজেদের অধীনস্থ জ্ঞান করতো এবং খানায়ে কা'বার সেবা-যত্ন বা তত্ত্বাবধায়ন করাকে নিজেদের হক মনে করতো।

"তোমরা যদি উক্ত হাকিকাত থেকে ওয়াকিবহাল থেকেই থাকো সেগুলি স্বীকারও করো, আবার অস্বীকারও কর না, কেননা সেগুলি তোমরা তোমাদেরই সহীহ্ কিতাবাদিতে যেভাবে উপস্থাপন করেছ, যদিও সেখানে অনেক কাট-ছাঁট করে বর্ণনা করা হয়েছে -কিন্তু ততটুকুতেই তোমরা **'খেলাফতে রাশেদার'** ভীতকে দূর্বল করে দিয়েছো"।

আর তোমরা যদি ঐ সমস্ত হাকীকতকে অস্বীকার কর এবং সত্য বলে মান্য করতে না চাও, তাহলে প্রমান হবে যে তোমাদের সহীহ্ গ্রন্থগুলোর প্রতি তোমরা তোমাদের আক্বিদা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ। তোমাদের যেসমস্ত বিশ্বস্ত গ্রন্থ সমূহে উক্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে সেগুলিকে অবিশ্বাস করলে তোমাদের সমস্ত আক্বিদা-বিশ্বাস ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

অবমাননা করার লক্ষ্যে এমনই কাজ করলেন যে, হযরত আলী ও আনছারদেরকে রাসুল (সাঃ)-এর কাফন-দাফনে ব্যস্ত দেখে, সুযোগটিকে '**গনিমত**' মনে করে সকীফাতে গিয়ে মিটিং করলেন এবং নিজেদের মন মর্জি মোতাবেক খলিফা নির্বাচন করে নিয়ে তার সাথে নিজেদের আশা-আকাংক্ষাকে জুড়ে রাখলেন। অতঃপর সাধারণ মানুষের কাছে জোর জবরদস্তী বায়াত গ্রহণ করা শুরু করে দেন এবং রাজনীতি থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে পূর্ণ শক্তি সামর্থ লাগিয়ে দেন। খেলাফতের বিষয়ে যারাই মুখ খুলতে চেয়েছে তখন পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তাদের এই কথা বলে দমন করা হলো যে, এরা ঐক্যে চিড় ধরাতে চায়। অথবা বলতেন যে, এরা নতুন শারয়ী খেলাফততের বিষয়ে সন্দেহ পোষন করছে। এখন এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী যদি ফাতিমা (সাঃআঃ) হন তাতেও তাদের কোন পরওয়া নাই।

অতঃপর তারা নবীর (সাঃ) হাদীসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিলেন যেন খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত মানুষের নিকট পৌছাতে না পারে এবং কাজটি করতে যেয়ে রক্তপাত ও হত্যাযজ্ঞ ঘটানোতেও তারা পিছপা হন নি। আর এ সমস্ত অপকর্ম '**ফেৎনা**' দমনের নামে করা হয়েছে। আবার কখনো মানুষের প্রতি '**কাফের**' হওয়ার দোষ চাপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এসমস্ত বিষয় আমরা ইতিহাস বেত্তাদের লেখনীর মাধ্যমে পেয়েছি। যদিও তাদের অনেকেই সত্য লুকানোর যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন বিভিন্ন সন্দেহভাজন রেওয়ায়েত রচনা করেছেন অথবা মূল রেওয়ায়েতের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন এবং নিজেদের খেয়াল-খুশি মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিয়েছেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেগুলির বাস্তবতাকে সত্য হাদীসসমূহ আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সেই সমস্ত হাদীস বেত্তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু নির্দোষ কারণ তারা যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছেন তা তাদের পূর্ববর্তী সেই সমস্ত উৎস থেকে যা তদানিন্তন রাজনৈতিক ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে লেখা হয়েছিল যার কারণে বিরাট ফেৎনার সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব কিছুই বনি উম্মাইয়াদের খেলাফত আমলে হয়েছে যারা বিভিন্ন সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের মাঝে ধন-সম্পদ ও পদ-পদবী বিতরণ করতো।

সুতরাং কিছু কিছু ইতিহাস বেত্তাগণ যারা '**চোখের খেয়ানত**' এবং '**অন্তরের গোপন রহস্যাবলী**' জানতেন না তারা সাহাবাদের প্রতি দূর্বলতা থাকার কারণে এমন সব কথা লিখে দিয়েছেন যার কারণে সত্য ও মিথ্যা রেওয়ায়েতসমূহ মিলে মিশে একাকার হয়েগেছে, বিধায় সত্য সন্ধানীদের পক্ষে সত্য উদঘাটন করা কঠিন হয়েগেছে।

সত্যসন্ধানীদের মন-মানসিকতাকে বাস্তবতার নিকটবর্তী করার জন্য কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়েছে, যেন এই সমস্ত প্রশ্ন-উত্তর দ্বারা সত্যের উপর থেকে পরদা সরে যায় অথবা বিভিন্ন দিক নির্দেশনা স্পষ্ট হয়ে যায়, যা সত্য পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করবে।

অতঃপর ইসলামের যখন আবির্ভাব হলো, তখন রাসুল (সাঃ) উক্ত (নেতৃত্ব) বিষয়টিকে এতোই গুরুত্ব দিলেন যে ঃ কোন গোত্র যখন রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করতো, তখন তিনি উক্ত দলের মধ্য হতে দলপতি এবং ভদ্র ব্যক্তিটিকে উক্ত গোত্রের প্রধান নিযুক্ত করে দিতেন। উদ্দেশ্য সে যেন লোকজনের নামাজের ইমামতি করে, তাদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করে এবং রাসুল (সাঃ) ও নিজের গোত্রের মাঝে প্রতিনিধিত্ব করে।

অতঃপর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, যার সমস্ত হুকুম-আহ্‌কাম, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, সবকিছুই আল্লাহ্‌র ওহী মোতাবেক সম্পাদন করা হতো। সুতরাং সমষ্টিগত বিষয়-আষয় যেমন ঃ বিবাহ সম্পাদন, তালাক, কেনা-কাটা, লেন-দেন, মীরাস ও যাকাত এবং ঐ সমস্ত বিষয় যেমন যুদ্ধ ও মামলা-মোকাদ্দমা এবং এবাদত-বন্দেগী সমূহ, একা বা জামায়াতে হোক -এই সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামই আল্লাহ্‌র ওহীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং রাসুল (সাঃ)-এর কাজ ছিল উক্ত হুকুম-আহ্‌কাম গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেগুলির উপর আমল করে দেখিয়ে দেয়া। সুতরাং, রাসুল (সাঃ) নিশ্চয়ই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন যে, এই আন্দোলনকে বিজয়ী করে রাখার জন্য নিজের পরে কাকে খলিফা নিযুক্ত করবেন।

আর এই কথাটিও অবশ্যম্ভাবী যে, প্রত্যেক হুকুমতের রাষ্ট্রপতি বা বাদশাহ (যদি সে তার জাতির কল্যাণ কামনা করে, তাহলে সে) এই সমস্ত কর্মকান্ড বা দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কাউকে না কাউকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করে থাকেন। ঐ নায়েবটি বাদশাহর অনুপস্থিতিতে জাতির নেতৃত্ব দিবে। সুতরাং উক্ত নায়েব, বাদশার উজির বা ওয়াসি (উত্তরসূরী) হিসাবে গণ্য হবে। এবং ইহাও প্রতিষ্ঠিত যে, যখন বাদশাহর কাছে কেউ উপস্থিত থাকবে না তখন একান্তে ঐ নায়েবই উপস্থিত থাকবে। এবং এই বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী যে, এই নায়েবকে নিশ্চিত রূপে প্রত্যেক উজির ও আমলা চিনবে এবং জানবে।

অতএব বিবেক-বুদ্ধি এই কথা মানতে রাজি নয় যে, রাসুল (সাঃ) এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি বা কোন গুরুত্বই দেন নি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কর্মটি তাঁর অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচুর হাদীস ছিল, যেগুলিকে এক শ্রেণীর লোকেরা পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলেছেন। যারা **'শোরা'**-র ধ্যান-ধারণা পোষন করতেন, তারাই খলিফা নিযুক্তিকে কেন্দ্র করে রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে ধুলিস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তারাই রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অভিযোগ আরোপ করেছেন। ওসামাকে সৈন্য বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করাতে কানা ঘূষা করে বলেছিলেন যে, **"ওসামা তো ছেলে মানুষ, নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্যতা তার নাই"**। তারাই আবার রাসুল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের বিষয়টি নিয়েও লোকজনকে সন্দিহান করে ফেলেছিলেন যেন তাঁর নির্দেশ মত লোকেরা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক **'মনোনীত খলিফা'**-র হাতে বায়াত গ্রহণ করে না বসে। তারা রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তবলীর

প্রশ্ন-৩। রাসুল (সাঃ) উম্মতকে যখন গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য ওয়াসিয়াত লিখতে চেয়েছিলেন তখন কিছু কিছু সাহাবা কেন বাধা সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অপবাদ কেন দিলেন?

উত্তরঃ অবশ্যই কিছু কিছু সাহাবারা রাসুল (সাঃ)-কে ওয়াসিয়াত লিখতে দেন নি এবং তাঁর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অপবাদ দিয়েছেন। যেহেতু ঐ সমস্ত সাহাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) হযরত আলীর (আঃ) জন্য খেলাফত বিষয়ে অসিয়ত লিখে দিবেন। কারণ কিছু দিন পূর্বেই তো তিনি **'আল্লাহ্‌র কিতাব'** ও **'তাঁর বংশধরদের'** আঁকড়ে ধরে থাকার কথা বলেছেন যেন উম্মত তাঁর পরে গোমরাহ না হয়ে যায়। সাহাবারা বুঝে ফেলেছিলেন যে, তিনি উক্ত ওয়াসিত-নামাতে সেই কথাগুলিই হুবহু লিখিত আকারে দলিল করে দিয়ে যেতে চান। আর আলী (আঃ) রাসুল (সাঃ)-এর বংশধরদের নেতা ছিলেন এবং ঐ সমস্ত সাহাবা হযরত আলীর (আঃ) নেতৃত্বকে মনে প্রানে মেনে নিতে পারেন নি অথবা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ মত খলিফা বানাতে চেয়েছিলেন। সেহেতু সাহাবাগণ রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি **'প্রলাপ বকার'** অপবাদ দিয়েছিলেন যেন তিনি নির্দিষ্ট ফয়সালাটি লিখিতি আকারে রেখে যেতে না পারেন। আর এ কারণেই ওয়াসিয়াত লেখার পূর্বেই হট্টোগোল শুর করে দেয়া হল এবং পরস্পর বিরোধ শুর হয়ে গেল। ঐ সকল সাহাবাদের আকীদানুসারে নবী (সাঃ) যখন প্রলাপ বকবেন তখন তো তাঁর ওয়াসিয়াতটিও **'প্রলাপ'** বলেই বিবেচিত হবে। তাই আকল ও বিবেকের দাবী হচ্ছে যে ওয়াসিয়াত-নামা না লেখাটাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-৪। রাসুল (সাঃ) ওয়াসিয়াত লেখার জন্য জোরাজুরী করলেন না কেন, বিশেষ করে তিনি যখন উম্মতকে গোমরাহী থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন?

উত্তরঃ ওয়াসিয়াত লেখার জন্য জোরাজোরী করাটা রাসুল (সাঃ)-এর ক্ষমতার বাহিরে চলে গিয়েছিল। কেননা গোমরাহী থেকে বাঁচানোর বিষয়টি অধিকাংশ সাহাবা কর্তৃক **'প্রলাপ বকার'** কথা দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় উক্ত ওয়াসিয়াত গোমরাহী থেকে বাঁচার স্থলে গোমরাহীরই কারণ হয়ে দেখা দিত। তিনি (সাঃ) যদি ওয়াসিয়াত লেখার প্রতি জোর খাটাতেন তাহলে অকারণে অনেক ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হতো এমনকি আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কোরআনের সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যেও সন্দেহ করা হতো।

প্রশ্ন-৫। মৃত্যুর পূর্বে রাসুল (সাঃ) তিনটি মৌখিক ওয়াসিয়াত করেছিলেন, তাহলে আমাদের পর্যন্ত মাত্র দু'টি ওয়াসিয়াত পৌছেছে, আর একটি কোথায় ও কেন হারিয়ে গেল?

উত্তরঃ বিষয়টি পরিস্কার। প্রথম ওয়াসিয়াতটি এজন্য গায়েব করে দেয়া হল কেননা উক্ত ওয়াসিয়াতটি হযরত আলীর (আঃ) খেলাফত সমপর্কে ছিল। আর প্রথম তিন খলিফা, খেলাফতের বিষয়ে কোন কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। অন্যথায় কোন

প্রশ্ন ও উত্তর

বিভিন্ন স্থান থেকে আমার নিকট কঠিন প্রশ্ন সম্বলিত কিছু পত্র এসেছে। উক্ত প্রশ্নাবলী দ্বারা পাঠকবৃন্দের মনের ইচ্ছা ও সত্য জানার আকাংখ্যা স্পষ্টঃ বুঝতে পারা যায়। তাদের মধ্যেকার অনেককেই আমি উত্তর দিয়েছি আবার অনেকের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকাতে আমি কোন সমস্যা দেখিনি। কারণ সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর আমার পূর্ববর্তী **"অবশেষে আমি সত্য পেলাম"** এবং **"আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে গেলাম"** বই দু'টিতে বর্ণনা করেছি। আর এ কারণেই পাঠকমন্ডলী বিভিন্ন হাদীস ও ঘটনাবলী একই পুস্তকে বারংবার অথবা তিনটি বইতেই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন। উক্ত কাজটি আমি আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণে করেছি। পবিত্র কোরআন মজিদ একই বিষয়কে মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলার জন্য বিভিন্ন সুরাগুলিতে বারংবার বর্ণনা করেছে।

প্রশ্ন-১ । রাসুল (সাঃ) যখন জানতেনই যে খেলাফতের বিষয় নিয়ে উম্মতের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ হবে, তখন তিনি (সাঃ) কেন খলিফা নিযুক্ত করে যান নি?

উত্তরঃ রাসুল (সাঃ) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করার পর **'গাদীর-এ-খোম'** নামক স্থানে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে সকল মুমিন ও মুমিনাতের খলিফা নিযুক্ত করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সাহাবাগণই তার স্বাক্ষ্য দিয়েছিলন। তদুপরি রাসুল (সাঃ) জানতেন যে তাঁর উম্মত ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

প্রশ্ন-২ । সাহাবীগণ রাসুল (সাঃ)-এর নিকট খেলাফত বিষয়ে কোন প্রশ্ন কেন করেন নি?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সাহাবাগণ খেলাফত বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং রাসুল (সাঃ)-ও উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

"আমাদের কি কোন অধিকার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে" । [১]

"তোমাদের অভিভাবক তো আল্লাহ্‌, তাঁহার রাসূল এবং ঐসমস্ত মু'মিন ব্যক্তিবর্গ যারা ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত দিয়েছে" । [২]

সাহাবাগণ যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন নবী (সাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, **"আমার পরে এ (আলী) হচ্ছে আমার ভাই, আমার ওয়াসী (উত্তরসূরী) এবং আমার খলিফা"** । [৩]

---

১ সূরা ঃ আলে-ইমরান - ১৫৪

২ সূরা ঃ মায়িদা - ৫৫

৩ **তারিখে তাবারী ও তারিখে কামিল ঃ 'ওয়া আনযির আশিরাতাকাল আকরাবী'** অধ্যায়ে পাঠ করুন।

খেলাফতের লোভ-লালসা ছিল না। তারা হযরত আলীর (আঃ) প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন না আর না তারা ওয়াদা ভঙ্গ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

প্রশ্ন-৯। রাসুল (সাঃ) উক্ত গোঁপ-দাড়ি বিহীন যুবককে সৈন্য দলের নেতা কেন বানালেন?

উত্তরঃ কারণ তারা হযরত আলীর (আঃ) প্রতি হিংসা পোষণ করতেন এবং তাঁর বিষয়ে খারাপ ধারণা পোষন করতেন এবং আলী (আঃ)-কে বয়সে অনুপাতে কনিষ্ট মনে করতেন। কোরায়েশের ৬০ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠরা ৩০ বছর বয়সী আলীর আনুগত্য করতে চাচ্ছিলেন না। সুতরাং নবী (সাঃ) ১৭ বছরের যুবক ওসামাকে যার তখনো গোঁপ-দাড়ি গজায়নি তাদের দলের আমীর নিযুক্ত করলেন। উক্ত সাহাবাদের অহংকার চূর্ণ করাই রাসুল (সাঃ)-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, যেন প্রথমে তাদের এবং পরবর্তীতে সমস্ত মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিজ ঈমান অনুসারে সত্য মুমিন সেই যে নিজের নাফ্সের খায়েশ থাকা সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ মান্য করে এবং আনুগত্য করে। ওসামা আর আমিরুল মু'মেনিন, সৈয়্যেদুল ওয়াসিয়ীন, রাসুল (সাঃ)-এর জ্ঞান নগরীর তোরন, আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে কোন তুলনা কখনো কি সম্ভব? আর এ জন্যই রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ওসামাকে আমীর নিযুক্ত করায় সাহাবাগণ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ফেল্লেন এবং ওসামার নেতৃত্বের বিষয়ে কানা ঘুসা শুর করেদিলেন এবং তার অধীনে যুদ্ধে যাওয়াকে অস্বীকার করলেন। আমাদের ভুললে চলবে না যে সাহাবাদের মধ্যে ঐ সমস্ত চালাক-চতুর ব্যক্তিবর্গরাও ছিলেন যাদের সম্পর্কে কোরআন মজিদ ঘোষণা দিয়েছেঃ **"উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু উহাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ রহিত করিয়াছেন, যদিও উহাদের চক্রান্ত এমন ছিল, যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত"** [১]

প্রশ্ন-১০। আদেশ অমান্যকারীদের প্রতি রাসুল (সাঃ) এতো চরম রাগ কেন হল যে তিনি তাদের প্রতি লানত করলেন?

উত্তরঃ অবশ্যই রাসুল (সাঃ)-এর রাগ তখন চরমে উঠে গিয়েছিল যখন তিনি জানতে পারলেন যে ওসামাকে আমীর নিযুক্ত করায় সাহাবারা বিদ্রুপ করছেন। তাদের বিদ্রুপটি রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি ছিল না উসামার প্রতি? আর এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ্ ও রাসুল (আঃ)-এর প্রতি ঐ লোকগুলির ঈমান ছিল না। তারা নিজেদেরই ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিল, রাসুল (সাঃ)-এর আদেশকে নয়। এ কারণেই রাসুল (সাঃ) তাদের প্রতি লানত করেছেন, যেন তাদের ভক্তবৃন্দ এবং সমস্ত মুসলমানকে জানিয়ে দেয়া যায় যে পানি মাথার উপরে উঠে গেছে। আর এই দলিল-প্রমান সাপেক্ষেই উক্ত মহারথিগণ ধ্বংশ হয়েছেন।

---

১ সূরা ঃ ইব্রাহীম - ৪৬

জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা কিভাবে স্বীকার করে নিবে যে, রাসুল (সাঃ) কোন ওয়াসিয়াত করবেন আর সেটাকে ভুলে যাওয়া হবে -যেমনটি বুখারী বলেছেন।

প্রশ্ন-৬। রাসুল (সাঃ) কি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানতেন?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন এবং বিদায় হজ্জ থেকে ফেরৎ আসার সময় তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বলেই তো উক্ত হজ্জকে **'বিদায়ী হজ্জ'** বলা হয়ে থাকে। আর সাহাবাগণও বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন যে রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে তাই তারা সমস্বরে ক্রন্দনও করেছিলেন।

প্রশ্ন-৭। রাসুল (সাঃ) এমন একটি বাহিনী কেন গঠন করেছিলেন যার মধ্যে প্রধান প্রধান মুহাজির ও আনছার ও সমস্ত বড়বড় সাহাবাদের যোগদান দিতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে ফিলিস্তিন (উবনা) অভিমুখে রওয়ানা দেয়ার হুকুম জারি করলেন?

উত্তরঃ রাসুল (সাঃ) এজন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু তিনি কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন যা তারা **'গাদীর-এ-খোমের'** ফয়সালার পর গোপনে করেছিল এবং তারা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করে ছিল যে, রাসুল (সাঃ)-এর পরে অবাধ্যতা করবে এবং আলীর (আঃ) কাছ থেকে 'খেলাফত' কেড়ে নিবে। সেজন্যেই তিনি ঐ সমস্ত সাদাবীদের ওসামার সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করে মদীনার বাহিরে পাঠাতে চেয়েছিলেন যাতে তারা যতদিনে মদীনায় ফেরৎ আসবে ততদিনে হযরত আলীর (আঃ) খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে, এভাবে তারা তাদের ষড়যন্ত্রে সফলকাম হতে পারবে না। এছাড়া ওসামার নেতৃত্বে সৈন্য গঠনের অন্য কোন কারণ খুজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটা কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না যে নিজের মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে রাজধানীকে সৈন্য শক্তি থেকে শূন্য করে দিবেন।

প্রশ্ন-৮। রাসুল (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে ওসামার সৈন্য বাহিনীতে কেন অন্তর্ভূক্ত করলেন না?

উত্তরঃ কারণ রাসুল (সাঃ)-এর জন্য মৃত্যুর পূর্বেই খলিফা নিযুক্ত করে যাওয়াটা একান্ত জরুরী ছিল, যেন দায়ীত্ব প্রাপ্ত খলিফা তাঁর কাছ থেকে যাবতীয় দায়ীত্ব বুঝে নিতে পারে। এ কারণেই তিনি হযরত আলী (আঃ)-কে উক্ত সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করেন নি, যে দলে মুহাজের ও আনছারদের পরিচিত মুখ দলভুক্ত ছিলেন এবং উক্ত দলে আবু বকর, উমর, উসমান এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফও (রাঃ) ছিলেন। রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত আমল দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁর পর হযরত আলী (আঃ) **'বিলা ফসল'** খলিফা এবং যে সমস্ত সাহাবাদের রাসুল (সাঃ) ওসামার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে বলেন নি তাদের মধ্যে

প্রশ্ন-১৩। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এমন কসম কেন করেছিলেন যে, রাসুল (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেন নি, এবং তিনি ঐ সমস্ত সাহাবাদের হত্যা করার হুমকি কেন দিয়েছিলেন যারা বলছিলেন যে রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন? আবার ঐ হুমকিটি তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) পৌছে যাওয়ার পর কেন দিলেন?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহ হযরত উমর (রাঃ) ঐ সমস্ত সাহাবীদের হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন যারা বলছিল যে রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) তাদেরকে এ জন্য ধমকা দিচ্ছিলেন তারা যেন দো'টানায় ভুগতে থাকে এবং আলী (আঃ)-এর বায়াত করতে না পারে। ততক্ষনে ঐ সমস্ত ঝগড়াটে লোকজন মদীনায় এসে উপস্থিত হয়ে গেল যাদের সাথে বিভিন্ন পদের চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল। আর যারা পৌছাতে পারেনি তারা দেখল যে তারা বাজি মাত করে দিয়েছে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে সফলকাম হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) নাংগা তরবারি নিয়ে লোকজনার উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং লোকজনকে নবীর (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছিলেন যেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়, তা না হলে গৃহতে কাউকে প্রবেশ করতে দিচ্ছিলেন না কেন? একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) গৃহতে যাতায়াত করছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন বুঝতে পারলেন যে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে তখন তিনি বল্লেন, **"যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে পূজা করতো সে জেনে রাখুক যে মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ জীবিত আছেন, সে কখনো মরবে না"**।

আমরা এখানে উক্ত কথার প্রতি একটুখানি জেরা করতে চাই যে, তাহলে কি হযরত আবু বকরের (রাঃ) এমন আকীদা ছিল যে মুসলমানদের মধ্যেকার কেউ কেউ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পুজা করতো? কখ্‌খনো না! এমনটা তো তিনি মেজাজ দেখানোর জন্য এবং বিশেষ করে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে অপমান ও খাটো করার জন্য বলেছিলেন। যেহেতু হযরত আলী সমগ্র আরববাসীদের সম্মুখে গর্ব করে বলতেন যে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হলেন আমাদের মধ্য থেকে এবং আমরা তাঁর **'আহাল'** তথা বংশধর এবং আমরাই অন্যান্য লোকের তুলনায় তাঁর (সাঃ) **'মীরাস'**-এর জন্য অধিক হকদার।

হযরত আবু বকরের (রাঃ) উক্ত বক্তব্য হযরত উমরের (রাঃ) ঐ বক্তব্যের তুলনায় আরো জঘন্য বলে বিবেচিত হয় যা হযরত উমর (রাঃ) রাসুলের (সাঃ) মৃত্যু শয্যায় এভাবে বলে ছিলেন যে, ***"আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট"***। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে, এখন আমাদের জন্য মুহাম্মাদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তাঁর কাহিনী সমাপ্ত হতে চলেছে এবং তার জামানা শেষ। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তার এ কথা দ্বারা উক্ত কথারই গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিলেন যে, ***"যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে পূজা করতো সে জেনে রাখুক যে মুহাম্মদ মারা গেছেন"***। এ বাক্য দ্বারা আবু বকর (রাঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, যারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য আমাদের উপর গর্ব করতো, তারা

প্রশ্ন-১১। কোন মুসলমানের প্রতি লানত করা কি জায়েজ, বিশেষ করে নবী (সাঃ) কর্তৃক?

উত্তরঃ যারা কেবল মুখে ইসলামের স্বীকারোক্তি করে অর্থাৎ **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'** বলে, অথচ অন্তর দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করে না, এমতাবস্থায় তাদের প্রতি লানত করা জায়েজ। এ সমপর্কে কোরআন মজিদে অনেক আয়াত আছে। আমরা সেগুলির মধ্য থেকে একটি আয়াত উল্লেখ করছিঃ **"নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগনও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়"** [১] স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই যখন সত্য গোপনকারীদের প্রতি লানত করেছেন, তখন সত্য অস্বীকারকারী এবং বাতিলের প্রতি আমলকারীদের উপর লানত করতে দোষ কোথায়।

প্রশ্ন-১২। রাসুল (সাঃ) কি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামাজ পড়ানোর জন্য নিয়োগ করেছিলেন?

উত্তরঃ বিপরীতধর্মী কয়েকটি রেওয়ায়েত দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে রাসুল (সাঃ) হযরত আবু বকরকে (রাঃ) নামাজ পড়ানোর জন্য নিয়োগ করেন নাই। তবে হ্যাঁ, আমরা যদি হযরত উমরের (রাঃ) মত আকীদা পোষণ করি তাহলে ভিন্ন কথা। (সম্ভবতঃ) রাসুল (সাঃ) (মায়াজাল্লাহ্) **'প্রলাপ বকা'** অবস্থায় যদি কিছু বলে দিয়ে থাকেন, আর যে ব্যক্তিই অনুরূপ আকীদা পোষণ করবে সে হচ্ছে **'কাফের'**। অন্যথায় একজন বিবেক-বুদ্ধি সমপন্ন মানুষ কিভাবে ব্যাপারটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিবে। কারণ রাসুল (সাঃ) তো হযরত আবু বকরকে (রাঃ) ওসামার নেতৃত্বে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ওসামাকে তার (আবু বকরের) আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তো তখন মদীনাতেই উপস্থিত ছিলেন না। ইতিহাস এ কথার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে নবীর (সাঃ) মৃত্যুর সময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনাতে ছিলেন না বরং তিনি ওসামার বাহিনীতে মদীনার বাহিরে অবস্থান করছিলেন। আবিল হাদীদসহ বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, হযরত আলী (আঃ) আয়শাকে (রাঃ) দোষারোপ করেন যে, তিনি তার পিতাকে বলে পাঠান যে, তিনি যেন উপস্থিত লোকজনের নামাজ পড়ান। কিন্তু নবী (সাঃ) যখন ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন তখন খুবই রাগান্বিত হলেন এবং আয়শাকে (রাঃ) বল্লেন, **"তোমার মতই মহিলারা ইউসুফের সঙ্গে ছিল"**। কথাটুকু বলেই রাসুল (সাঃ) মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন এবং আবু বকরকে (রাঃ) সরিয়ে নিজে নামাজ পড়ালেন যেন লোকজনার জন্যে পরবর্তীতে কোন 'হুজ্জাত' বা দলিল বাকী না থাকে।

---

১ সূরা ঃ বাকারা - ১৫৯

হয়েছেন। যদি আমরা মোহাজেরদের আমাদের শহরে এবং গৃহে জায়গা না দিতাম, তাদের সাহায্য না করতাম তাহলে তাদের কোন ইজ্জত হতো না। যদি **'আওস'** ও **'খাজরাজ'** গোত্র দ্বয়ের মাঝে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব না দেখা দিত তাহলে আবু বকর ও উমর (রাঃ) খেলাফত হাসিল করার সুযোগই পেতেন না এবং তারাও তাদেরই বায়াত গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন।

প্রশ্ন-১৫। হযরত আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দাগণ (রাঃ) **'সকীফার'** আয়োজন এত দ্রুত কেন করলেন এবং হঠাৎ করেই আনছারদের কাছে কেন উপস্থিত হলেন?

উত্তরঃ মুহাজের সরদারগণ যখন আনছারদের তৎপরতা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারলেন তখন তাদের মধ্য হতে সালিম হাযিফার গোলাম দ্বারা আবু বকর, উমর এবং আবু ওবায়দাকে উক্ত গোপন জমায়েতের সংবাদ পাঠান। তখন তারা সকীফার অভিমুখে দ্রুত ছুটে যান যাতে আনছারদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে আনছারদের বুঝিয়ে দিতে পারেন যে আমরা তোমাদের পরিকল্পনা থেকে অজ্ঞ নই।

প্রশ্ন-১৬। হযরত উমর (রাঃ) পথি মধ্যেই আনছারদের আশ্বস্থ করার জন্য ওসিয়াত কেন তৈরী করলেন?

উত্তরঃ এতে কোন সন্দেহ নাই যে হযরত উমর (রাঃ) আনছারদের উক্ত কর্মকান্ডকে ভয় পাচ্ছিলেন যে, যদি আনছারগণ হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার বিষয়ে আমাদের সাহায্য না করেন তখন কি হবে? সমস্ত পরিশ্রমই পন্ড হয়ে যাবে এবং সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে। কেননা তিনি উক্ত খেলাফতের জন্যই নবীর সম্মুখে দুঃসাহস দেখিয়ে ছিলেন তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হযরত উমর (রাঃ) পথি মধ্যেই ফন্দি করতে থাকেন যে ঐ আনছারদের সাথে কেমন ছল-চাতুরি করা হবে যাতে করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের মত ও রায় গ্রহণ করতে সফলকাম হওয়া যায়।

প্রশ্ন-১৭। মুহাজেরগণ কিভাবে আনছারদের উপর প্রভাব ফেলে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) খলিফা বানিয়ে নিলেন?

উত্তরঃ মুহাজেরদের সফলতা এবং আনছারদের বিফলতার বিভিন্ন কারণ আছে। আনছারদের কিছু গোত্র ছিল যারা জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে আসছিল। রাসুল (সাঃ)-এর কারণে এ সমস্যাটি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তারা যখন জানতে পারল যে উম্মতের কিছু সাহাবা খেলাফতকে তার আসল হকদারের নিকট থেকে কেড়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তখন

যেন আজ থেকে পিছনের সারিতে দাড়ায়। কারণ মুহাম্মদের কাম তামাম হয়েগেছে, **"আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাবই যথেষ্ট"** -তা জীবিত আছে কখনোই মৃত হবে না। এ কথার প্রতি লক্ষ্য রেখেই যে, বনী হাশিমের মধ্যে হযরত আলী (আঃ) প্রকৃতপক্ষে রাসুল (সাঃ)-কে সবার চেয়ে অধিক জানতেন ও মানতেন। কিন্তু অন্যান্যরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে, মর্যাদা রক্ষায় এবং আদেশ পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করতো এবং তাদের অনুকরণেই অনেক গোলাম, সাহাবা ও কোরায়েশ ও পরদেশী লোকজনও এমনই আচরণ করতো। অথচ ঐ যুগেরই রাসুলভক্ত এক দল গরীব ও দ্বীনহীন মানুষ রাসুল (সাঃ)-এর উপস্থিতকাল হতেই হযরত আলীর (আঃ) অনুসারী ছিলেন এবং তাদেরকে স্বয়ং রাসুলই (সাঃ) **'শীয়ান-এ-আলী'** আলীর অনুসারী বলে আহ্বান করতেন। [১]

কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এবং কোরায়েশের কয়েকজন বড় বড় সাহাবা প্রায়ই রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অবহেলা এবং অমান্যও করতেন, বরং নিজেদেরকে তাঁর কর্মকান্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। হযরত উমর (রাঃ) সেই গাছটিকে কেটে ফেলে দিয়েছিলেন যার নীচে **'বায়াত-এ-রিদওয়ান'** অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেননা অনেক সাহাবা উক্ত গাছটিকে অনেক বরকতময় গণ্য করতেন এবং সে স্থানে উপস্থিত হয়ে দু-রাকাত শুকরানা নামাজ পড়তেন। যেহেতু হযরত উমর (রাঃ) বায়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন না বিধায় তার কাছে উক্ত গাছটির কোন মূল্যই ছিলনা তাই তিনি গাছটির নাম-নিশানা মুছে ফেল্লেন। আর আজকের যুগে ওয়াহাবীরাও ঠিক হযরত উমরেরই (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবীর স্মৃতি চিহ্নসমূহকে মুছে ফেলে দিল, এমনকি তারা নবী (সাঃ)-এর সেই গৃহটিকে ধুলিস্যাৎ করে দিল যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তাদের প্রচেষ্টা তো এটাই যেন নবীর (সাঃ) মিলাদ শরীফে লোকজনকে একত্র হতে না দেয়া। নবীর তাবাররুকের মধ্যে তাঁর প্রতি সালাম পাঠনোও একটি তাবাররুক হিসাবে গণ্য। সেকারণেই তারা গাফেলদের বুঝিয়ে দিল যে সালাম পাঠানো সম্পূর্ণ রূপে **'শিরক'**।

প্রশ্ন-১৪। আনছারগণ **'বনু সকীফাতে'** গোপনে কেন মিলিত হয়েছিলেন?

উত্তরঃ আনছারগণ যখন কোরায়েশদের তৎপরতাকে লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পারলেন যে তারা হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন তারা নবীর (সাঃ) ওফাতের পর একত্রিত হলেন এবং চেষ্টা করলেন যেন তাদের মধ্যেকার কেউ খলিফা নিযুক্ত হয়ে যাক। সুতরাং মুহাজির এবং কোরায়শের ঐ সমস্ত সরদারগণ যারা নবীর (সাঃ) সাথে বংশগত সম্পর্ক রাখতেন তারাই যখন হযরত আলীর (আঃ) বায়াত ভঙ্গ করার ইচ্ছা করলেন তখন আনছারগণও অন্যাদের তুলনায় নিজেদের খেলাফতের অধিক হকদার সাব্যস্ত করলেন। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল যে ইসলাম তাদের তরবারী দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে এবং মুহাজেরগণ তো তাদের অন্নে'র উপর পালিত

---

১ **তফসীরে দুররে মনসুর**, জালালউদ্দিন সুয়ুতি ঃ সূরা বাইয়্যিনাহ।

করে দাও, সে ফেতনা সৃষ্টি করছে"। ঐ নিদের্শটি হযরত উমর (রাঃ) এ জন্য দিয়েছিলেন যেন খেলাফতের ভীত মজবুত হয়ে যায় এবং এরপর আর কেউ যেন বায়াতকে অস্বীকার না করে। কারণ এর দ্বারা মুসলমানের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হবে আর এটাই কালে কালে ফেৎনার জন্ম দিবে।

প্রশ্ন-১৯। তারা (আবু বকর ও উমর) ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর গৃহকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি কেন দিলেন?

উত্তরঃ সাহাবাদের একটি দল হযরত আবু বকরের (রাঃ) বায়াতকে অস্বীকার করে হযরত আলীর (আঃ) গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যদি তাড়াহুড়া না করতেন এবং গৃহের চারিপাশে কাঠ জমা করে আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুমকি না দিতেন তাহলে ব্যাপারটি অনেক দীর্ঘায়িত হত এবং উম্মতের মধ্যে **'আলী পন্থী'** ও **'আবু বকর পন্থী'** দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে-চিন্তে কথাগুলো বল্লেন যে, **"তোমরা গৃহ থেকে বেরিয়ে আসো অন্যথায় গৃহের মালিকসহ সবাইকে পুড়িয়ে দিব"**। গৃহের মালিক দ্বারা হযরত উমর (রাঃ) ইমাম আলী ও মা ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে বুঝিযে ছিলেন।

অতঃপর সাহাবীদের মাঝে আর কোন ব্যক্তির সাহস থাকল না যে তারা আবু বকরের (রাঃ) বায়াতকে অস্বীকার করবে (কারণ তাদের কারণে হযরত আলী, ফাতেমা এবং হাসান ও হুসাইনের মত ব্যক্তিত্বকেও পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে)। আবার হযরত উমরের (রাঃ) কাছে তো সৈয়েদাতুন নিসায়িল আলামীন হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) এবং তাঁর স্বামী আলীর (আঃ) চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ বা আসামী আর কেউ ছিল কি?

প্রশ্ন-২০। আবু সুফিয়ান তাদের ভয় দেখানো পর আবার কেন নিরব হয়ে গেল?

উত্তরঃ কারণ আবু সুফিয়ান রাসুল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর যখন মদীনাতে এলো তখন তার কাছে জমাকৃত অনেক **'সদকা'** ছিল। অথচ তখন আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত চলছে, সে কারণেই সে দ্রুত আলীর (আঃ) গৃহের দিকে গেল এবং তাঁদের বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিতে লাগল এবং উক্ত খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ধন-সম্পদ ও লোক-বলের লোভ দেখাল। কিন্তু আলী (আঃ) তার ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরেছিলেন (সে যে এই খেলাফতের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়) তাই তিনি তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে ছিলেন। হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারলেন তখন তারা তাড়াতাড়ি আবু সুফিয়ানের কাছে গেলেন এবং তাকে ধন-সম্পদের লোভ দেখালেন এবং বলেন যে, **"তুমি সদকার মাল যা জমা করেছ সব কিছুই তোমাকেই ফেরৎ দিয়ে দিব এবং খেলাফতেও তোমাকে অংশীদার করে নিব"**। তাই ওয়াদানুসারে তার পুত্রকে শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হল। সুতরাং আবু

'আওস' গোত্র ও তাদের সরদার সাদ ইবনে ওবাদাকে খেলাফতের জন্য প্রলুব্ধ করল। কিন্তু **'খাজরাজ'** গোত্রের সরদার বশীর ইবনে সাদ নিজের চাচার প্রতি হিংসা পোষণ করল। যেহেতু সে জানতো যে সাদ ইবনে ওবাদার উপস্থিতিতে খেলাফত তার পর্যন্ত আসতে পারবে না, সেহেতু আনছারদের শক্তি বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্য হতে অনেকেই মুহাজেরদের দলে ভিড়ে যায়। এই সুযোগে মুহাজেরগনও তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে নসীহত ও পরামর্শ দিতে থাকেন। যেমন আবু বকর (রাঃ) তাদের জাহেলিয়াতের যুগের শত্রুতাকে উসকানি দিলেন। তাদের আমিত্বের শিরাকে এই কথা বলে আরো উত্তেজিত করে দিলেন যে, "*আমরা যদি খেলাফত 'আওসের' কাছে সোপর্দ করে দেই তাহলে 'খাজরাজ' গোত্র কখনোই রাজি হবে না। আর খেলাফতের দায়-দায়ীত্ব যদি 'খাজরাজদের' হাতে সোপর্দ করে দেই তাহলে 'আওস' গোত্র কখনোই সহ্য করবে না*"। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) তাদের এ কথা বলে লোভ দেখান যে, "*রাষ্ট্রে তোমাদেরও অংশ থাকবে, আমরা আমীর হলে তোমরা উজির হবে। আমরা তোমাদের প্রতি রায়ের মাধ্যমে কখনো প্রাধান্য বিস্তার করবো না*"।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের বুদ্ধির বলে সমগ্র উম্মতের সাথে একটি খেল দেখালেন এবং সত্য নসীহাতকারীর চরিত্রে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ধার্মিকতার সাহায্য নিয়ে বল্লেন যে, "*আমার খেলাফতের কোন প্রয়োজন নেই, তোমরা এ দু'জন 'উমর ইবনে খাতাব' এবং 'আবু ওবায়দার' মধ্যে যাকে খুশি তাকে নির্বাচিত করে নাও*"।

এটা ছিল একটি উত্তম এবং শক্তিশালী পরিকল্পনা। উমর ইবনে খাত্তাব ও আবু ওবায়দা বল্লেন যে, "*আমরা আপনার উপর কেমন করে প্রাধান্য পেতে পারি। আপনি আমাদের অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসুর (সাঃ)-কে গুহায় সঙ্গ দিয়েছেন। আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার বায়াত গ্রহণ করব*"। সুতরাং আবু বকর (রাঃ) হাত প্রসারিত করলেন এবং হযরত উমর ও আবু ওবায়দার (রাঃ) দেখাদেখি খাজরাজের সরদার বশির ইবনে সাদও দৌড়ে এসে বায়াত করে নিল এবং তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য সাহাবীরাও বায়াত গ্রহণ করে নিল। কিন্তু সাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বায়াত গ্রহণ করেন নি।

প্রশ্ন-১৮। সাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বায়াত করাকে কেন অস্বীকার জানালেন এবং হযরত উমর (রাঃ) তাকে হত্যা করার হুমকি কেন দিলেন?

উত্তরঃ আনছারগণ যখন আবু বকরের (রাঃ) বায়াত গ্রহণ করতে লাগলেন এবং উক্ত কাজে একে ওপরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন তখন সাদ ইবনে ওবাদা বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং নিজের গোত্রের লোকজনকেউ নিষেধ করতে থাকেন। কিন্তু কঠিন অসুস্থতার কারণে তাতে সফলকাম হলেন না। যেহেতু তিনি দরিদ্র ছিলেন তাই তার কথা কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিত না। এই সুযোগে উমর (রাঃ) বল্লেন, "**তাকে কতল**

এ কারণেই হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) আবু বকর ও উমরের (রাঃ) উপর আরো বেশী ক্ষুব্ধ ছিলেন। এমন কি প্রত্যেক নামাজের পর তিনি আবু বকর ও উমরের জন্য বদ-দোয়া করতেন এবং নিজের স্বামীকে ওয়াসিয়াত করে গেলেন যে, **"আবু বকর ও উমর যেন তাঁর জানাজাতে শরীক না হতে পারে এবং যাদের আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি তাদের ছায়াও যেন আমার জানাজায় স্পর্শ না করে"**।

তারা যখন জেনে বুঝেই হযরত ফাতেমা বিনতে রাসুলকে (যিনি সৈয়্যেতুন নিসায়িল আলামীন, যিনি রাগান্বিত হলে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন, যার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট) কষ্ট দিলেন যেন হযরত আলী (রাঃ)-কে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, তোমাকে আমরা কতই না তুচ্ছ জ্ঞান করি। এমতাবস্থায় হযরত আলীর কাছে **'সবর'** করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না।

প্রশ্ন-২৩। সাহাবাদের মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ওসামার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করার বিষয়ে গড়িমসি বা অনীহা কেন করলেন?

উত্তরঃ কারণ গোপনে হযরত আবু বকরের (রাঃ) জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি উমরের (রাঃ) প্রচেষ্টায় মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত হয়ে বসেছিলেন। সে জন্যই আবু বকর (রাঃ), ওসামার কাছে নিবেদন করে ছিলেন যেন উমরকে (রাঃ) দল থেকে বাদ রাখা হোক, যাতে খেলাফতের বিষয়ে উমরের (রাঃ) সাহায্য পাওয়া যায়। কারণ তিনি একা তার পরিকল্পনাকে সফল করতে পারতেন না। তার তো সেই সমস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল যারা রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে দুঃসাহস দেখিয়ে তাঁর বিরোধিতা করতে পেরেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র গজব ও রাসুল (সাঃ)-এর লানতের কোন পরোওয়া করতেন না।

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, উক্ত পরিকল্পনাকারীগণ ওসামার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করতে এজন্য গড়িমসি বা অনীহা প্রকাশ করেছিল যেন তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারে এবং নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।

প্রশ্ন-২৪। হযরত আলী (রাঃ)-কে পদ-পদবী থেকে কেন সরিয়ে রাখা হল এবং তাঁকে কোন বিষয়েই কেন শরীক করা হল না?

উত্তরঃ যদিও তারা (খলিফাগণ) তোলাকাদের (যারা মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা পেয়ে মুসলমান হয়েছিল) একটি বিরাট সংখ্যাকে তাদের দলভুক্ত করেছিলেন এবং শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের শরীক বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং **'জাজিরাতুর আরবের'** বিভিন্ন প্রদেশে তাদেরকে আমীর ও অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ দান করেছিলেন। যেমন- ওয়ালিদ ইবনে উকবা, মারওয়ান ইবনে হাকাম, আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াজিদ ও মুয়াবিয়া, আমরু ইবনে আ'স, মুগীরা ইবনে শোবা এবং আবু হুরায়রা, ইত্যাদি

সুফিয়ানও রাজি হয়ে গেল এবং আর কোন উচ্চ-বাচ্য করল না। তারপর আবু সুফিয়ানের ছেলে ইয়াজিদ যখন মারা গেল তখন তার দ্বিতীয় পুত্র মুয়াবিয়াকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হল এবং তাকে **'শাম নগরীর'** শাসক বানিয়ে দেয়া হল।

প্রশ্ন-২১। আলী (আঃ) কি খেলাফতকে মেনে নিয়ে বায়াত গ্রহন করেছিলেন?

উত্তরঃ কস্মিনকালেও নয়। আলী (আঃ) কখনও রাজি হন নি আর না কখনো চুপ করে বসেছিলেন। বরং তিনি হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতের বিরুদ্ধে সকল উপায়েই প্রতিবাদ করেছেন এবং শত হুমকি ও ভয়-ভিত্তির মুখেও বায়াত গ্রহণ করেন নি। ইবনে কোতায়বা তার ইতিহাসে লিখেছেন যে, আলী (আঃ) আবু বকর ও উমরকে (রাঃ) বলেন, **"খোদার কসম আমি কখনো তোমাদের বায়াত গ্রহণ করব না কেননা বায়াতের জন্য তোমরা দু'জনার চেয়ে আমি অধিক শ্রেষ্ট ও যোগ্য"**। তিনি নিজের স্ত্রী ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে আনছারদের মজলিসে গমন করেন। কিন্তু আনছারগণ এই কথা বলে পিছিয়ে গেল যে, **"আমাদের কাছে আবু বকর আগে এসেছিলেন"**। বুখারী বলেন যে, **"হযরত আলী, হযরত ফাতিমার জীবদ্দশায় বায়াত গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ফাতিমার তিরোধানের পর যখন লোকজন তাকে উপেক্ষা করতে লাগল তখন তিনি আবু বকরের সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন"**। মা ফাতিমা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাহলে কি তিনি জামানার কোন ইমামের বায়াত গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করলেন। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন **"যে তার জামানার ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল"**। আবার হযরত আলী কি এ কথা জানতেন যে, তিনি হযরত আবু বকরের (রাঃ) পরেও বেঁচে থাকবেন, কেননা তিনি বায়াত গ্রহণ করতে ছয় মাস বিলম্ব করেছিলেন? কিন্তু আলী (আঃ) কখনোই নিশ্চুপ ছিলেন না এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজের অধিকারের দাবী করেই গেছেন এবং দলিল হিসাবে তাঁর খোৎবা **'খোৎবায়ে শিক্‌শিকিয়্যাহ্' নাহ্‌জ আল-বালাঘা**-তে মজুদ আছে।

প্রশ্ন-২২। তারা হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ)-কে কেন রাগান্বিত করেছিলেন, তাঁর সাথে আপোষ করার কি কোন অবকাশ ছিল না?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই তারা হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, তাঁর পিতার **'মীরাস'** তাঁকে না দিয়ে এবং তাঁর সমস্ত দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাঁকে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত করেছিলেন। এমনকি তদানীন্তন লোকজনের কাছে হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর কোন মান-মর্যাদাই রইল না, তারা তাঁর স্বাক্ষ্যকেও গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তিনি যখন খেলাফতের দাবী উত্থাপন করলেন তখন আনছারগণ ওজর পেশ করলেন যে, **"আমরা পূর্বেই আবু বকরের বায়াত করে নিয়েছি যদি আপনার স্বামী আগে আমাদের কাছে আসতেন তাহলে আমরা তাঁরই বায়াত গ্রহণ করে নিতাম"**।

উত্তরঃ তারা প্রথম থেকেই নবীর (সাঃ) হাদীসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিলেন। আর এ নিষেধাজ্ঞা শুধু এ কারণেই ছিল, কেননা উক্ত হাদীসসমূহে হযরত আলীর (আঃ) জন্য খেলাফতের ঘোষণা সম্বলিত হাদীসও ছিল। বরং বেশীর ভাগ হাদীসই এমন ছিল যেগুলি খলিফাদের ঐ সমস্ত কথা ও কর্মের বিপরীত যেত যার দ্বারা তারা তাদের জীবন যাপনের নিয়ম-কানুন বানিয়ে ছিলেন এবং যার উপর ভিত্তি করে উক্ত নতুন শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভ দাড় করিয়ে ছিলেন এবং যা তারা .তাদের ইজতিহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

প্রশ্ন-২৭। হযরত আবু বকর (রাঃ) কি খেলাফতের দায়ীত্বভার নিয়ন্ত্রনে রাখার যোগ্যতা রাখতেন?

উত্তরঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের দায়ীত্বভার কিছুতেই নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারতেন না, যদি কিনা হযরত উমর (রাঃ) এবং বনী উমাইয়ার অন্যান্য গন্য-মন্য ব্যক্তিবর্গরা তাকে সাহায্য করতেন। ইতিহাস স্বাক্ষী যে, আহ্‌কামের বিষয়ে আবু বকর (রাঃ) হযরত উমরের (রাঃ) মুখাপেক্ষী ছিলেন, আসল শাসক তো হযরত উমরই (রাঃ) ছিলেন। আমার এ কথার স্বপক্ষে **'মুয়াল্লেফাতুল কুলুবের'** ঘটনাটি স্বাক্ষ্য প্রমান দিচ্ছে। মুয়াল্লেফাতুল কুলুবরা যখন নিজেদের হক নিতে হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট আসল তখন তিনি একটি চিরকুট লিখে তাদেরকে উমরের (রাঃ) কাছে পাঠালেন, কারণ **'বাইতুল মালের চাবি'** হযরত উমরের (রাঃ) কাছে ছিল। অথচ হযরত উমর (রাঃ) চিরকুটটি দেখেই ছিড়ে ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে, ফেরৎ চলে যেতে বল্লেন। তারা আবু বকরের (রাঃ) কাছে ফেরৎ গিয়ে বল্ল, **"খলিফা আপনি না সে (উমর)"**? আবু বকর জবাব দিলেনঃ **"ইনশাহ আল্লাহু, তিনিই খলিফা"**।

আবার তখনো একই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল, যখন আবু বকর (রাঃ) জমির একটি খন্ড উবায়দাহ ইবনে হাসীন এবং আকরা' ইবনে হাবিসের নামে লিখে দিয়েছিলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক লিখিত চিঠিটি পড়ার পর তাতে থুথু ফেলে মুছে ফেলেছিলেন। অতঃপর তারা উভয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে আবু বকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে বল্লেনঃ **"আল্লাহ্‌র কসম আমরা জানতাম না যে খলিফা আপনি নন, বরং উমর"** আবু বকর (রাঃ) বল্লেন,**"খলিফা, আসলে উমরই"**। কিছুক্ষণ পরই হযরত উমর (রাঃ) রাগে গজরাতে গজরাতে আসলেন এবং আবু বকরকে জমি লিখে দেয়ার কারণে কঠিন ভাষায় বকা-ঝকা করতে লাগলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) বল্লেন, **"আমি কি তোমাকে তখনই বলিনি যে, আমার তুলনায় তুমিই এই কাজের জন্য যোগ্য, কিন্তু তুমি আমাকে জোর জবরদস্তি ফাঁসিয়ে দিলে"**। [১]

---

১ আসকলানী তার **'কিতাবুল এসাবাহ ফি মারেফাতুস সাহা'**-তে আইয়িনাহের ঘটনার মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আবিল হাদীদ **'শারহে নাহ্‌জ আল-বালাঘা'**-র ১২তম খন্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

যাদের প্রতি রাসুল (সাঃ) অসন্তুষ্ট ছিলেন, এরকম আরো অনেককে তাদের দলে ভিড়িয়ে নেন। কিন্তু হযরত আলী (আঃ)-কে বাদ দিয়ে গৃহের মধ্যে আবাদ্ধ করে দিলেন এবং তাঁকে ২৫ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোন কাজেই অংশ গ্রহণ করতে দিলেন না। তার একমাত্র কারণ হল যে, তারা হযরত আলী (আঃ)-কে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। যেহেতু মানুষ দুনিয়ারই দাস, যার কাছে ধন-সম্পদ আছে তার দিকেই ছুটে যায়। অথচ হযরত আলীর (আঃ) কাছে সব সময়ই নিজস্ব পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ ছিল বিধায় লোকজন তাঁর কাছে ভিড়তো না।

সে কারণেই তিনি আবু বকর, উমর ও উসমানের (রাঃ) খেলাফত আমলে এক প্রকার গৃহ বন্দী ছিলেন এবং খলিফাদের প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তারা তাঁর জীবনাবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন, তাঁর ফাযায়েল ও মর্যাদা সমূহকে লুকিয়ে রাখতেন। হযরত আলীর (আঃ) কাছে দুনিয়ার তেমন কোন সম্পদ ছিল না যে, যার লোভে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত।

প্রশ্ন-২৫। তারা (আবু বকর ও উমর) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করলেন, যদিও রাসুল (সাঃ) তা হারাম করেছিলেন?

উত্তরঃ কারণ অনেক সাহাবা 'বিদায় হজ্জ' থেকে ফেরার পথে **'গাদীর-এ-খোমে'** নবীর (সাঃ) উপস্থিতিতে হযরত আলীর (আঃ) হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, তাই তারা আবু বকরকে (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন। যেহেতু তারা মদীনার বাসিন্দা ছিলেন না এবং নবীর (সাঃ) মৃত্যুর সময় মদীনাতে উপস্থিত ছিলেন না, বিধায় জানতেন না যে খেলাফত হযরত আলীর (আঃ) পরিবর্তে আবু বকরের (রাঃ) হাতে চলে গেছে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে তারা পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলেন যে হযরত ফাতেমা (সাঃআঃ) খলিফা আবু বকরের (রাঃ) প্রতি ক্ষুব্ধ আছেন এবং হযরত আলী (আঃ) বায়াত অস্বীকার করেছেন। এ সমস্ত কারণেই তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরকে (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন যতক্ষণ না তাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হচ্ছে।

অতএব, হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের (যে তাদের কাছে নাংগা তরবারী বলে গণ্য হত) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং খালিদ তাদের (যাকাত অস্বীকারকারীদের) সমস্ত উদ্যম ও অনুভূতিকে ঠান্ডা করে দিল এবং তাদের অনেককেই হত্যা করে ফেলে। তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে ফেলে, যেন তাদের শাসনের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে এবং ঐসমস্ত ব্যক্তিদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যায় যারা খলিফার আনুগত্য না করার ইচ্ছা পোষন করছে।

প্রশ্ন-২৬। তারা (তিন খলিফাগণ) রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা কেন আরোপ করলেন?

এর দ্বারা আমাদের কাছে আহলে সুন্নাতের 'শোরার' বিষয়টি আবারো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আসলে তাদের কাছে 'শোরার' কোন গুরুত্বই নাই, আর না আবু বকর ও উমরের (রাঃ) সেটার প্রতি কোন আস্থা ছিল। যদিও আহলে সুন্নাতগণ বিশ্বাস করেন যে রাসুল (সাঃ) দুনিয়া থেকে চলে গেলেন আর খেলাফতের সিদ্ধান্ত 'শোরার' উপর ন্যস্ত করে দিলেন। আর এই বিশ্বাসকে সবার আগে আবু বকরই (রাঃ) প্রত্যাখান করে উমরকে (রাঃ) খলিফা বানিয়ে দিলেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করলেন। আপনারা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে আহলে সুন্নাতগণ গর্ব করে বলে থাকেন যে, আমরা 'শোরার' প্রতি ঈমান পোষণ করি, কারণ একজন খলিফা 'শোরার' মাধ্যমেই সঠিকভাবে নির্বাচিত হতে পারে। তারা শিয়াদের এমন কথার প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে থাকেন যে, **'ইমামত আল্লাহ্ ও রাসুলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল'**। তারা আরো বলেন যে **'ইমামতের আকীদা পারস্য থেকে আগমন করেছে'**, কারণ পারস্যবাসীরাই আল্লাহ্‌র হুকুমতের বিষয়ে ওয়েরাসতকেই (উত্তরাধিকার) মানদন্ড বলে মান্য করে।

আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ লোকই **"ওয়া আমরুহু শোরা বাইনাহুম"** আয়াত দ্বারা দলিল ও যুক্তি প্রমান দিয়ে থাকেন এবং বলে থাকেন যে উক্ত আয়াতটি খেলাফতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাতের কথার সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি যে আবু বকর এবং উমর (রাঃ) দু'জনই আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করেছেন এবং খেলাফত হাসিল করার চক্রান্তে উক্ত বিষয়কে কোন গুরুত্বই দেন নি।

প্রশ্ন-২৯। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-কে পূর্ববর্তী দুই খলিফার সীরাতের প্রতি আমল করার শর্ত কেন আরোপ করেছিলেন?

উত্তরঃ দুনিয়ার পতনের দিকে লক্ষ্য করুন। হযরত উমরের (রাঃ) পরে আব্দুর রহমান ইবনে আউফই উম্মতের ভাগ্যের ফয়সালা করছেন। তিনি যাকে খুশি তাকে নির্বাচন করতে পারেন এবং যেমন ইচ্ছা তেমন ফয়সালা করতে পারেন। এসব কিছুই হযরত উমরের (রাঃ) ফন্দি ছিল যার মাধ্যমে উক্ত দলকে অন্যান্য সাহাবার উপর স্থান দিয়েছেন, যে দলের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মত লোক ছিল। যদিও সমগ্র আরবে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের একজন চালাক-চতুর ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি ছিল। এতে কোন সন্দেহ নাই যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফও খেলাফতকে তার আসল হকদারের কাছ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য এবং নিজেদের মনমত খলিফা নিযুক্তকারীদের দলে বিরাট ভুমিকা রেখেছিলেন। আর বুখারীও স্বীকার করেছেন যে, **"আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হযরত আলী-কে কোন কারণে ভয় পাচ্ছিলেন"**। [১]

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, ৮ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, কিতাবুল আহকামের **'কাইফা ইউবাইয়েউন্নাসাল ইমাম'** অধ্যায়ে।

বুখারী তার সহীহ্‌তে লিখেছেন যে, "উমর (রাঃ) সাহাবীদের আবু বকরের বায়াতের জন্য উৎসাহ যোগাতেন এবং বলতেন যে, '*আবু বকর রাসুল (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনিই সমস্ত মুসলমানদের মাঝে শাসক হওয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ট। ওঠো এবং তার বায়াত গ্রহণ কর। আনাস ইবনে মালিক বলেন যে, আমি উমরকে দেখলাম যে আবু বকরকে মিম্বরে যাওয়ার জন্য বলছিলেন। বারংবার চাপ সৃষ্টি করার পর আবু বকর মিম্বরে উঠলেন এবং সবাই তার বায়াত গ্রহণ করে নিল*"।

প্রশ্ন-২৮। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের মৃত্যুর পূর্বেই হযরত উমরকে (রাঃ) কেন খলিফা বানিয়েছিলেন?

উত্তরঃ কারণ উমর (রাঃ), হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করার বিষয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এ বিষয়ে তিনি রাসুল (সাঃ)-এর সাথেও ঝগড়া করেছেন এবং আবু বকরের (রাঃ) বায়াতের জন্য আনছারগণকেও তিনিই রাজি করিয়েছিলেন। সাহাবীদের উপর জোর-জুলুম চালিয়ে '**বায়াত**'-কে ওয়াজিব করে দিয়েছিলেন। এমন কি হযরত ফাতেমা (সাঃআঃ)-এর গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়ারও হুমকি দিয়েছিলেন।

আর প্রকৃত খলিফা তো হযরত উমরই (রাঃ) ছিলেন যা আমি পূর্বেই বয়ান করেছি, কারণ প্রথম ও শেষ সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা তারই ছিল। এতে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি আরবের চালাক-চতুর লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানগণ বিশেষ করে আনছারগণ একজন ঠুনকো মেজাজ ও রাগী মানুষের হাতে কখনো বায়াত করবে না তাই তিনি আবু বকরকে (রাঃ) উপস্থাপন করলেন যিনি নরম মেজাজের মানুষ ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য দিকে তার কন্যা আয়শা (রাঃ) একজন সাহসী মহিলা ছিলেন, যিনি কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। আর উমর (রাঃ) এটা ভাল করেই জানতেন যে আবু বকর (রাঃ) তো তারই অধীনস্থ এবং সবকিছু তারই ইংগিতে করবেন।

হযরত উমরের (রাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে আবু বকরের (রাঃ) ওয়াসিয়াত লেখার পূর্বেই অনেক সাহাবা বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। ইমাম আলী (আঃ) তো প্রথম দিনই হযরত উমরকে (রাঃ) বলেছিলেন, "**যত পার চেষ্টা চালিয়ে যাও এতে তোমারই লাভ আছে। আজ মেহনত করে আবু বকরের খেলাফতকে শক্তিশালী করে দাও, কালকে সে তোমাকেই ফিরিয়ে দিবে**"। ঠিক এমন কথাটিই অপর একজন তখন বলেছিলেন যখন হযরত উমর (রাঃ) খেলাফত সংক্রান্ত 'ওসিয়াত-নামা'-টি হাতে নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন যে, "**আমি জানি তাতে কি লেখা আছে, প্রথমে তুমি তাকে খলিফা বানিয়েছিলে, আজ তিনি তোমাকে খলিফা বানিয়ে দিলেন**"।

এখানে আমি আরো একটি কথা সংযোজন করতে চাই যে, উক্ত হাদীস খেলাফতকে কেবল কোরাইশদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ ঐ **'শোরা'**-র দৃষ্টিভঙ্গীটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যে 'শোরা'-র প্রতি আহলে সুন্নাতগণ আকীদা পোষণ করে থাকেন। কেননা **'নির্বাচন'** আর **'ডেমোক্রেসী'**-তে উম্মতের সমস্ত লোকই অন্তর্ভূক্ত। সমস্ত গোত্রকে বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং উক্ত নির্বাচনে আরব ছাড়া অনারব ইসলামী গোত্রসমূহও অন্তর্ভূক্ত।

এগুলি ছিল সেই সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর যা পাঠক মন্ডলীর মন মানসিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ সমস্ত সমস্যাবলীর বিস্তারিত উত্তর ইতিহাস গ্রন্থাগুলোতে পাওয়া যাবে এবং আমার **'অবশেষে আমি সত্য পেলাম'** ও **'আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে গেলাম'** বই দু'টিতে পাওয়া যাবে।

সত্য সন্ধানীদের মূল বিষয় বস্তুর দিকে মনোযোগ দেয়া উচিৎ এবং নিরপেক্ষভাবে রেওয়ায়েতসমূহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যাচাই বাছাই করা উচিৎ। যাতে সেখান থেকে বাতিলের পর্দা ছিন্ন করে সত্যের প্রকাশ ঘটানো যায় এবং সেগুলিকে তার আসল রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ নিশ্চিতরূপে হযরত আলী (আঃ)-কে খেলাফত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য পুরো চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে যা কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন -হযরত আলীর অবস্থান সেগুলির বিরুদ্ধে এবং হযরত আলী সবসময়ই সেগুলির প্রতিবাদ করেছেন।

সে কারণেই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত আলীর (আঃ) সামনে এই শর্ত রাখলেন যে, আপনাকে সমস্ত ফয়সালা শায়খাইনদের (পূর্ববর্তী দুই খলিফা) সীরাত অনুসারে করতে হবে। বরং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এ কথাটি অন্য সবার চেয়ে উত্তমরূপে বুঝতে পারতেন যে হযরত আলী (আঃ) ধোকাবাজ নন, মিথ্যাবাদী নন। সুতরাং হযরত আলী (আঃ) কখনই এমন শর্ত মেনে নিবেন না। আর আব্দুর রহমান বিন আউফ ইহাও জানতেন যে তার ভগ্নিপতি উসমানের প্রতি কোরায়েশ ও খলিফা নির্বাচন কমিটির দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে।

প্রশ্ন-৩০। আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থাদিতে "**১২ ইমাম**" সংক্রান্ত কোন হাদীস মজুদ আছে কি?

উত্তরঃ বুখারী, মুসলিম এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য সকল হাদীসবেত্তাগণ নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ

"দ্বীন ইসলাম ধ্বংস হবে না ক্বিয়ামত পর্যন্ত, অথবা ১২ খলিফার আগমন পর্যন্ত এবং তারা প্রত্যেকেই কোরায়শ থেকে হবেন" [১]

উক্ত হাদীসটি এমন একটি কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে যে, যার উত্তর বা সমাধান আহলে সুন্নাতের কাছে নাই। আর না তাদের উলামাদের কারোর মাঝে কোন ক্ষমতা আছে যে উক্ত চার জন '**খোলাফায়ে রাশেদা**' ও পঞ্চম '**উমর ইবনে আব্দুল আজিজ**' ছাড়া অন্য কোন খলিফার নাম গণনা করতে পারবেন। বাকি সাত জনের তাদের কাছেও কোন অস্তিত্ব বা গুরুত্ব নাই।

আহলে সুন্নাতের কাছে অবশ্যই একটা পথ খোলা আছে, তারাও যেন শিয়াদের মত হযরত আলী (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের '**ইমামত**'-কে স্বীকার করে নেন অথবা উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করে তাদের সহীহ্ গ্রন্থাদি থেকে বের করে ছুড়ে ফেলে দেন। কিন্তু তারা তাও করতে পারবেন না, কারণ সেটা করলে তাদের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে সত্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এবং সেগুলিতে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, ৮ম খন্ড, ১২৭ পৃঃ এবং **সহীহ্ মুসলিম**, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩ পৃঃ। **ইঃ ফাঃ সহীহ্ মুসলিম**, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-৪৫৫৪-৬০ এবং **বাঃ ইঃ সেন্টার জামে আত-তিরমিজী**, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-২১৭০।

রাসুল (সাঃ) ধোকা দিয়েছেন (মায়াজাল্লাহ্) ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ইসতায়িযান'** এবং **'কিতাবুল দিয়াত'**-এর অধ্যায়ে, অনুরূপভাবে মুসলিম তার সহীহ্ **'কিতাবুল আদব'**-এর **'তাহ্‌রিমুন নাযারু ফি বাইতে গায়রুহু'** অধ্যায়ে আনাস ইবনে মালিক হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, *"নবীর (সাঃ) গৃহের মধ্যে হঠাৎ একজন লোক ঢুকে পড়লো। সুতরাং নবী (সাঃ) একটি অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, নবী (সাঃ) তাকে ধোকা দিয়ে জখম করতে চান"*।

এমন গর্হিত কাজ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে শোভা পায় না, কারণ নবী (সাঃ) হলেন মুমিনদের জন্য 'রউফ' ও 'রহিম'। বরং বিষয়টা তো এমন হওয়া উচিৎ ছিল যে, লোকটি নবী (সাঃ)-এর গৃহতে হঠাৎ করে যখন ঢুকেই পড়েছিল, তখন নবী (সাঃ) তাকে ইসলামের শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, তুমি যা করেছ তা হারাম, এভাবে বিনানুমতিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করতে নাই। অথচ এ আবার কেমন কথা যে নবী (সাঃ) লোকটিকে ধোকায় ফেলে জখম করার চেষ্টা করছিলেন। এমনও তো হতে পারে যে লোকটির নিয়্যত ঠিক ছিল, যেহেতু উক্ত গৃহটি নবীর কোন স্ত্রীর গৃহ ছিল না এবং সেখানে মালিক ইবনে আনাসও উপস্থিত ছিলেন, তাহলে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ প্রবেশ করাতে এমন কি কিয়ামত হয়ে গেল। (মায়াজাল্লাহ্) রাসুল (সাঃ)-এর চিন্তা-চেতনা কি এতই খারাপ ছিল যে তাকে অসতর্ক অবস্থায় ফেলে তার চোখ অন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।

বুখারীর ব্যাখ্যা তো উক্ত ঘটনাকে আরো জঘন্য বানিয়ে দিয়েছে। বুখারী তার ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসুল (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে অসতর্ক অবস্থায় ফেলে অর্থাৎ এমনভাবে যেন সে দেখতে না পারে, তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কাউকে অসতর্ক বানানো রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষে অসম্ভব একটি ব্যাপার।

রাসুল (সাঃ) কঠিন শাস্তি প্রদান করেন এবং মুসলমানদের হাত-পা কর্তন করে ফেলেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল তিব'**-এর অধ্যায়ে লিখেছেন যে সাবিত, আনাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, *"লোকজন মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ আমাদেরকে বাঁচান এবং খাবার ও পান করার জন্য কিছু দিন। নবী (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, উটের দুধ ও প্রসাব পান কর। সুতরাং তারা তা পান করল এবং সুস্থ্য হয়ে গেল। তারপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে ফেলে এবং উটগুলোকে পানি পান করালো। উক্ত ঘটনা যখন রাসুল (সাঃ) জানতে পারলেন তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। লোকজন যখন তাদেরকে নিয়ে এলো তখন রাসুল (সাঃ)*

সপ্তম অধ্যায় ঃ

হাদীস সম্পর্কে

আমি অতি শীঘ্রই পাঠকমন্ডলীর সামনে উপস্থাপন করবো যে, হাদীসের সমস্যা উপরোক্ত সমস্যাবলীর চেয়েও অধিক জটিল যেখানে আজও মুসলমানরা আটকে আছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে -কারণ ওয়াহাবীদের ইউনির্ভাসিটিগুলো থেকে মানুষ হাদীসের বিষয়ে **'ডক্টরেট ডিগ্রি'**-র সনদ নিয়ে বের হচ্ছে। আপনারা লক্ষ্য করবেন তারা কেবল ঐ সমস্ত হাদীসগুলোই মুখস্ত করে থাকে যেগুলি তাদের মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহনযোগ্য। আর ঐ হাদীসগুলোর মধ্যে ঐ সমস্ত হাদীসের সংখ্যাই অধিক যেগুলি তাদেরই মডেল বা মানদন্ড তথা বনি উমাইয়াদের কর্তৃক রচিত, ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা তারা নবী (সাঃ)-এর নূরকে নিভিয়ে দিতে এবং রেসালতের চিন্তা-চেতনাকে কলংকিত করতে চেয়েছিল। যেমনঃ রাসুল (সাঃ) বুঝতে পারতেন না যে তিনি কি বলছেন !! (মায়াজাল্লাহ্) এবং তিনি তাঁর ঐ সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বযুক্ত কথা-বার্তা বা কাজ-কর্মকে জানতেন না !! (মায়াজাল্লাহ্), যা দেখা বা শুনার পর পাগলেরও হাসি পাবে।

যদিও আহলে সুন্নাতের উলামা এবং সত্য সন্ধ্যানীগণ হাদীসের বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন এবং মেহনত করেছেন কিন্তু আফসোস তাদের এতো পরিশ্রম করা সত্বেও তাদের সহীহ্ গ্রন্থগুলিতে প্রচুর পরিমানে ভিত্তিহীন বিষয়-আষয় মজুদ আছে। অনুরূপভাবে শিয়াদের হাদীস গ্রন্থাদিতেও অনেক গরমিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শিয়ারা স্বীকার করে থাকেন যে তাদের কাছে একমাত্র **"আল্লাহ্র কিতাব সহীহ-শুদ্ধ বাদবাকী সব কিছুতেই ভুল-ত্রুটি আছে"**। অপর পক্ষে, আহলে সুন্নাতগণ এ কথার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, **"আল্লাহ্র কিতাবের পরে -সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিম হল সবচাইতে বিশ্বস্ত ও সহীহ্ শুদ্ধ গ্রন্থ"**। বরং তারা বলে থাকেন যে, যা কিছু এদুই কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সবকিছুই সত্য ও সহীহ-শুদ্ধ। সে কারণেই নমুনা স্বরূপ আমি সুধী পাঠকবৃন্দের সম্মুখে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম হতে এমন কিছু হাদীস উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যেগুলি রাসুল (সাঃ) এবং আহলে বাইতে রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে এবং তাদের চরিত্রকে কলংকিত করেছে। উপরন্তু ঐ সমস্ত হাদীসও বর্ণনা করব যার দ্বারা বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের কর্মকান্ডকে জায়েজ বানানোর জন্য রচনা করা হয়েছে। আসলে তারা নিজেদের অপকর্মকে এবং নেক মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত নিজেদের হাতকে লুকিয়ে রাখার জন্য নবী (সাঃ)-এর ইজ্জত-আব্রুকে ভূ-লুন্ঠিত করেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য বুঝতে সহজ হবে যে, ঐ বর্ণনাটি, উমাইয়া ও তাদের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক রচিত। সেসব ভক্তবৃন্দ ঐ সমস্ত শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য রচনা করতেন যাদের কাছে কেবল সন্দেহ ও দোষারোপের কারণেই হত্যা করে ফেলা কোন গুরুত্বই বহন করত না। আবার একই রাবীগণ বিগত দিনগুলির মনগড়া উদাহরণ উপস্থাপন করতেন। এ বর্ণনাটিই হচ্ছে সেই কথার দলিল যা বুখারী লিখেছেন। তিনি বলেন যে, আমি খবর পেলাম যে হাজ্জাজ আনাসকে বল্ল যে, *'আমার সম্মুখে এমন হাদীস বর্ণনা কর যার দ্বারা নবী (সাঃ) কর্তৃক কঠিন শাস্তি প্রদানের প্রমান মিলে'*। তখন তিনি হাদীসটি বয়ান করেন। হাসান যখন এ ব্যাপারে খবর পেলেন তখন তিনি বল্লেন, '*আমার মনে হয় তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন নি*'।[১]

উক্ত হাদীসটি হাজ্জাজ সাকাফীর **সন্তুষ্টি অর্জনের** জন্য রচনা করার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যে হাজ্জাজ জমিনকে ফেৎনা-ফ্যাসাদে পূর্ন করে দিয়েছিল এবং আহলে বাইত (আঃ)-এর হাজার হাজার অনুসারীদের প্রতি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। সে তাদের হাত-পা কর্তন করে ফেলতো, চোখ অন্ধ করে দিত এবং মুখ থেকে জিহ্বা টেনে বের করে ফেলতো। জীবিত মানুষকে ফাঁসিতে এমনভাবে লটকে রাখত যাতে সে সূর্যের তাপেই জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণ করতো। আর এ ধরণের রেওয়ায়েত হাজ্জাজের অপকর্মকেই জায়েজ ঘোষণা দেয়ার জন্য রচনা করা হয়েছে। কেননা ঐ বর্ণনার ভিত্তিতে হাজ্জাজ তো রাসুল (সাঃ)-এরই আনুগত্য করল!! যেহেতু **'রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে'**। **লাহাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।**

এ কারণেই মুয়াবিয়া হযরত আলী (আঃ)-এর অনুসারীদের ভিন্ন ভিন্ন রকম শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছে। কখনো হাত-পা কর্তন করেছে, কখনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছে। অনেক মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। কতক লোককে জীবিত কবর দিয়েছে, বেশিরভাগ লোককে ফাঁসি দিয়েছে। আবার অনুরূপভাবে মুয়াবিয়ার উজির আমর ইবনে আ'সও বিকৃত মানুষত্বের শাস্তি আবিস্কার করেছিল। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (রাঃ)-এর হাত-পা কর্তন করে গাধার চামড়ায় পুরে সেটাকে সেলাই করে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা এমনই সব নৃশংসতা দেখিয়ে ছিল। আর যুবতী ও মহিলাদের নিয়ে খেলা করার বিষয়ে যে হাদীস রচনা করেছে তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

রাসুল (সাঃ) সহবাসে আসক্ত ছিলেন (মায়াজাল্লাহ্) ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল গোসল'**-র **'ইযা জামেয়া সুম্মা আদু ওয়া মিন দারু আলা নেসায়েহি ফি গিসলে ওয়াহিদ'** অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে ঃ আমাকে মোয়াজ ইবনে

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৭, পৃঃ ১৩।

তাদের হাত-পা কেটে ফেল্লেন এবং চক্ষু অন্ধ করে দিলেন। আমি দেখলাম তাদের মধ্যে একজন জিহ্বা দ্বারা মাটি চাটতে চাটতে মারা গেল"।

কোন মুসলমান কি এই কথা বিশ্বাস করবে যে, যে রাসুল হাত-পা কর্তন করতে নিষেধ করতেন, সেই রাসুল নিজেই একদল লোকের হাত-পা কর্তন করে ফেল্লেন এবং তাদের চোখগুলি অন্ধ করে দিলেন, শুধু এই কারণে যে তারা একজন রাখালকে হত্যা করে ছিল? রেওয়ায়েতকারী যদি এমন কথাও বলতো যে তারা রাখালের হাত-পা কেটে ফেলেছিল, তখন হয়তো নবীর (সাঃ) ক্ষেত্রে তাদের হাত-পা কর্তন করার জন্য ওজর থাকতো। কিন্তু রেওয়ায়েতে এ কথার উল্লেখ নাই। আর রাসুল (সাঃ) (মায়াজাল্লাহ্‌) সত্য উদঘাটন না করেই কিভাবে তাদের হাত-পা কর্তন করলেন? মূল হত্যাকারীর সন্ধান কেন করেন নি? আমার মতে বর্ণনাকারীকেই জিজ্ঞাসা করা উচিৎ, তাদের মধ্যেকার কেউ হয়তো বলবেন যে আমরাও তো উক্ত হত্যাকান্ডে শরীক ছিলাম। রাসুল (সাঃ) তাদের **'কেসাসের'** বিনিময়ে কি ক্ষমা করে দিতে পারতেন না? একজনকে হত্যার দায়ে একদল লোককে পঙ্গু এবং অন্ধ করে দেয়ার মত বিচার করা কি রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষে সম্ভব? তারা যখন বলেছিল, **'ইয়া রাসুলুল্লা আমরা মুসলমান'** তখন রাসুল (সাঃ) কি আল্লাহ্‌র এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন যে, **"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তাহলে ততটুকু যতটুকু তারা তোমার সাথে করেছে, আর যদি সবর কর তাহলে ইহাই সবরকারীদের জন্য উত্তম"** ।

উক্ত আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন রাসুল (সাঃ)-এর অন্তর তাঁর চাচা সৈয়্যেদুস শুহাদা হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুতল্লিবের শোকে দগ্ধ হচ্ছিল। যার বুক চিরে, কলিজা বাহির করে চিবানো হয়েছিল এবং আংগুলগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল। রাসুল (সাঃ) তাঁর চাচাকে ঐ অবস্থায় দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং বল্লেন, "*যদি আল্লাহ্‌ পাক আমাকে শক্তি দেয় তাহলে আমি সত্তর বার অনুরূপভাবে তাদের হাত-পা কর্তন করব*"। তখনই উক্ত আয়াতটি নাযিল হল এবং তিনি (সাঃ) বল্লেন, **"সাবারতু ইয়া রব"** অর্থাৎ **"হে পরওয়ারদিগার আমি সবর করলাম"**। তিনি নিজের চাচার পশুতুল্য হত্যাকে যে তাঁর দেহকে খন্ড-বিখন্ড করে ছিল এবং তার কলিজা চিবিয়ে খেয়ে ছিল, তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এই হল নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা আখলাক।

যে বিষয়টি বর্ণনাকারীর হীনমন্যতাকে আপনাদের (পাঠকমন্ডলী) কাছে প্রকাশ করেছে সেটি হল বর্ণনাকারীর বর্ণনা যা বিষয়টিকে জঘন্য বানিয়ে দিয়েছে। আমি সেটাকে ধারাবাহিকভাবে বয়ান করবঃ

রাবী বলেন যে, আমাকে কোতাদা বলেছেন যে '*উক্ত ঘটনা আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল*'। যেন এভাবে নবীর কর্মের সমালোচনা করতে পারেন। রাসুল (সাঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম নাযিলের পূর্বে কস্মিন কালেও এমন নির্দেশ দিতে পারেন না। যেহেতু তিনি অতি সাধারণ বিষয়াবলীতেও আল্লাহ্‌র অহির অপেক্ষা করতেন সেহেতু তিনি কিভাবে রক্তপাতের নির্দেশ জারি করে দিবেন?

অতঃপর হাদীসের ব্যাখ্যাকারী মুসলিমের **'হাশিয়া'** অর্থাৎ টিকাতে লিখেছেন যে মিসবাহতে কিস্‌ল (দূর্বল হয়ে পড়া)-এর অর্থ হল যে সহবাসের পরে দূর্বলতার কারণে যখন বীর্য পাত হয় না তাহলে একথা কিভাবে প্রমান হল যে তাঁকে (তথা নবীকে) ৩০ জন মহিলার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল? (মায়াজাল্লাহ্)

রচনাকারীগণ এই দ্বিতীয় হাদীসটিও মিথ্যা রচনা করে নিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক এবং তাদের প্রতি আযাবের মাত্রা বাড়িয়ে দিক। রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে একজন জ্ঞানী ও বিবেক সম্পন্ন মানুষ এ ধরনের হাদীসকে কিভাবে কবুল করতে পারে যার দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর ইজ্জতের প্রতি আঘাত আসে এবং যার দ্বারা প্রমান হয় যে তিনি নিজের স্ত্রীর সামনে অপর পুরুষের সাথে এমন কথা বর্ণনা করেছেন, যা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন সাধারণ মোমিনও লজ্জা বোধ করে।

উমাইয়াদের আমলে নাচ-গানকে জায়েজ করার বিষয়ে কিছু উদাহরণ ঃ

রাসুল (সাঃ) নৃত্য দেখে আনন্দ পেতেন এবং গান-বাজনা (Music) শুনতেন। বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুন নিকাহ্'**-এর **'যারাবুদ্দাফ ফিন্নিকাহে ওয়াল ওয়ালিমাহ্'** অধ্যায়ে লিখেছেন যে আমাকে বশির ইবনে মুফাজ্জল এবং খালিদ ইবনে যাকওয়ান বর্ণনা করেছেন যে রাবিয়া বিনতে মোআওয়াজ্জ ইবনে আ'ফরা বলেছেন যে ঃ নবী (সাঃ) আমার সাথে যখন বিবাহ্ করলেন তখন আমার নিকট আসলেন এবং আমার বিছানার এত দূরত্বে বসলেন যত দূরত্বে তুমি বসে আছ। অতঃপর নাচনে ওয়ালীরা এসে আমাদের সামনে দাফ বাজাতে শুরু করে দিল এবং 'বদর যুদ্ধে' নিহত আমার পূর্ব পুরুষদের শোকগাথা বয়ান করা শুরু করে দিল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলতে লাগল, "*যদিও আমাদের নবী জানেন যে কালকে কি হবে*" তখন নবী (সাঃ) বল্লেন, "*এগুলো বাদ দাও, আগে যা গাইতে ছিলে সেটাই গাও*"।

এভাবেই বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল জিহাদ'**-এর **'অদ্দরক'** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র কিতাবুস **'সালাতুল ঈদাইন'**-এর **'আর-রুখসাতু ফিল্লায়িবিল্লাযি লা মা'সিয়াতু ফিহে"** অধ্যায়ে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) আমার নিকট এমন সময় আসলেন যখন দু'জন নাচ-গান পরিবেশন করছিল। তিনি বিছানায় বসে পড়েন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বকা-ঝকা দিয়ে বল্লেন, '*শয়তানী কাজ রাসুলের সামনে করা হচ্ছে*? তখন রাসুল (সাঃ) আবু বকরকে বল্লেন, '*বাদ দাও*'। অতঃপর দু'জন (রাসুল ও আবু বকর) অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তখন উক্ত নাচ-গান পরিবেশনকারীরা দু'জন বেরিয়ে গেল।

আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন হাবশিরা খেল-তামাশা প্রদর্শর্ন করছিল তখন আমি রাসুলকে জিজ্ঞাসা করলাম অথবা রাসুল (সাঃ)

হিশাম বলেন যে, আমার সাথে আমার পিতা কোতাদার সূত্রে বয়ান করেছেন যে, কোতাদা বলেন যে, আমার কাছে আনাস ইবনে মালিক বয়ান করেছেন যে, *"নবী (সাঃ) রাত দিনে নিজের ১১ জন স্ত্রীর কাছ থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসতেন। কোতাদা আনাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর (রাসুল) কি এতোই শক্তি ছিল? তখন আনাস বল্লেন, তাঁকে ৩০ জনের শক্তি দান করা হয়েছিল"*।

উক্ত রেওয়ায়েতটি রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার জন্য রচনা করা হয়েছে, যাতে মুয়ায়াবিয়া এবং ইয়াজিদের বেহায়া ও বেহুদা কর্মের উপর পর্দা ফেলা যায়। আর আনাস ইবনে মালিক ব্যাপারটা কিভাবে জানতে পারলেন যে নবী (সাঃ) এক ঘন্টার মধ্যেই ১১ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস সেরে নিতেন। এ কথা কি স্বয়ং রাসুল (সাঃ) আনাসকে বলেছিলেন অথবা আনাস কি দেখে বেড়াতেন। এই মিথ্যা কথা হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করি। আর আনাস এ কথাটি কোথা থেকে জানতে পারলেন যে, রাসুল (সাঃ)-কে ৩০ জন মহিলার সাথে সহবাস করার শক্তি দান করা হয়েছিল?

যে নবী তাঁর সমস্ত জীবন, জিহাদ, ইবাদাত-বান্দেগী এবং উম্মতের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সরাসরি রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

জাহেল ব্যক্তিবর্গ এ ধরণের রেওয়ায়েত বয়ান করার সময় কেমন ধারণা পোষণ করতো। তারা তাদের নোংরা বিবেক ও কামবাসনার দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক সহবাস করাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করতো। সেই কারণে তারা তাদের সমবয়সীদের সামনে গর্ব করতো। আসলে উক্ত রেওয়ায়েতটি নবী (সাঃ)-এর চরিত্রকে কলংকিত কার জন্য রচনা করা হযেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা এ রেওয়ায়েতের উপর ভর করে শাসকগোষ্ঠী ও খলিফাগণের এ ধরনের বেহায়াপনার উপর পর্দা ফেলে দিতে চায়। মহিলা ও গৃহ-পরিচারিকাদের উপর তাদের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর এ হাদীসের রাবী আনাস ইবনে মালিক - নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়শার (রাঃ) সামনে বলবেন কি, কারণ আয়শা (রাঃ) বলেন যে, **'নবীও (সাঃ) সহবাসের সময় অন্যান্য পুরুষের মতই একজন পুরুষ'**।

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তাহারাত'**-এ আবু যোবায়ের হতে এবং তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে আর তিনি উম্মে কুলসুম হতে এবং তিনি নবীর স্ত্রী আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন, *"এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুল (সাঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করল যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দূর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে কি উভযের প্রতিই গোসল ওযাজিব হবে?* তখন আয়শা রাসুলের নিকট বসা ছিলেন। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, *"আমি আর এ (আয়শা) এরকমই করে থাকি তারপর গোসল করে নেই"*।

উক্ত কথা দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, (মায়াজাল্লাহ্) নবী (সাঃ) মদ খেতেন। সম্ভবতঃ নাবীজ দ্বারা অপরিচিত নাবিজকে বুঝাতে চেয়েছে। কারণ আরবদের অভ্যাস ছিল যে তারা পানির গন্ধকে দূর করার জন্য তাতে খেজুর ছেড়ে দিত। সুতরাং সেটি সত্যিকারের নাবিজ নয়। বিভিন্ন জনের ধারণা হচ্ছে যে সেটার ব্যবহার জায়েয আছে।

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল আশরাবাহ্'**-তে উক্ত রেওয়ায়েতটি লিখেছেন। এখান থেকেই মদ পান করা শুরু হয় এবং উক্ত ঘটনা থেকেই শাসকগণ হুকুম জারি করে দেন যে যতক্ষণ সেটা নেশা সৃষ্টি করতে না পারে ততক্ষণ হালাল হবে।

আরো কিছু বিষয়-আশয় যাতে বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা জড়িত ছিল ঃ

রাসুল (সাঃ) আর ইবতিযাল (হীনতা/নীচতা) ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল হজ্জ'**-এর **'আজ জিয়ারাতু ইয়াওমুল খর'** অধ্যায়ে আয়শা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েতে করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমরা নবীর (সাঃ) সাথে হজ্জ করলাম এবং কুরবানীর দিন সাফিয়ার হায়েজ শুরু হয়ে যায় এবং নবী (সাঃ) তার সাথে সেই আমল করতে চাইলেন যা পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে, তখন আমি বল্লাম, ***'ইয়া রাসুলুল্লাহ্, সে হায়েজ অবস্থায় আছে'***।

বড় আশ্চর্য লাগে সেই নবীর প্রতি যে, তিনি এমন একটি পবিত্র স্থানে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইলেন এবং অপর একজন স্ত্রী যখন তা বুঝতে পারলেন তখন তিনি নবীকে বল্লেন যে, ***'সে হায়েজ অবস্থায় আছে'*** অথচ নবী (সাঃ) বিষয়টি নিজে জানতেন না!

রাসুল (সাঃ) আর লজ্জা ঃ

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ফাযায়েল'**-এর **'ফাযায়েলে উসমান ইবনে আফফান'** অধ্যায়ে নবীর স্ত্রী আয়শা এবং উসমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ আবু বকর রাসুল (সাঃ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন, তখন নবী (সাঃ) আয়শার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি আবু বকরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন এবং সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। আবু বকরের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর তিনি বিদায় নিলেন। উসমান বলেন যে কিছুক্ষণ পর উমর এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসুল (সাঃ) তাকেও প্রবেশের অনুমতি দিলে তিনিও প্রবেশ করেন, কিন্তু তিনি (সাঃ) শুয়েই থাকলেন। প্রয়োজন মিটে গেলে উমরও বিদায় নিলেন। আবার উসমান বলেন যে, তারপর আমি অনুমতি

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *'তুমি কি দেখতে চাও'?* আমি বল্লাম, *'হ্যাঁ'*। তখন তিনি তাঁর পিঠের উপর আমাকে এমনভাবে তুলে নিলেন যেন তার গালের উপর আমার গাল ছিল। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, *'হে বনী আরফদা (হাবশিগন), তোমরা তোমাদের নাচ জারি রাখ'*। এক সময় আয়েশা বলেন যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, *'ব্যাস এতটুকুই যথেষ্ট'*। আমি বল্লাম, *'হ্যাঁ'*। তিনি (সাঃ) বল্লেন, *'যাও'*।

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুন নিকাহ'**-এ আয়শা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সাঃ)-কে দেখলাম যে তিনি চাদরের মধ্যে আমাকে লুকাচ্ছিলেন এবং আমি ঐ হাবশীদের তামাশা দেখছিলাম যারা মসজিদের মধ্যে হট্টোগোল করছিল। এক সময় আমারও দেখতে মন চাইল, এমন কি আমার ইচ্ছা হতে লাগল যেন নাচতে শুরু করে দেই।

অনুরূপভাবে মুসলিম তার সহীহ্র **'কিতাবুস সালাতিল ঈদাইন'**-এর **'আর রুখসাতু ফিল্লায়িব'** অধ্যায়ে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন হাবশীগণ নাচতে নাচতে মসজিদে আসলে নবী (সাঃ) আমাকে ডেকে নিলেন, অতঃপর আমি তাঁর ঘাড়ের উপর মাথা রেখে তামাশা দেখাতে এমনভাবে নিমগ্ন হলাম যে তাদের দিক থেকে চোখই ফিরাতে পারছিলাম না।

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুন নিকাহ'**-এ আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ নবী (সাঃ) দেখলেন যে মহিলা ও বাচ্চারা বিয়েতে খেলাধূলা করছে। তখন তিনি (সাঃ) আগ্রসহকারে দেখতে লাগলেন এবং বল্লেন, *'তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়'*। বুখারীর ব্যাখ্যাকারী বলেন যে, আগ্রহ সহকারে দাঁড়ানোর অর্থ হল যে তিনি (সাঃ) তাদের খেলাধূলা থেকে আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

নেশার দ্রব্য এবং মদ পান করার অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঔষধের নাম দিয়ে পান করার কিছু নমুনা ঃ

রাসুল (সাঃ) নাবীজ পান করতেন (মায়াজাল্লাহ্)ঃ

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুন নিকাহ'**-এ দুই স্থানে আবু হাযিম হতে এবং তিনি সহল হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ আবু আসীদ সা'দী যখন বিয়ে করলেন তখন নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের জন্য খাবার রান্না করালেন না এবং নিজেও তাঁদের নিকট আসলেন না। তবে আসীদের মা রাতে কিছু খেজুর পাথরের ছোট্ট পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিল সেগুলিই নবী (সাঃ) এবং তাদের সামনে উপস্থিত করে দিল। নবী (সাঃ) যখন পান করে নিলেন তখন তোহফা স্বরূপ উক্ত খেজুরের পানি দ্বারা সবাইকে তৃপ্ত করা হল।

লজ্জা স্থান দেখতে পারিনি।[১] তাঁর স্ত্রীগণ যারা তাঁর সাথে হামামে একত্র গোসল করতেন যখন তাঁদের কাছেও তিনি তাঁর লজ্জা স্থানকে লুকিয়ে রাখতেন এবং তাঁদের পক্ষেও কখনো দেখা সম্ভবপর হয়নি তখন সাধারণ সাহাবাদের পক্ষে কিভাবে তাঁকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা সম্ভব হবে?

হ্যাঁ, এ সমস্ত মনগড়া হাদীসগুলি উমাইয়াদের কর্তৃক রচিত হয়েছে। যারা কোন কিছুরই পরোওয়া করতো না। তাদের খলিফা যখন কোন কবির গজল শুনে বে-সামাল হয়ে যেত তখন দাড়িয়ে পড়তো এবং কবির লজ্জা স্থান খুলে তার লিঙ্গতে চুম্বন করতো। সুতরাং তাদের পক্ষে নবী (সাঃ)-কে উলঙ্গ করা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আর এমন নাফসানী রোগ, সমগ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল, আর আজ এই বেহায়াপনাকে অতি মামুলি বিষয় জ্ঞান করা হচ্ছে। তাদের কাছে চরিত্র ও লজ্জা শরমের কোন গুরুত্বই নেই। সব জায়গাতেই উলঙ্গপনার আড্ডা খানা ও সেন্টার খুলে রাখা হয়েছে, যেখানে পুরুষ ও নারী একত্রে এই বেহায়াপনার শ্লোগান দিচ্ছে যে, '***হে পরোওয়ারদিগার! তুমি যেভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলে আমরা সেই হালতেই আছি***।

শরীয়াতের আহ্‌কাম ও দ্বীনের সাথে খেল-তামাশা করার কিছু নমুনা ঃ

রসুল (সাঃ) দ্বারা নামাজে ভুল হয় ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল আদব**'-এর '**মা ইয়াজুযা মিন যিকরুন্নাস**' অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযেউস সালাত**'-এর '**আস সহু ফিস সালাতে ওয়াস সুজুদে লাহু**' অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বল্লেন ঃ নবী (সাঃ) আমাদের সাথে জোহরের নামাজ দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর মসজিদের সামনে রক্ষিত কাঠের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, লোকজনের মাঝে তখন আবু বকর এবং উমরও উপস্থিত ছিলেন, তারা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য দৌড়ে লোকজনের মধ্য হতে বেরিয়ে গেলেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে নামাজে সহু (ভুল) হয়েগেছে। লোকজনের মাঝে আরো একজন ছিল যাকে রাসুল (সাঃ) '*জুল ইয়াদিন*' বলে ডাকতেন, সে বলে উঠল, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি কি নামাজ ভুলে গিয়েছিলেন অথবা নামাজ কি কসর পড়েছেন*'? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*নাহ্, আমি ভুলে যাই নি আর না কসর পড়েছি*"। তখন লোকজন আবারো বল্ল, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি নামাজ ভুলে গিয়েছেন*"। অতঃপর রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*জুল ইয়াদিন সত্য বলেছে*"। অতঃপর রাসুল (সাঃ) আরো দু'রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে সিজদার সমান অথবা তার

---

১ **সুনানে ইবনে মাজা**, ১ম খন্ড, ৬১৯ পৃঃ।

চাইলাম, তখন তিনি (সাঃ) উঠে বসলেন এবং আয়শাকে বল্লেন, "***তুমিও তোমার কাপড় চোপড় ঠিক করে নাও***"। যখন আমারও প্রয়োজন মিটে গেল আমিও বিদায় নিলাম। তখন আয়শা বল্লেন, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্, আমি আবু বকর ও উমরের আগমনের সময় আপনাকে এতো আয়োজন করতে দেখিনি যতটা আপনি উসমানের ক্ষেত্রে করলেন*"। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*উসমান হলেন অত্যান্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি, সুতরাং আমার ভয় হচ্ছিল যে আমি যদি ঐভাবে শুয়ে থেকে অনুমতি দেই তাহলে তিনি ফেরৎ না চলে যান*"।

এ আবার কেমন নবী যে তার সাহাবীরা দেখা করতে আসবে অথচ তিনি স্ত্রীর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন, অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী সাধারণ কাপড় পরিধান করে পাশে বসে থাকেন। স্ত্রীর পিতা ও চাচাতুল্য অপর সাহাবী দেখা করতে আসে তবুও তিনি একই হালতে শুয়ে থাকেন। অথচ উসমান যখন আসলেন তখন তিনি উঠে বসেন এবং স্ত্রীকে বলেন যে '***তোমার কাপড় চোপড় ঠিক ঠাক করে বস***'।

রাসুল (সাঃ) আর উলঙ্গপনা ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুস সালাত**'-এর '**কারাহেতুত তা'রা ফিস সালাত**' অধ্যায়ে এবং অনুরূপ ভাবে মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল হায়েজ**'-এর '**আল-এ'তেনাও বেহিফজুল আওরাহ্**' অধ্যায়ে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ রাসুল (সাঃ) আমাদের সঙ্গে ক্বাবার জন্য পাথর বয়ে আনছিলেন তখন তিনি লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর চাচা আব্বাস বল্লেন, "*ভাতিজা লুঙ্গী খুলে ফেল এবং সেটা ঘাড়ের উপর রেখে তার উপর পাথর রাখ*"। সুতরাং তিনি (সাঃ) লুঙ্গী খুলে ঘাড়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন, তখন দেখা গেল যে তিনি উলঙ্গ আছেন।

সুধী পাঠক মন্ডলী, সেই রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি বেহুদা অপবাদকে লক্ষ্য করুন, যার লজ্জা-শরমকে ঈমানের স্তম্ভ বলা হয়েছে। যিনি একজন কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আহলে সুন্নাতগণ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হন নি বরং এমন মনগড়া বর্ণনা দ্বারা তাঁর লজ্জা স্থানকেউ উলঙ্গ করার অপবাদ দিয়েছেন! (মায়াজাল্লাহ্) **তাদের নিকট কি রাসুল (সাঃ) এতোই অবুঝ ছিলেন যে তিনি তাঁর চাচার কথামত নিজের দেহকে উলঙ্গ করে ফেল্লেন? (মায়াজাল্লাহ্)**

ঐ সমস্ত শয়তান ও ইবলিশের কথা-বার্তা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুক, যারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-কে অপবাদ দিয়েছে। তিনি হচ্ছেন সেই রাসুল যার লজ্জা স্থানকে কখনো তাঁর স্ত্রীগণও দেখতে পান নি। যেহেতু শরীয়াত তাঁকে এ বিষয়ে অনুমতি দেয় নি। এতদসত্বেও আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি কখনো রাসুল (সাঃ)-এর

খাচ্ছো'। তখন আবু মূসা বল্লেন, *'চলে এসো, আমরা এটি রাসুলকেও খেতে দেখেছি'*। লোকটি বল্ল, *'আমি কসম খেয়েছি, আমি ওটা খাব না'*। আবু মূসা বল্লেন, তোমাকে কসমের বিষয়ে বলি যে, নবীর (সাঃ) নিকট একজন আশয়ারী হাজির হলো, আমরা নবীকে অনুরোধ করলাম যে আমাদের নিয়ে চলুন, তখন তিনি তাকে নিয়ে যেতে অস্বীকার করলেন। আমরা আবারও দাবী জানালে তিনি কসম খেয়ে বল্লেন যে, *"আমি নিয়ে যাব না"*। অতঃপর আমাদেরকে পাঁচ ফারবাহ্ উষ্ট্রী দেয়ার হুকুম দিলেন। আমরা যখন তা গ্রহণ করে নিলাম তখন বল্লাম যে, *'নবী (সাঃ) কসমের বিষয়ে অবহেলা করেছেন, এরপর আমরা আর কখনোই সফলকাম হতে পারব না'*। অতঃপর আমি এসে বল্লাম, *'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কসম খেয়েছিলেন যে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন না অথচ এখন নিয়ে যাচ্ছেন'*। তিনি (সাঃ) বল্লেন, *"হ্যাঁ, আমি এমন কসমই খেয়ে থাকি যাতে কল্যান থাকে এবং আমি তাই করেছি যাতে কল্যান ছিল"*।

সেই রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, যাঁকে আল্লাহ্ পাক এজন্য পাঠিয়ে ছিলেন যেন তিনি মানুষকে জানিয়ে দেন যে, ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা কর, ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দাও এবং কসম ভঙ্গ কর না। তবে হ্যাঁ কাফ্ফারা দিয়ে ভঙ্গ করতে পার। কিন্তু তিনি লোকজনকে যে নির্দেশ দিচ্ছেন সেটা নিজেই পালন করেন না। অথচ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ **"তোমদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন। আতঃপর ইহার কাফ্ফারা দশজন দারিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যাহা তোমারা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যাহার সামর্থ্য নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ বিশাদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"**।[১]

অন্যত্র বলা হচ্ছেঃ **"আর নিজেদের কসমকে স্থায়ীত্ব দানের পর ভঙ্গ কর না"**। কিন্তু আফসোস! তারা রাসুল (সাঃ)-এর কোন ফজিলাত ও ভদ্রতাকেই বাদ দেন নি।

কসমের কাফ্ফারা হিসাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) ৪০জন গোলাম মুক্ত করেনঃ

হায় আফসোস! কোথায় আছেন রাসুল? (আপনারা লক্ষ্য করুন যে) তাঁর স্ত্রী আয়শা (রাঃ) একটি কসমের কাফ্ফারা হিসাবে চল্লিশজন গোলামকে মুক্ত করে দিলেন। তাহলে আয়শা (রাঃ) কি রাসুল (সাঃ)-এর তুলনায় আল্লাহ্কে বেশী ভয় করতেন?[২]

---

১ সূরা ঃ মায়িদা - ৮৯

২ সহীহ্ বুখারী, খঃ ৭, পৃঃ ৮৯।

চেয়ে কিছু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে আবার সিজদায় গেলেন এবং অনুরূপভাবে সিজদা করলেন তারপর মাথা তুলে তাকবীর দিলেন।[১]

বড়ই আফসোস যে, নবীর (সাঃ) দ্বারা নামাজ ভুল হয় এবং তিনি বুঝতেও পারেন নি যে তিনি কত রাকাত নামাজ পড়েছেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, "*আপনি কি কসর পড়েছেন*"? তখন তিনি বল্লেন যে, "*নাহ! আমি নামাজ ভুলিনি আর না কসর পড়েছি*"। আহলে সুন্নাতগণ খলিফাদের বাচানোর জন্য রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি এই অপবাদ দিয়েছেন। কারণ তারা প্রায়ই নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ পড়াতো, তখন বুঝতে পারতো না যে সে কত রাকাত নামাজ পড়িয়েছে। আর তাদের আমীরের এই ঘটনাটি তো ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বহুল আলোচিত যে, সকালে চার রাকাত নামাজ পড়ানোর পর মুক্তাদীদের প্রশ্ন করে যে, "***আরো পড়াবো নাকি এতটুকুই যথেষ্ট***"।

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল আযান**'-এর '**ইযা কামার রুজুলু আঁই ইয়াসারাল ইমাম**' অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে ঃ আমি মাইমুনার কাছে ছিলাম এবং সেই রাতে রাসুলও (সাঃ) মাইমুনার ঘরে ছিলেন। তিনি (সাঃ) ওজু করে নামাজ পড়তে লাগলেন আমিও তাঁর বামপার্শ্বে দাড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে ডান পার্শ্বে করে দিলেন। অতঃপর তের রাকাত নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং নাক ডাকা শুরু করে দিলেন, তিনি যখনই ঘুমাতেন তখন তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন আযান দিল তখন বিনা ওজুতেই নামাজ পড়লেন। আমরু বলেন আমি ঘটনাটি যখন বাকীরকে বল্লাম তখন তিনি বল্লেন যে, '*কারীবও আমাকে এভাবেই বলেছে*'।

রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি এমন মিথ্যা হাদীসের নিসবাত করে তারা বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয়দের আমীর-ওমরাহ ও রাজা-বাদশাহদের ওজু ও নামাজের ত্রুটিকে হালকা করতে চেয়েছে। এমনকি আমাদের মাঝে এ উদাহরণটি বিখ্যাত হয়ে গেল যে, '**সালাতুল ক্বিয়াদ ফিল জুমুআতে ওয়াল আয়িইয়াদ**' তথা আমীর ও হাকিমগণ জুমআ ও ঈদের নামাজ পড়ে থাকেন।

রাসুল (সাঃ) আর ওয়াদা ভঙ্গ ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল মাগাজী**'-র '**ওমান ও বাহরাইনের**' ঘটনায় আবু কোলাবা হতে ও তিনি যোহদম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন যে ঃ আবু মূসা যখন আসলেন তখন শহরের লোকজন তাকে সম্মান প্রদর্শন করল, আমরা তার নিকটবর্তী হয়ে বসলাম, তখন তিনি মোরগা মোসাল্লাম খাচ্ছিলেন। ঐ জায়গায় পূর্ব হতেই একজন বসা ছিল। আবু মূসা তাকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করলে সে বল্ল, '*আমি দেখছি যে তুমি নোংরা*

---

১ **সহীহ্ বুখারী** ও **সহীহ্ মুসলিম**, কিতাব "**সুঁসু ওয়াল মারজান**" অধ্যায়, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃঃ।

দিক নির্দেশনা দিচ্ছে তা হল এই যে, এটা হয়তো আয়শারই (রাঃ) ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল অন্যথায় আয়শা (রাঃ) কেমন করে ৪০টি গোলাম অথবা তাদের সমমান মূল্যের মালিক হয়েছেন। এ কোন ছোট খাটো ব্যাপার নয় এবং ইতিহাসে কোথাও বর্ণনা নাই যে রাসুল (সাঃ) কখনো এতো পরিমানে গোলাম মুক্ত করেছেন।

আহলে সুন্নাতগণ কোন বেহুদা ও খারাপ দিককেই বাদ দেন নি এবং সব কিছুকেই রাসুল (সাঃ)-এর দিকে নিসবাত (ইংগিত) করেছেন। যার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তারা যেন তাদের আমীর ও হাকিমদের সমালোচনার উর্ধ্বে রাখতে পারেন। কেউ আপত্তি করলে যেন বলা যেতে পারে যে **'এমনটি স্বয়ং রাসুলই করেছেন তাহলে তারা করলে দোষ কোথায়'**। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুক, তারা অতি জঘন্য কাজ করেছে। শরীয়াতের আহ্কাম সমূহের অবমাননা করাই তাদের চেষ্টা ও তদবীর ছিল।

রাসুল (সাঃ) আল্লাহ্র আহ্কামের মধ্যে নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন করতেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুস সাওম'**-এর **'ইগতিসালুস সিয়াম'** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্র **'কিতাবুস সিয়াম'**-এর **'তাগলিজুত তাহরীমুলজামায়া ফি নাহারে রমযানু আলাস সায়েমু ওয়া অজুবুল কাফ্ফারাতুল কুবরা ফিহি ওয়া ইন্নাহা তাজিবু আলাল মাওসিরে ওয়াল মা'সেরে'** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমরা রাসুল (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম এমন সময় একটি লোক তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বল্ল, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম*'। রাসুল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, '*তোমার কি হয়েছে*'। লোকটি বল্ল, '*আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি অথচ আমি রোজা ছিলাম*'। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, '*তুমি কি গোলাম মুক্ত করতে পারবে*'? সে বল্ল, '*না*'। তখন নবী (সাঃ) বল্লেন, '*তুমি কি একাধারে দু'মাস রোজা রাখতে পররবে*'? সে বল্ল, '*না*'। তিনি (সাঃ) বল্লেন, '*তুমি কি ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে*'? সে বল্ল, '*না*'। রাবী বলেন যে ঐ ব্যক্তি কিছুক্ষণ নবীর কাছে থাকল, আমরাও বসেছিলাম, তখন নবী (সাঃ) তাকে খেজুরের রস দিলেন যাতে খেজুরও ছিল, তিনি বল্লেন, আগন্তুক লোকটি কোথায়'? সে বল্ল, '*এই তো আমি আছি*'। নবী (সাঃ) বল্লেন, '*তুমি এটাকে সদকা করে দাও*'। সে বল্ল, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমার চেয়েও কি বড় কোন ফকির আছে, আল্লাহ্র কসম কোন পরিবার আমার পরিবারের চেয়ে অধিক গরীব নয়*'। তার কথা শুনে নবীর (সাঃ) হাসি পেল, এমন কি তাঁর দন্ত মোবারকও দেখা গেল। অতঃপর তিনি (সাঃ) বল্লেন, '*যাও নিজের গৃহবাসীদের খাইয়ে দাও*'।

আল্লাহ্র আহ্কাম ও তার সীমালংঘনের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। আল্লাহ্ তার সামর্থ বান্দাদের জন্য গোলাম মুক্ত করা, যদি গোলাম মুক্ত না করতে পারে তাহলে ৬০ জন

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল আদব'**-এর **'আলজাহরা'** অধ্যায়ে এবং রাসুল (সাঃ)-এর সেই কথা যে, *"কোন মুমিনের জন্য অপর একজন মুমিনের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েজ নয়"* প্রসংগে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আয়শা (রাঃ) বয়ান করেছেন যে ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের সেই বিষয় বা দান সম্পর্কে যা আয়শা তাকে দান করেছিলেন বলেন যে, '*আমি এর থেকে খরচ করার জন্য আয়শাকে বাধা দিব*'। তখন আয়েশা বল্লেন, '*কথাটি কি সে বলেছে*'? লোকেরা বল্ল, '*হ্যাঁ*'। আয়শা বল্লেন, '*আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে যুবায়েরের সাথে কোন দিনও কথা বলব না*'। এভাবেই যখন দীর্ঘ দিন কথা বন্ধ থাকে, তখন ইবনে যুবায়ের আয়শার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আয়শা বল্লেন, '*কষ্মিনকালেও নয়, খোদার কসম আমি কখনো তোমাকে ক্ষমা করব না, আর না নিজের কসম ভঙ্গ করব*'। ঐভাবে যখন আরো কিছু দিন গত হয়ে গেল, তখন ইবনে যোবায়ের, মাসুর ইবনে মাখরামা ও আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুসের সাথে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করলেন। ঐ দুই ব্যক্তি 'যাহরা' গোত্রভূক্ত ছিলেন এবং বল্লেন, '*খোদার কসম দিয়ে বলছি, তোমরা আমাকে আয়শার কাছে পৌঁছে দাও, কারণ তার জন্য জায়েজ হচ্ছে না যে তিনি আমার সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখবেন*'। উক্ত দু'জন ইবনে যোবায়েরকে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন এবং আয়শাকে সালাম করার পর ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন। আয়শা বল্লেন, '*চলে এসো*'। তারা বল্লেন, '*আমরা কি সবাই চলে আসবো*'? আয়শা বল্লেন, '*হ্যাঁ, সবাই চলে এসো*'। আয়শা জানতেন না যে তাদের সাথে ইবনে যুবায়েরও আছেন।

সুতরাং তারা যখন প্রবেশ করলেন তখন তাদের পিছু নিয়ে ইবনে যোবায়েরও প্রবেশ করেন। তাকে দেখে আয়শা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তখন যোবায়ের কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করতে লাগলেন, মাসুর ও আব্দুর রহমানও ততক্ষন অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন যতক্ষন না আয়শা তাদের কথা মেনে নিলেন। ঐ দু'জন বল্লেন, *'আপনি ভাল করেই জানেন যে নবী (সাঃ) তিন দিনের বেশি কথা-বার্তা বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন'*। তারা আয়শাকে অনেক বুঝালেন ও চাপ সৃষ্টি করলেন, অতঃপর আয়শা তাদের কথা মেনে নিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, *'আমি তার সাথে কথা না বলার জন্য কসম করেছিলাম, আর কসম খুবই সাংঘাতিক বিষয় হয়ে থাকে'*। কিন্তু তারা সেখান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়ল না যতক্ষণ না আয়শা ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা-বার্তা শুরু করলেন। অতঃপর আয়শা নিজের কসম ভঙ্গ করার জন্য কাফ্‌ফারা হিসাবে চল্লিশ জন গোলামকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং নিজের কসমকে স্মরণ করে এতো কাঁদতেন যে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

যদিও আয়শার (রাঃ) কসমটি সত্য ছিল না, কারণ নবী (সাঃ) একজন মুসলমানকে অপর একজন মুসলমানের সাথে কথা-বার্তা তিন দিনের অধিক বন্ধ রাখাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু আয়শা (রাঃ) সেটার উপর আমল করেন নি এবং বিভিন্ন কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে ৪০ জন গোলামকে মুক্ত করেছেন। এ কথাটি আমাদের একটি বিষয়ে

কাঠিন্য নাই। আর রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **"সহজ বিষয়কে গ্রহণ কর, কঠিন বিষয়াবলী থেকে বাঁচ"**।

যদিও কথাটি সত্য, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অসত্য বা বাতিল। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য সহজ ও সুবিধা রেখেছেন এবং কোন অসুবিধায় ফেলেন নি। কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাতের মাধ্যমে তাঁর আহ্‌কাম সমূহ আমাদের নিকটে পৌছে দিয়েছেন এবং সময় সাপেক্ষে আমাদেরকে ছাড়ও দিয়েছেন -যেমন পানির অপ্রাপ্তিতা বা অসুস্থতার কারনে 'ওজুর' পরিবর্তে **'তায়াম্মুম'**-এর সুবিধা দান করেছেন। অনুরূপভাবে অবস্থার প্রয়োজনে বসে নামাজ পড়ার ছাড় দিয়েছেন এবং সফর অবস্থায় রোজা না রাখার ছাড় এবং নামাজে কসর করার অনুমতি দিয়েছেন। এসবগুলিই সত্য। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম সমূহের বিরোধিতা করি -যেমন ওজু ও তায়াম্মুমের ধারাবাহিকতাকে পরিবর্তন করে ফেলি। হস্তদ্বয় চেহারার পূর্বেই ধুয়ে ফেলি বা মাথার আগে পায়ের মাসেহ করে ফেলি।

কিন্তু মনগড়া হাদীস ও ঘটনাবলী রচনাকারীদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, রাসুল (সাঃ)-কে এতো নীচে নামিয়ে দাও যাতে আমাদের পথ পরিস্কার হয়ে যায়। আজও অনেকের কাছে যদি কোন ফিকাহ্‌গত মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করবেন তখন তারা বলবে যে, ভাই আমার কোন কিছুতে অসুবিধা নাই, আসল উদ্দেশ্য নামাজ পড়া, যেমন মন চায় তেমন পড় কোন সমস্যা নাই।

তাজ্জবের ব্যাপার তো এই যে, বুখারী যে পৃষ্ঠাতে নবীর (সাঃ) এই কথা **"আফআলু, আফআলু ওয়ালা হারাজ"** অর্থাৎ "করে যাও করে যাও কোন অসুবিধা নাই" উল্লেখ করেছেন, সেখানেই একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা প্রমান হয় যে, রাসুল (সাঃ) সমস্ত সীমা লংঘন করে অনেক দূর এগিয়েছিলেন। আবু হুরায়রার সূত্র দিয়ে লিখেছেন যে ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ পড়ল। রাসুল (সাঃ) মসজিদের এক কোনায় বসেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি নামাজ শেষ করে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এসে সালাম করল। নবী (সাঃ) তাকে বল্লেন, *"আবার নামাজ পড়, তুমি নামাজ পড়নি"*। লোকটি ফেরৎ গিয়ে নামাজ আদায় করল এবং ফিরে এসে রাসুল (সাঃ)-কে সালাম করল। রাসুল (সাঃ) আবার বল্লেন, *"তুমি ঠিকমত নামাজ পড়নি"*। এমনকি লোকটি তিনবার নামাজ পড়ল আর প্রত্যেক বারই রাসুল (সাঃ) বল্লেন যে আবার নামাজ পড়, তুমি নামাজ পড়নি। অতঃপর লোকটি রাসুল (সাঃ)-কে বল্ল, *"ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমাকে নামাজ শিখিয়ে দিন"*। তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, *"রুকু ও সিজদাকে ধীরস্থীরভাবে কর। রুকুর পরে সোজা দাড়িয়ে যাও তারপর ধীরস্থীরভাবে সাথে সিজদা কর এবং সিজদার পর ধীরস্থীরভাবে বস, তারপর ধীরস্থীরতার সাথে দ্বিতীয় সিজদা কর, তারপর সোজা দাড়িয়ে যাও, এভাবে সম্পূর্ণ নামাজ পড়"*।

মিসকিন খাওয়ানো, আর যারা নিস্বঃতার কারণে মিসকিনও খাওয়াতে পারবে না তাদের জন্য দু'মাস পর্যন্ত রোজা ওয়াজিব করেছেন। এ ব্যবস্থা ঐ সমস্ত গরীব ব্যক্তিদের জন্য কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন যারা গোলাম মুক্ত বা মিসকিন খাওয়ানোর মত সমর্থ রাখেনা। কিন্তু উক্ত রেওয়ায়েত তো আল্লাহ্র ঐ সীমাকে লংঘন করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আমাদের জন্য উক্ত অপরাধী ব্যক্তির এ কথাটাই যথেষ্ট যে, রাসুল (সাঃ) এমনভাবে হাসি দিলেন যে তাঁর পবিত্র দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছিল। তাই তিনি আল্লাহ্র হুকুমকে সহজ করে দিলেন এবং সাদকাকে **'মোবাহ'** করে দিলেন।

আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি এর চেয়েও কি বড় অপবাদ দেয়া যেতে পারে যে, পাপিকে তার পাপের সাজা না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। এদ্বারা তো এর চেয়েও অধিক পাপি তথা ফাসেক ও ভ্রষ্ট লোকজনকে আরো উৎসাহ প্রদান করা হবে।

এধরণেরই রেওয়ায়েতগুলির কারণে আজ আল্লাহ্র দ্বীন এবং তাঁর আহ্কাম সমূহ ছেলে খেলায় পরিনত হয়েছে। জেনাকারীরা তাদের অপকর্মের জন্য গর্ববোধ করছে। বিয়ে-শাদীর মাহফিলগুলোতে অশ্লীল গান-বাজনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে রমজান মাসের রোজা ভঙ্গকারীরা রোজাদারদের মুখ ভেংচী দিচ্ছে।

যেমনটি বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুল ঈমান ওয়ান্নুযুর'**-এর **'ইযা হানাসু নাসিয়ান'** অধ্যায়ে আতা হতে, আর তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে বল্ল, "*আমি রমি জুমরাতের পূর্বেই জিয়ারতের তাওয়াফর করে নিয়েছি*"। নবী (সাঃ) বল্লেন, "*তাতে কোন ক্ষতি নাই*"। অপর একজন বল্ল, "*আমি কুরবানীর পূর্বেই মাথা মুন্ডন করেছি*"। নবী (সাঃ) বল্লেন, "*তাতেও কোন ক্ষতি নাই*"। তৃতীয় একজন বল্ল, "*আমি রমি জুমরাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি*"। রাসুল (সাঃ) তাকে বল্লেন, "*তাতে কোন অসুবিধা নাই*"।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমরু ইবনে আস হতে রেওযায়েত করেছেন যে ঃ আমাদের মাঝে নবী (সাঃ) খোৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন দাড়িয়ে বল্ল, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ! অমুকের পূর্বে আমার এমন এমন ধারণা ছিল*"। তারপর আরো এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বল্ল, "*আমি উক্ত তিনটি বিষয়ের (মাথা মুন্ডন, কুরবানী, রমি জুমর) ব্যাপারে এমনই ধারণা পোষণ করতাম*"। নবী (সাঃ) বল্লেন, "*তাতে কোন অসুবিধা নাই। তিনটি বিষয়কেই একই দিনে আঞ্জাম দিতে হয়*"। সুতরাং তাদের মধ্যেকার যখন কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করল তখন তিনি বল্লেন, "*করতে থাক, করতে থাক, তাতে কোন অসুবিধা নেই*"।

বড় আশ্চর্যের বিষয় তো এটাই যে, আপনি যখন উক্ত রেওয়ায়েতটিকে বর্ণনা করবেন তখন তারা বুক ফুলিয়ে বলবে যে আল্লাহ্র দ্বীন অতি সহজ এতে কোন কষ্ট

শো'বা বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে যে নবী (সাঃ) বলেছেন যে, *"বিরোধ সৃষ্টি কর না, কারণ তোমাদের পূর্বের লোকেরা বিরোধ করেছিল বিধায় ধ্বংস হয়ে গেল"*।

সুবহান আল্লাহ্ (আপনারা একটু লক্ষ করুন যে) নবী (সাঃ) কিভাবে তাদের মাঝে বিরোধের জন্ম দিয়ে বল্লেন যে, *"তোমরা দু'জনই সঠিক"*। অথচ তাদেরকে একটি কেরাতের উপর জমায়েত করে দেন নি, যেন বিরোধ শিকড় শুদ্ধ উপড়ে যায়। তারপরও বলেন যে, *"বিরোধ কর না, তোমাদের পূর্বে যারা বিরোধ করেছিল তারা ধ্বংস হয়েগেছে"*। হে খোদার বান্দারা, খোদাকে ভয় কর। এটা কি মনগড়া কথা নয়? রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত কথার কারণে কি লোকজনার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয় নি? এটাইতো বিরোধের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অথচ রাসুল (সাঃ) হলেন সকল প্রকার বিরোধ মুক্ত, যেগুলিকে বিবেক ঘৃনা করে। তারা কি কোরআনে প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? যেখানে বলা হয়েছে ঃ **"ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত"**। [১]

মুসলিম উম্মাহের মাঝে কোরআন কেরাত করার বিরোধের চেয়েও কি বড় কোন বিরোধ আছে, যা কোরানের অর্থকেই বিভিন্ন তাফসীর ও তরজমার মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং ওযুর স্পষ্ট আয়াতটিই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হচ্ছে।

রাসুল (সাঃ) শিশু সুলভ আচরণ করেন এবং যে ব্যক্তি সাজা পাওয়ার যোগ্য নয় তাকেই সাজা দেন (মায়াজাল্লাহ্) ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল মাগাযী'**-র **'মারাজুন্নবী ওয়া ওয়াফাতুহু'** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুস সালাম'**-এ আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমি রোগের সময় জোরপূর্বক নবীকে (সাঃ) ঔষধ খাইয়ে দিলাম। তখন তিনি ইশারা করে বল্লেন যে, '*আমাকে ঔষধ দিও না*'। আমি বল্লাম, *"রুগী তো ঔষধ খেতে আপত্তি করেই থাকে"*। তিনি যখন একটু সুস্থ্য হলেন তখন বল্লেন, *"আমি কি নিষেধ করিনি যে আমাকে ঔষধ দিও না"*? আমি বল্লাম *"রুগী তো ঔষধ খেতে আপত্তি করেই থাকে"*। তিনি বল্লেন, *"ঘরের সবাই আমাকে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত ছিল, আর আমি নিরুপায় হয়ে দেখছিলাম। একমাত্র আব্বাস তোমাদের সঙ্গ দেয় নি"*।

বড় আশ্চর্য লাগে যে, রাসুল (সাঃ)-এর সেবা যত্নকারীগণ তাঁকে এমন শিশু তুল্য মনে করলেন, যে শিশু নাকি তিতা ঔষধ খাওয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় ও বিরক্ত হয় এবং ইশারায় ঔষধ খাওয়াতে নিষেধ করে। তবুও জোর-জবরদস্তী করে তাকে ঔষধ খাওয়ানো হয়। যখন একটু সুস্থ বোধ করলেন তখন বলেন ঃ *"আমি কি তোমাদের ঔষধ খাওয়াতে*

---

১ সূরা ঃ নিসা - ৮২

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তৌহিদ'**-এ উমর ইবনে খাত্তাব হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হিশ্‌শাম ইবনে হাকীমকে **'সূরা ফোরকান'** তেলাওয়াত করতে শুনেছি। তার কেরাতের প্রতি আমি যখন গভীর মনোযোগ দিলাম তখন বুঝতে পারলাম যে এমন অনেক হরফ আছে যার শিক্ষা রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে দেন নি। আমি চাইলাম যেন নামাজরত অবস্থাতেই তার কলার ধরে টান মারি কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধারন করলাম। তারপর নিজের চাদর দ্বারা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "*এই সুরাটি তোমাকে কে পড়িয়েছে*"? সে বল্ল, "*রাসুল (সাঃ)*"। আমি বল্লাম, "*তুমি মিথ্যা বলছ, আমাকে তো এভাবো শিক্ষা দেন নি যা তুমি পড়ছিলে*"। আমি তাকে নিয়ে রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বল্লাম, "*আমি একে সূরা ফোরকানের তেলাওয়াত করতে শুনেছি যা আপনি আমাকে শেখান নি*"। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*ছেড়ে দাও, হে হিশশাম! পড়*"। সুতরাং সে তাই তেলাওয়াত করল যা আমিও শুনে ছিলাম। অতঃপর রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*এ সুরাটি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে*"। তারপর রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*হে উমর! পড়*"। সুতরাং আমি তাই কেরাত করলাম যা আমাকে শিখিয়ে ছিলেন। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*এই সুরাটি এভাবেই নাযিল হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই কোরআন সাত হরফের উপর নাযিল হয়েছে, যেভাবে সম্ভব পড়*"।

উপরোক্ত বর্ণনার পর কি আর কোন সন্দেহ থাকে যে মনগড়া হাদীস রচনাকারীগণ রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্রতার উপর কলংক লেপন করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি কোরআনের বিষয়েও তাঁর ব্যক্তিত্বকে খাটো করেছেন যে, তিনি (সাঃ) সাহাবাদের বিভিন্ন কেরাত শিখিয়েছিলেন এবং যে যেভাবে কেরাত করলো তাকে সেভাবেই নাযিল হওয়ার কথা বলে দিলেন। কেরাতে যদি বিরোধ না থাকতো তাহলে উমর (রাঃ) হিশ্‌শামকে নামাজের মধ্য হতে টেনে নিয়ে আসার কথা ভাবতেন না এবং ধমকও দিতেন না। এর দ্বারা আহলে সুন্নাতগণের সেই ব্যবহারের কথা মনে পড়ে যায় যে, তারা সেই কেরাতকেই জায়েজ মনে করে যার জ্ঞান তাদের আছে। তাছাড়া অন্য কেরাত যার জ্ঞান তাদের নাই সেগুলি কারোর জন্যই জায়েজ মনে করে না। একদা আমি **"উযকুরু নে'মাতিয়াল্লাতি আনয়ামতু আলায়কুম"**-এর তেলাওয়াত করতেছিলাম। তাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি আমার উপর খেপে উঠল এবং চেঁচিয়ে বল্ল, "*তুমি যদি কেরাতের বিষয়ে মুর্খ থাক তাহলে কোরআনকে খন্ড বিখন্ড কর না*"। আমি বল্লাম, "*কিভাবে আমি কোরআনকে খন্ড বিখন্ড করলাম?*"। সে বল্ল, "**উযকুরু নে'মাতি**" *হবে*, না "**না'মাতি**"?

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ইস্তিকরায ওয়া আদাউদ্দীন'**-এর **'আল খুসুমাত'** অধ্যায়ে আব্দুল মালিক ইবনে মায়সারা হতে মুরসাল তরিকায় বর্ণনা করেছেন যে ঃ আমি এক ব্যক্তিকে নবীর (সাঃ) কেরাতের বিপরীত একটি আয়াত কেরাত করতে শুনলাম। তাকে ধরে নবীর (সাঃ) কাছে আনা হলে তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*তোমরা উভয়ই সঠিক*"। [১]

---

১ সহীহ্ বুখারী, খঃ ৩, পৃঃ ৮৮।

কিন্তু আফসোস! মিথ্যাবাদী, মনগড়া রচনাকারীগণ এ সবকিছুকে দূরে ঠেলে দিয়েছে এবং তাঁর (সাঃ) প্রতি এমন সব বাতিল ও অবমাননাকর কর্মকান্ড ও কথা-বার্তা আরোপ করেছে, যেগুলিকে না আকল গ্রহণ করে আর না বুদ্ধি-বিবেক। সত্য সন্ধানীদের অধিকার আছে, তারা রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে এ ধরণের উপস্থিত রেওয়ায়েত সমুহের জন্য (যার দ্বারা হাদীস গ্রন্থাবলী ভরপুর হয়ে আছে, বিশেষ করে ঐ সমস্ত যেগুলিকে সিহাহ্ সিত্তা বলা হয়ে থাকে -সেগুলিতে ঐ সমস্ত বেহুদা ও বাজে ঘটনা এবং কথা-বার্তা উল্লেখ আছে) প্রতিবাদ মুখর হবেন এবং সেগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন।

আমরা বেশী দূর যাব না। শুধু বুখারী ও মুসলিমের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি, যা আহলে সুন্নাতের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাবের পরেই সহীহ্-শুদ্ধ কিতাব বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাদেরই অবস্থা যখন এরকম যে তারা রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্রতাতে কলংক লেপন করেছে তখন অন্যান্যগুলির আলোচনা করে কি লাভ। এ হাদীসগুলি হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর সেই সমস্ত দুশমনদের কর্তৃক রচিত যারা মুয়াবিয়া ও বনী উমাইয়া শাসকদের খুবই ঘনিষ্ট ছিল। তারা এতো পরিমানে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে যে হাদীসের বইগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ঐ সমস্ত হাদীস রচনা দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর পবিত্রতা ও মান-মর্যাদাকে খাটো করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ একদিকে তো তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি নাযিলকৃত বিষয়াবলীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না। অন্য দিকে তারা তাদের নেতা ও সরদারদের সেই সমস্ত বদ আমল ও আচরণকে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, যেগুলিকে মুসলমানগণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত রেখেছেন। রাসুল (সাঃ) নবুয়াত প্রচারের প্রথম দিকেই তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের থেকে সাবধান থাকার জন্যে বলেও দিয়েছিলেন। তাদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাবারী লিখেছেন যে ঃ নবী (সাঃ) দেখলেন যে আবু সুফিয়ান গাধার উপর বসে আছে যার লাগাম (দড়ি) ধরে মুয়াবিয়া হাটছিল এবং ইয়াজিদ (আবু সুফিয়ানের ছেলে) পিছন থেকে গাধাকে তাড়াচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*আল্লাহ্ ঐ সোয়ারী এবং তার আগে আগে চলমান ব্যক্তির প্রতি লানত করুক*"। [১]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার **'মুসনাদে'** ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা একদা রাসুল (সাঃ)-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। দু'জন লোককে গান করতে দেখা গেল, গানের মধ্যেই তারা একে অপরের কথার জবাব দিচ্ছিল। নবী (সাঃ) বল্লেন, "*দেখ তো এরা কারা*"। লোকেরা বল্ল, "*এরা হল মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আস*"। তখন রাসুল (সাঃ) হাত উত্তোলন করে বল্লেন, "*হে পরোওয়ারদিগার! এদেরকে বরবাদ করে দাও এবং জাহান্নামে ফেলে দাও*"। [২] আবু যার গিফারী হতে বর্ণিত আছে যে তিনি মুয়াবিয়াকে বলেন ঃ 'তুমি যখন নবীর (সাঃ) সম্মুখ থেকে যাচ্ছিলে তখন আমি তাঁকে

---

১ **তারিখে তাবারী**, খন্ডঃ ১১, ৩৫৭ পৃঃ।

২ **মুসনাদে আহমদ**, খঃ ৪, পৃঃ ৪২১ এবং **তিবরানী**ও তার **'কাবির'**-এ লিখেছেন।

নিষেধ করি নি"? তখন সবাই ক্ষমা চেয়ে বল্ল, "*আমরা মনে করেছিলাম, রুগী তো সাধারণতঃ ঔষধ খেতে চায় না*"। তাই সবাই মিলে ঔষধ খাওয়ালেন আর নবী (সাঃ) অসহায় অবস্থায় দেখতেই থাকলেন যে, কেউ যদি তাঁকে এদের কবল থেকে মুক্ত করে। উপস্থিত সকলেই উক্ত কাজে শরীক ছিল একমাত্র তাঁর চাচা আব্বাস ব্যতীরেকে, কারণ তিনি বর্ণনা উপস্থিত ছিলেন না, ঔষধ খাওয়ানোর পরপরই তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন নি। রাসুল (সাঃ) ঐ লোকগুলি সম্পর্কে কি বলেছেন তাও তিনি বর্ণনা করেন নি। (বিষয়টি অজ্ঞাতই থেকে গেল যে) এই ঔষধ খাওয়ানোর পর্বটি পুরুষদের দ্বারা হয়েছিল না কি মহিলাদের দ্বারা এবং এরপর আরো কিছু ঘটেছিল কি না?

রাসুল (সাঃ) কোরআনের কিছু কিছু আয়াতকে শেষ করে দিয়েছেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্র '**কিতাবুল ফাযায়েলুল কোরআন**'-এর '**নিসইয়ানুল কোরআন**' অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্র '**কিতাবুস সালাতুল মুসাফেরীন ওয়া কাসারুহা**' অধ্যায়ে ওসামা হতে এবং তিনি হিশ্শাম ইবনে উরওয়াহ হতে এবং তিনি তার পিতা এবং তিনি আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি সূরা রাতের বেলায় তেলাওয়াত করতে শুনে বল্লেন, "***খোদা তার প্রতি রহম করুক, সে আমাকে একটি আয়াত মনে করিয়ে দিল যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম***"।

অনুরূপ বুখারী অন্য একটি বর্ণনা আলী ইবনে মাসহার হতে এবং তিনি হিশ্শাম হতে এবং তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ নবী (সাঃ) রাতের বেলায় মসজিদে কাউকে কেরাত করতে শুনে বল্লেন, "*খোদা তার প্রতি রহম করুক, সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিল যেগুলিকে আমি অমুক অমুক সুরার সাথে মিশিয়ে ফেলেছিলাম*"।

সূধী পাঠকমন্ডলী! লক্ষ্য করুন। ইনিই হলেন সেই নবী, যাকে কোরআন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল আর এই কোরআনই হচ্ছে তাঁর চিরস্থায়ী মো'জেযা। সেই নবী যার প্রতি ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়ার পূর্বেই একত্র কোরআন নাযিল হয়েছিল এবং তার হেফাজতও তিনি করতেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ "**আপনি কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্রুত জিহ্বা নাড়াবেন না**"। আল্লাহ আরো বলেছেনঃ "**নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিব্রাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার। অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে**"। [১]

---

১ সূরা ঃ শু'আরা, ১৯২-১৯৬

তাহলে তুমি এটাকে সেই ব্যক্তির জন্য রহমত ও বরকত এবং কিয়ামত দিবসে তাকে নিজের নৈকট্য হাসিলের জন্য উপায় বানিয়ে দিও"।

এধরণেরই মনগড়া হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে নবী (সাঃ) মানুষের প্রতি রাগান্বিত হণ, গাল-মন্দ করেন এমনকি লানতও করেন এবং তাকে বেত্রাঘাতও মারেন যদিও সে এগুলির উপযুক্ত নয়। (মায়াজাল্লাহ্) এ আবার কেমন নবী যে, যখন শয়তানী ভর করে তখন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। কোন সাধারণ মানুষও কি এমন গর্হিত কাজ করতে পারে? এ ধরণের কাজ কি গর্হিত কাজ নয়?

এধরণেরই মনগড়া হাদীসের অযুহাত দেখিয়ে বনী উমাইয়ার সেই সমস্ত শাসক যাদের প্রতি রাসুল (সাঃ) লানত করে ছিলেন এবং বদদোয়া করেছিলেন এবং যাদের বিভিন্ন বেহুদা কাজের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়ে ছিলেন এবং জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন -তারাই মজলুম ও পুতঃপবিত্র হয়ে গেল, রহমতের উপযুক্ত হয়ে গেল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে গেল !!!

এই সমস্ত মনগড়া হাদীস স্বয়ং রচনাকারীদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করছে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কারোর প্রতি গাল-মন্দ করতেন না, আর না কোন বেহুদা কথা-বার্তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন। কষ্মিনকালেও নয়। তারা (মিথ্যা রচনাকারীরা) ছোট মুখে বড় কথা বলেছে। আল্লাহ্ যেন তাদের প্রতি নিজের **'গজব'** নাযিল করুক এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়েই আছে।

এধরণের বাতিল চিন্তা-চেতনার মূলোৎপাটন করার জন্য আমাদের কাছে বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসই যথেষ্ট হবে। বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল আদব'**-এর **'লাম ইয়াকুনিন্নবী ফাহিশাওঁ ওয়া মুতাফাহ্‌হিশা'** অধ্যায়ে আয়শা হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ ইয়াহুদীরা নবীর (সাঃ) কাছে এসে '*আস্‌সামু আলায়কুম*' বল্ল। আয়শা বলেন আমি বল্লাম, '*তোমাদের প্রতিই ধ্বংস হোক এবং আল্লাহ্‌র লানত ও গজব হোক*'। নবী (সাঃ) বল্লেন, '*বাদ দাও! হে আয়শা, অন্তরকে শান্ত রাখ। মন্দ হতে বিরত থাক*'। আমি বল্লাম, '*আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে*'? তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন, '*তুমি কি শুনো নি আমি কি বলেছি? আমি তাদের বদ-দোয়াকে তাদের প্রতিই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ক্ষেত্রে আমার বদ-দোয়া গৃহিত হবে, আর আমার ক্ষেত্রে তাদেরটা গৃহিত হবে না*'।

যেমনটি মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল বার ওয়াস সালামাতুল আদব'**-এ লিখেছেন যে রাসুল (সাঃ) মুসলমানদের লানত করা থেকে নিষেধ করেছেন এমন কি তিনি চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীগুলোর প্রতিও লানত করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে বলা হল, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি মুশরিকদের জন্য বদ-দোয়া করুন*'। তিনি বল্লেন, '*আমাকে লানতকারী হিসাবে পাঠানো হয় নি, আমাকে তো কেবল রহমত বানিয়ে পাঠানো হয়েছে*'।

বলতে শুনেছি যেঃ "*হে পরোওয়ারদিগার! এর প্রতি লানত কর এবং মাটি ছাড়া এর উদরকে কখনো পরিতৃপ্ত কর না*"।[১] আবার আলী (আঃ) তাঁর সেই চিঠিতে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যা তিনি ইরাকীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ

"*আল্লাহ্‌র কসম আমি কখনো যদি তাদের মোকাবেলা করার জন্য বের হই আর পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা হাতছানি দেয় তাও আমি পরওয়াহ করব না, আর না বিচলিত হব এবং যে গোমরাহীতে তারা নিমজ্জিত আর যে হিদায়েতের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত এবং এ বিষয়ে সমস্ত দৃষ্টিশক্তি ও নিজের পরোওয়ারদিগারের ফজল ও করমের উপরে আকীদা পোষণ করি এবং আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি এবং তার সুন্দর সোয়াব সমূহের জন্য কোচড় প্রসারিত করে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আমি এই জাতির জন্য চিন্তাগ্রস্থ যে জাতির উপর বদমেজাজ ও দুঃশ্চরিত্র লোকেরা শাসন করে এবং সে আল্লাহ্‌র ধন-সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে এবং তাঁর গোলামকে নিজের গোলাম বানিয়ে নেয়। নেক বান্দাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এবং দুঃশ্চরিত্রদের নিজের কবজায় রাখে*"।

যদিও রাসুল (সাঃ) তাদের প্রতি লানত করেছেন, কিন্তু আহলে সুন্নাতগণ উক্ত হাদীস দ্বারা মোটেই ভীত নন। কারণ উক্ত সাহাবা এই হাদীসগুলিকে ভাল করেই জানতো, বিধায় তারা উক্ত হাদীসগুলির মোকাবেলায় আরো হাদীস রচনা করল, যেগুলি '**হক**'-কে '**বাতিল**' দ্বারা পরিবর্তন করে ফেল্ল। আর রাসুল (সাঃ)-কে একজন এমন সাধারণ মানুষ বানিয়ে দিল যে, তার প্রতি জাহিলিয়াত প্রভাব সৃষ্টি করতো। আর কখনো এতো পরিমানে রাগান্বিত হয়ে পড়তেন যে অযথা একজন মানুষের প্রতি বকা-ঝকা আরম্ভ করে দিতেন। তারা তাদের মালাউন সরদারদের রক্ষা করার জন্যই এই হাদীস রচনা করেছে যেটাকে বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুদ্‌ দাওয়াত**'-এ এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল বর ওয়াস সিলা ওয়াল আদব**'-এ আয়শা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ)-এর নিকট দু'ব্যক্তি এলেন এবং একটি এমন বিষয় নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিলেন যা আমি জানতাম না। অতঃপর রাসুল (সাঃ) তাদের প্রতি রাগান্বিত হলেন এবং লানত ও বকা-ঝকা দিলেন। তারা চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ! তাদের দ্বারা এমন কি ভুল হয়েছিল*"? তিনি বল্লেন, '*তুমি কি বলছো*'? আমি বল্লাম, "*আপনি তাদের প্রতি লানত করেছেন*"? তিনি বল্লেন, "*তুমি জানো না যে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট শর্ত রেখেছি যে, হে পরোওয়ারদিগার! আমিও মানুষ, সুতরাং আমি যদি কোন মুসলমানের প্রতি লানত করি বা গালমন্দ করি তখন তুমি সেটাকে ক্ষমা করে দিও এবং তাকে প্রতিদান দিও*"।

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বল্লেনঃ "ইয়া ইলাহী! আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি যে আমি কোন কার্পন্য করব না কারণ আমিও মানুষ। সুতরাং আমি যদি কোন মোমিনকে গাল-মন্দ করি অথবা তার প্রতি লানত করি অথবা বেত্রাঘাত মারি,

---

১ **লিসানুল আরব**, খঃ ৭, পৃঃ ৪০৪।

গরিমার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। আমরা একটি জমায়েতে হাদীস নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আলোচনাকালে মুয়াবিয়ার প্রসঙ্গ উঠলো। ঐ বুজুর্গ মুয়াবিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি চতুরতা, যুক্তি-তর্ক ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বহুল প্রশংসিত ছিলেন। তিনি মুয়াবিয়ার রাজনীতি এবং যুদ্ধে হযরত আলী (আঃ)-এর উপর তার বিজয় অর্জন করার কথা বয়ান করছিলেন। আমি অনেক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করলাম। কিন্তু তিনি যখন মুয়াবিয়ার গুণাবলী ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন তখন আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমি তাকে বল্লাম, "*রাসুল (সাঃ) মুয়াবিয়াকে মোটেই ভাল বাসতেন না এবং তিনি (সাঃ) মুয়াবিয়ার প্রতি লানত করেছেন এবং তার জন্য বদ-দোয়া করেছেন*"। আমার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই তাজ্জব হয়ে গেল, কেউ কেউ আমার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু সেই বুজুর্গ অত্যন্ত আস্থার সাথে আমার কথা সমর্থন করলেন, তাতে উপস্থিত সবাই আরো বিস্মিত হলেন এবং বুজর্গকে বলতে লাগলেন, "*আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিকে তো আপনি মুয়াবিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর অন্য দিকে এ কথাও স্বীকার করছেন যে রাসুল (সাঃ) তার প্রতি লানত করেছেন। এক সাথে দুটোই কিভাবে সম্ভব*"? ঐ লোকগুলির সাথে আমিও একই প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি অত্যন্ত গোলমেলে একটি জবাব দিলেন যা কবুল করা কঠিন। তিনি বল্লেন, "*রাসুল (সাঃ) তার প্রতি যে অভিশাপ ও লানত করেছেন সেগুলিই আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য রহমত ও বরকত হয়ে গেছে*"। উপস্থিত সবাই এক বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন, '*তা কেমন করে হল*'? তিনি বল্লেন, "*তা একারণে যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'আমিও সমস্ত মানুষের মতই এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করেছি তিনি যেন আমার লানতকে রহমত ও বরকত বানিয়ে দেন*"। তারপর বুজুর্গটি তার কথার জের ধরে বল্লেন, "*এমন কি কেউ যদি রাসুল (সাঃ)-কে হত্যাও করে থাকে তাহলেও সে দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতবাসী হয়ে যায়*"। অতঃপর আমি যখন বুজুর্গটিকে একা পেলাম তখন উক্ত হাদীসের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি আমাকে সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা দিলেন। এভাবে আমিও উক্ত হাদীসগুলি সম্পর্কে অবগত হলাম। কিন্তু হাদীসটি অধ্যয়ন করার পর আমার সেই আকীদা-বিশ্বাস আরো প্রকোট হয়ে গেল যা উমাইয়াদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জন্ম নিয়ে ছিল যে, **"তারা সত্যকে এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটিকে গোপন করার জন্য এবং রাসুল (সাঃ)-এর নিষ্পাপতা ও মান-মর্যাদাকে কলংকিত করার জন্য, নিজেদের খেয়াল-খুশিমত হাদীস রচনা করেছে"**।

তারপর তো অনেক এমন রেওয়ায়েত আমার দৃষ্টিগোচর হল যা ঐ বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়। এমনকি ষড়যন্ত্রকারীরাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তারা বেশীরভাগ কথাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করেদিল।

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তাওহীদ'**-এর **'কাওলুল্লাহি তায়ালা ইউরীদুনা আঁই ইয়াবদিলু কালামুল্লাহি'** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ রাসুল (সাঃ) বলেছেন "যদি কোন ব্যক্তি নেক কাজ না করে, তাকে মৃত্যুর পর পুড়িয়ে দাও অথবা তার

এটিই হল সেই বিষয় যার দ্বারা কোমল হৃদয় এবং সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই বিষয়টিই রাসুল (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তিনি কারোর প্রতি অযথা গাল-মন্দ এবং লানত করতেন না এবং কোন নির্দোশ ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত কারেন নি। তিনি যদি কারোর প্রতি রাগান্বিত হতেন তখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য তার প্রতি লানত করতেন যে লানতের উপযুক্ত হত এবং আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন। যার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতো না বা নিজের দোষ স্বীকার করতো না, এমন কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতেন না।

কিন্তু তাদের অন্তর ঐ রেওয়ায়েত দেখে জ্বলে-পুড়ে ছার-খার হতো, যে রেওয়ায়েতে মুয়াবিয়া ও বনী উমাইয়ার প্রতি লানত করা হয়েছিল। সুতরাং তারা মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য এবং মুয়াবিয়ার মান-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এধরণের মনগড়া হাদীস রচনা করে নিয়েছে। সে কারণেই মুসলিম উক্ত রেওয়ায়েতগুলিকে লিপিবদ্ধ করার পর [যেখানে নবী (সাঃ) মুয়াবিয়ার প্রতি লানত করেছিলেন, আর যেগুলি মুয়াবিয়ার জন্য রহমত হয়ে গেছে] ইবনে আব্বাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন ঃ আমি বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলাম, রাসুল (সাঃ)-কে আসতে দেখে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। ইবনে আব্বাস বলেন যে, রাসুল (সাঃ) আমাকে ধরে ফেল্লেন এবং বল্লেন, "*যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে নিয়ে আস*"। ইবনে আব্বাস বলেন যে, আমি মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে আবার রাসুলের নিকট ফেরত এসে বল্লাম, '*সে খানা খাচ্ছে*'। তিনি (সাঃ) আবারও যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, '*ওকে ডেকে নিয়ে এসো*'। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি আবারও গেলাম এবং ফেরৎ এসে বল্লাম যে, '*সে খানা খাচ্ছে*'। তখন রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "**আল্লাহ্‌ যেন কখনোই তার উদর পূর্তি না করেন**"। [১]

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম নাসায়ী **'আল খাসায়েস'** (যা আমীরুল মুমেনীন আলী ইবনে আবি তালিবের ফাযায়েল সম্পর্কে লিখেছেন) লেখার পর শাম নগরীতে গমন করেন। তখন শামের লোকেরা তার প্রতি অভিযোগ করে বলে যে, "*তুমি মুয়াবিয়ার ফাযায়েল কেন বর্ণনা করনি*"? ইমাম নাসায়ী বল্লেন, "*আমি তার কোন ফযিলাত সম্পর্কে অবগত নই। তবে এতটুকু অবশ্যই জানি যে, আল্লাহ তার পেট কখনোই ভরাট করবেন না*"। তার এ কথা শুনা মাত্রই লোকজন তাকে এতো পরিমানে মারধর করল যে তিনি সেই মারের চোটে শহীদ হয়ে গেলেন। ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, মুয়াবিয়ার উপর রাসুল (সাঃ)-এর বদদোয়া কার্যকর হয়েছিল, আর সে কারণেই মুয়াবিয়া খেতে খেতে হাপিয়ে উঠতো তবুও তার পেট ভরতো না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমিও উক্ত বর্ণনা সমূহের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম যেগুলিতে **'লানত'**-কে রহমত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু **'তিউনিস'**-এ একজন বুজুর্গ আমাকে সেটা জানিয়ে দিলেন। বুজুর্গ ব্যক্তিটির জ্ঞান

---

১ **সহীহ্‌ মুসলিম**, খঃ ৮, পৃঃ ২৭।

পারবে না'। আহলে সুন্নাতের মতে এটা তখনকার কথা যখন উসমান **'আসরার'** জন্য সেনাবাহিনী গঠন করতে ছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা বখশিশের জন্য এমনই পত্র, যা বেহেশতে দাখিল হওয়ার জন্য **'কিনিয়াবাসীরা'** দিয়ে থাকে।

সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় হবে না যদি উসমান (রাঃ) এমন কাজ করেন যার জন্য খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাকে হত্যা করার পর বিনা গোসল ও কাফনে ইয়াহুদীদের গোরস্থানে দাফন করার কারণ হল। **"এগুলি হচ্ছে তাদের আশা-ভরসা, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে দলিল উপস্থাপন কর"**।

রাসুল (সাঃ)-এর কথা-বার্তায় বিভ্রান্তি ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌তে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে 'হাম্মাদ' এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বল্ল যাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় না। সে বল্ল, 'আমি ফেৎনার রাত্রিগুলির একরাত্রে নিজের অস্ত্র নিয়ে বের হলাম তখন আবু বাকরাহ আমার সামনে এসে যায় এবং বলে, *'কোন দিকে যাচ্ছো'?* আমি বল্লাম, *'রাসুল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই আলীকে সাহায্য করার ইচ্ছা আছে'*। আবু বাকরাহ বল্ল, *'রাসুল (সাঃ) বলেছেন যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে তখন উভয়েই জাহান্নামে যাবে'*। বলা হল যে, *'হত্যাকারী তো হত্যা করার জন্য জাহান্নামে যাবে কিন্তু নিহতের কি দোষ'?* তিনি (সাঃ) বল্লেন, *"যেহেতু সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করতো"*।

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন ঃ আমি আইউব ও ইউনুস, আবু ওবায়দার সামনে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করলাম যেন তিনও আমাকে সমর্থন করেন। তখন তিনি বলেন যে, উক্ত হাদীসটি হাসান ইবনে কায়েসকে এবং তিনি আবু বাকরাহ হতে নকল করেছেন।[১] মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ফিতান'**-এ আবু বাকরার হাদীসকে আহনাফ ইবনে কায়েস হতে নকল করেছেন যে তিনি বলেন যে, আমি ঐ ব্যক্তি সাহায্যের উদ্দেশ্যে বের হলাম, অতঃপর আবু বাকরার সাথে দেখা হয়ে গেল, সে বল্ল, *'কোথায় যাচ্ছ'?* আমি বল্লাম, *'ঐ ব্যক্তির সাহায্যে যাচ্ছি'*। সে বল্ল, 'ফেরৎ চলে যাও, কারণ আমি রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, *'যখন দু'জন মুসলমান একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে যাবে'*। তখন আমি বল্লাম, *'ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ হল হত্যাকারীর জন্য, নিহতের কি দোষ'?* তিনি বল্লেন, *'সেও তার ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল'*।

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ৯২, **কিতাবুল ফিতান**।

দেহের অর্ধাংশ মাটিতে এবং অর্ধাংশ সমুদ্রে সোপর্দ করে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি এটার প্রতি ক্ষমতা রাখে তাহলে তাকে এমন আযাব দিবে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ দিতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ সমুদ্রকে হুকুম দিবে এবং যাকিছু তাতে থাকবে জড় হয়ে যাবে। তারপর মাটিকে হুকুম দিবে তখন তার মধ্যে যা আছে সবকিছু জড় হয়ে যাবে। তারপর বলবে, '*তুমি কেন এমন করলে*'। সে বলবে, '*তোমার ইচ্ছা মত এবং তুমি তো জানোই*'। সুতরাং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবে।

এবং উক্ত পৃষ্ঠাতেই আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণনাকৃত এ রেওয়ায়েতটি মজুদ আছে যে ঃ আমি রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন কোন বান্দা কর্তৃক কোন গুনাহ সংঘটিত হয় তখন সে প্রায়শঃই বলে থাকে যে আমার দ্বারা গুনাহ্ সংঘটিত হয়েছে এবং বলে, '*পরোওয়ারদিগার! আমি গুনাহ করেছি*' অথবা কখনো কখনো বলে থাকে '*আমার দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয়েছে অতএব তুমি ক্ষমা করে দাও*'। তার পরোওয়ারদিগার বলে, '*আমার বান্দা কি জানতো যে, তার পরোওয়ারদিগার আছে যে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দিবে। সুতরাং আমি আমার বান্দার গুনাহকে ক্ষমা করে দিলাম*'। তারপর বান্দা কিছুকাল পর্যন্ত কোন গোনাহ থেকে বিরত থাকার পর, আবারও যদি গোনাহ্ করে ফেলে এবং বলে যে, '*পরোওয়ারদিগার আমার কর্তৃক দ্বিতীয় গোনাহ সংঘটিত হয়েছে, সুতরাং তুমি ক্ষমা করে দাও*'। তখন আল্লাহ্ বলবে, '*আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন (প্রতিপালক) আছে যে গোনাহগুলি ক্ষমা করে দেয়, সুতরাং আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম*'। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবে সে গোনাহ্ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি গোনাহ্ করে ফেলে এবং বলে যে, '*হে প্রতিপালক আমি আবারো গোনাহ করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও*'। আবারো আল্লাহ্ বলে, '*আমার বান্দা কি জানে যে তার রব আছে যে গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়। আমি আমার বান্দাকে তিন বার ক্ষমা করলাম, এখন যা খুশি তাই করতে পারে।*"

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! এ আবার কেমন রব? যদিও বান্দা জানতো যে তার রব আছে যে গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু তার রব সে কথা জানতে পারল না, প্রত্যেক বারই বলতে থাকে যে, '*আমার বান্দা কি জানে যে তার রব আছে এবং তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকে*'? এ আবার কেমন রব যে, একজন বান্দা গোনাহের পর গোনাহ করতে থাকবে এবং সে ক্ষমা করতে থাকবে এবং বান্দাকে বলে যে, ***'এখন যা খুশি তাই কর!! ...***

তাদের মুখ নিসৃত কথা অনেক বড় হয়ে গেল। যদিও সেটা মিথ্যা। সুতরাং এসমস্ত লোক যদি এই কথার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে কি আপনি তাদের পিছু নিয়ে নিজের প্রানকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিবেন?

জি হ্যাঁ, এটাই হল তাদের ধ্যান-ধারণা যে রাসুল (সাঃ) উসমানের (রাঃ) বিষয়ে বলেছেন যে, '*তুমি যা ইচ্ছা তাই কর আজ হতে তোমার কোন কাজ তোমার ক্ষতি করতে*

তার পর বল্ল, *‘এই আলীই হচ্ছে হক, আর এই আলীই হচ্ছে বাতিল, আমি তার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব’*। এরকম আরো কত গোলমেলে হাদীস আছে যেগুলি ‘হক’-কে ‘বাতিল’-এর সাথে সংমিশ্রণ করে দিয়েছে এবং আলোকিত পথ সমূহকে অন্ধকার দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

আমরা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাই, রাসুল (সাঃ) অনেক সাহাবাকে বেহেশতের সু-সংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ করে উক্ত দশজন সাহাবাকে যারা মুসলমানদের মাঝে **‘আশারায়-এ-মুবাশ্‌শারা’** নামে বিখ্যাত।

আহমদ, তিরমিজি এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে ঃ নিঃসন্দেহে নবী (সাঃ) বলেছেন, *“উমর, আবু বকর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং আবু ওবায়দাহ ইবনে জেরাহ-গণ হলেন বেহেশতী”*। [১]

আর নবীর (সাঃ) এ কথাটিও সত্য যে ঃ *“ইয়াস্‌সারের বংশধরদের সংবাদ দিয়ে দাও যে তোমাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে”*। রাসুল (সাঃ) এ কথাও বলেছেন যে, *“বেহেশত চার জনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, তারা হলেন, আলী, আম্মার, সালমান এবং মেকদাদ”*।

মুসলিম তার সহীহ্‌তে আরো রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে সালামকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর এ কথাও সত্য যেঃ *“হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সরদার এবং জাফর ইবনে আবি তালিব জান্নাতে ফেরেশ্‌তাদের সাথে উড়ে বেড়ানোর কথাটাও সত্য। এবং ফাতিমা জান্নাতের নারীদের সম্রাজ্ঞী এবং এও সত্য যে তাঁর (ফাতেমার) শ্রদ্ধেয় মাতা হযরত খাদিজাকে জিব্রাইল জান্নাতে কসর-এর সু-সংবাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সোহেব রুমিকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন, বেলাল হাবশী এবং সালমান ফারসীকে বেহেশতের সু-সংবাদ দিয়েছেন”*।

যখন এতোগুলো লোককে জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে তখন কেন একমাত্র ঐ দশজন ব্যক্তির (আশারায়-এ-মুবাশ্‌শারা) কথা ব্যপক ভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। আপনারা লক্ষ্য করবেন, কোন মাহ্‌ফিল বা জলসায় যখন বেহেশতের আলোচনা করা হবে তখন **‘আশারায়-এ-মুবাশ্‌শারা’**-র আলোচনা অবশ্যই হবে।

আমরা তাদের উক্ত কথার প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করি না, আর না আমরা আল্লাহ্‌র অসীম দয়াকে সীমিত করতে পারি যা প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বলতে চাই যে, এ সমস্ত হাদীস উক্ত হাদীসের বিরপীত অবস্থান নেয় যেখানে রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, **‘দু’জন মুসলমান যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে**

---

১ **মুসনাদে আহমদ**, খঃ ১, পৃঃ ১৯৩; **সহীহ্ তিরমিযি**, খঃ ৩, পৃঃ ১৮৩ এবং **সুনানে আবু দাউদ**, খঃ ২, পৃঃ ২৬৪।

এমন মনগড়া হাদীস রচনা দ্বারা পাঠকমন্ডলী অবশ্যই কারণ নির্ণয় করতে পারবেন যে, কেন এই মনগড়া হাদীস রচনা করা হল এবং রাসুল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাইয়ের প্রতি আবু বাকরার শত্রুতার কথা প্রকাশ পেয়ে যায়। আর এ কথাটি স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে যায় যে, আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (আঃ)-কে অপমান করার জন্য তারা এমনটা রচনা করেছে। শুধু তাই নয় বরং **'বাতিল'**-এর বিপক্ষে **'হক'**-কে বিজয়দানকারী সাহাবাদের নিরুৎসাহিত করেছে। তাদের জন্য উক্ত হাদীসের মতই আরো কত হাদীস রচনা করে রেখেছে যেগুলিকে না বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করে আর না কোরআনের কোন সমর্থন পাওয়া যায়, আর না সুন্নাতের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ **"আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষন না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে"**। [১]

জালেম ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সে কারণেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বুখারীর উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাকারী তার 'হাশিয়া'-তে এভাবে মন্তব্য করেছেনঃ "*লক্ষ্য করুন এই হাদীসটি কি বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য হুজ্জাত হবে? যদিও আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে যে বিদ্রোহীদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ফিরে আসে*"।

আর যে হাদীস **'আল্লাহ্‌র কিতাব'**-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, সেগুলি মনগড়া ও মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত, সেগুলিকে দেয়ালে ছুড়ে মারা উচিৎ। হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে নবীর (সাঃ) সত্য হাদীস হল যেঃ "*আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! তার সাহায্যকারীকে তুমি সাহায্য কর, তার সাথে শত্রুতা পোষণকারীকে হেয় প্রতিপন্ন কর এবং হককে তার দিকে ফিরিয়ে দাও*"।

অতএব, হযরত আলীর (আঃ) প্রতি ভালবাসা পোষণ করার অর্থ হল নবী (সাঃ)-কেই ভালবাসা এবং আলীর (আঃ) সাহায্য করা সমস্ত মুসলমানের উপর ওয়াজিব এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার অর্থ হল **'বাতিল'**-এর সাহায্য কারা এবং **'হক'**-কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

আপনি যদি বুখারীর হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন দেখতে পাবেন যে, নামহীন বা অপরিচিত রাবীর সিলসিলা প্রচুর আছে যাদের নামের উল্লেখ নাই। **'হাম্মাদ'** একটি অপরিচিত ব্যক্তির মারফতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এর দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, উক্ত অপরিচিত ব্যক্তিটি মুনাফেকদের অন্তর্ভূক্ত যারা আলীর (আঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো এবং তাঁর ফাযায়েলসমূহ গোপন করার চেষ্টা তদবীর চালাতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে (প্রপাগেন্ডায়) ব্যস্ত থাকতো। আর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস যে হকের সাহায্য করতে নিষেধ করেছিল, সে বলে যে, *'আমাকে তরবারী দাও'*

---

১ সূরা ঃ হুজরাত - ৯

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তাওহীদ'**-এর **"কাওলুহু তায়ালা, ওয়াকাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলীমা"** অধ্যায়ে আনাস ইবনে মালিক হতে শবে মে'রাজের ভ্রমন, সপ্তম আসমানে পৌছানো, সেখান থেকে সিদরাতুল মুন্তাহা পৌছানো এবং মুহাম্মদ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ৫০টি নামাজ ওয়াজিব হওয়া সম্মন্ধে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উক্ত ৫০টি নামাজ তো মূসার (আঃ) বদৌলতে মাফ হয়েছে কেবল ৫টি নামাজ ফরজ করা হল। উক্ত কাহিনীতে সরাসরি মিথ্যা ও কুফুর মজুদ আছে যেমন ঃ আল্লাহ্ পাক নিকটে আসলেন এবং এতো পরিমান অগ্রসর হলেন যে দুই ধনুক বা তার চেয়েও কম দূরত্ব রয়ে গেল। এধরণের গর্হিত ও ফালতু বক্তব্য তো আছেই। কিন্তু উক্ত বর্ণনাতে যে বিষয়টি আমাদের কাছে গুরুত্ব বহন করছে তা হল এই যে ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) যখন সপ্তম আসমানের দরজা খুল্লেন তখন দেখলেন যে সেই মূসা (আঃ) বসে আছেন যাকে আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে কথা বলার মর্যাদায় সপ্তম আসমানে স্থান দিয়েছেন। মূসা (আঃ) যখন তাঁকে (মুহাম্মদ) দেখলেন তখন বল্লেন, "***পরোওয়ারদিগার আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে আমার চেয়েও অধিক কাউকে মর্যাদা দেয়া হবে***" ।

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ঈমান'**-এর **'বাদাউল ওয়াহী ইলা রাসুলুল্লাহ'** অধ্যায়ে এবং বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাব বাদাউল খালক'**-এর **'যাকারুল মালায়েকাতু সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম'** অধ্যায়ে প্রথম কাহিনীর মত আরো একটি কাহিনী নকল করেছেন, রাতের ভ্রমন তথা মে'রাজকে বয়ান করেছে। কিন্তু এই কাহিনীতে হযরত মূসা (আঃ)-কে ৬ষ্ঠ আসমানে এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সপ্তম আসমানে দেখানো হয়েছে। সেখানে আবার এ কথাটি গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসুল (সাঃ) বলেন ঃ "অতঃপর আমি ৬ষ্ঠ আসমানে আসলাম, শব্দ শুনা গেল, '*ইনি কে*'? জবাব দেয়া হল, '*জিব্রাইল*' । আবার বলা হল, '*তোমার সঙ্গে কে আছে*' । বল্লেন, '*মুহাম্মদ*' । আবার শব্দ ভেসে এল, '*তাঁর কাছে কি সংবাদ পৌছে দেয়া হয়েছে*'? বল্লেন, '*জি হ্যাঁ*' । তারপর '*মারহাবা*' বলা হল। এরপর মূসার খেদমতে হাজির হলেন এবং সালাম করলেন। তিনি আমাকে, '*আমার ভাই এবং নবী*' বলে স্বাগত জানালেন। আমি যখন সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলাম তখন মূসা (আঃ) কান্না জুড়ে দিলেন। শব্দ ভেসে এল, '*তোমার কান্নার কারণ কি*'? বল্লেন, '*এই বালককে আমার পরে নবী বানানো হল অথচ সে আমার উম্মাতের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক তাঁর উম্মতের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করবে*' ।

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ঈমান'**-এর **"আদনা আহলিল জান্নাতে মানযিলাতু ফিহা"** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামত দিবসে আমি মানুষের সরদার হব। তোমরা কি জান এটা কেমন করে হবে? প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের সকলকে একটি স্থানে জমায়েত করা হবে, যেখান থেকে আহবানকারীকে সবাই দেখতে পাবে এবং তাঁর ডাকও সবাই শুনতে পারবে ... সূর্য তাদের অতি নিকটে চলে আসবে। মানুষের কষ্ট সহ্যর সীমা ছাড়িয়ে যাবে। মানুষ বলবে, '*তোমার কি নিজের অবস্থার খবর নেই*'? তোমাদের কি জানা নাই যে তোমার প্রতিপালকের দরবারে

যুদ্ধ করে তাহলে হত্যাকারী এবং নিহত উভয়কেই জাহান্নামী হতে হবে'। কারণ আমরা যদি এই হাদীসকে সত্য বলে মেনে নেই তাহলে '**সু-সংবাদ**'-এর হাদীসগুলি ধুম্র হয়ে উড়াল দিবে। কেননা তাদের মধ্য থেকে বড় বড় ব্যক্তিবর্গ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন এবং কেউ কেউ হত্যাও করেছেন এবং নিহতও হয়েছেন।

হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে হযরত আয়শার (রাঃ) নেতৃত্বে '**জংগ-এ-জামল**'-এ তালহা ও যুবায়ের নিহত হয়েছেন এবং হাজারো মুসলমানের হত্যার কারণ হয়েছেন। অনুরূপভাবে আম্মার ইয়াস্‌সার (রাঃ), মুয়াবিয়া কর্তৃক সৃষ্ট '**জংগ-এ-সিফফিন**'-এ শহীদ হয়েছেন, যখন তিনি তরবারী দ্বারা হযরত আলী (আঃ)-এর বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করছিলেন তখন বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করে। আর এ বিষয়ে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস আছেই। অনুরূপভাবে সৈয়্যেদুস শুহাদা, বেহেশতে যুবকদের সরদার ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ নিজেদের তরবারী দ্বারা ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার সৈন্যদের মোকাবেলা করেছেন এবং ইয়াজিদ তাদের সকলকেই হত্যা করালো। আলী ইবনুল হুসাইন জয়নুল আবেদীন (আঃ) ব্যতীত আর কেহই বেঁচে ছিলেন না। অতএব ঐ মিথ্যাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে হত্যাকারী এবং নিহত সবাই জাহান্নামী হলেন (মায়াজাল্লাহ্) কেননা তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন !!

মনে রাখা উচিত, উক্ত হাদীসকে ঐ রাসুল (সাঃ)-এর দিকে নিসবাত করা যাবে না, যিনি নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু বলতেন না, যা কিছু বলতেন তা ওহীর মাধ্যমে বলতেন। যেমন আমরা পূর্বেও বলেছি যে, উক্ত হাদীস বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে অবস্থান রাখে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাতে রাসুল (সাঃ)-এর বিপরীত। এখানে অবশ্য প্রশ্ন দেখা দেয় যে এ ধরণের মনগড়া, মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত হাদীসগুলি থেকে বুখারী ও মুসলিম কিভাবে গাফেল থাকলেন এবং সেগুলি কেন যাচাই-বাছাই করেন নি। আবার এমনও হতে পারে যে, এধরণের হাদীসই হচ্ছে তাদের মাযহাব ও আকীদাগত বিশ্বাস।

রাসুল (সাঃ)-এর ফাযায়েলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঃ

অন্যান্য আম্বিয়া ও রাসুলগণের ফযিলাতের বিষয়ে সহীহ্ গ্রন্থসমূহে ত্রুটিযুক্ত হাদীসও পাওয়া যায় এবং এমন কিছু হাদীসও উক্ত সিহাহ্ সমূহে বর্ণিত আছে যার দ্বারা মূসার (আঃ) মর্যাদা আমাদের রাসুল (সাঃ)-এর চেয়েও বেশী বুঝানো হয়েছে। আমার আকীদা হচ্ছে যে, এ সমস্ত হাদীস, হযরত উমর ও উসমানের (রাঃ) আমলে যে সকল ইয়াহুদীরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য মুসলমান হয়েছিল, যেমন ঃ কা'বুল আহবার, তামিমুদ্দারী এবং ওহব ইবনে মুম্বাহ্ ইত্যাদীগণ কিছু কিছু সাহাবা যেমন ঃ আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিকের নামে রচনা করে চালু করেদিয়েছে।

(সাঃ)-কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা সকলেই উক্ত কথাকে স্বীকার করি এবং এ জন্যেই আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সমগ্র মানব জাতির উপরে ফজিলাত দিয়ে থাকি। কিন্তু ইয়াহুদী (ইসরাইলী) এবং তাদের পক্ষাবলম্বনকারী ও তাদের সাহায্যকারী বনী উমাইয়ারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ফজিলাতকে সহ্য করতে পারিনি। এমনকি তারা মূসাকে (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য মনগড়া রেওয়ায়েত রচনা করেছে -যা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় শবে মে'রাজের ঘটনায় মুহাম্মদ (সাঃ) হতে মুসার (আঃ) কথোপকথনের প্রতি লক্ষ্য করেছি। আবার যখন আল্লাহ্‌, রাসুল (সাঃ)-এর জন্য ৫০টি নামাজ ওয়াজিব করে দিলেন, তখন মুসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছিলেন, "*আমি মানুষ সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি*"। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেই তারা ক্ষান্ত দেয় নি বরং মুসার (আঃ) মর্যাদাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তুলনায় আরো বৃদ্ধি করার জন্য মনগড়া হাদীস রাসুল (সাঃ)-এর মুখেই রচনা করে ফেলল। সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরা হল ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তাওহীদ'**-এর **"ফিল মশিয়্যাতু ওয়াল ইরাদাতু ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আঈ ইয়াশায়াল্লাহ"** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ একজন মুসলমান আর একজন ইয়াহুদীতে বাক-বিতন্ডতা হল। মুসলমান ব্যক্তিটি বল্ল, "*তাঁর কসম যিনি মুহাম্মদকে সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন*"। ইয়াহুদীটি বল্ল, "*তাঁর কসম যিনি মূসাকে সমগ্র জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন*"। একথা শুনা মাত্র মুসলমান ব্যক্তিটি ইয়াহুদীকে একটা চড় মেরে বসল। ইয়াহুদী ব্যক্তিটি রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের এবং মুসলমান ব্যক্তির ঘটনাটি বল্ল। তখন নবী (সাঃ) বল্লেন, "*তোমরা মূসার উপর আমাকে ফজিলাত দিও না। কারণ কিয়ামত দিবসে সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে এবং সবার আগে আমি হুশ ফিরে পাব অথচ মূসা আরশের উপর বসে থাকবেন। আমি জানি না তিনিও হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকাদের মধ্যে ছিলেন এবং আমার পূর্বেই হুশ ফিরে পাবেন অথবা আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে এর থেকে পরিত্রান দিয়ে থাকবেন*"।

বুখারীর আরো একটি রেওয়ায়েত আছে যে ঃ একজন ইয়াহুদী চড় খাওয়ার পর নবীর (সাঃ) খেদমতে এসে বল্ল, "*হে মুহাম্মদ! আনসারের মধ্য হতে আপনার একজন সাহাবী আমার মুখে চড় মেরেছে*"। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*তাকে ডাকো*"। সে যখন এলো তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*তুমি তার মুখে চড় কেন মারলে*"? সে বল্ল, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌! আমি যখন ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তাকে বলতে শুনি যে, 'তাঁর কসম, যে মূসাকে (আঃ) সমগ্র মানুষের উপর নির্বাচিত (শ্রেষ্ঠত্ব দান) করেছেন*'। আমি বল্লাম, "*মুহাম্মদ (সাঃ)-এরও কি উপরে? অতঃপর আমার রাগ হয়ে গেল এবং চড় মেরে বসলাম*"। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*তুমি আম্বিয়াদের উপর আমাকে ফযিলাত দিও না। কেননা কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষের উপর অজ্ঞানতা ছেয়ে থাকবে এবং সবার আগে আমার হুশ ফিরে পাবো তখন আমি মূসকে আরশের পায়া ধরে দাড়িয়ে থাকতে দেখব। আমি জানি না*

কে তোমাদের শাফায়াত করতে পারে? সুতরাং একজন অপরজনকে বলবে তোমরা আদমের কাছে যাও। সব মানুষ আদমের (আঃ) নিকট আসবে এবং বলবে, "*আপনি হলেন আবুল বাশার, আপনাকে আল্লাহ্ নিজ হাতে তৈরী করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের আদেশ করেছেন যারা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখতে পারছেন না, আপনি কি আমাদের খারাপ দশা অনুভব করতে পারছেন না*"? তখন আদম (আঃ) বলবেন, "*আজ আমার প্রতিপালক অত্যান্ত রাগান্বিত এবং ইনিই সেই খোদা যিনি আমাকে গাছের নিকট যাওয়ার জন্য নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি সেই কথার উপর আমল করিনি। নাফসী, নাফসী, আমি বাদে অন্য কাউকে খুজে নাও, বরং নূহের কাছে চলে যাও*"। (এই রেওয়ায়েতটি অনেক দীর্ঘ এবং আমি সংক্ষিপ্ততাকে সব সময়ই প্রাধান্য দিয়েছি)

যাহোক, মানুষ নুহের (আঃ) কাছে হাজির হবে, তার পর ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে, তারপর মূসার (আঃ) কাছে যাবে কিন্তু সবাই নাফসী, নাফসী বলবেন এবং ঈসা (আঃ) ছাড়া সবাই তাদের দোষ-ত্রুটির কথা বলবেন। কিন্তু ঈসাও (আঃ) নাফসী, নাফসী ডাক দিতে থাকবেন এবং বলবেন, "*যাও আমার ছাড়া অন্য কারোর কাছে যাও, মুহাম্মদের কাছে চলে যাও*"। রাসুল (সাঃ) বলেন, "*সকল মানুষ আমার কাছে আসবে। অতঃপর আমি আরশের নীচে গিয়ে নিজের পরোওয়ারদিগারের সামনে সিজদায় মাথা রেখে দিব। তারপর আল্লাহ্ পাক আমার জন্য হামদ ও সানার দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন, যা ইতিপূর্বে কারোর জন্য করেন নি*"। তারপর আহ্বান করা হবে, "*হে মুহাম্মদ! মাথা তুলো, তুমি আবেদন জানাও, দান করা হবে। শাফায়াত কর, তোমার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে*"। সুতাং আমি মাথা তুলবো এবং বলব ঃ "*উম্মাতি ইয়া রব, উম্মাতি*"। আহ্বান করা হবে, "*হে মুহাম্মদ নিজের উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে আয়মন দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। এখন তাদের জন্য আর কোন হিসাব হবে না*"। এছাড়াও তারা অন্যান্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করবে। তারপর রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*সেই সত্মার কসম যার কবজায় আমার প্রাণ, জান্নাতের দরজার পাটগুলির মাঝে এতো দূরত্ব আছে যতটা মক্কা ও হামীর-এর মাঝে অথবা মক্কা ও বসরার মাঝে যত দূরত্ব আছে*"।

উক্ত হাদীসগুলিতে রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, কিয়ামত দিবসে তিনি মানুষের সরদার হবেন। আর মূসা (আঃ) বলেন যে, পরোওয়ারদিগার আমার চিন্তা-ধারনাতেও ছিল না যে আমার মঞ্জিলেও কেউ পৌছাতে পারবে। তারপর রাবী বর্ণনা করেন যে, মুসা (আঃ) কান্না জুড়ে দিয়ে বলেন যে, "*হে আল্লাহ্! এই ছেলেটিকে আমার পরে নবী বানানো হয়েছে, অথচ আমার উম্মতের চেয়েও অধিক নিজের উম্মতের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে*"।

এই হাদীসগুলি দ্বারা এ কথাই আমাদের বুঝে আসে যে, আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-সহ ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত রাসুল ও আম্বিয়াগণ (আঃ) কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র কাছে শাফায়াত করবেন না। শাফায়াতের জন্য আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ

দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন"।[১]

আর যখন মুসলমানদের বেহেশতে প্রবেশ করা রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরন এবং তাঁর শাফায়াতের উপর নির্ভরশীল তখন আমরা উক্ত হাদীসের সত্যতা কিভাবে স্বীকার করে নিব। যেটা নাউজুবিল্লাহ্, বনী উমাইয়াদের আকীদার চেয়েও জঘন্য, যারা একদিনের জন্যও এই কথার উপর ঈমান আনে নাই যে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র সত্য রাসুল। তারা রাসুল (সাঃ)-কে এমন একজন বাদশা হিসাবে মানতো যে নাকি তার নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মানুষের উপর বিজয় অর্জন করেছে। এই কথাকে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদ এবং তাদেরই খলিফা ও শাসকবৃন্দ স্পষ্ট করেছে।

রাসুল (সাঃ) ইল্‌ম (জ্ঞান) ও তিব (চিকিৎসা)-এর মধ্যে ত্রুটি বা গরমিল করেছেন ঃ

নিঃসন্দেহে জ্ঞান প্রমান করে যে কিছু কিছু রোগ মো'তাদী (ছোঁয়াচে প্রকৃতির) হয়ে থাকে যার সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষই জানে এমনকি বিধর্মীরাও জানে। কিন্তু ইউনির্ভাসিটির ছাত্রদের সম্মুখে যদি এ কথা বলা হয় যে, রাসুল (সাঃ) এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তখন তারা তাঁকে ঠাট্টা করবে এবং তারা **'ইসলামের রাসুল'**-এর প্রতি বিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে এমন শিক্ষকও আছেন যারা এ ধরণের বিষয়ের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু অত্যান্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যে সমস্ত হাদীস বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন সেগুলিতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে ছুত (ছোঁয়াচে) বা মো'তাদী রোগের কোন অস্তিত্বই নাই। আবার এমনও হাদীস আছে যাতে প্রমান হয় যে, ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব আছে। এজন্যই অত্র অধ্যায়ে উপরোক্ত শিরনাম দিয়েছি যে, নবী (সাঃ) ত্রুটি বা গরমিল করেছেন। কেবল পাঠকমন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উক্ত শিরনামকে বেছে নিয়েছি। যাতে পাঠকগণ মাসুম রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি উত্থাপিত মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হাদীসগুলি থেকে অবগত হয়ে যান। আর এধরণের হাদীস সমূহকে তুলে ধরার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্যকেও বুঝতে পারেন, যা নবীর (সাঃ) প্রতি নাযিল হওয়া তাঁর জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দিক নির্দেশনা দেয় যা সমস্ত আধুনিক জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এমন কোন সহিহ্-শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নাই যা নবীর (সাঃ) সহীহ্-শুদ্ধ হাদীসগুলির বিপরীত হবে। আর যদি বিপরীত হয় তাহলে বুঝে নেয়া উচিৎ যে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। এটা গেল এক দিক, অন্য দিকে এই সমস্ত হাদীস আবার অন্যান্য হাদীসের বিপরীতে অবস্থান নেয় যা জ্ঞানের দৃষ্টিতে

---

১ সূরা ঃ আত্‌হ্ ১-৩

যে তিনি আমার থেকে আগেই হুশ ফিরে পাবেন না তাকে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত জায়গা দান করা হবে" ।

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুত তাফসীরুল কোরআনে'** সূরা **'ইউসুফ'**-এর আয়াত **'ফামান জায়ার রাসুলু'** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ লুতের উপর রহম করুক যে তিনি কঠিন রুকনের নিকট আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। আমাকে যদি ইউসুফের মত বন্দীশালায় ফেলে দেয়া হতো তখনও আমি কবুল করতাম। যদিও আমার মর্যাদা ইব্রাহীমের চেয়ে বেশী দান করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলেছিল, **"আওয়ালাম তু'মিন"** অর্থাৎ **"তুমি কি ঈমান আনো নাই"** ।

এই সমস্ত মনগড়া হাদীস রচনাকারীগণ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয় নি। বরং রাসুল (সাঃ)-কে তাঁর পরোওয়ারদিগার সম্বন্ধে সন্দিহান করে ছেড়েছে। এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমান হল যে, তার না শাফায়াত করার অধিকার আছে আর না তিনি সাহাবাদের জান্নাতের সু-সংবাদ দিতে পারেন। কারণ তিনি তো নিজের বিষয়েই জানতেন না যে কিয়ামত দিবসে তাঁর কি হবে। আসুন আমার সাথে, বুখারীর রেওয়ায়েত অধ্যয়ন করুন এবং আশ্চার্যানিত হোন বা নাই হোন সেটা আপনাদের এখতিয়ারভুক্ত।

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল কাসাউফ'**-এর **'আল-জানায়েয'** অধ্যায়ে খারেজাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে সাবিত হতে বর্ণনা করেছেন যে ঃ আনসারের এক মহিলা **'উম্মুল ওলা'** যে রাসুল (সাঃ)-এর বায়াত করেছিল, সে বলে যে, "নবী (সাঃ) যখন মোহাজেরদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন তখন উসমান ইবনে মাযউন আমাদের ভাগে পড়লেন। তাকে আমরা নিজেদের ঘরে জায়গা দিলাম। তার এমন কঠিন পীড়া হল যে তাতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। ইন্তেকালের পর গোসল দেয়া হল এবং তারই কাপড়ে তাকে কাফন পরানো হল। রাসুল (সাঃ) যখন প্রবেশ করলেন তখন আমি বল্লাম, "*হে আবু সায়েব! আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুক, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে সবচেয়ে সম্মানিত করেছেন*"। নবী (সাঃ) বল্লেন, "*তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহ্ আমাকে সবচেয়ে সম্মানিত করেছেন*"? আমি বল্লাম, "*আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, তাহলে আল্লাহ্ আর কাকে সবচেয়ে সম্মানিত করবে*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*আল্লাহ্‌র কসম আমি রাসুল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে*"। সেই মহিলা তখন বল্ল, "*খোদার কসম এরপর আর কাউকেই পাক করা হবে না*"।

আল্লাহ্‌র কসম! বড়ই অবাক করার মত কথা। রাসুল (সাঃ) যখন নিজেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন যে, "*আমার কি হবে আমি নিজেই জানি না*" তখন আর কিই বা অবশিষ্ট থাকল? অথচ আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "**বরং মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা ভাল করেই উপলব্ধী করে**"। আবার আল্লাহ্ নিজের নবী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, **"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে**

জ্বি হ্যাঁ, বাতাস রোগ জীবানু এবং ছোঁয়াছে রোগকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। কখনো কখনো বাতাসের কারণে সমস্ত গ্রাম অথবা সমস্ত শহর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর জন্য টীকা ও ইনজেক্‌শন তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় সেই রাসুল (সাঃ) হতে কিভাবে আড়াল হল, যিনি ওহী ছাড়া কথা বলতেন না? ইনিই তো সেই রাব্বুল আলামীনের রাসুল, যার জ্ঞানের বাহিরে কোন কিছুই নাই। জমিন ও আসমানের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নাই। তিনি তো শ্রবনকারী ও সব কিছুরই জ্ঞান রাখেন। এজন্যই আমরা উক্ত হাদীসকে অবিশ্বাস করি এবং কবুল করে নিতে পারি না। তবে হ্যাঁ, বুখারীর এই হাদীসকে স্বীকার করি, যা তিনি উক্ত অধ্যায়েরই একই পৃষ্ঠাতে আবি সালমা হবে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা হতে শুনেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ *"এক রোগীর সেবক যেন রুগীর কাছ থেকে সরে সরাসরি কোন সুস্থ মানুষের কাছে যেন গমন না করে"*। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা যখন এ হাদীসের পূর্বের হাদীসটিকে অস্বীকার করলেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, *"তুমি কি এ কথা বলনি যে, কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়"*। তখন তিনি (আবু হুরায়রা) হাবশী ভাষায় বিড় বিড় করতে থাকেন। আবু সালামা বলেন যে, আমি এভাবে আবু হুরায়রাকে কখনো হাদীস ভুলতে দেখিনি।

উপরোক্ত দুটি হাদীস যে, *'কোন রোগই ছোঁয়াচে নয় এবং কোন সেবককে রোগীর কাছ থেকে উঠে সরাসরী কোন সুস্থ্য মানুষের কাছে গমন করা উচিৎ নয়'* -এর পাশাপাশি বুখারী ও মুসলিম নিজেদের সহীহ্‌র 'কিতাবুস সালাম'-এও লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই হাদীসগুলির মধ্য হতে আমরা এই হাদীসটিকে সহীহ্‌-শুদ্ধ বলে জ্ঞান করি যে, *"রোগীর সেবাকারীকে রোগীর কাছ থেকে উঠে সরাসরি কোন সুস্থ্য মানুষের কাছে যাওয়া উচিৎ নয়"*। হাদীস হচ্ছে রাসুল (সাঃ)-এর কাথা, তিনি কখনোই বিপরীতধর্মী কথা-বার্তা বলতে পারে না। আর ঐ হাদীস যে, *"কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়"* এর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। কারণ উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি চিকিৎসা শাত্রে অজ্ঞ ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্‌)। উক্ত দু'টি হাদীসে গরমিল থাকার কারণেই তো সাহাবারা আবু হুরায়রার সাথে তর্কে লিপ্ত হন এবং প্রথম হাদীস সম্পর্কে জেঁকে ধরেন তখন আবু হুরায়রা উক্ত ঘুর-প্যাঁচ থেকে বাচার কোন পথ খুজে পেলেন না বিধায় হাবশী ভাষায় বিড়বিড় করতে লাগলেন। বুখারীর ব্যাখ্যাকারী ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি রাগের চোটে এমন কথা বল্লেন যা বুঝার অযোগ্য ছিল।

আর যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, রাসুল (সাঃ) আধুনিক জ্ঞান থেকে পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। বিশেষ করে ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে। তা হলো এই যে তিনি মুসলমানদের তাউন (প্লেগ), জযাম (কুষ্ঠ রোগ) এবং ওয়াবা (মহামারী) থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল আম্বিয়া'**-র **'হাদ্দিসনা আবু ঈমান'** অধ্যায়ে এবং অনুরূপভাবে মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুস সালাম'**-এ ওসামা ইবনে যায়দ হতে

যুক্তি সম্মত হয়ে থাকে। অতএব এমন পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত এবং প্রথমটিকে বর্জন করা ওয়াজিব, আর একথাটি বলার অবকাশ রাখে না।

এর উদাহরণে দুশমনদের কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি যা হচ্ছে আলোচনার গুরুত্বপূর্ন বিষয়বস্তু। আর আমাদের জন্য এগুলিই সাহাবা, রাবী ও রচনাকারীদের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছে যেখানে রাসুল (সাঃ)-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, সে জন্যই আমি বুখারী কর্তৃক সংকোলিত দু'টি হাদীসকেই যথেষ্ট জ্ঞান করছি, কারণ আহলে সুন্নাতগণের নিকট বুখারীই হচ্ছে সর্বাধিক সহীহ্-শুদ্ধ গ্রন্থ। যেন ব্যাখ্যাকারীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে না পারেন এবং কেউ এমন কথা বলতে না পারে যে এ হাদীসটি বুখারীর নিকট প্রমানি নয়। পাঠকমন্ডলী জানেন যে, অত্র অধ্যায়ে আমি বুখারী কর্তৃক হাদীসে ত্রুটি-বিচ্যুতি করার উদাহরণ উপস্থাপন করাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করেছি।

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুত তিব**'-এর '**আল-হামা**' অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ *"না কোন মো'তাদী (ছোঁয়াচে) রোগ আছে আর না সফর দহামা (মহামারী) বলে কোন জিনিস আছে"*। এক গেঁয়ো ব্যক্তি বল্ল, *"ইয়া রাসুলুল্লাহ্! ঐ উটগুলি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি, যারা মরুতে হরিণদের মত চলা ফেরা করে। আবার তাদের দলে চুলকানি রোগে আক্রান্ত কোন উট যখন মিশে যায় তখন সবাই উক্ত রোখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে"*? রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "*এই রোগ, উটটি প্রথমে কোথা থেকে লাগাল*"?

লক্ষ্য করুন! উক্ত গেঁয়ো লোকটি নিজের প্রকৃতি দ্বারা কেমন করে ছোঁয়াচে রোগের সন্ধান করল যে, চুলকানি রোগে আক্রান্ত একটি উট যখন অন্যান্য উটের সাথে মিশে যায় তখন সবাই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু রাসুল (সাঃ)-এর নিকট এর কোন সদুত্তর ছিল না, সেহেতু তিনি উল্টা গেঁয়ো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন যে, '*প্রথমে উটটি উক্ত রোগ কোথা হতে লাগিয়েছে*'।

এ স্থানে আমার সেই চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যার কাছে একদা এক মহিলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত তার শিশুকে নিয়ে আসে। (বাচ্চাকে দেখে) চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করল, *"তোমার আশেপাশে এমন কোন ব্যক্তি আছে যার বসন্ত রোগ হয়েছে"?* মহিলাটি বল্ল, "*মোটেই না*"। চিকিৎসক বল্ল, "*তাহলে হয়তো মাদ্রাসা হতে ছেলেটি উক্ত রোগ বাধিয়েছে*"। মহিলাটি তড়িৎ উত্তর দিল, "*জ্বি না, সে এখনো মাদ্রাসায় ভর্তি হয় নি,কারণ এর বয়স মাত্র ৫ বছর*"। তখন চিকিৎসক বল্ল, "*তাহলে তুমি তাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে অথবা তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমার কাছে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে এই রোগের জীবানু ছিল*"। মহিলাটি আবার না সূচক মাথা নাড়ল। তখন চিকিৎসক বল্ল, "*তাহলে এই জীবানুটি বাতাসে ভর করে ছেলেটি পর্যন্ত এসেছে*"।

বলে বিবেচিত হবেন এবং নতুন প্রজন্মের সম্মুখে মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করবেন যা ইসলামের মূল বাণির আয়না স্বরূপ হবে।

"হে মু'মিনগণ! মুসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে"। [১]

---

১ সূরা ঃ আহযাব, ৬৯-৭১

রেওয়ায়েত করেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ "*তাউন হচ্ছে একটি রিজস্ যা নবী ইসরাইলের একটি দলের উপর অথবা তোমাদের পূর্বের লোকগুলির উপর পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা যখন শুনবে যে, সেখানে তাউন আছে তাহলে সেখানে যাবে না। আর যদি সে স্থানে 'তাউন' ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ তাহলে সেটা বাঁচার জন্য ঐস্থান থেকে পালিয়ে যাবে না*"। অপর একটি হাদীসে আছে যে, "*সেখান থেকে পালিয়ে যাও*"। এর অর্থে রাসুল (সাঃ)-এর এই কথাটি সত্য যে, "*কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ্যের কাছ থেকে এমন ভাবে পালাবে ঠিক যেমন সিংহের কাছ থেকে পালাও*"। তাঁরই (সাঃ) নির্দেশ হচ্ছে যে ঃ "*পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস নিও না*"। অনুরূপভাবে তাঁরই নির্দেশ হচ্ছে যে, "*ছয় বার পানি দ্বারা আর একবার মাটি দ্বারা পাক করে নাও*"।

এসব কিছুই উম্মতকে সুস্থতা, পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য সম্মত জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। রাসুল (সাঃ) এমন কথা বলেননি যে, "*যখন কোন জিনিসে মাছি পড়ে যায় তখন মাছিটিকে পুরোপুরি চুবিয়ে দাও*"।

এতে তো আমরা খোলা-খুলি ভাবে বৈপরীত্ব লক্ষ্য করি। এমনকি হামার ব্যাপারেও যেটা থেকে আরবরা দশগুন নিতো। হামা হচ্ছে একটি পাখি যা রাতের বেলায় উড়ে বেড়ায়। একে পেঁচাও বলা হয়। মালিক ইবনে আনাস এমন অর্থই বয়ান করেছেন। সুতরাং রাসুর (সাঃ) যখন বলেছেন যে হামার দ্বারা কিছুই হয় না তাহলে তাবীজ কেন তৈরী করেন।

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাব বদাউল খল্ক'**-এ যায়েদ ইবনে জবীর হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন যে ঃ "*রাসুল (সাঃ) হাসান ও হুসাইনের জন্য তাবীজ তৈরী করতেন, আমাদের দাদা ইব্রাহীমও ইসমাইল ও ইসহাকের জন্য এভাবেই তৈরী করতেন*" [১]

জ্বি হ্যাঁ, আমি এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত বিপরীতমুখী ও ক্রটিযুক্ত কিছু হাদীসের উদাহরণ উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষন করেছিলাম যেগুলিকে রাসুল (সাঃ)-এর দিকে নিসবাত করা হয়েছে। অথচ রাসুল (সাঃ) এগুলো থেকে সম্পূর্ন রূপে মুক্ত। এ ধরণের আরো শত শত বিপরীতমুখী ও ক্রটিযুক্ত হাদীস আছে যেগুলিকে বুখারী ও মুসলিম নিজেদের সহীহ্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আপাততঃ আমরা সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছি। কারণ আমি সর্বদাই পাঠকমন্ডলীকে সংক্ষিপ্ততা ও ইশারা-ইংগিতের জন্য অভ্যস্ত করে ফেলেছি। গবেষকদের এই ব্যাপারে গবেষণা করা উচিত। অদূর ভবিষ্যতে তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসগুলোকে পাক সাফ করে দিবে এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দিবে এবং তারা **'হক'**-কে **'বাতিল'** থেকে পৃথক করার কারণ

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ১১৯।

সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু যারা হৃদয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে উপস্থিত হবে তাদের ব্যতিত।

এ সমস্ত বিষয়াবলীর পাশাপাশি সেই সমস্ত মুমিনদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে যারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে জানতে ও বুঝতে পেরেছেন এবং শাসক, খলিফা ও রাজা-বাদশাদেরকে গণনার মধ্যেই আনেন নি।

আমার মনে আছে যে আমি তখন কঠিন বিরোধিতার মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলাম যখন আমি বুখারীর এই হাদীসের সমালোচনা করেছিলাম যে, **"হযরত মূসা (আঃ) মালাকুল মাওতকে চড় মেরে তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন"**। এমন কি তখন আমাকে দ্বীন থেকে খারিজ এবং কাফের বলা হল এবং বলা হল যে বুখারীর প্রতি সমালোচনা করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? চেচা-মেচী ও হৈ-হুল্লোড় করতে করতে তারা আমার চারিপাশে জমায়েত হয়ে গেল। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি **'আল্লাহ্‌র কিতাব'**-এর কোন আয়াতের সমালোচনা করে ফেলেছি।

বাস্তবতা তো এই যে, গবেষক যখন অন্ধ অনুকরণের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এবং বেহুদা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে 'বুখারী' এবং 'মুসলিম' গ্রন্থ্য দু'টি অধ্যয়ন করবে তখন সে অবশ্যই সেগুলিতে বড় আজব আজব বিষয়াবলী দেখতে পাবে, যা আরবের বেদুইনদের বিবেক-বুদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তাদের চিন্তা-ভাবনা স্থুল, তারা যতসব বাজে কিস্‌সা-কাহিনীর প্রতি ঈমান পোষন করে থাকে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা আজব সব বিষয়াবলীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর এটা কোন আজব বিষয় নয় আর না আমরা সেটাকে বিবেক-বুদ্ধির ঘাটতি বলতে পারব। কেননা তাদের যুগ আধুনিক টেকনোলজির যুগ ছিল না, আর না টেলিভিশন ও টেলিফোনের ব্যবহার ছিল আর না মিসাইল ইত্যাদীর জামানা ছিল।

আবার আমাদের ইচ্ছা এমনটিও নয় যে, এই সমস্ত বিষয়াবলীকে রাসুল (সাঃ)-এর সাথে সংমিশ্রণ করে দিব, কারণ এতে বিরাট ব্যবধান আছে। ইনি হলেন সেই রাসুল যাকে আল্লাহ্ তায়ালা অশিক্ষিতদের মাঝে পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন এবং কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করেন। আর যেহেতু তিনি হলেন খাতেমুল আম্বিয়া ও মুরসালীন, সে জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আওয়াল ও আখেরের সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন।

যেমনটি আমরা সুধি পাঠকমন্ডলীর দৃষ্টি ইতিপূর্বেই এই দিকে আকৃষ্ট করিয়েছি যে বুখারীর ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত যা রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি সম্পর্কিত হয়েছে, সেগুলি নবীর (সাঃ) হাদীস নয়। বুখারী নবীর (সাঃ) কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করার পরপরই বিভিন্ন সাহাবাদের রায়ও লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। যার দরুন পাঠকরা সন্দিহান হয়ে পড়েন যে সাহাবাদের রায়ও হচ্ছে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস, অথচ সেগুলি রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি ঃ

অষ্টম অধ্যায়

বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে

আহলে সুন্নাতগণের নিকট এই দুই গ্রন্থ অনেক গুরুত্ব বহন করে। দ্বীনের আলোচনায় আলেমগণের জন্য এগুলিই হচ্ছে 'আসাসী' ও 'আউয়ালীন মাসাদিও' (ভিত্তি ও প্রাথমিক উৎস)। অথচ কিছু কিছু গবেষকদের জন্য এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েগেছে যে তারা এই সমস্ত বিপরীতমূখী ও বাজে বিষয়াবলীকে কিভাবে স্পষ্ট করবেন যা তারা এই ভিত্তি ও উৎসগুলোতে দেখতে পান। তারা এগুলোকে তেঁতো ঢোক মনে করে গলাধ্বকরণ করেন এবং ভয়-ভীতির কারণে জাতির সামনে প্রকাশ করেন না। কেননা তাদের অন্তরে উক্ত দুই কিতাবের জন্য অনেক মর্যাদা ও সম্মান লুকায়িত আছে। বাস্তবতা তো এটাই যে, বুখারী ও মুসলিমও কখনো এই কথা মেনে নিতে পারেন নি যে, উলামাদের মধ্যেকার আর কেউ তাদের সমকক্ষ্য হোক।

আমরা তাদের প্রতি সমালোচনা এবং তাদের উদ্দেশ্যের উপর থেকে পরদা সরানোর সংকল্প শুধু এ কারণেই করেছি যেন আমাদের নবীর (সাঃ) পবিত্রতা এবং **'মাসুমিয়াত'**-কে প্রমান করা যায়। আর এই পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে যখন সাহাবাগণ সমালোচনার কবল থেকে বাঁচতে পারেন নি, তখন বুখারী ও মুসলিম তো রাসুল (সাঃ)-এর নিকটে ওঠ-বসকারীদের চেয়ে কিছুতেই উত্তম নন।

আমাদের উদ্দেশ্য হল রাসুলে আরবীর (সাঃ) মান-মর্যাদা রক্ষা করা এবং আমরা তাঁর নিষ্পাপতাকে প্রমান করার চেষ্টা করব, যদিও বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি হলেন সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও খোদাভীরু। আর আমাদের আকীদা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে নির্বাচিত করেছে যেন তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমত হয়ে যান এবং সমস্ত জিন ও ইনসানের প্রতি তাঁকে নবী বানিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে তার পবিত্রতার প্রতি উৎসর্গ হওয়া এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছেন। এবং তাঁর বিষয়ে অযথা নাক গলানো থেকে নিষেধ করেছেন। আর এ জন্যই আমাদের কাছে এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে দাবী জানিয়েছেন যেন সেই সমস্ত বিষয়াবলীকে ত্যাগ করি যা তাঁর উন্নত চরিত্রের বিরুদ্ধে যায় এবং সেই সমস্ত বিষয়ও পরিহার করি যা তাঁর নিষ্পাপতার বিরুদ্ধে যায় এবং তাঁর সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের সমকক্ষ্য না হয়। সুতরাং, সাহাবা, তাবেয়ীন, সমস্ত মুহাদ্দেসীন এবং সমস্ত মুসলমান এমনকি সমগ্র মানুষ তাঁর দয়া ও বুজুর্গির মুখাপেক্ষী। অতএব সমালোচনাকারী এবং হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদের অদূরভবিষ্যতে (যেমনটি তাদের অভ্যাস আছে) রক্ত টগবগ করবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর তা হবে সেই দিনের জন্য ধন-ভান্ডার, সঞ্চয় এবং উপঢৌকন, যেদিন ধন-

ধ্যান-ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিবর্গেকে উপস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছি। ঐ বুখারী সাহেবই **'মানাকিবুল মোহাজেরীন'** অধ্যায়ে উক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি পাঠকবৃন্দকে বিশ্বাস করাতে চান যে, এটি হল রাসুল (সাঃ)-এর রায় বা মত। কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝা যায় সেটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) রায় যিনি হযরত আলীর (আঃ) শত্রু ছিলেন।

অতি শীঘ্রই আমি বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলীর সম্মুখে হযরত আলীর (আঃ) সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়াবলীতে বুখারীর নীতিকে উপস্থাপন করবো এবং এও বলে দিব যে তিনি তাঁর **'ফাযায়েল'**-কে গোপন করার বিষয়ে কতই না সচেষ্ট ছিলেন এবং দোষারোপ করার সুযোগে ছিলেন। যেমনটি বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব **'বদাউল খলক'**-এর **"হাদ্দিসনার হামীদী"** অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া হতে রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন যে তিনি বলেন ঃ "আমি আমার পিতাকে বল্লাম, '*রাসুলের পরে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে?*' তিনি বল্লেন, '*আবু বকর*'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, '*তাঁর পরে?* বল্লেন, '*উমর*' (মুহাম্মদ হানাফিয়া বলেন) আমার ভয় হল যেন উমরের পরে উসমানের নাম না বলে ফেলেন, সেজন্যই আমি আগে ভাগেই বল্লাম, '*তাঁর পরে*'। তিনি বল্লেন, '***আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ***'।

জ্বি হ্যাঁ, তারা এই হাদীসটি রচনা করে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার দিকে নিসবাত করে দিয়েছে। এটা হুবহু সেই হাদীস যা ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের (রাঃ) মুখে বয়ান হয়েছে। দুটোরই ফলাফল একই। যদিও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ভীত ছিলেন যে, এমন না হয় যে তৃতীয় নম্বরে তার পিতা মহোদয় উসমানের নাম বলেন দেন। কিন্তু তার পিতা এই কথা বলে তার কথাকে প্রত্যাখান করে দিলেন যে, '***আমি তো একজন সাধারণ মানুষ***'। এর দ্বারা এ কথা প্রমানিত হয় যে হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ্য। কেননা, আহলে সুন্নাতের কোন ব্যক্তিই এমন কথা বলে না যে উসমান (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল। বরং তারা বলেন যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবু বকর (রাঃ) ছিলেন, তারপর উমর (রাঃ) এবং তারপর উসমান (রাঃ), তারপর আমরা নবীর (সাঃ) সকল সাহাবাকে সমান গণ্য করতাম। কাউকে কারোর উপর ফজিলাত দিতাম না, কারণ বাকী সবাই সমান ছিলেন।

বুখারী কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসের প্রতি আপনাদের আশ্চর্য লাগে না? তার প্রতিটা হাদীসেরই এই একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল যেন হযরত আলী (আঃ)-কে প্রত্যেক ফজিলাত থেকে বঞ্চিত প্রমান করা যায়। এর দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, বুখারী সেই সমস্ত বিষয়াবলীকেই লিখেছেন যা বনী উমাইয়া, বনী আব্বাস এবং তাদের শাসকবৃন্দের মন-মর্জি মাফিক হয়েছে। তার পুরো প্রচেষ্টা আহলে বাইত (আঃ)-এর মানহানীতেই নিঃশেষ হয়েছে। যারা হাকীকাত থেকে জ্ঞাত হতে চান তাদের জন্য এগুলি হচ্ছে নিবিড় দলিল।

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল হীল'**-এর **'আন্নিকাহ'** অধ্যায়ে [১] আবু হুরায়রা হতে এবং তিনি রাসুল (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন ঃ *"কুমারী মেয়েদেরকে অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা উচিৎ নয় এবং বিবাহিতাকে পরামর্শ ছাড়াই বিবাহ করা উচিৎ নয়"*। বলা হল, *"ইয়া রাসুলুল্লাহ্! এই অনুমতির ধরণ কি হবে"?* তিনি বল্লেনঃ "*তার চুপ থাকা*'। কিছু কিছু লোকেরা বল্ল যে, কুমারী যদি অনুমতি না দেয় যদিও সে বিবাহ না করে থাকে এবং কোন ব্যক্তি ছল-চাতুরি মাধ্যমে দু'জন মিথ্যা স্বাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষ্য দেয় যে, '*আমি এই মহিলার সাথে বিবাহ করেছি,* তাহলে কাজী উক্ত বিবাহকে সহীহ্ বলে ঘোষণা দিবে। অথচ তার স্বামী এ কথাটি জানে যে এই স্বাক্ষ্যটি মিথ্যা। অতএব তার সাথে সহবাস করাতে কোন দোষ নাই এবং এই বিবাহটি সহীহ-শুদ্ধ হবে।

বুখারীর এই তথ্য কর্মটির প্রতি লক্ষ্য করুন, রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস শেষ করা মাত্র লিখেছেন যে, কিছু কিছু লোকেরা বলল। সুতরাং কিছু অজ্ঞাত লোকের স্বাক্ষ্য দেয়াতে বিবাহ সহী-শুদ্ধ হয়েগেল। এখানেই পাঠকগণ ধোকায় পড়ে যান যে, এটাই হল রাসুল (সাঃ) দৃষ্টি ভঙ্গী। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

দ্বিতীয় উদাহারণ ঃ বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাব বদাউল খলক'**-এর **"মানাকিবুল মোহাজেরীন ওয়া ফাযালুহুম"** অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেনঃ "*আমরা রাসুল (সাঃ)-এর জামানাতে আবু বকরের সমতুল্য কাউকেই জ্ঞান করতাম না, তারপর উমরকে, তারপর উসমানকে তারপর নবীর সমস্ত সাহাবা সমান ছিলেন এবং কারোর প্রতি কারোর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না*'।

এটা হল আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) রায় এবং তিনিই এর দায়-দায়ীত্ব বহন করবেন। অথচ এই কথা কেমন করে সম্ভব হবে, কারণ রাসুল (সাঃ)-এর পরে তো হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এখানে তার কোন আলোচনাই হয় নি এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে সাধারণ সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন? সেজন্যই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আলী (আঃ)-এর বায়াত অস্বীকার করেছিলেন, যদিও হযরত আলী (আঃ) তার মাওলা ছিলেন। কেননা ***"আলী যার মাওলা নন সে মু'মিন নয়"*** [২]।

আর রাসুল (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ **"হক আলীর সাথে আর আলী হকের সাথে"** [৩] অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)-এর শত্রু এবং মু'মিনদের দুশমন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তির বায়াত করেছিলেন। আমরা এধরণের আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু পাঠকমন্ডলীর সম্মুখে বুখারী এবং তারই মত

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৮, পৃঃ ৬২।

২ **সোয়ায়েক্বে মুহরিকা**, পৃঃ ১০৭।

৩ **সহীহ্ তিরমিযি**, খঃ ৫, পৃঃ ২৯৭ এবং **মুস্তাদরাকে হাকিম**, খঃ ৩, পৃঃ ১২৪।

বল্লাম, "*পুরুষদের মধ্যে*"। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*তার পিতা*"। আমি বল্লাম, "*তার পর*"। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*উমর ইবনে খাত্তাব, তারপর সকলেই সমান*"।

রচনাকারীরা উক্ত হাদসিটি তখন রচনা করলেন, যখন তারা জানতে পারলেন যে, ৮ম হিজরীতে (অর্থাৎ নবীর ওফাতের ২ বছর পূর্বে) নবী (সাঃ) 'জাতে স্লাসিল' নামক যুদ্ধের জন্য আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং ঐ বাহিনীর মধ্যে আবু বকর ও উমরও (রাঃ) শরীক ছিলেন। সুতরাং তারা এই হাদীস দ্বারা সেই ব্যক্তির মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে যে এই কথা বলতে পারে, যে আমরু ইবনুল আস তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অতএব হাদীস রচনাকারীরা স্বয়ং আমরু ইবনুর আসের মুখেই রেওয়ায়েত করিয়ে নিল। আবার আয়েশা (রাঃ)-কে এভাবে চুপ করিয়ে দিল যে একদিকে তো তার সন্দেহকে দূর করল এবং অন্য দিকে আয়শা (রাঃ)-কে চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হল।

এ কারণেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে ইমাম নূদী মুসলিমের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, "*এগুলি হচ্ছে আবু বকর, উমর ও আয়শার ফাযায়েলের ব্যাখ্যা এবং এতে আহলে সুন্নাতের জন্য স্পষ্ট দলিল নিহিত আছে যে, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবু বকর এবং তারপর উমর*"।

উক্ত রেওয়ায়েতের প্রতিও অন্যান্য দূর্বল রেওয়ায়েতগুলির মত দাজ্জালগণ সে বিষয়ে জ্ঞান করেনি বরং আলী ইবনে তালিব (রাঃ)-এর মুখ দিয়ে একটি রেওয়ায়েত রচনা করে ফেললো এবং নিজেদের খোড়া অহংকারে তারা সেটাকে শিয়াদের প্রতি হুজ্জাত বলে ঘোষণা দিয়েছে যারা হযরত আলী (আঃ)-কে সকল সাহাবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর অন্য দিকে মুসলমানদের এভাবে ধোকা দিল যে, আবু বকর ও উমরের (রাঃ) প্রতি আলী (রাঃ)-এর কোন অভিযোগই ছিল না। বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব **'ফাযায়েলে আসহাবুন নবী'**-র **"মানাকিবে উমর ইবনে খাত্তাব"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **"ফাযায়েলে উমর"** অধ্যায়ে আলী (আঃ) ও ইবনে আব্বাস (সাঃ) হতে নকল করেছেন যে তিনি বলেন যে ঃ "উমরকে খাটের উপর শোয়ানো হল, লোকজন তার আশে পাশে জড় হয়ে গেল এবং তার জন্য দোয়া করল, আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি কেউ লক্ষ্য করিনি। এক ব্যক্তি আমার ঘাড় ধরে দাড়িয়ে ছিল, তিনি ছিলেন আলী। যিনি বল্লেন, '*আল্লাহ্ উমরের প্রতি রহম করুক*", তারপর বল্লেন, '*তোমার পরে আমার নিকট আর কোন ব্যক্তিও প্রিয় নয় যে তোমার মত নিজের আমলসহ আল্লাহ্‌র সাথে মোলাকাত করেছে এবং আল্লাহ্‌র কসম আমার বিশ্বাস যে আল্লাহ্ আপনাকে আপনার বন্ধুর (মুহাম্মদ সাঃ) পাশে জায়গা দান করবে*'। আমার স্মরণ আছে যে, আমি নবী (সাঃ) বারংবার বলতে শুনেছি যে, '*আমি, আবু বকর ও উমর (অমুক জায়গায়) গেলাম। আমি এবং আবু বকর ও উমর (অমুক জায়গায়) প্রবেশ করলাম। আমি এবং আবু বকর ও উমর (অমুক জায়গার জন্য) বের হলাম*"।

বুখারী ও মুসলিম আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর ফজিলাত বয়ান করেছেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব **'বদাউল খলক'**-এর **"হাদ্দেসনাল ঈমান"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র কিতাব **'ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **"ফাযায়েলে আবু বকর সিদ্দিক"** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন ঃ রাসুল (সাঃ) সকালের নামাজ আদায় করে লোকজনের নিকট এস বল্লেন, "*কেউ গরুর উপর সোয়ার হয়ে তাকে তাড়ায় তখন ঐ গরুটি বলে যে আমি এর জন্য পয়দা হয় নি বরং আমাকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে*"। লোকেরা বল্ল, "*সুবহান আল্লাহ্! গরুও কি কথা বলে*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*নিঃসন্দেহে আমাকে, আবু বকর ও উমরকে এটার জন্য আমীন বানানো হয়েছে*"। অথচ আবু বকর ও উমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, "আর যখন কোন ব্যক্তি নিজের ভেড়া ও ছাগলগুলিকে ছেড়ে দেয় এবং হায়না কোন ছগলকে তুলে নিয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি খোজ লাগিযে তাকে হায়নার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়, তখন হায়না তাকে বলে, '*আজ তো তুমি তাকে আমার থেকে রক্ষা নিলে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাকে কে রক্ষা করবে, সেদিন আমি ছাড়া তার কোন রাখাল হবে না*'। লোকেরা বল্ল, "*সুবহান আল্লাহ্! হায়নাও কি কখনো কথা বলে*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*নিঃসন্দেহে আমাকে, আবু বকর ও উমরকে এর জন্য আমীন বানানো হয়েছে*" এবং আবু বকর ও উমর সেখানে ছিলেন না। [১]

উক্ত হাদীসটিও ঐ দু'জন খলিফার ফাযায়েলকে বাড়ানোর জন্য রচনা করা হয়েছে। অন্যথায়, রাসুল (সাঃ)-এর সাহাবীরা তাঁর কথাকে কেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিলেন। এমনকি তাঁকে বলতে হল যে, **"আমাকে, আবু বকর ও উমরকে এর জন্য আমীন বানানো হয়েছে"**। তারপর রাবীর তাকীদসহ এই কথার প্রতি লক্ষ্য করুন যে, **"সেখানে আবু বকর ও উমর উপস্থিত ছিলেন না"**। এগুলি এমনই সব হাস্যকর ফাযায়েল যার কোন বাস্তবতা নাই। কিন্তু ডুবন্ত মানুষের মত খড়কুটোর আশ্রয় সন্ধান করে থাকে। আর যখন হাদীস রচনাকারীরা তাদের (খলিফাদের) সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা খুজে পান না তখন তারা নিজের পক্ষ থেকে এ ধরণেরই ফাযায়েল রচনা করে ফেলেন যা সম্পূর্ণ রূপে মনগড়া ও তাদের খেয়াল-খুশির আবিস্কার হয়ে থাকে। সেগুলির ভিত্তি কোন জ্ঞানগত যুক্তি-তর্ক এবং ঐতিহাসিক দলিল নির্ভর হয় না। যেমনটি বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাব ফাযায়েলে আসহাবুন নবী'**-র **'কাওলুন্নবী, লাও কুন্তু মুত্তাখেযা খলিলা"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **'তিন ফাযায়েলে আবি বকর সিদ্দিক'** অধ্যায়ে আমরু ইবনুল আস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী (সাঃ) তাকে 'জাতে স্লাসিলের' লস্করে প্রেরণ করলেন। সুতরাং আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বল্লাম, "*আপনার কাছে সবার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটি কে*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*আয়শা*"। আমি

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৪, পৃঃ ১৪৯।

তিনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন'। লোকেরা বল্ল, *'ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন'?* তিনি (সাঃ) বল্লেন, '***এর অর্থ হল দ্বীন***'।

সুতরাং নবী (সাঃ), হযরত উমর (রাঃ)-এর পোষাকের ব্যাখ্যা যখন 'দ্বীন' করেছেন, তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সমস্ত মানুষের চেয়ে উত্তম বিবেচিত হর্লেন। কেননা ঐ বেচারাদের বুক পর্যন্তও 'দ্বীন' পৌছাতে পারে নি অর্থাৎ তাদের কলব হতে দ্বীন আগে বাড়ে নি। অথচ উমর (রাঃ) মাথা থেকে পায়ের বুড়া আঙ্গুল পর্যন্ত দ্বীনে পরিপূর্ণ বরং এর চাইতেও অধিক কেননা তিনি 'দ্বীন'-কে টেনে টেনে হাঁটছেন। তাহলে তার সম্মুখে আবু বকরের (রাঃ) মর্যাদা কোথায় রইল যার ঈমানের পাল্লা সমগ্র উম্মত-এ-মুহাম্মদীর চেয়ে ভারি?

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল ইলম**'-এর '**ফাযালুর ইলম**' অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা**'-র "**ফাযায়েলে উমর**" অধ্যায়ে ইবনে উমর হতে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন যে আমি রাসুল (সাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ "*আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার সম্মুখে দুধের পেয়ালা আনা হয়েছে। অতঃপর আমি এতো পরিমানে পান করলাম যে আমার নখ হতে ঝর্ণা ফুটে বের হল। অবশিষ্ট পানি আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে দিয়ে দিলাম*'। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, '*আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন*'? তিনি বল্লেন, '***ইলম্ তথা জ্ঞান***'।

আমি বলতে চাই যে, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং মূর্খরা কি সমান? উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন দ্বীনের বিষয়ে আবু বকর (রাঃ) এবং পুরো উম্মতের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছেনই এবং এই রেওয়ায়েতের আলোকে তিনি জ্ঞানের দিক থেকে সবার উপরে অবস্থান করছেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর পরে তিনিই মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানী।

এবার আর একটি ফযিলাত বাকী থেকে গেছে, যার দিকে লোকেরা আকৃষ্ট হয় এবং সেটার দ্বারা সজ্জিত হতে চান। আর এ হল সেই সমস্ত প্রশংসিত গুনাবলীর মধ্যে থেকে যাকে আল্লাহ্ ও রাসুর (সাঃ) এবং সমস্ত মানুষ প্রিয় গণ্য করে থাকে এবং সকলেই সে পর্যন্ত পৌছাঁতে চেষ্ট করে, তা'হলো বীরত্ব। রেওয়ায়েত রচনাকারীদের জন্য জরুরী ছিল যেন এ বিষয়েও কোন হাদীস রচনা করে ফেলেন। সুতরাং তারা আবু হাফসার (রাঃ) ব্যাপারে হাদীস রচনা করল।

বুখারী তার সহীহ্‌র '**কিতাব ফাযায়েলে আসহাবুন নবী**'-র "**কাওলুন্নবী, লাও কুন্ত মুত্তাখেযা খলিলা**" অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা**'-র "**ফাযায়েলে উমর**" অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বল্লেন, আমি নবী (সাঃ) হতে শুনলাম যে তিনি বলছিলেন ঃ "*আমি স্বপ্নে একটি কুপ দেখলাম যার উপরে (ডোল) পানি উত্তোলনের পাত্র পড়ে ছিল। আমার যতটা সম্ভব হল পানি উত্তোলন করলাম। অতঃপর ডোল ইবনে আবি কোহাফা (আবু বকর) নিয়ে নিলেন। তিনি এক বা দুই ডোল উত্তোলন করলেন। তার ডোল টানাতে দূর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তার দূর্বলতাকে ক্ষমা*

জ্বি হ্যাঁ, এই হাদীসের জাল হওয়া তো স্পষ্ট। এর দ্বারা তো সেই রাজনীতির গন্ধ আসছে, যে রাজনীতিটি ফাতিমা যাহরা (সাঃআঃ)-কে (প্রত্যেক বিষয় হতে) আলাদা করেছে। তাঁকে পিতার পাশে দাফন হতে দিল না। অথচ তিনিই সবার আগে রাসুল (সাঃ)-এর কাছে পৌছেছেন। রাবী সম্ভবতঃ *'আমি, আবু বকর ও উমর গেলাম; আমি, আবু বকর ও উমর প্রবেশ করলাম; আমি, আবু বকর ও উমর বের হলাম'* বাক্যটির পরে **'আমি, আবু বকর ও উমর একত্রে দাফন হব'** শব্দটি যোগ করতে ভুলে গেছেন।

এমন ধরণের মনগড়া রেওয়ায়েতের প্রতি, যেগুলিকে ইতিহাস ও ঘটনাবলী মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, আপত্তিকারীগণ এড়িয়ে গেছেন। অথচ এই বিষয়ে মুসলমানদের কিতাবাদি ভরপূর হয়ে আছে যে, ইমাম আলী ও ফাতেমা (সাঃআঃ)-এর জীবদ্দশায় আবু বকর ও উমর (রাঃ) তাঁদের প্রতি জুলুম করেছেন। তারপর আপনারা যদি রেওয়ায়েতের প্রতি মনোযোগ দেন তখন জানা যাবে যে, রাবী হযরত আলী (আঃ)-কে একজন 'আগন্তুক ব্যক্তির' চরিত্রে উপস্থাপন করেছে, যে একজন অচেনা লোকের মাইয়্যতের উপর দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছে, তখন দেখে যে লোকজন তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তার জন্য দোয়া চাচ্ছে। তিনি ইবনে আব্বাসের ঘাড় ধরে দাড়িয়ে আছেন যেন খুব ধীরে তার কানে কানে কিছু বলার জন্য পিছনের দিকে টানছেন। অথচ স্বীকৃত বিষয় তো এটাই যে, হযরত আলী (রাঃ) সবার আগে ছিলেন এবং তিনি সবার সাথে নামাজ পড়ে ছিলেন এবং দাফন পর্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন।

প্রত্যেক ইতিহাস বেত্তাগণই অবগত আছে যে, বনী উমাইয়ার যুগে মুয়াবিয়ার নির্দেশে লোকজনের মাঝে হাদীস রচনা করার বিষয়ে প্রতিযোগিতা হত। মুয়াবিয়া আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর ফাযায়েলের তুলনায় আবু বকর ও উমরের (রাঃ) ফাযায়েলকে বৃদ্ধি করতে চাইত। সেজন্যই রাবীদের বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দূর্বল, হাস্যকর ও বিপরীতমুখী হাদীসগুলো অস্তিত্ব লাভ করল। কেননা হাদীস রচনাকারীদের মধ্যে 'বনু তামিম' গোত্রভুক্তরাও ছিল যারা আবু বকরের (রাঃ) উপর কাউকে প্রাধান্য দিত না। তাদের মধ্যে 'বনু আ'দুবী'রাও ছিল যারা উমরের (রাঃ) উপর কাউকেই প্রাধান্য দিত না। আর বনী উমাইয়ারা তো উমরের (রাঃ) ব্যক্তিত্বকে রাসুল (সা)-এর ব্যক্তিত্বের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দিত। এ বিষয়ে তারা কাউকেই পরোওয়াহ করত না। উমরের (রাঃ) প্রশংসায় তারা প্রায়ই এমন সব হাদীস রচনা করেছে যেখানে তাকে আবু বকরের (রাঃ) উপর ফজিলাত দেয়া হয়েছে। সুধী পাঠকমন্ডলী! আপনাদের সম্মুখে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি ঃ

মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **"ফাযায়েলে উমর"** অধ্যায়ে এবং বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ঈমান'**-এর **"তফাযিলু আহলুর ঈমানু ফিল আ'মাল"** অধ্যায়ে আবু সাঈদ খুদরী হবে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ "*আমি স্বপ্নে দেখলাম যে লোকজনকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হচ্ছে। তারা এমন পোষাক পরে আছে যা বুক পর্যন্ত বা তার চেয়ে কম হবে। উমর ইবনে খাত্তাবকে যখন আমার সম্মুখে আনা হল তখন দেখা গেল তিনি এমন পোষাক পরে আছেন যাকে*

সম্মুখে লোকজনকে হাজির করা হল'। কখনো বলেন **'যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন আমার নিকট দুধের একটা পেয়ালা আনা হল'**। আর কখনো বলেন, **'ঘুমের মধ্যে যখন স্বপ্ন দেখছিলাম তখন একটা কূপ দেখলাম'**। আবার **'যখন ঘুমের ঘোরে ছিলাম তখন আমাকে জান্নাত দেখানো হল'**। সম্ভবতঃ উক্ত হাদীসের রাবী শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন দেখতো, তাই সে নবীর (সাঃ) পবিত্র মুখ দিয়েও (নিজের পক্ষ থেকে) হাদীস রচনা করে ফেলল। রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই যখন কত মিথ্যা হাদীস রচনা করা হয়েছে তখন তাঁর ইন্তেকালের পর কেমন অবস্থা হয়েছিল? নিশ্চয়ই উম্মত বদও যুদ্ধে গিয়েছিল, একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল, দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক দলই যার যার আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে সুখী ছিল। কিন্তু একটা জিনিস বাকী ছিল, সেটাকে ইতিহাস বেত্তাগণ এবং উমরের (রাঃ) সাহায্যকারীগণ বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই যে, হযরত উমরের (রাঃ) চরিত্রের কাঠিন্যতা ও এক গুয়েমী এবং রাগ -যার কারণে হযরত উমর (রাঃ) সমস্ত মানুষের উপর অত্যাচার করতেন। আর এমন রাগী ও কঠিন চরিত্রের মানুষের প্রতি কেউ কখনো ভালবাসা পোষণ করে না। সুতরাং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ **"যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত"**।[১]

কিন্তু হযরত উমরের (রাঃ) ভক্তবৃন্দরা মানদন্ডকে পরিবর্ত করে ফেল্লেন। তারা দোষ-ক্রটিকে মর্যাদা এবং জঘন্যতাকে **'ফজিলাত'** বলে চালিয়ে দিলেন। তারা তাদের বোকামী এবং অজ্ঞানতার কারণে রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদাকে ক্ষুন্নকারী রেওয়ায়েতগুলি রচনা করলেন। তাও আবার সেই নবী সম্পর্কে যার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, **"রাসুল কোন মন্দ চরিত্র বা কঠিন মেজাজের ব্যক্তি নন, বরং তিনি হলে নরম মেজাজের মানুষ এবং তার কোমলতা হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত। নিঃসন্দেহে আপনি খুলকে আযীমে অধিষ্ঠিত, মোমিনদের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু এবং রহমাতুল্লিল আলামীন"**। অত্র বিষয়েও আমাদের ঐ বোকাদের কাছ থেকেই শ্রবণ করা উচিৎ যে এ বিষয়ে তারা কি বলেছে?

বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব **'বদাউল খলক'**-এর **"সিফাতুন ইবলিস ওয়া জুনুদুহা"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **"ফাযায়েলে উমর"** অধ্যায়ে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "হযরত উমর রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হওয়াব জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন তাঁর (সাঃ) নিকট কোরায়েশদের কিছু মহিলা উচ্চ স্বরে কথা-বার্তা বলছিলেন। কিন্তু তারা যখন উমরের কণ্ঠ শুনলেন তখন তাড়াতাড়ি নিজেদের হিজাব (পরদা) ঠিকঠাক করে উঠে দাড়ালো। রাসুল (সাঃ) উমরকে অনুমতি দিলেন। মহিলাদের এমন বিচলিত হওয়াকে দেখে রাসুল (সাঃ) মুচকি হাসি দিচ্ছিলেন। উমর বল্লেন, "*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বদা সুখি রাখুক, ঘটনা কি*"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*ঐ মহিলাদের প্রতি আমার*

---

১ সুরা ঃ আলে-'ইমরান - ১৫৯

করুক। তারপর ডোল ইবনে খাত্তাব নিয়ে নিলেন। আমি এ বিষয়ে তার চেয়ে উত্তম কাউকে পাই নি। এমনকি লোকজনকে এক জায়গায় জমা করে দিলেন"।

দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের মেরুদন্ড, তাকওয়াহ্ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যকে একা উমরই যখন দখল করে নিয়েছিলেন এবং সেটাকে নিজের পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে বেড়াতেন, অথচ অন্যান্য সাহাবীর বুক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের দেহের অন্যান্য অংশগুলো ঈমান হতে খালি আছে এবং ইলমও (জ্ঞান) উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) জন্যই নির্দিষ্ট আছে। যা বেঁচে গেল সেখান থেকে তিনি অন্য সাহাবীদের জন্য কিছু রাখলে না এবং রাসুল (সাঃ) দেয়া সবটুকুই পান করে নিলেন। এমনকি নিজের বন্ধু আবু বকরেরও (রাঃ) পরোওয়া করলেন না। [এতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে জ্ঞান হযরত উমর (রাঃ)-কে দান করা হয়েছিল তারই মাধ্যমে নবীর (সাঃ) ওফাতের পর তিনি আল্লাহ্‌র আহ্‌কামসমূহে রদ-বদল করেছেন। নিঃসন্দেহে তার ইজতিহাদ এই জ্ঞানেরই অবদান ছিল।]

আবার যখন শক্তি ও বীরত্বকেও উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) সাথে নির্দিষ্ট করা হল এবং আবু বকরও (রাঃ) তাকে এই কথা বলেছিলেন যে, **"তুমি আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু তুমি জোর খাটালে"**। আল্লাহ্ আবু বকরকে (রাঃ) ক্ষমা করুন যে তিনি দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও খেলাফতের প্রতি উমরের (রাঃ) আগেই দখল করলেন। নবী উমাইয়া আর বনী আ'দী হতে উমরের (রাঃ) বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীরা সচ্ছলাবস্থা, মালে গনীমাত, বিজয় ইত্যাদি আবু বকরের (রাঃ) জামানায় ততটা দেখতে পারেন নি যতটা তার জামানায় দেখেছেন।

জ্বি হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে এ সব কিছুই উমরের (রাঃ) অবদান। কিন্তু আখেরাতেও লোকজনকে তার জন্য বেহেশতের গ্যারান্টী নেয়া উচিৎ ছিল তাও আবার আবু বকরের (রাঃ) চেয়েও উচ্চ স্তরের জান্নাত। সুতরাং লোকেরা সেরকমই করল। বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব **'বদাউল খলক'**-এর **"মাজাআ ফি সিফাতু জান্নাতু ইন্নাহা মাখলুকাহ্"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা'**-র **"ফাযায়েলে উমর"** অধ্যায়ে আবু হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলের খেদমতে ছিলাম, তিনি বল্লেন, "ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে বেহেশত দেখানো হল। সেখানে একটি প্রাসাদে এক মহিলা অযু করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম '*এ প্রাসাদটি কার*'? উত্তর দেয়া হল, '*উমর ইবনে খাত্তাবের*'। আমি তার অহংকারকে দেখলাম, সে মুখ ফিরিয়ে হাটতে লাগল (এই কথা শুনে) উমর কান্নাজুড়ে বল্লেন, "***ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনার প্রতি হিংসা করিলাম***'।

শ্রদ্ধেয় পাঠকমন্ডলী! আপনারা নিশ্চই উক্ত ধারাবাহিক মিথ্যা, বানোয়াট ও মনগড়া রেওয়ায়েত সমূহকে স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছেন। যদিও আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে প্রত্যেক রেওয়ায়েতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ উল্লেখ করেছি, আর তা হল রাসুল (সাঃ)-এর এই কাথা যে, **'আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম'** তথা প্রত্যেক রেওয়ায়েতে **'ঘুম'** শব্দটি মজুদ আছে। কখনো বলেন, **'আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন দেখলাম আমার**

কিন্তু আপনারা যখন তাদের সামনে বলবেন যে ঃ **"মুয়াল্লেফাতুল কুবের অধিকারকে বাতিল করে অথবা 'মোতা বিবাহ' এবং 'মোতা হজ্জ'-কে হারাম ঘোষনা দিয়ে উমর (রাঃ) ভুল করেছেন"** তখন দেখবেন যে তাদের নাসিকায় টান পড়েছে, রাগের চোটে চোখ দু'টি রক্তবর্ণ হয়েগেছে এবং সাথে সাথেই আপনাকে দ্বীন হতে খারিজ হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দিবে এবং বলবে যে, **"সৈয়্যেদানা উমর ফারুক (রাঃ), যিনি হলেন 'হক' ও 'বাতিল'-এর মধ্যে পার্থক্যকারী, তাঁর সমালোচনা করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?"**। সুতরাং তেমন পরিস্থিতিতে আপনার কাছে তাদের কথাকে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না এবং দ্বিতীয় দফা আপনি তাদের সাথে আলোচনা করার সাহসও পাবেন না। আর যদি সাহস দেখান তাহলে মুসিবাতের শিকার হবেন।

হযরত উমরের (রাঃ) ইজ্জত রক্ষা করার জন্য বুখারী হাদীসের মধ্যে তাদলিস (গরমিল) করেছেন ঃ

জ্বী হ্যাঁ! সত্যসন্ধানীগন যখন বুখারীর হাদীসে অনুসন্ধান চালাবেন তখন তার সামনে অনেক হাদীস মোয়াম্মাহ্ (ধাঁধাঁ) হিসাবে দেখা দিবে। তখন সে চিন্তা করবে হয়তো হাদীসটি দূর্বল। আবার বুখারী কখনো একই হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে একই সূত্র উল্লেখ করে শাব্দিক রদ-বদল করে বর্ণনা করেছে। আর এসব কিছুই উমরের (রাঃ) প্রতি গভীর ভালবাসার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর সম্ভতঃ বুখারীর প্রতি আহলে সুন্নাতদের মনোযোগের কারনও এটাই। এ কারণেই তারা বুখারীকে সমস্ত কিতাবাদির উপরে স্থান দিয়েছেন। **'আল্লাহ্ কিতাব'**-এর পরে তাদের কাছে **'বুখারী'**-ই হল সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও সত্য ধর্মগ্রন্থ। বুখারীর প্রতি তাদের ভালবাসার আর একটি কারণ হল যে, বুখারী হযরত আলীর (আঃ) ফজিলাতকে খুব কম সংকলন করেছেন। একদিকে বুখারীর মনমুগ্ধকর কাজ হল যে, তিনি হাদীসে কাট-ছাঁট করতেন বিশেষ করে উক্ত হাদীস দ্বারা যখন হযরত উমরের (রাঃ) ব্যক্তিত্ব খাটো হত, ঠিক যেমনটি তিনি আলীর (আঃ) ফাযায়েল সম্পর্কে হাদীস সংকলন করতে যেয়ে করেছেন। নিম্নে আপনাদের জন্য কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি ঃ

হযরত উমরের (রাঃ) হাকীকত ফাঁস হয়ে যাওয়া হাদীস সমূহে কাট-ছাঁট ঃ

(১) মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল হায়েজ'**-এর **'তায়াম্মুম'** অধ্যায়ে লিখেছেন যে ঃ এক ব্যক্তি উমরের কাছে এসে বল্ল, "*আমি মুজনাব হয়ে পড়েছিলাম এবং পানি প্রাপ্ত হয়নি*"। উমর বল্লেন, "*তাহলে নামাজ পড় না*"। আম্মার বল্লেন, "*হে আমিরুল মুমেনীন! আপনার কি ঐ সময়ের কথা মনে নাই যখন আমি ও আপনি এক সফরে মুজনাব হয়ে পড়েছিলাম এবং পানি প্রাপ্ত হয়নি। আপনি তো নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি*

হাসি পাচ্ছে যারা কিছুক্ষণ আগেই আমার নিকট ছিল। তারা যেই না তোমার কণ্ঠ শুনলো ওমনি নিজেদের হিজাব ঠিকঠাক করে নিল'। উমর বল্লেন, *'ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌! তাদেরকে তো আমার চেয়ে আপনাকেই অধিক ভয় পওয়া উচিৎ'*। তারপর বল্লেন, *'হে মহিলারা! তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ রাসুলকে ভয় পাও না'?* মহিলারা বল্লো, *'তুমি রাসুলের চেয়ে অধিক দুঃশ্চরিত্র এবং কঠিন মেজাজের মানুষ'*। রাসুল (সাঃ) বল্লেন, *'সেই সত্ত্বার কসম যার কব্জায় আমার প্রান, তোমার নিকট কষ্মিনকালেও শয়তান আগমন করবে না'*।

তাদের মুখ নিসৃত কথা অনেক বড় হয়েগেল। যদিও তারা যাকিছু বলে তা মিথ্যা হয়ে থাকে। রেওয়ায়েতের নোংরামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যে, মহিলারা উমরকে (রাঃ) ভয় পান অথচ রাসুল (সাঃ)-কে ভয় পান না এবং নিজেদের কণ্ঠ তাঁর (সাঃ) কণ্ঠের চেয়ে উঁচু করে ফেলেন। তারা তাঁকে সম্মান করেনি এমনকি তাঁর সামনে পরদাও করেনি। কিন্তু যেই না উমরের (রাঃ) কণ্ঠ শুনলো ওমনি চুপ হয়ে যায় এবং নিজেদের পরদা ঠিকঠাক করে নেয়। আল্লাহ্‌র কসম! এই বোকাদের কথার প্রতি আমার বড়ই তাজ্জব লাগে। তারা সুস্পষ্ট রূপে রাসুল (সাঃ)-কে দুঃশ্চরিত্র এবং কঠিন মেজাজের মানুষ বানিয়ে দিল। কেননা উমর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক আফ্‌যুন (দুঃশ্চরিত্র) ও আগলুযুন (কঠিন মেজাজের মানুষ) ছিলেন। **'আফযুন'** এবং **'আগলুযুন'** শব্দ দু'টি **'ইস্‌মে তাফযীরে সীগা'**। এ দুটোই যদি রাসুল (সাঃ)-এর জন্য 'ফজিলাত' বুঝায় তাহলে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও হযরত উমর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর চেয়ে উত্তম হলেন আর যদি এ দুটোই অবমাননাকর হয়ে থাকে, তাহলে মুসলমান ও তাদের রাজা-বাদশা এবং বুখারী ও মুসলিম এমন হাদীসগুলিকে কেমন করে সহিহ্‌-শুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিলেন?

তারা শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত দেন নি, বরং বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে শয়তান খেলা করে অথচ তাঁকে ভয় পায় না। নিঃসন্দেহে শয়তানই মহিলাদের প্ররোচিত করেছে না হলে তারা কেমন করে তাঁর (সাঃ) সম্মুখে উচ্চ স্বরে কথা-বার্তা বলবে এবং পরদাহীন অবস্থায় বসে থাকবে। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর গৃহে হযরত উমর (রাঃ) প্রবেশ করা মাত্রই এমনকি তার কণ্ঠ শোনা মাত্রই শয়তান পালিয়ে যায় অর্থাৎ মহিলারা চুপ হয়ে গেল এবং নিজেদের পরদাগুলিকে ঠিকঠাক করে নিল।

হে সম্মানিত মুসলমানেরা! আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে তাদের নিকট রাসুল (সাঃ)-এর মান-মর্যাদা ও মূল্য কত? এবং জেনে শুনে বা অজান্তেই হযরত উমরকে (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর চেয়েও উত্তম বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উক্ত কথার প্রমান আজও দেখতে পাওয়া যায় যে, তারা যখন রাসুল (সাঃ)-এর আলোচনা করে তখন তারা রাসুল (সাঃ)-এর দোষ-ত্রুটিও তুলে ধরে এবং বলে যে বাশার (মানুষ) হওয়ার কারণে তাঁর দ্বারাও ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, আর তাঁর ভুল-ত্রুটিকে প্রায়ই হযরত উমর (রাঃ) সংশোধন করে দিতেন। আবার কয়েকবার তো হযরত উমরের (রাঃ) রায়ের পক্ষেই কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আহলে সুন্নাতগণ এ বিষয়ে **'বদর যুদ্ধের বন্দি'** এবং **'তাবীরে নখল'** ইত্যাদী দ্বারা দলিল উপস্থাপন করে থাকেন।

যে 'আব্ব' বলতে কি বুঝানো হয়েছে'। তারপর আবার বল্লেন, "**তোমরা সেগুলির আনুগত্য কর যার হিদায়েত আল্লাহ্‌র কিতাব করেছে আর যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমরা জানো না সেগুলিকে আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত করে দাও**"।

হযরত হযরত উমরের (রাঃ) উক্ত কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে রাসুল (সাঃ) উক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দিয়ে যান নি। যদি দিয়ে যেতেন তাহলে মানুষ কেমন করে কোন বিষয় থেকে অজ্ঞ থাকবে। এটা কি সম্ভব যে, যে রাসুল (সাঃ) মানুষের হিদায়েতের জন্য এসেছিলেন তিনি কোরআনের ব্যাখ্যা না দিয়েই তাঁর নবুয়াত পূর্তির ঘোষণা দেয়া হল এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণ করা হল। এটা রাসুল (সাঃ)-এর পক্ষে কেমন করে সম্ভব যে তিনি মানুষকে কোন কোন বিষয়ে অন্ধকারেই রেখে তাঁর মিশনকে শেষ করে বিদায় নিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে হযরত উমর (রাঃ) নিজের '**ইজতিহাদ**' মতে মুসলমানদের পরিচালনা করার জন্য এভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন।

উক্ত রেওয়ায়েতকে সূরা '**আবাসা**'র তাফসীরে বিভিন্ন মুফালসেরীনগণ সংকলন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপঃ সুয়ুতি '**দুররে মনসুর**'-এ, যামাখশারী '**কাশ্‌শাফ**'-এ, ইবনে কাসীর তার '**তাফসীর**'-এ এবং রাজি তার '**তাফসীরে খাবিন**'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু বুখারী তার স্বভাব অনুযায়ী মানুষকে উক্ত কথা হতে অজ্ঞ রাখার জন্য হাদীসকে এভাবে কাট-ছাঁট করে উপস্থাপন করেছেন যে, হযরত উমর '**আব্ব**' শব্দের অর্থ জানতেন না। আনাস ইবনে মালিক বলেন যে, "আমরা উমরের কাছে উপস্থিত ছিলাম, তিনি বল্লেন, '**আমাদের কষ্ট করার ক্ষেত্রে ভয় দেখানো হয়েছে**'। বুখারী '**কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ও সুন্নাত**'-এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

জ্বি হ্যাঁ! বুখারী ঐ সকল হাদীসেই কাট-ছাঁট করেছেন যেগুলি দ্বারা উমরের (রাঃ) হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার গন্ধ পাওয়া যেত। প্রকাশ থাকে যে, পাঠক তো বর্ণিত হাদীসের বিষয়সমূহকে বুঝতে পারবে না। তাই বুখারী কথাটি উড়িয়ে দিলেন যে, উমর '**আব্ব**' শব্দের অর্থ জানতেন না বিধায় বল্লেন যে, '**আমাদের কষ্ট করার ক্ষেত্রে ভয় দেখানো হয়েছে**'।

(৩) ইবনে মাজা তার '**সুনান**'-এর ২য় খন্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায়, হাকিম তার '**মুস্ত াদরাক**'-এর ২য় খন্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায়, আবু দাউদ তার '**সুনান**'-এর ২য় খন্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায়, বায়হাকী তার '**সুনান**'-এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে হাজর '**ফাতহুল বারী**'-তে ইবনে আব্বাস হতে সংকলন করেছেন যে তিনি বলেন ঃ "একটি পাগল মহিলা যখন জেনার দোষে অভিযুক্ত হল তখন তাকে উমরের কাছে আনা হল। উমর উক্ত বিষয়ে লোকজনার সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাকে পাথর দ্বারা আঘাত করার হুকুম জারি করলেন। হযরত আলী যখন উক্ত মহিলাকে ঐ অবস্থায় দেখলেন তো জিজ্ঞাসা করলেন, '*এই মহিলার অপরাধ কি*'? লোকজন বল্ল, '*এ হল অমুক খান্দানের পাগল মহিলা, সে জেনা কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং উমর তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিয়েছেন*'। হযরত আলী

মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামাজ পড়ে নিয়েছিলাম। তখন নবী (সাঃ) আমার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তোমার দুই হাতকে মাটির উপর আঘাত করে তারপর ফুৎকার দিয়ে হস্ত দ্বয়কে চেহারা এবং হাতের উপরিভাগ মাসেহ করলেই যথেষ্ট ছিল"। উমর বল্লেন, "*হে আম্মার, আল্লাহ্ কে ভয় কর*"। আম্মার বল্লেন, "*এটাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি এটাকে আর বয়ান করব না*"। উক্ত রেওয়ায়েতকে আবু দাউদ তার **'সুনানে'**, আহমদ ইবনে হাম্বল তার **'মুসনাদে'** এবং নাসায়ী তার **'সুনানে'**, বায়হাকী ও ইবনে মাজা ইত্যাদীগনও হুবহু সংকলন করেছেন।

মনে রাখা দরকার, বুখারী হাদীস সংকলনে আমানতের খেয়ানত করেছেন। যেমন হযরত উমরের (রাঃ) ইজ্জত রক্ষা করতে যেয়ে হাদীসে কাঠ-ছাঁট করা তার অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল। কারণ তিনি এ কথা পছন্দ করতেন না যে মুসলমানেরা ইসলামী ফিকহ্-তে খলিফার মূর্খতাকে জানতে পারে। আপনাদের সম্মুখে সেই রেওয়ায়েতটি উপস্থাপন করা হচ্ছে যা বুখারী তাসাররুফ (কাট-ছাঁট) করেছেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুত তায়াম্মুম'**-এর **"আত-তায়াম্মামু হাল ইয়ানফুখু ফিহিমা"** অধ্যায়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ "একজন উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে এসে বল্ল, '*আমি মুজনাব হয়ে পড়েছি এবং পানি পাচ্ছি না*'। আম্মার ইয়াস্সার উমরকে বল্লেন, '*আপনি কি ঐ ঘটনা ভুলে গেছেন যখন আপনার ও আমার সাথেও একটি সফরে অনুরূপ হয়েছিল*'।

নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, বুখারী হযরত উমরের (রাঃ) **"তুমি নামাজ পড় না"** কথাটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা এ কথা দ্বারা হযরত উমর (রাঃ) দোষী হয়ে যাচ্ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বুখারী এই জটিলতা এজন্য রেখেছেন যেন মুসলমানরা হযরত উমরের (রাঃ) উদ্দেশ্যকে বুঝে না ফেলে। যে ব্যক্তি নবীর (সাঃ) জীবদ্দাশাতেও সন্দিহান থাকতো এবং কোরআন ও হাদীসের বিপক্ষে ইজতিহাদ করতো। সুতরাং হযরত হযরত উমর (রাঃ) তার নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন, আর একসময় মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত হয়ে যান। ব্যাস, তখন নির্দ্বিধায় মুসলমানদের উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে চাপাতে থাকলেন এবং প্রসার ঘটাতে থাকলেন। ইবনে হাজর বলেন, "**এ হল উমরের বিখ্যাত মাযহাব**"। তার দলিল তো এটাই যে উমর হযরত (রাঃ) তার সিদ্ধান্তে উপরই অটল ছিলেন, বিধায় হযরত আম্মার (রাঃ) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, **'আপনি যদি চান তাহলে আমি বিষয়টাকে আর বর্ণনা করব না'**।

(২) হাকিম তার **'মুস্তাদরাক'**-এর ২য় খন্ডের ৫১৪ পৃঃ আনাস হতে একটি রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন, যেটাকে যাহাবীও তার **'তাখলিসে'** সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। আনাস ইবনে মালিক বলেন যে, "উমর মিম্বরের উপর এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ **'ফাম্বতনা ফিহা হাব্বাওঁ ওয়া এ'নাবাওঁ ওয়া ক্বাযবাওঁ ওয়া জয়তুনাওঁ ওয়া নাখলাওঁ ওয়া হাদায়েক্বা গালাবাওঁ ওয়া ফাকিহাতাওঁ ওয়া আব্বা"** অতঃপর বল্লেন, "*আমি এগুলিকে বুঝেছি কিন্তু জানি না*

আনাস বলেন যে, আবু বকরও অনুরূপ করেছিলেন। কিন্তু যখন উমরের খেলাফতকাল শুরু হল তখন তিনি লোকজনার কাছে পরামর্শ করলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বল্লেন, *'৮০ দোরদা বিধানকে কিছু কমানো উচিৎ'*। অতঃপর উমর সেটাকেই মঞ্জুর করলেন"।

বুখারী তার স্বভাব মত কথাটি প্রকাশ করতে চান নি যে, হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তসমূহকে জানতেন না। তাহলে তাকে সাহাবীদের কাছে পরামর্শ করার কি প্রয়োজন ছিল, যেটার উপর রাসুল (সাঃ) ও আবু বকরও (রাঃ) আমল করেছেন, তিনি কি তাদের আমলগুলি দেখেন নি?

বুখারী তার **'কিতাবুল হুদুদ'**-এর **'মা জাআ ফি যারবে শারিবুল খামরি'** অধ্যায়ে আনাস ইবনে মালিক হতে সংকলন করেছেন যে ঃ "রাসুল (সাঃ) মদপানকরীকে ভাল চড়ানো (সম্ভবতঃ চামড়া দিয়ে মোড়ানো) ছড়ি দ্বারা আঘাত করাতেন এবং আবু বকরও ৪০ দোররা মারার নির্দেশ দিতেন"। [এখানেও বুখারী একই ব্যক্তি হতে একই বিষয়ের রেওয়ায়েতে উমরের (রাঃ) ঘটনাকে গায়েব করে দিলেন।]

(৫) যে সমস্ত মুহাদ্দেসীন ও ইতিহাস বেত্তাগণ নবীর (সাঃ) রোগ ও মৃত্যুর ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন, আর যারা এই কথাটি লিখেছেন যে, "নবী (সাঃ) তাদের কাছে কিভাবে দোয়াত-কলম চেয়েছিলেন যেন তারা তাঁর পরে গোমরাহ না হয়ে যায় এবং উক্ত দিবসটির নাম **'রাযিয়াতুল খামিস'** হয়ে গেল এবং হযরত উমর (রাঃ) সেখানে কিভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, (মায়াজ্‌ল্লাহ্‌) **'রাসুল প্রলাপ বকছেন'**।"

বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল জিহাদ'**-এ **'হাল ইয়াসতাশফিউ ইলা আহলিয যিম্মাতু ওয়া মোয়ামিলাতুহুম'** অধ্যায়ে এবং মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ওসিয়াত'**-এর **"তারাকুর ওয়াসিয়াতু লিমান লাইসা লাহু শাইয়িন ইউসা বিহি"** অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস হতে সংকলন করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "*হায়! সেই বৃহস্পতিবার! ঐ বৃহস্পতিবারে কি হয়েছিল*"। তারপর এতো কাঁদলেন যে তার অশ্রু দ্বারা মাটি ভিজে গেল। তারপর বল্লেন, "বৃহস্পতিবারে রাসুল (সাঃ)-এর পীড়ায় কাঠিন্য আসলো, তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*আমাকে কাগজ-কলম দাও যেন আমি তোমাদের জন্য কিছু ওসিয়াত লিখে দেই, তোমরা আমার পরে যেন গোমরাহ না হয়ে যাও*"। কিন্তু সাহাবীরা (উক্ত বিষয়ে) নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। যদিও নবীর সামনে ঝগড়া করা সমিচীন ছিল না এবং বল্ল যে, '*তিনি প্রলাপ বকছেন*'। তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার অবস্থানে উত্তম আছি বরং ঐ বিষয় ঠিক নয় যার প্রতি তোমরা আমাকে আহ্বান করছো*"। তিনি মৃত্যুর সময় তিনটি ওসিয়াত করে ছিলেন যে, "*জাযিরাতুল আরব হতে মুশরিকদের বের করে দেয়া, আমি যেভাবে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে ব্যবহার করি সেভাবেই উত্তম ব্যবহার করা এবং তৃতীয় ওসিয়াতটি আমি ভুলে গেছি*"।

বল্লেন, '*তাকে ফেরৎ নিয়ে যাও*'। লোকেরা তাকে ফেরৎ নিয়ে এলো। হযরত আলী, উমরকে বল্লেন, '*তুমি কি জানো না যে, পাগল জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না ওঠা পর্যন্ত এবং শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত -তাদের উপর থেকে শাস্তির বিধান তুলে নেয়া হয়েছে*'। কথাটি শুনে উমর মহিলাকে ছেড়ে দিলেন এবং বল্লেন, '***আলী যদি না থাকতো তাহলে উমর হালাক হয়ে যেত***'। [১]

কিন্তু বুখারী উক্ত রেওয়ায়েতেও হযরত উমরের (রাঃ) দূর্বলতা অনুভব করেছিলেন। সুতরাং কাট-ছাঁট করে ফেল্লেন। তাহলে লোকজন কিভাবে জানতে পারল যে হযরত উমর (রাঃ) ঐ সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে জানতেন না যা '**আল্লাহ্‌র কিতাব**'-এ উল্লেখ আছে এবং সেগুলি রাসুল (সাঃ)ও বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তির এমন দশা, সে কিভাবে খেলাফতের আসনে আসীন হতে পারে। আর বুখারী উক্ত রেওয়ায়েতকে কেমন করে বর্ণনা করবেন, কারণ সেখানে আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) ফজিলাত বর্ণিত আছে। হযরত আলী (আঃ) উমরকে (রাঃ) ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেছেন যেগুলি হযরত উমর (রাঃ) জানতেন না এবং তিনি নিজেও উক্ত কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, '**আলী না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত**'। এখন আমরা বুখারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করব যে তিনি কিভাবে উক্ত রেওয়ায়েতকে কাট-ছাঁট করে পরিবর্তন করে দিলেন ঃ

বুখারী তার সহীহ্‌র কিতাব '**আল মোহারেবীনা মিন আহলিল কুফরে ওয়ার রাদ্দাহ**'-র '**লা ইয়ারহামু মাজনুনুহ**' অধ্যায়ে (সনদের উল্লেখ ছাড়াই) লিখেছেন যে ঃ হযরত আলী, উমরকে বল্লেন, '*তুমি কি জান না যে পাগল ভাল না হওয়া পর্যন্ত, শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না ওঠা পর্যন্ত -তাদের উপর থেকে শাস্তির নির্দেশ তুলে নেয়া হয়েছে*'।

জ্বি হ্যাঁ, বুখারী কর্তৃক হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে কাট-ছাঁটা করার বিষয়ে এ হল আর একটি উদাহরণ। উক্ত রেওয়ায়েতে পূর্বের ঘটনা এবং হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক কথিত পরবর্তী বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। বুখারী এভাবেই ঐ সমস্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতে কাট-ছাঁট করেছেন যার দ্বারা হযরত উমরের (রাঃ) মর্যাদাহানী হয়।

অনুরূপভাবে বুখারী ঐ সমস্ত হাদীসে কাট-ছাঁট, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আশ্রয় নিয়েছে যেগুলি দ্বারা হযরত আলীর (আঃ) ফজিলাত ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার পক্ষে এ ধরণের হাদীস লিপিবদ্ধ করার শক্তিই ছিল না।

(৪) মুসলিম তার সহীহ্‌র '**কিতাবুল হুদুদ**'-এর "**হাদ্দে শারিবুল খামরি**" অধ্যায়ে আনাস ইবনে মালিক হবে রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ "নবীর (সাঃ) সম্মুখে এক ব্যক্তিকে আনা হল, সে মদ পান করেছিল। তাকে নবীর নিদের্শে দু'বার চল্লিশ দোররা মারা হল।

---

১ **ইবনে জাওযীর** 'তাজকিরাতুল খাওয়াস', পৃঃ ৫৭।

যেহেতু মুসলিম নিজের ওস্তাদ বুখারী হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন সে জন্য আমরা বুখারীকে নিজেদের প্রতিপক্ষ বানিয়েছি। যদিও বুখারী বাক্যটিতে কাট-ছাঁট করেছেন এবং সত্য গোপন করার আপ্রান চেষ্টা করেছেন কিন্তু বুখারীর সৈয়দ ও সরদার উমরের (রাঃ) জন্য বুখারীর প্রতি হুজ্জাত কায়েম করার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট যতটুকু তিনি সংকলন করেনে। কেননা **'হাজর'** শব্দের অর্থ হল **'প্রলাপ'** এবং **'কৃদ গোলেবা আলাইহিল ওয়াজায়া'** বাক্যটিরও একই অর্থ দাড়ায়। কারণ যাদের চক্ষু আছে তারা জানেন, এমনকি আজো মৃত্যুসজ্জায় শায়িত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানুষ বলে থাকে যে, **'সে এখন অপারগ, কেননা তার প্রতি জেদ ভর করেছে এবং প্রলাপ বকছে'**।

বিশেষ করে আমরা হযরত উমরের (রাঃ) সেই কথার "*তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব আছে এবং আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট*" উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। হযরত উমরের (রাঃ) উক্ত বাক্যের অর্থ এমন দাড়ায় যে "*রাসুল (সাঃ)-এর কাম তামাম হয়ে গেছে এবং তাঁর সাথে তাঁর অস্তিত্বও বিলীন হয়েগেছে*"। আমি প্রত্যেক বিবেকবান ইসল্যামী চিন্তাবিদকে ঢোল পিটিয়ে বলতে চাই যে, তারা যদি কেবল এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তার অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য ও গভীরেও যদি প্রবেশ না করেন তাহলে তারাও খলিফা থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন। কারণ এই খলিফাটিই উম্মতকে হিদায়েত থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে পতিত (নিক্ষেপ) করেছেন।

আমরা সত্য কথা বলা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় পাব না, যতক্ষণ না এর দ্বারা রাসুল (সাঃ), তার পরে কোরআন এবং ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের প্রতিরক্ষা হবে। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেনঃ **"অতঃএব তোমরা আনুষকে ভয় করনা আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করনা। যে সব লোক আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদ অনুযায়ী ফয়সালা করেনা, তারাই কাফের"**।

আমি বুঝতে পারি না, আজকের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও কিছু কিছু **'ওলামা-এ-দ্বীন'** কেন যে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেন এবং কাজটির জন্য অযথা সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করে থাকেন। ঐ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলিতে না কোন ভিত্তি আছে আর না মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আপনাদের সম্মুখে **'মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী'** নামক একজন আলেমের আবিস্কারকে উপস্থাপন করছি। তিনি **"লুলু' ওয়াল মারজান ফিমাত্তাফেকু আলাইহিশ শাইখান"**-এর ব্যাখ্যায় যেখানে **'ইয়াওমুল খামীসের'** ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেখানে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক দোয়াত-কলম চাওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যার নীচে লিখেছেন যে ঃ

রাসুল (সাঃ) কলম ও দোয়াত আনতে বলেছিলেন। রাসুল (সাঃ) যে কিতাব আনতে বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর উদ্দ্যেশ্য ছিল সেই বস্তু যার উপর লেখা হয়ে থাকে যেমন, কাগজ বা ছাল। আর কিতাব দ্বারা আবু বকরের খেলাফতকে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লোকজন যখন ঝগড়া শুরু করে দিল এবং তাঁর রোগে কাঠিন্য দেখা দিল তখন

জ্বী হ্যাঁ! বৃহস্পতিবারের এটিই হল সেই মুসিবাত যেখানে হযরত উমর (রাঃ) রাজনৈতিক চাল চেলে ছিলেন এবং রাসুল (সাঃ)-কে ওসিয়াত লিখতে বাধা প্রদান করেছিলেন। নবীর (সাঃ) শানে এমন জঘন্য বাক্য উচ্চারণ করলেন যা সরাসরি কোরআন বিরোধী। বাক্যটি হল এই যে, **"নবী প্রলাপ বকছেন"**। এখানেও বুখারী ও মুসলিম ঐ সমস্ত সত্য বাক্যাবলী সংকলন করেছেন যেগুলি হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক বলা হয়েছিল তাতে কোন রদ-বদল করেন নি। কিন্তু চাতুরতার সাথে হযরত উমরের (রাঃ) নাম না নিয়ে **'উপস্থিত লোকজনের'** উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যে কোন রেওয়ায়েতেই এভাবে হযরত উমরের (রাঃ) নাম আসে যে, তিনি এমন বাক্য ব্যবহার করেছেন। তখন বুখারী ও মুসলিমের জন্য উক্ত রেওয়ায়েতকে অবিকল ছেড়ে দেয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। কারণ তাতে খলিফার সম্মান হানী হয় যা তার স্বরুপকে প্রকাশ করে দেয়। আর এ বিষয়টি সে কথার উপর থেকে পর্দা উন্মোচন করে দেয় যে, তিনি রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে কতই না উদ্ধ্যতা প্রদর্শন করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করেছে, তার সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম জানতেন যে মুসলমানদের অনুভূতিকে উত্তেজিত করার জন্য এই একটি বাক্যই যথেষ্ট। এর দ্বারা খেলাফতে বিশ্বাসী আহলে সুন্নাতগণও তার বিরোধী হয়ে যাবেন। সেজন্যই বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েতে কাট-ছাঁটের আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরণের ঘটনাবলীতে তাদের এমন চেষ্টা বহুল পরিচিত। তারা **'হিযইয়ান'** শব্দটিকে **'পীড়ার কাঠিন্য'** শব্দ দ্বারা বদলে ফেলেছেন এবং উক্ত জঘন্য বাক্যকে চেটে-চুটে খেয়ে ফেলেছেন। এখন আমরা আপনাদের সম্মুখে সেই মুসিবাত সম্পর্কে স্বয়ং বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতকে উপস্থাপন করছি ঃ

ইবনে আব্বাস বলেন যে ঃ রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি যখন মৃত্যু যন্ত্রনা দেখা দিল তখন ঘরের মধ্যে অনেক লোকজন উপস্থিত ছিল, তার মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাবও ছিলেন। নবী (সাঃ) বল্লেন, *"লেখার উপকরণ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য একটা ওসিয়াত লিখে দেই যাতে তোমরা গোমরাহ হবে না"*। উমর বল্লেন, *"নবীর উপর ব্যাথা প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব মজুদ আছে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট"*। কথাটির জন্য উপস্থিত লোকজনার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ বল্ল, নবী (সাঃ)-কে দোয়াত-কলম দিয়ে দাও যাতে তিনি ওসিয়াত লিখে দেন যেন আমরা গোমরাহ না হই। আর কিছু লোক উমরের কথাকেই বারবার আউড়াচ্ছিল। নবীর (সাঃ) সম্মুখে যখন চেঁচামেচী বৃদ্ধি পেল তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, "*আমার কাছ থেকে উঠে পড়*" (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন) ইবনে আব্বাস বলেন যে, "*নিশ্চয়ই রাসুল (সাঃ)-কে ওসিয়াত লেখা হতে বিরত রাখা এবং তার সম্মুখে চেঁচামেচি করাটাই হল সবচেয়ে বড় মুসিবাত*"। [বুখারী ৭ম খন্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় **'কিতাবুল মারাযু'**-র **"কাওলু আল মারিযু কুমু আন্নি"** অধ্যায়ে এবং মুসলিম ৫ম খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় **'কিতাবুল ওয়াসিয়াত'**-এর **"তারদুদুল ওয়াসিয়াত"** অধ্যায়ে।]

বুখারী উক্ত রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন, কারণ এতে আয়শা (রাঃ) ওসিয়াতকে অস্বীকার করেছেন, আর এ বিষয়টিই হল বুখারীর জন্য সান্ত্বনার কারণ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যে, যারা এই কথা আয়শার (রাঃ) সামনে বলেছিলেন যে, **'রাসুল (সাঃ) আলীকে ওসিয়াত করেগেছেন'** তারা সত্য ছিল। কারণ আয়শাও (রাঃ) তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন নি আর না তিনি ওসিয়াতকে অস্বীকার করেছেন। তবে হ্যাঁ অস্বীকার করার ভঙ্গী করে উল্টা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, **'তিনি কখন আলীকে ওসিয়াত করলেন?'**। (বিঃদ্রঃ এখানে আবারো কারচুপি করা হয়েছে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ বয়ান করা হয় নি। কারণ আয়শার (রাঃ) জিজ্ঞাসার উত্তরে লোকেরা কি বলেছিল, তারা কি ওসিয়াত করার ঘটনা ও সময়কাল সম্পর্কে কিছু বলে ছিল? কিন্তু দুঃখের বিষয় বুখারী তার কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই)। যাহোক, এব্যাপারে আয়শার (রাঃ) জন্য আমাদের উত্তর হল যে, রাসুল (সাঃ) জলিলুল কদর সাহাবাদের উপস্থিতি এবং আপনারও অনুপস্থিতিতে ওসিয়াত করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, ঐ জলিলুল কদর সাহাবারা আয়শাকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, **'তিনি (সাঃ) কখন আলীকে ওসিয়াত করেছিলেন'**। কিন্তু আপতিত শাসকগণ তাকে এধরণের ঘটনা বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। যেমনটি তৃতীয় ওসিয়াতের জন্য নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাই বাধ্য হয়েই ইবনে আব্বাস তৃতীয় ওসিয়াতকে ভুলে গেছেন। রাজনীতির বাস্তবতাকে লুকানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল। স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ) এ কথা স্বীকার করেছেন যে তিনি রাসুল (সাঃ)-কে ওসিয়াত লেখা থেকে বিরত রেখেছেন। কেননা হযরত উমর (রাঃ) জানতেন যে, ওসিয়াতটি হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফত সম্পর্কে হতো। ইবনে আবিল হাদীদ, উমর ইবনে খাতাতাব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথপোকথনকে লিখেছ যে, উমর (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলেন যে, "*আলীর অন্তরে কি এখনো খেলাফতের আকাংখ্যা বিরাজ করছে*"? ইবনে আব্বাস বল্লেন, "*হ্যাঁ*"*। উমর বল্লেন,* "***রাসুল (সাঃ) মৃত্যু সজ্জায় আলীর নাম উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি ইসলামের উপর দয়া করে তাঁকে উক্ত কাজ হতে বিরত রাখলাম***"। [**শারহে নাহ্‌জ আল-বালাঘা** -ইবনে আবিল হাদীদ, ১২তম খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, উক্ত ঘটনাকে **'তারিখে বাগদাদ'**-এর লেখক লিখেছেন।]

হে মাওলানা সাহেব! এখন আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে লাভ নেই। সত্য স্বীকার করা থেকে গা বাঁচাবেন না। কারণ গোমরাহীর যুগ, বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয়দের সাথেই বিদায় নিয়েছে। আপনি উক্ত গোমরাহীর উপর পর্দা ফেলে সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনি অন্যদের উক্ত বাস্তবতাকে গ্রহণ করা এবং তার নিকটবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করছেন। যাকিছু আপনি বলেছেন সেটার ভিত্তি যদি ভাল নিয়তে হয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আপনার হিদায়েত করেন এবং আপনার অন্তর দৃষ্টি খুলে দেন।

বুখারী প্রায়শই নবী (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত হাদীস সমূহে রদবদল, গরমিল ও কাট-ছাঁট করেছেন যেগুলি দ্বারা আবু বকর ও উমরের (রাঃ) হেয় প্রতিপন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

তিনি (সাঃ) এই কথার প্রতি আস্থা রেখে চুপ হয়ে গেলেন যে, আমি তো আবু বকরকে নামাজে আমার স্থলাভিষিক্ত করেই দিয়েছি এখন সেটার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই।

তারপর তিনি **'হিযইয়ান'** শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ হুজর (হিযইয়ান)-এর বিষয়ে ইবনে আবতালের ধারণা হচ্ছে যে, হুজর (হিযইয়ান)-এর অর্থ হল ইখতেলাত (সংমিশ্রন) এবং ইবনে আত-তীনের দৃষ্টিভঙ্গী হল যে, এর অর্থ হচ্ছে **'হাযা'** কিন্তু এটি তাঁর (সাঃ) শানের খেলাফ হবে। একটি অনুমান ভিত্তিক কথা এমনও আছে যে, **'রাসুল (সাঃ) তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন'**। এখানে **'হুজর'** শব্দটি **'ওয়াস্‌ল'** শব্দের প্রতিকূলতা বুঝাচ্ছে। কেননা তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র নযুলসমূহ নাযিল হয়ে গিয়েছিল, সেজন্যই তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুকে বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, উক্ত বাক্যটি হচ্ছে **'ইসতেফহামিয়াহ্‌'** (না-অর্থবোধক) এখানে **'হামযা'** উহ্য রয়ে গেছে। অর্থাৎ রোগের কারণে তার কণ্ঠ-স্বর বদলে গেছে এবং কথার সংমিশ্রণ হয়েগেছে। এ বিষয়ে এটাই হল সর্বোত্তম কথা। একে **'খবর'** হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না অন্যথায় এর অর্থ **'ফাহেশ'** (গালী) অথবা **'প্রলাপ'** বলে গৃহিত হবে। যেহেতু উক্ত বাক্য উচ্চারণকারী হলেন উমর, সেহেতু উমর কর্তৃক এমন ধরণের বাক্য উচ্চারণ করার কথা চিন্তাও করা যেতে পারে না।

জনাব বুজুর্গ আলেম! আমরা আপনার এই কথাকে ভ্রান্ত বলে বাতিল করছি। 'হক'-এর বিষয়ে আপনার এমন ধারণা সামন্য পরিমানও লাভবান হবে না। আমাদের জন্য আপনার এতটুকু স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট যে, উক্ত বাক্যের বক্তা হলেন হযরত উমর (রাঃ), এখন সেই বাক্যের অর্থ **'গালী'** হোক বা **'প্রলাপ'** যাই হোক না কেন। আবার আপনার এমন ধারণা পোষণ করা যে, রাসুল (সাঃ) আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতকে নির্দিষ্ট করার জন্য লিখতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে উমরের (রাঃ) আপত্তি ছিল? যদিও হযরত উমরই (রাঃ) আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতকে শক্তিশালী করেছেন। তিনিই সাহাবীদের নিকট থেকে জোর-জবরদস্তী মূলক এবং বল প্রয়োগ করে বায়াত গ্রহণ করেছেন। এমন কি হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ)-এর গৃহে আগুন লাগানোরও হুমকি দিয়েছেন। হে বুজুর্গ আলেম! আপনি ছাড়া, আর কেউ এমন দাবী করেছেন কি?

প্রবীন ও নবীন সকল উলামার নিকট এই কথা বহুল আলোচিত আছে যে, **"হযরত আলীই, রসুল (সাঃ)-এর খেলাফতের যোগ্য ছিলেন"**। যদিও তারা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করণকে মানতে রাজি নন। আপনার জন্য বুখারীর এই কথাটুকুই যথেষ্ট ঃ *"লোকজন আয়শার সামনে বল্ল যে, 'আলী হলেন ওয়াসী'। আয়শা বল্লেন, 'তাকে কখন ওসিয়াত করেছিলেন, রাসুল (সাঃ) তো আমার বুকের উপর মাথা রেখেছিলেন, তিনি হাত ধোয়ার পাত্র চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কোলে তার মাথা ছিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি অনুভব করলাম যে তাঁর ইন্তেকাল হয়েগেছে, তাহলে তিনি কখন আলীর জন্য ওসিয়াত করলেন'?*

সুধী পাঠকমন্ডলী! লক্ষ্য করুন যে, স্বার্থ এবং মাযহাবী শত্রুতার কারণে বুখারী হাদীসে এবং ঘটনাতে কিভাবে কর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। আপনারাই বিচার করুন, বুখারীর বর্ণনা এবং অন্যান্য আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দেসীনগণ যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে কোন তাল-মিল বা সম্পর্ক আছে কি?

শুধু তাই নয়, বরং বুখারী আবু বকরকে (রাঃ) এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে ঘোষণাকারীদের সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে তিনি (আবু হুরায়রা) মিনাতে ঘোষণা করে দেন যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশরিককে হজ্জ করতে দেয়া হবে না আর না উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারপর হামীদ ইবনে আব্দুর রহমানের উক্ত কথা স্থান পেয়েছে যে, *"রাসুল (সাঃ) আলীকে সুরা বারায়াত দিয়ে পাঠান এবং তা ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন। তারপর আবারও আবু হুরায়রার কথা আসে যে* ***'নাহারিয়ার দিবসে'*** *ঘোষণাকারীদের মাঝে আলিও যোগদান পূর্বক ঘোষণা দিলেন যে, "এ বছরের পর মুশরিকগণকে হজ্জ করতে দেয়া হবে না আর না কাউকে উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে"*।

এই আচরণ দ্বারা বুখারী, হযরত আলী (আঃ)-এর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) তাঁকে **'সুরা বারায়াত'** তাবলিগের জন্য পরে পাঠিয়েছিলেন। অথচ রাসুল (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে ঐ সময় পাঠিয়েছিলেন যখন জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম নিয়ে নাযিল হলেন যে, আবু বকরকে (রাঃ) উক্ত নির্দেশবাহক অভিযান থেকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত বানীকে হয় তুমি প্রচার করতে পার আর না হয় এমন কেউ যে তোমা থেকে হবে, সেই প্রচার করতে পারবে। কিন্তু বুখারীর কাছে কথাটি খুবই অপছন্দ হল যে, আবু বকর (রাঃ) আল্লাহ্‌র ওহি দ্বারা বরখাস্ত হলেন এবং আলী (আঃ)-কে আবু বকরের (রাঃ) উপর মর্যাদা দেয়া হল। এ কথা দ্বারা বুখারী কখনোই সুখী হতে পারতেন না, সে কারণেই তিনি রেওয়ায়েতের মধ্যে গোঁজামিল করে দিলেন।

আর সত্যসন্ধানীগন উক্ত গোঁজামিল এবং জ্ঞানত আমানতে খেয়ানতকে কেনই বা বুঝতে পারবেন না। বিশেষ করে তারা যখন পাঠ করবেন যে, আবু হুরায়রা বল্লেন, উক্ত হজ্জে আবু বকর (রাঃ) আমাকে ঐ ঘোষণাকারীদের কাছে পাঠালেন যাদের কুরবানীর দিনে পাঠিয়েছিলেন। তাহলে আবু বকর (রাঃ) কি রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর হুকুম বন্টন করা শুরু করে দিয়েছিলেন? আর তিনি কি নিজেই নির্দেশিত হয়ে যান নি? তাহলে কেমন করে হাকিম সেজে বসলেন এবং সাহাবাদের মাঝ থেকে কাজের জন্য লোকও বাছাই করলেন?

বুখারীর কারসাজির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন যে কিভাবে তিনি আসল বিষয়বস্তুকে পাল্টে ফেল্লেন যে, হযরত আলী (আঃ), যিনি ছাড়া আর কেউ উক্ত কার্য আঞ্জাম দিতে পারতো না, তিনি নবীর (সাঃ) পক্ষ থেকে উক্ত মিশনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন, অথচ তিনিও (আলী) আবু হুরায়রা এবং তারই মত ঘোষণাকারী

আসুন, দেখুন বুখারী একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাকে পছন্দ করেন নি। কারণ এতে আবু বকরের (রাঃ) প্রতি আলী (আঃ)-কে ফযিলাত দান করা হয়েছে। আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ নিজেদের **'সিহাহ্'** ও **'মাসানীদ'** গুলিতে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিরমিযি নিজের **'সহীহ্'**-এ, হাকিম তার **'মুস্তাদরাক'**-এ, আহমদ ইবনে হাম্বল তার **'মুসনাদ'**-এ, ইমাম নাসায়ী তার **'খাসায়েস'**-এ, তাবারী তার **'তাফসীর'**-এ, জালালউদ্দিন সুয়ূতী তার **'দুররে মনসুর'**-এ, ইবনে আসীর তার **'ইতিহাস'**-এ এবং জামাখশারী তার **'কাশ্‌শাফ'**-এ রেওয়ায়েত করেছেন যে ঃ

রাসুল (সাঃ) আবু বকরকে (রাঃ) মক্কা পাঠালেন এবং সেখানে ঐ আয়াত সমূহকে (আল্লাহ্ ও রাসুল মুশরিকদের থেকে মুক্ত) পাঠ করার হুকুম দিলেন। তার পশ্চাতে আবার আলীকে পাঠালেন এবং তাকে উক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আলী (আঃ) **'আইয়ামে তাশরীক'**-এ দাঁড়িয়ে উক্ত আয়াতসমূহকে পাঠ করলেন যে ঃ *"হে মুসলমানেরা! তোমরা যে সমস্ত মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিলে, এখন হতে আল্লাহ্ ও রাসুলের পক্ষ থেকে সেগুলি ভঙ্গ করা হল। অতঃপর চার মাস পর্যন্ত যেখানে খুশি সেখানেই যাও। স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বেঁচে কোথাও যেতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করবেন। এ বছরের পর মুশরিকদের হজ্জ করতে দেয়া হবে না। আরা উলংগ অবস্থায় কাউকে তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না"*।

আবু বকর (রাঃ) ফিরে এসে রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, *"ইয়া রাসুলুল্লাহ্, আমার সম্পর্কে কি কোন কিছু নাযিল হয়েছে"*? রাসুল (সাঃ) বল্লেন, "না, কিন্তু আমার কাছে জিব্রাইল নির্দেশ নিয়ে এসে বলেছে যে, **'উক্ত আয়াতকে হয় আমি নিজে প্রচার করি না হয় এমন কোন ব্যক্তি যে হবে আমা হতে**"।

বুখারী তার স্বাভাব মত অত্র ঘটনাকেও কাট-ছাঁট ও গরমিল করেই বয়ান করেছেন। সুতরাং তিনি তার সহীহ্‌র **'কিতাব তাফসীরুল কোরআন'**-এর **"কাওলুহু ফাসাব্বিহু ফিল আরযে আরবায়াতু আশহুরু"** অধ্যায়ে লিখেছেন যে ঃ আমাকে হামীদ ইবনে আব্দুর রহমান খবর দিয়েছেন যে, আবু হুরায়রাহ বলেছেন যে, উক্ত ঘটনা হচ্ছে অন্যান্য ঘোষণাকারীদের সঙ্গে আবু বকর আমাকেও পাঠিয়ে ছিলেন এবং আমাকে এই কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন যে, "**এই বছরের পর হতে মুশরিকগণ হজ্জ করতে পারবে না। আর না উলংগ অবস্থায় কাউকে তাওয়াফ করতে দেয়া হবে**"। হাদীদ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন যে, তারপর রাসুল (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে উক্ত আয়াত সমূহ দিয়ে পাঠালেন এবং **'বারায়াত'**-এর ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু হুরায়রা বলেন যে, **'নাহরিয়ার দিবসে'** আলী মিনাতে বারায়াতের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ কথা বল্লেন যে, "**আগামী বছর থেকে মুশরিকদের হজ্জ করতে দেয়া হবে না, আর উলঙ্গ অবস্থায় কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে দেয়া হবে না**"। [১]

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খন্ড ঃ ৫, পৃঃ ২০২।

বুখারী প্রথমে চিন্তা করে দেখলেন যে, এর দ্বারা তো বেশীরভাগ সাহাবারাই (বিশেষ করে বুখারী পছন্দসই সাহাবারা) মুনাফেক হিসাবে গণ্য হবেন, কারণ তারা উক্ত হাদীস বর্ণনার সময় রাসুল (সাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। সেহেতু বুখারী উক্ত হাদীসকে বেমালুম গায়েব করে দিলেন।

রাসূল (সাঃ) তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না বরং যা কিছু বলেন তা ওহি দ্বারা নির্দেশিত হয়েই বলেন। হাদীসটি স্বয়ং হযরত আলী (আঃ)-এর জন্য অনেক বড় ফজিলাত। কেননা তাঁরই মাধ্যমে **'হক'**-কে **'বাতিল'** হতে এবং **'বাতিল'**-কে **'ঈমান'** হতে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। হযরত আলী (আঃ) হলেন এই উম্মরে জন্য **'আয়াতুল্লাহুল উজমা'** এবং **'হুজ্জাতুল কুবরা'** এবং এই উম্মতের জন্য **'পরীক্ষার বস্তু'**, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক উম্মত-এ-মুহাম্মদীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। যদিও **'নেফাক'**-এর রহস্য গোপন রহস্যের মধ্যে নিহীত এবং আল্লাহ্র সেটাকে ভাল করেই জানেন কারণ তিনিই চোখের খেয়ানত ও অন্তরে লুকানো রহস্যাবলী হতে অবগত আছেন। স্পষ্টতঃ তিনি ছাড়া গায়েবের ইলম্ আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ্ এই উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া ও করুনা করেছেন এবং মাওলা আলী (আঃ)-কে এই উম্মতের জন্য **'মুমিন'** ও **'মুনাফেক'** চিহ্নিত করার কৌশল বানিয়েছেন। কারণ যে **'হালাক'** বা ধ্বংস হবে সে যেন **'হুজ্জাত'** সহ হালাক হয়, আর যে **'নাজাত'** বা মুক্তি পাবে সেও যেন **'হুজ্জাত'** সহকারেই নাজাত পাক।

আমি অত্র বিষয়ে বুখারীর চতুরতার একটি উদাহরণ পেশ করছি। আমার ব্যক্তিগত আকীদা হচ্ছে যে, সম্ভবতঃ পূর্বপুরুষ হতেই সেই বিশেষত্ব সহকারে আহলে সুন্নাতগণ বুখারীকে অন্যান্য মুহাদ্দেসীনদের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বুখারীর সারা জীবনের চেষ্ট একটি মাত্র বিষয়েই নিঃশেষ হয়েছে, তা হল এই যে, "**যেন এমন কোন হাদীস সংকলিত হতে না পারে যা তার মাযহাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়**"।

সুতরাং বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুল হুব্বাহ ওয়া ফাযলুহা ওয়াত তাহরীসু আলাইহা'**-র **'হুব্বাতুর রুজুল লিইমরয়াতু ওয়াল মুররায়াতু লিজাওজিহা'** অধ্যায়ে লিখেছেন যে ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন যে আয়শা (রাঃ) বলেছেন, 'নবীর (সাঃ) শরীর যখন বেশী খারাপ হয়ে গেল এবং ব্যাথায় অধিক কাঠিন্য দেখা দিল তখন তিনি (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে অনুমতি চাইলে যে, "*আমার সেবা-যত্ন যেন আমার (আয়শার) ঘরে হোক*"। স্ত্রীগণ অনুমতি দিয়ে দিলেন। তখন তিনি (সাঃ) দু'জন ব্যক্তি সাহায্যে সেখান থেকে বাহির হলেন, তাঁর পদ যুগল মাটিতে দাগ কাটছিল। উক্ত দুই ব্যক্তি মধ্যে একজন আব্বাস ছিলেন এবং আরো কেউ একজন ছিল। যাহোক আব্দুল্লাহ বল্লেন, '*আমি আব্বাসকে আয়শার উক্ত কথাটি বল্লাম*'। তখন তিনি বল্লেন, '*তুমি কি জানো না যে, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ছিল যার নাম আয়শা বলেন নি?* আমি বল্লাম, '*আপনি বলুন*'। তিনি বল্লেন, **'সে ছিল আলী ইবনে আবি তালিব'**।

দলের সাথে যোগ দিলেন। অথচ আবু বকরের (রাঃ) উক্ত মিশন হতে প্রত্যাহার এবং কাঁদতে কাঁদতে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট ফিরে আসার বিষয়টিকে বর্ণনা করেন নি, আর না রাসুল (সাঃ)-এর উক্ত কথাকে উল্লেখ করেছেন যে **"আমার কাছে জিব্রাইল এসে বলে গেছেন যে, উক্ত বানীকে হয় আমি না হয় আমা হতে কেউ একজন প্রচার করতে পারবে"**।

যেহেতু রাসুল (সাঃ) উক্ত হাদীসে নিজের চাচাতো ভাই এবং উত্তরসূরী হযরত আলী (আঃ)-কে উম্মতের নেতা বানিয়েছেন। আর একথা তো স্পষ্ট যে রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক আনিত সংবাদ অনুসারেই হয়ে থাকে। সুতরাং তার পরে ব্যাখাকারীর জন্য (বুখারীর মত) এমন ব্যাখ্যা করার আর কোন অবকাশই থাকে না যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রায়ও অন্যান্য মানুষেরই মত কারণ তিনিও তো মানুষ, তার দ্বারাও ভূল-ক্রটি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বুখারীর জন্য উত্তম হত তিনি যেন এই হাদীসকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে ফেলতেন এবং অন্যান্য হাদীসের ন্যায় চেটে-পুটে খেয়ে ফেলতেন।

সুতরাং আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুস সোলেহ'**-এর **'কাইফা ইয়াকতুবু হাযা মা ছালেহ ফালানিবনে ফালান'** অধ্যায়ে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) সম্পর্কে রাসুল (সাঃ)-এর এই কথা, **"আলী আমা হতে আমি আলী হতে"**-কে আলী, জাফর এবং যায়দের ঘটনাতে দেখতে পাবেন ...

অথচ ইবনে মাজা, তিরমিযি, নাসায়ী, ইমাম আহমদ এবং কানযুল উম্মালের লেখক (ইত্যাদীগন) সবাই রাসুল (সাঃ)-এর এই কথা **"আলী আমা হতে আমি আলী হতে"**-কে বিদায়ী হজ্জের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বুখারী উপরোক্ত অধ্যায়ে বয়ান করেছেন।

এখানে আমি আরো একটি কথা সংযোজন করতে চাই, তা হল এই যে, মুসলিম তার সহীহ্‌র **'কিতাবুল ঈমান'**-এর **"আদ্দালীল"** অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আলী এবং আনছারগণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করাতে দ্বীনের পরিচয় পাওয়া যায় আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাতে মুনাফেকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হযরত আলী (আঃ) হতে নকল করেছেন যে ঃ তিনি (সাঃ) বলেছেন, "কসম সেই সত্তার যিনি কুঁড়িকে প্রসফুটিত করেছেন এবং বাতাসকে বহমান করেছেন"। আমাকে উম্মী নবী (সাঃ) বলেছেন যে, **"কোন মুনাফেক আমাকে ভালোবাসবে না এবং কোন মু'মিন আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না"**।

তিরমিযি তার **'সহীহ্‌ত'**-এ, নাসায়ী তার **'সুনান'**-এ, আহমদ ইবনে হাম্বল তার **'সুনান'**-এ এবং বায়হাকী তার **'সুনান'**-এ, তাবারী তার **'যাখায়েরুল উকবাত'**-এ, ইবনে হাজর **'লেসানুল মিজান'**-এ উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বুখারী উক্ত হাদীসকে সংকলনই করেন নি। যদিও হাদীসটি তার কাছেও সত্য বলে প্রমানিত ছিল অথচ মুসলিম সেটাকে সংকলন করেছেন এবং উক্ত হাদীসের রেওয়ায়েতও সত্য। উক্ত হাদীস সম্পর্কে

সেই মকতবগুলি বুখারী এবং তারই মত ব্যক্তিদের চয়ন করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের বাদশার আনুগত্য এবং তাদের মাযহাব সমূহের বিস্তার ঘটানোর জন্য ধন ভান্ডার ও স্তম্ভ বানিয়ে ছিল এবং তাদের **'ইজতিহাদ'**-কে যেমন ইচ্ছা তেমন নাচিয়েছে। কেননা এই কাজটি উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে অতি উত্তম ব্যবসা এবং ফলদায়ক মালামাল ছিল সে সমস্ত আলেমদের জন্য যারা খলিফাদের সমর্থন হাসিলের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করতেন। যেভাবেই হোক না কেন, বানোয়াট হাদীস রচনা করে অথবা অপব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। এটাই ছিল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'-এর রাজনীতি। প্রত্যেকেই তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা এবং তাদের কাছ থেকে ধন-সম্পদ হাসিল করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। তারা দুনিয়ার বিনিময়ে নিজেদের আখেরাতকে তো বিক্রয় করে দিলেন, কিন্তু তাদের সেই ব্যবসা তাদের কোন ফায়দা পৌছাতে পারল না এবং তারা কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছিত এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

জনগন তো জনগনই। যুগ তো যুগই। আজও আপনারা সেই ঢং এবং সেই রাজনীতিই অবলোকন করে থাকেন। কত বড় বড় আলেম নিজেদের ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছেন, যাদেরকে মানুষ চিনেই না বা তাদের সম্পর্কে কিছু জানেই না। অথচ বিরাট সংখ্যক অজ্ঞ-মূর্খরা **'খতিব'**, জামায়াতের **'ইমাম'** এবং মুসলমানদের শহর সমূহের **'হাকিম'** সেজে বসে আছে। এর কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের নৈকট্য ও সমর্থন। অন্যথায় আপনারা নিজের প্রতিপালকের কসম খেয়ে আমাকে বলুন যে, আহলে বাইতে রাসুল (সাঃ), **যাদের নিকট হতে আল্লাহ্ পাক সমস্ত ধরণের কলুস-কালিমাকে দূরে রেখে দিয়ে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করেছেন যতটা পবিত্রতার হক আছে"** -তাঁদের প্রতি বুখারীর শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে কেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে? **'আইম্মায়ে হুদা'**-র প্রতি বুখারীর শত্রুতার কেমন করে ব্যাখ্যা হতে পারে, যদিও বুখারী জীবদ্দশাতেই **'আইম্মায়ে হুদা'** উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বুখারী তাঁর কাছ থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেন নি। তবে হ্যাঁ, কোন হাদীস যদি নিয়েছেন তবে সেই হাদীসে তাদের মান-মর্যাদাকে খাটো করার জন্য ইচ্ছা মত রচনা করে তাঁদের দিকে নিসবাত করেদিয়েছেন। আর এ কর্মটি হলো তাদের নিষ্পাপতার বিরুদ্ধে, যা কোরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমানিত। এর কিছু কিছু উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

বুখারী আবার অনেক হাদীস খারেজীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন, যারা সারা জীবন আহলে বাইত (আঃ)-দের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে এবং তাঁদের হত্যা করেছে। যেমনটি আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বুখারী -মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আ'স, আবু হুরায়রা, মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং মাকাতিল ইবনে সোলেমান যাকে 'দজ্জাল' বলা হয়। ইমরান ইবনে খাত্তানের মত রাবী যে ছিল হযরত আলী ও আহলে বাইত (আঃ)-দের শত্রু তার থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন এবং সে ছিল খারেজীদের কবি ও খতিব, যে হযরত আলী (আঃ)-কে হত্যা করার পর ইবনে মুলজামের অঢেল প্রশংসা করেছে।

যেমনটি বুখারী খারেজী, মারজাহ্ ও মুজাসসিমাহ্ এবং কিছু কিছু এমন সব নাম না জানা লোকের কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যাদের ইতিহাসের মধ্যে কোন অস্তিত্বই

উক্ত ঘটনাকে ইবনে সা'দ সত্য সনদ সহকারে নিজের **'তাবাকাত'**-এ বিস্তারিত লিখেছেন।[১] অনুরূপভাবে **'সীরাতুল হালবিয়াহ্'** এবং **'সুনান'** লেখকগনও ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, আয়শা (রাঃ) এক মুহূর্তের জন্যও মাওলা আলী (আঃ)-কে সহ্য করতে পারতেন না।

কিন্তু বুখারী উক্ত ঘটনা হতে ঐ বাক্যকে উড়িয়ে দিলেন যার দ্বারা আলীর (আঃ) প্রতি আয়শার (রাঃ) বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছিল, তা এই যে তিনি (আয়শা) হযরত আলীর নাম নেয়াটাও বরদাশ্ত করতে পারতেন না। তদুপরি বুখারী যতটুকু লিখেছেন ততটুকুই বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। ইতিহাস অধ্যায়নকারী কোন সত্য সন্ধানীর কাছে এ কথা ঢাকা থাকবে না যে, উম্মুল মুমেনীন আয়শা (রাঃ), মাওলা আলীর (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

ইবনে হাজর সোয়ায়েকে **'মুহরিকা'**-র ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, দু'জন গেয়োঁ ব্যক্তি উমরের কাছে নিজেদের ঝগড়ার মিমাংসার জন্য এলা। উমর, হযরত আলীকে বিচার করার জন্য অনুরোধ করলেন। তাদের মধ্যে একজন বল্ল, "*ইনিই কি আমাদের বিচার করবেন*"? কথাটা শুনা মাত্রই উমর উঠে গিয়ে তার কলার ধরে বল্লেন, **"আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুক, তুই কি জানিস ইনি কে, ইনি হলেন সমস্ত মুমেনীনের মাওলা এবং ইনি যার মাওলা নন সে মু'মিন নয়"**।

হযরত আয়শার (রাঃ) বিদ্বেষের শেষ সীমা তো এই যে, তিনি যখন হযরত আলী (আঃ)-এর শাহাদাতের খবর পেলেন তখন **'শুকরানা সিজদা'** করলেন। যা'হোক আল্লাহ্ পাক উম্মুল মুমেনীনের প্রতি রহম করুক এবং তাঁর স্বামীর মর্যাদার কারণে যেন তাকে বখ্শিশ করে দেন। আমরা আল্লাহ্র সেই রহমতকে সীমিত জ্ঞান করি না যা প্রতিটা জিনিসের উপর ছায়া করে আছে। আমরা তো এতটুকুই বুঝি যে, যদি সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ফিতনা সৃষ্টি না হত যা আমাদের ভ্রষ্টতা, আমাদের দিধা-বিভক্তি এবং আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যার কারণে আজ আমরা 'মুসতাকবেরীন' বুদ্ধিজীবিদের মুখের খাদ্য এবং জালেম শাসকদের লক্ষ্য (টার্গেট) হয়েছি। **লাহাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আযীম।**

যে সমস্ত বর্ণনা দ্বারা আহলে বাইত (আঃ)-গণের মর্যাদাহানী হয়েছে সেগুলি বুখারীর কাছে খুবই প্রিয় ঃ

অনেক পরিতাপের বিষয় যে, বুখারী এমন পথ অবলম্বন করেছেন যা খলিফাদের চরিত্রনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যেগুলিকে রাষ্ট্রযন্ত্র শক্তিশালী ও স্থায়ী করেছে। অথবা

---

১ তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৯

উক্ত অধিবেশনে যেখানে বাছাই করা ইসলামের শিক্ষকমন্ডলী এবং মুসমানদের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের প্রতি আঘাত করেছিলাম যা'দ্বারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আরব খৃষ্টানও উপস্থিত ছিল। আমার ধারণা সে লেবাননের অধিবাসী। সে চালাকী ও খেয়ানতের আশ্রয় নিয়ে আমার প্রতি আপত্তি করে বসল এবং আমার সমস্ত পরিশ্রম প্রায় ধুলিস্যাত হতে যাচ্ছিল।

উক্ত ডক্টরটি স্পষ্ট আরবীতে বলল, "*তুমি এই অধিবেশনে যা কিছু বক্তব্য রেখেছে তাতে অনেক মিথ্যাচারিতা করেছো। বিশেষ করে নবীর মাসুম হওয়ার বিষয়ে। কেননা এই বিষয়ে খোদ মুসলমানরাই তোমার পক্ষে নন, স্বয়ং মুহাম্মদও তোমার পক্ষ অবলম্বন করেন না। তিনি বহুবার বলেছেন যে, আমিও বাশার (মানুষ) যার দ্বারা ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব। উপরন্তু মুসলমানগণ তাঁর কয়েকটি ভুল-ভ্রান্তিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তাদের নাম উল্লেখ করতে পারব না। মুসলমানদের সহীহ্ ও বিশ্বস্ত কিতাবাদি এ কথার স্বাক্ষ্য বহন করছে*"। এরপর খৃষ্টান ব্যক্তিটি বল্ল, "*অতঃপর যুদ্ধ সংক্রান্ত -এ বিষয়ে উপস্থিত সুধীমন্ডলী ইতিহাসের আলোচনা করুন। বরং অত্র বিষয়ে কিতাবাদিতে মুহাম্মদের যুদ্ধ সমুহের অধ্যয়নই যথেষ্ট হবে। তারপর উক্ত যুদ্ধে ধারাবাহিকতা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' পর্যন্ত অব্যহত ছিল। এমনকি তারা ফ্রান্সের শহর* ***POITIER*** *(রোয়েটিয়ার) পর্যন্ত পৌছে যান এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তারা তাদের নতুন ধর্মকে তরবারীর জোরে স্বীকার করাতেন*"।

উপস্থিত সবাই তার কথাকে গ্রহণ করছিলেন এবং করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করলাম যে, প্রফেসর সাহেব যা বলছেন তা মিথ্যা, যদিও এগুলি মুসলমানরা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছে। আমার উক্ত কথার প্রতি অনেক ঠাট্টা-মস্করা করা হল এবং অট্ট হাসিতে পুরো হল গমগম করতে লাগল।

ডক্টরটি আবারও বাধা দিয়ে বল্ল, '*যা কিছু আমি বয়ান করেছি তার কোনটিই অবিশ্বস্ত কিতাব হতে বলেনি, উক্ত কথাগুলি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে মজুদ আছে*'। আমি বল্লাম, '*উক্ত কিতাব দু'টি সুন্নিদের কাছে বিশ্বস্ত এবং শিয়াদের নিকট তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই। আর আমি হচ্ছি শিয়া মুসলমান। শিয়াদের কিতাবাদিতে তেমন কোন কথার উল্লেখ নাই*'। সে বল্ল, '*শিয়াদের রায় ও মত আমাদের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। কারণ তাদেরকে অধিকাংশ মুসলমান কাফের বলে থাকেন। সুন্নিরাই হলেন মুসলমান এবং তাদের সংখ্যা শিয়াদের তুলনায় ১০ গুন, তাদের নিকট শিয়াদের কথার কোন মূল্য বা গুরুত্ব নাই*'। সে আরো বল্ল, '*তোমাদের মুসলমানদের মাঝে যখন বোঝাপড়া হয়ে যাবে এবং নিজেদের নবীর ইসমাত (নিষ্পাপতা) বিষয়ে তোমরা তোমাদের নফস্‌গুলিকে সন্তুষ্ট করে নিবে তখন হয়তো সম্ভব হবে যে তোমরা আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করতে পারবে*'। (এ কথাগুলি সে মুচকি হাসি দিয়ে ধিক্কার দেয়ার ভঙ্গীতে বলল)।

নেই। অনুরূপভাবে বুখারী তার সহীহ্‌তে কয়েকজন বিখ্যাত রাবীর প্রতি বিভিন্ন ভন্ড ধরণের রাবীদের মাধ্যমে মিথ্যারোপ এবং পরিবর্ত বা পরিবর্ধন করেছেন। এর উদাহরণ হল এই যে, বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুন নিকাহ্'**-এর **"মা উহিল্লু মিনান্নিসায়ে ওয়ামা ইউহাররিমু ওয়া কাওলুহু তায়ালা 'হুররিমাত আলাইকুম উম্মাহাতিকুম ...**" অধ্যায়ে লিখেছেন। অন্য অধ্যায়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই কাওল **"ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাউ যালিকুম"** সম্পর্কে লিখেছেন যে, আকরামাহ্ ইবনে আব্বাস হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "*কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর বোনের সাথে জেনা করে তাহলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না*"। আবার ইয়াহইয়া কান্দি হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি শো'বা ও আবু জাফর হতে নকল করেছেন যে, "*কোন ব্যক্তি যদি কোন বালকের সাথে খারাপ কাজ করে তাহলে তার মায়ের সাথে বিবাহ হারাম হবে*"।

বুখারীর ব্যাখ্যাকারী উক্ত বাক্যের **'হাশিয়া'**-তে লিখেছেন যে, **"উত্তম হলো এটাই যেন উলামাগণ তাদের গ্রন্থ সমূহ থেকে এধরণের কথাকে বাদ দিয়ে নিজেদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন"**। অনুরূপভাবে বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাবুর তাফসীরুল কোরআন'**-এর **"নিসাউকুম হারসুন লাকুম"** অধ্যায়ে না'ফে হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন, "ইবনে উমর কোরআন তেলাওয়াত করার সময় কারোর সাথে কথা বলতেন না। একদিন তেলাওয়াত করার সময় আমি তার কাছে পৌছে গেলাম। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিলাওয়াত সমাপ্ত করলেন তখন বল্লেন, '*তুমি কি জানো যে এই আয়াত কোন বিষয়ের জন্য নাযিল হয়েছে?* আমি বল্লাম, '*না*'। তিনি বল্লেন, '*অমুক অমুক বিষয়ের জন্য নাযিল হয়েছে*'। তারপর তিনি বিদায় নিলেন।

আর না'ফে ইবনে উমর হতে রেওয়ায়েত করেছেন, **"কালু হারসিকুম ইন্নি শে'তুম"**। তিনি বল্লেন, "ইয়া আইইয়াতুহা ফি ... অর্থাৎ অমুক দিক থেকে ... ব্যাখ্যাকারী এর উপর 'হাশিয়া' সংযোজনের সময় বলেছেন যে, **"কাওলুহু ফি ... বিহাযিফাল মাজরুরু ওয়াহুওয়ায যারাফু আইউ ফিদ্দুবুর"** তার এই কথা যে অমুক দিক হতে ... তিনি এখানে **'মাজরুও'**-কে **'হাযাফ'** (বিলোপ) করেছেন আর তা হল **'দুবুর'**। আরো একটি কাওল হল এই যে, **'মুয়াল্লিফ'** (লেখক) ঘৃনার কারণে সেটাকে **'হাযাফ'** করেছেন এবং অনুরূপভাবে ব্যাখ্যাকারীও"।

একদিন আমি প্যারিসের ইউনিভারসিটি **'সারবুন'**-এ **'রাসূল (সাঃ)-এর আখলাক'** শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে তাঁর আখলাকের স্বাক্ষ্য পবিত্র কোরআন দিয়েছে এবং রেসালতের ঘোষণা দেয়ার পূর্বেও রাসুল (সাঃ)-এর আখলাক অনেক প্রসিদ্ধ ছিল, তাই তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমিন' বলা হত। অধিবেশনটির প্রায় এক ঘন্টা অতিবাহিত হয়েগিয়েছিল ততক্ষণে আমি এই কথা স্পষ্টাকারে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম যে, নবী (সাঃ) জংজু (যুদ্ধ-বিগ্রহ মনা) ছিলেন না আর না নিজের ধর্মকে বিস্তার করার জন্য মানবতার হককে ভূ-লুণ্ঠিত করেছেন এবং শক্তির বলে নিজের ধর্মকে স্বীকার করাতেন না, যেমনটি কিছু কিছু মুস্তাশরেকীনদের (বুদ্ধিজীবি) দাবী আছে।

খ্রীষ্টান ডক্টরটি বল্ল, "*কিন্তু মুসলমানেরা বিষয়টাকে নবীর সুন্নাত বানিয়ে নিয়েছে। কতই না অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ তাদের পিতা নিজেদের সমবয়সীদের সাথে দিয়েছে। আর আফসোসের বিষয় তো এটাই যে উক্ত রীতি-নীতি এখনো বিদ্যমান*"।

আমি এই সুযোগটিকে গনিমাত মনে করে বল্লাম, "*সে জন্যই তো আমি সুন্নি মাযহাব ত্যাগ করে শিয়া মাযহাব গ্রহণ করেছি। কেননা শিয়া মতবাদ মহিলাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে যে, তারা নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করতে পারে, কোন ওলি বা অভিভাবক তাতে কোন বাধা দিতে পারবে না*"।

সে বল্ল, '*সুন্নি ও শিয়ার আলোচনা বাদ দিন। আমরা আয়শার সাথে মুহাম্মদের বিবাহের আলোচনা করছি*'। সে উপস্থিত সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে বল্ল, "*মুহাম্মদ হলেন নবী, ৫৪ বছর যার বয়স হয়েগেছে, তিনি এমন এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার সাথে বিবাহ করলেন যে বৈবাহিক জীবন স্পর্কে কিছুই জানে না। বুখারী আমাদের বলে দিচ্ছে যে, ঐ বালিকা তার স্বামীর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলা করতো। এর দ্বারা আয়শার শিশু সুলভ আচরণটিই প্রকাশ করে। এটাই কি সে উত্তম চরিত্র, যার দ্বারা নবী সম্মানিত হয়েছেন*'?

আমি আবার নতুন করে তাদেরকে এভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলাম যে, '*বুখারীর কথাকে নবীর (সাঃ) ব্যাপারে হুজ্জাত (দলিল) বলে ঘোষণা দেয়া যাবে না*'। কিন্তু এখন আর কোন কথা বলাই নিষ্ফল ছিল। কারণ উক্ত লেবাননী ডক্টরটি প্রত্যেক বিষয়ে আহলে সুন্নাতের চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টিকোণকেই ইসলামের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে খেলা করছিল। সুতরাং আমার জন্য আলোচনা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোন গত্যান্তর ছিল না। কারণ সে আমার প্রতি বুখারীর মাধ্যমে দলিল-প্রমান প্রতিষ্ঠা করছিল অথচ আমি বুখারীর কোন কথাকেই স্বীকার করি না।

আমি সেখান থেকে ঐ সমস্ত মুসলমানের উপর আফসোস করতে করতে বেরিয়ে এলাম যারা ইসলাম ও রাসুল (সাঃ)-এর শত্রুদের হাতে এমন সব অস্ত্র সরবরাহ করে দিয়েছে যেগুলিকে তারা আমাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। ঐ অস্ত্র সরবরাহীকারীদের মধ্যে বুখারী হলে সর্ব শীর্ষে। সে দিন আমি অত্যান্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফেরৎ এলাম এবং সহীহ্ বুখারীর পৃষ্ঠা উল্টানো শুরু করে দিলাম, তখন আমি **'ফাযায়েল-এ-আয়শার'** অধ্যায়ে সব কিছুই পেয়ে গেলাম। তখন আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। অন্যথায় আমি রাসুল (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহেই পড়ে থাকতাম, যদিও সেগুলি আমাকে প্রথমেই সন্দিহান করে রেখেছিল। আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া।

এখানে ঐ সমস্ত কিছু কিছু রেওয়ায়েতের আলোচনা করে দেয়াটা অত্যান্ত জরুরী যা উক্ত অধিবেশনে বিতর্ককালে উপস্থাপিত হয়েছিল। যেন সুধী পাঠক মন্ডলীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিদ্রুপকারীরা আমাদেরকে অযথা দোষারোপ করে না। তারা আমাদের

তারপর সরাসরি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্ল, *'কিন্তু যতদূর তাঁর (মুহাম্মদের) উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, তাহলে আমি আপনার কাছে আরজ করছি আপনি যেন উপস্থিত সকলকে এই কথা বুঝিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ ৫৪ বছর বয়সে মাত্র ৬ বছর বয়স্কা আয়শার সাথে কেমন করে বিয়ে করলেন'?* অবারো অট্ট হাসি দ্বারা পুরো হল গমগম করে উঠল এবং লোকজন ঘাড় উঁচু করে আমার জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল। আমার পক্ষ্য থেকে আমি এ কথা বিশ্বাস করাতে চেষ্ট করলাম যে আরবে বিয়ে দু'টি স্তরে হয়ে থাকে। প্রথম স্তরটি হল **'আক্দ'** ও **'নিকাহ'** এবং দ্বিতীয় স্তর **'দখুল'** তথা সহবাসের সাথে সম্পর্কিত। আর নবী (সাঃ) আয়শার সাথে ৬ বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তখন তিনি সহবাস করেননি বরং আয়শার যখন ৯ বছর বয়স হল তখন সহবাস করেছিলেন। আমি বল্লাম, *'এমনটিই বুখারী লিখেছেন। যদিও কথাটি আমার মতপুতঃ নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত রেওয়ায়েতের সহীহ্-শুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান। কেননা ঐ যুগে মানুষ মাযহাব ভিত্তিক জীবন যাপন করত না, আর না জন্ম-মৃত্যুর দিন তারিখ লিখে রাখা হত। আবার রেওয়ায়েতটিকে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়াও হয় তাহলেও ৯ বছরের বয়সে আয়শা বালেগ হয়ে গিয়েছিলেন। আজ আমরা রাশিয়া ও রোমানিয়ার যতগুলি মেয়েকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখি তাদেরকে দৈহিকভাবে কামিল (পূর্ণ যৌবনা) দেখতে পাই কিন্তু যখন তাদের বয়স বলা হয় তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই যে কারোর বয়স ১১ বছরের চেয়ে অধিক নয়। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী (সাঃ) আয়শার বালেগ হওয়া এবং মাসিকের হিসাব করেই সহবাস করেছিলেন। কেননা ১৮ বছর বয়সকে বালেগ হওয়ার জন্য সময়-সীমাকে সমর্থন করে না, যেমনটি তোমাদের ফ্রান্সে বিখ্যাত আছে। বরং মহিলাদের বালেগ হওয়ার বিষয়ে তাদের হায়েজ (মাসিক রক্তপাত) শুরু হওয়া এবং পুরুষদের বালেগ হওয়ার বিষয়ে তাদের বীর্জপাত হওয়াটাই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার আজকের যুগে তো আমাদের সামনে এমন অনেক উদাহরণ আছে যে ১০ বছর বয়সেই ছেলেদের বীর্জ পাত হয় এবং অনুরূপভাবে মেয়েরাও ১০ বছরের পূর্বেই হায়েজ হয়ে যায়'*।

আমার এই কথার পর এক মহিলা দাড়িয়ে আমার প্রতি আপত্তি করে বল্লো, *'আপনার কথাকে যদি স্বীকারও করে নেয়া হয় এবং কখনো কখনো এমনটি হয়েও থাকে এবং জ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি সঠিক। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সাথে উক্ত বুড়োর বিবাহকে কেমন করে স্বীকার করা হবে, যার বয়স তার জীবনের শেষ কোঠায় উপনীত হয়েছে'*।

আমি বল্লাম, *'মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন আল্লাহ্র নবী। তিনি যা কিছু করেন তা ওহী মারফত নির্দেশিত হয়েই করেন। আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্র প্রতিটা কাজেই হিকমত নিহিত থাকে, যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই হিকমত সম্পর্কে জ্ঞাত নই*।

এরপর কি সেই ইসলামের দুশমনদের কোন নিন্দা করা যেতে পারে যারা প্রতি নিয়ত এই কথাকে বাতাস দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মহিলাদের অনেক প্রিয় জ্ঞান করতেন এবং তিনি যথেষ্ট কামুক ব্যক্তি ছিলেন? (মায়েজাল্লাহ্) যেহেতু তারা বুখারীতে লক্ষ্য করেছে যে, তাঁর (মুহাম্মদ) প্রতিপালক তাঁর ইচ্ছার (নফস) বিষয়ে তড়িৎগতিতে কাজ করে থাকেন এবং তারা বুখারীতে এ কথাও লক্ষ্য করেছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এক ঘন্টার মধ্যে ১১ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন এবং তাঁকে ৩০ জন বলিষ্ঠ যুবকের শক্তি দেয়া হয়েছিল। (মায়েজাল্লাহ্)

সুতরাং উক্ত মুসলমানদের প্রতি **'লানত'** করা উচিৎ যারা এধরণের জঘন্য ঘটনাবলী ও বিষয়বলীকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলিকে সহীহ্-শুদ্ধ বলে স্বীকারও করেছেন। বরং এগুলিকে সেই কোরআনের মতই জ্ঞান করে থাকেন, যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আহলে সুন্নাতগণ সর্ব বিষয়েই অসহায়, এমন কি তারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসেও স্বাধীন নন। একটি বিষয়েও তাদের নিজেদের কোন অধিকার নেই। নিশ্চিতরূপে উক্ত কিতাবাদি তাদের পূর্ববর্তী শাসকগণ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন পথ তাদের সামনে খোলা নেই এবং উক্ত **'সিহাহ্ সিত্তার'** বাহিরে এক কদমও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

এখন আমরা সেই রেওয়ায়েত সমূহকে লিপিবদ্ধ করব যেগুলিকে বুখারী আহলে বাইত (আঃ)-দের মর্যাদাকে খাটো করার জন্য বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বুখারী তার সহীহ্‌র ৮ম খন্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় **'কিতাবুল মাগাযী'**-র **"শহুদুল মালায়েকাতু বাদরান"** অধ্যায়ে আলী ইবনুল হুসাইন হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হুসাইন ইবনে আলী খবর দিয়েছেন যে, আলী বলেছেন ঃ "বদরের মালে গনিমাত হতে আমি একটি উস্ত্রী পেয়েছিলাম এবং নবী (সাঃ) **'খুমস'** হতে আমাকে কিছু দিয়েছিলেন। ফাতেমা বিনতে রসুলের সাথে আমার বিবাহের কথা ঠিক হল তখন আমি **'বনি ফাইয়ানকা'**-র উট সাজানে ওয়ালা একজন লোককে নিজের হাটে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে সেটাকে বিক্রয় করে বিবাহের ওলিমা করব। আমি উস্ত্রীর কুজাওয়াহ্ (হাওদা) ও দড়িগুলো একত্র করে নিলাম, ঐ মুহুর্তে আমার উস্ত্রীটি আনছারদের একজনের হুজরার ছায়ায় বসা ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে তার কোহান (পিঠের উঁচু হাড়) কাটা, তার পাঁজর ফেঁড়ে কলিজা বাহির করে নেয়া হয়েছে। এমন দৃশ্য দেখে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আমি বল্লাম যে, '*এই কাজটি কে করেছে?*' লোকেরা বল্ল, '*হামজা ইবনে আব্দুল মুতাল্লিব এবং তিনি ঐ ঘরে আছেন। আনছারদের মধ্যেকার তার কিছু সঙ্গীও সেখানে উপস্থিত আছে এবং তাদের কাছে মদের পাত্রও আছে। হামজা তরবারী দিয়ে তার পিঠের মাংশ কেটে নিল এবং পাঁজড় ফেঁড়ে তার কলিজা বের করে নিল*'।

হযরত আলী বলেন, 'আমি নবীর (সাঃ) খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর পাশে যায়দ ইবনে হারিসও বসা ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে নবী (সাঃ) অনুমান করে

'সিহাহ্ সিত্তার' মধ্যে দোষ-ক্রটি পেয়েছে এবং সেগুলিকেই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুল খলক'**-এর **"তাযবীজুন্নবী (সাঃ) ওয়া কুদুমুহুল মাদীনাতে ওয়া বনায়েহি বিহা"** অধ্যায়ে আয়শা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন, *"নবী (সাঃ) যখন আমার সাথে বিবাহ করলেন তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। অতঃপর আমরা মদীনায় এলাম এবং হরিস ইবনে খাযরাজের ঘরে অবস্থান করলাম। সেখানে আমার চুল ধুলোয় ভরে গেল। একদিন আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এলেন, ঐ মুহূর্তে আমি আমার সখীদের দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তিনি আমার প্রতি রাগান্বিত হলেন। আমি তার নিকটে এলাম, কিন্তু আমি জানতাম না যে তিনি আমার প্রতি কেন রাগ করেছেন, তিনি আমার কাছে কি চান। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং দরজার উপর এন দাঁড় করালেন, আমার দম ফুলতে লাগল। যখন একটু শান্ত হলাম তখন তিনি আমার চেহারা ও মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে ঘরের ভিরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সেখানে আনছারের মহিলারা জমায়েত আছেন। তারা আমাকে দোয়া দিলেন, আমার মা আমাকে তাদেও নিকট সোপর্দ করে দিলেন। তারা আমার চুল আঁচড়ে দিলেন, তারপর আমাকে রাসুলুল্লাহ্র (সাঃ) কাছে সোপর্দ করে দিলেন। ঐ মুহূর্তে আমার বয়স ছিল ৯ বছর"*। এধরণের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে টীকা লেখার কাজ আমি সুধী পাঠকমন্ডলীর নিকট সোপর্দ করে দিলাম।

যেমনটি বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাবুল আদব'**-এর **'আল-ইম্বিসাতু ইলান্নাস'** অধ্যায়ে আয়শা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন, "*আমি নবীর (সাঃ) ঘরে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার সখীরাও আমার সাথে খেলা করত। রাসুল (সাঃ) যখন আসতেন তখন অমার সখীরা সরে পড়তো কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন তারা আমার সঙ্গে খেলা শুরু করে দিত*"।

আপনারা যদি এমন ধরণের রেওয়ায়েত অধ্যয়ন করার পরও কি ঐ সকল বুদ্ধিজীবিদের বিদ্রুপের প্রতি আপত্তি করতে পারবেন? নিজের প্রতিপালকের কসম খেয়ে আমাকে বলুন! আপনারা যখন রাসুল (সাঃ)-এর সম্পর্কে আয়শার (রাঃ) উক্ত কথাকে পাঠ করবেন যে, "*কল্পনার প্রতিপালককে আমি আপনার ইচ্ছার প্রতি তড়িৎকর্মা পেয়েছি*"। [১] (সত্যি করে বলুন) এই মহিলা সম্পর্কে আপনার অন্তরে আর কোন সম্মান অবশিষ্ট থাকবে কি? যিনি রাসূল (সাঃ)-এ পবিত্রতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। এর দ্বারা আপনার অন্তর কি একথাই বলবে না যে, এ হল তার বোকামির দলিল এবং তার বুদ্ধি-বিবেক পরিপক্ক ছিল না।

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৬, পৃঃ ২৪, কিতাব-**'তাফসীরুল কোরআন'** অধ্যায়ে।

বুখারী এমনই সব রেওয়ায়েত বর্ণনা করে সন্তুষ্টি লাভ করেন যেগুলিতে আহলে বাইত (আঃ)-দের গৌরবের বিষয় বস্তুতে আঘাত লাগে এবং এ ধরণের হাদীস রচনাকারীদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।

বুখারী বলেন যে, আমার কাছে অব্দান বর্ণনা করেছে, আমাকে, আব্দুল্লাহ খবর দিয়েছে, আমাকে ইউনুস খবর দিয়েছে এবং আমার কাছে আহমদ ইবনে সালেহ্ বয়ান করেছে, আমার কাছে আম্বাহ্ বয়ান করেছে।[১] উক্ত সাতজন ব্যক্তির কাছ থেকে বুখারী রেওয়ায়েত নকল করেছেন। সনদের ধারাবাহিকতা 'সৈয়্যেদুস সাজেদীন' পর্যন্ত যাওয়ার পূর্বেই প্রশ্ন ওঠে যে, জয়নুল আবেদীন (আঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই কথা কি যুক্তি যুক্ত হবে যে তিনি এমন ধরণের মিথ্যা কথা-বার্তা বয়ান করেছেন যে, **'সৈয়্যেদুস শুহাদা মদ পান করতেন, যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরাতও করেছিলেন'**। এটি তখনকার ঘটনা যখন মুসলমানরা অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। যেমনটি রেওযায়েত দ্বারা স্পষ্ট আছে যে, উক্ত উষ্ট্রী হযরত আলী (আঃ)-এর বিবাহের ওলিমার জন্য ছিল যা দ্বিতীয় হিজরীতে সম্পন্ন হয়েছিল। আর নবী (সাঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে বদরের মালে গনীমাত হতে তাঁর অংশ দিয়েছিলেন। আবার সৈয়্যেদুস শুহদার ক্ষেত্রে এমন কথা কি মানায় যে তিনি জেনাকারী মহিলার গান শ্রবন করবেন এবং তারই আব্দার মতে বেধড়ক উষ্ট্রীকে কেটে ফেলবেন?

এমন কথা কি সৈয়্যেদুস শুহাদার (হামজা) ক্ষেত্রে যুক্তি যুক্ত হবে যে, আল্লাহ্‌র নামে জবেহ না হওয়ার পশুর মাংশ খাবেন এবং তার পাঁজর ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিবেন? এই কথা কি রাসুল (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে মানায় যে তিনি বেহুদা ও মদ পানকারীদের অসরে উপস্থিত হয়ে হামজার প্রতি বকা-ঝকা করবেন? সৈয়্যেদুস শুহাদার জন্য এটা কি উচিৎ ছিল যে তিনি মদ পান করে এতোই মাতাল হয়ে যাবেন যে তার চোখ রক্তিম বর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনি রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি এমন অকথ্য ভাষা ব্যবহার করবেন যে, *'তুমি হলে আমার পিতার গোলাম'*? রাসুল (সাঃ)-এর জন্য এমনটা করা কি উচিৎ হয়েছে যে, তিনি বিষয়টির নিস্পত্তি না করেই তৎক্ষানত ফেরৎ চলে এলেন, যদিও কথাটি বিখ্যাত যে তাঁর রাগ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হত।

আমি বিশ্বাস করি যে, উক্ত রেওয়ায়েতটি যদি হযরত হামজার (রাঃ) পরিবর্তে আবু বকর অথবা উমর অথবা উসমান অথবা মুয়াবিয়া সম্পর্কে হত তাহলে দুঃখের চোটে বুখারী সেটাকে সংকলনই করতেন না। আর যদিও সংকলন করতেন তাহলে কাট-ছাঁট ও করে উপস্থাপন করতেন। কি আর করা যাবে, বুখারী সেই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট নন যারা খলিফাদের 'মাসলাক'-কে (আকীদা) অস্বীকার করেছিলেন। এমন কি তাদের প্রত্যেককেই কারবালা মরু প্রান্তরে শহীদ করে দেয়া হল, একমাত্র আলী ইবনুল হুসাইন (আঃ) ছাড়া, কেউ বাঁচতে পারলেন না। কিন্তু হায় আফসোস! দুশমনরা তাঁর পবিত্র মুখ

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ১, পৃঃ ১৬।

ফেল্লেন এবং বল্লেন, "*তোমার সাথে এমন কি ব্যবহার হয়েছে*"? আমি বল্লাম, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! হামজা আমার উস্ত্রীর পিঠের মাংশ কেটে নিয়েছে, তার পাঁজড় ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিয়েছে এবং সে উক্ত ঘরের মধ্যে মাতালদের মাঝে বসে আছে*'। নবী (সাঃ) নিজের চাদর চাইলেন সেটাকে ঘাড়ে ফেলে রওয়ানা দিলেন। আমি ও যায়েদ উভয়ে তাকে অনুসরণ করে সেই ঘর পর্যন্ত পৌছালাম যেখানে হামজা ছিলেন। প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে নবী (সাঃ) হামজার কর্মের জন্য তাকে বকা-ঝকা করলেন। মদের নেশায় হামজার চোখ রক্তিম বর্ণ ছিল। হামজা নবী (সাঃ)-কে দেখল তারপর দৃষ্টি তুলে তাঁর চেহারার দিকে তাকাল এবং বল্ল, '*তুমি হলে আমার পিতার গোলাম*'। *সুতরাং নবী (সাঃ) বুঝে ফেল্লেন যে, এ মদ পান করে আছে তাই নিরব হয়ে ফেরৎ চলে এলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম*"।

সুধী পাঠকমন্ডলী! মিথ্যায় পরিপূর্ণ উক্ত রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই রেওয়ায়েত দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে **'সৈয়েদুশ শুহাদা হযরত হামজা'**-র প্রতি গালি দেয়া হয়েছে এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কারণ সৈয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামজা আহলে বাইতের মধ্য একজন গর্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কতবারই না হযরত আলী (আঃ) তাঁর কবিতার মধ্যে হযরত হামজার জন্য প্রশংসা করেছেন। সুতরাং বলেন ঃ "*হামজা হল শহীদদের সরদার এবং আমার চাচা*"। আবার রাসুল (সাঃ)ও তাঁর জন্য গর্ব বোধ করতেন এবং তিনি যখন শহীদ হলেন তখন রাসুল (সাঃ) তাঁর জন্য ক্রন্দন করেছিলেন এবং তাঁকে সৈয়্যেদুস শুহাদার উপাধীতে ভূষিত করেছেন।

রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামজা (রাঃ) হলেন সেই ব্যক্তি, যার দ্বারা আল্লাহ্ ইসলামকে তখন সমুন্নত করে ছিলেন যখন দূর্বল মুসলমানরা গোপনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো। নিজের ভাতিজার বিজয়ের জন্য কোরায়েশদের মোকাবেলায় উঠে দাড়ানো, এবং কোরায়েশদের বড় বড় বীর-বিক্রমদের সম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়ার ঘটনাটি অত্যান্ত বিখ্যাত। হযরত হামজা (রাঃ) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি হিজরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং নিজের ভাতিজার জন্য হিজরাতের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছিলেন।

হযরত হামজা (রাঃ) তাঁর ভাতিজা হযরত আলী (আঃ)-এর সাথে বদর ও ওহুদের যুদ্ধের বীর-বিক্রমদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। স্বয়ং বুখারী তার সহীহ্‌র **'কিতাব তাফসীরুল কোরআন'**-এর কাওলুহু **"হাযানে খাসমানিখ তাসেমুফি রাব্বিহিম"** অধ্যায়ে হযরত আলী (আঃ) হতে রেওয়ায়েত করছেন যে, তিনি বলেন ঃ "কিয়ামত দিবসে রহমানের সম্মুখে খুসুমতের (শত্রুতা/বিবাদ) জন্য আমি তর্ক-বিতর্ক করব"। কায়েস বলেন, "*উক্ত আয়াত তাঁরই শানে নাযিল হয়েছে। বদরে যুদ্ধকারীরা হলেন আলী, হামজা, ওবায়দা, শীবাহ্ ইবনে রবীয়াহ্, ওতবাহ্ ইবনে রবীয়াহ্ এবং ওয়ালীদ ইবনে ওতবাহ্*"।[১]

---

১ **সহীহ্ বুখারী**, খঃ ৫, পৃঃ ২৪২।

বিতর্ক করেছেন এবং বলেছেন যে, **'আমাদের প্রাণ আল্লাহ্‌র হাতে তিনি যদি চান তাহলে আমরা উঠে দাঁড়াব'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি চান তাহলে আমরা অবশ্যই নামাজ পড়ব।

হযরত আলী (আঃ) তো সেই ব্যক্তি যার ভালবাসা হল **'ঈমান'** এবং যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হল **'মুনাফেকী'**। আর হে বুখারী! আপনি তাঁকে তর্কবাজ বলছেন -এ কথা তো সরাসরি মিথ্যা, এ বিষয়ে কেউ আপনার পক্ষাবলম্বন করবে না, এমন কি স্বয়ং ইমাম আলী (আঃ)-এর হত্যাকারী ইবনে মুলজিমও। তাঁর কঠিনতম দুশমন মুয়াবিয়াও, যে মিম্বরের উপর থেকে তাঁর প্রতি **'লানত'** দেয়ার রীতি চালু করেছিল, সেও আপনার উক্ত কথাকে সমর্থন করবে না। এ কথা হল অত্যন্ত নীচ, হীন ও জঘন্যতম কথা। কিন্তু আপনি এ কথা দ্বারা অনেক উপার্জন করেছেন। আপনি আপনার যুগের ফাসেকদের, যারা আহলে বাইত (আঃ)-দের শত্রু ছিল, তাদের রাজি-খুশি করেছিলেন, যারা এই নশ্বর পৃথিবীতে আপনার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে আপনার যে ধারণা, তা'দ্বারা আপনি আপনার আল্লাহ্‌কে রাগান্বিত করেছেন। আমীরুল মু'মেনীন তো সেই ব্যক্তিত্ব যিনি হলেন (ক্বারামাল্লাহু ওয়াজহু) উজ্জ্বল ললাট ধারীদের সরদার, তিনিই হলে **'জান্নাত'** ও **'জাহান্নাম'** বন্টনকারী। তিনিই কিয়ামত দিবসে আ'রাফের উপর দন্ডায়মান হবেন এবং প্রত্যেককে তার ললাট দ্বারা চিনে নিবেন।

হিসকানী জানাফী তার **'শাওয়াহেদুত তান্জীল'**-এর ১ম খন্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই কাওল **'ওয়া আ'লাল আ'রাফে রিজালুই ইয়ারিফুনা কুল্লান বিসীমাহুম'** তফসীর এবং হাকিম হযরত আলী (আঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, "*কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকব, অতএব যারা আমাদের সাহায্য করেছে সেদিন তাদেরকে চিনে নিব*" এবং জাহান্নামকে বলব,"*ওরা হল তোমার আর এরা হল আমার*"। ইবনে হজর শাফেয়ী তার **'সোয়াকে মুহরিকা'**-র ১০১ পৃষ্ঠায় নবী (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন ঃ "*হে আলী! তুমি হলে জান্নাত ও জাহান্নাম বন্টনকারী এবং তুমি কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে বলবে যে, এরা হল আমার আর ওরা হল তোমার*"। ইবনে হাজর আরো যুক্ত করে বলেন যে, আবু বকর (রাঃ), আলী (আঃ)-কে বল্লেন, 'আমি রাসুল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, **"আলী লিখে না দেয়া পর্যন্ত সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা কারোর পক্ষে সম্ভবপর হবে না"**।

হে বুখারী! আমি জানি না যে, কিয়ামত দিবসে আপনার কিতাব কি আজকের এই আকারেই থাকবে যে আকারে এখন আছে এবং সুন্দর মলাট দ্বারা বাঁধাই করা?

তবে হ্যাঁ, বুখারী সাহেবের জন্য এটাই অনেক বড় কথা যে তিনি নিজের সৈয়দ ও সরদার উমর ইবনে খাত্তাবকে (রাঃ) পানি প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে **'তারিকুস সালাত'** তথা নামাজ বর্জনকারী বলে লিখে দিয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) তার উক্ত সিদ্ধান্তের উপরই নিজের খেলাফতকাল পর্যন্ত অটল ছিলেন এবং কোরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করে বলেন যে, **'মুজনাব অবস্থায় পানি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি নামাজ পড়ব না'**।

থেকেও মনগড়া কথা রচনা করে ফেল্ল। বুখারী পবিত্র আহলে বাইত (আঃ)-দের ফিকহ্ সম্পর্কে, তাঁদের জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে, তাঁদের ইবাদত-বান্দেগী ও তাকওয়াহ্ সম্পর্কে, কোন হাদীসই সংকলন করেন নি। অথচ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য হাদীস বেত্তা ও ইতিহাস বেত্তাদের কিতাবাদিতে **'আহলে বাইত'**-এর মর্যাদা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

এবার আসুন বুখারীর কাছ থেকে আর একটি রেওয়ায়েত শোনা যাক, যেখানে তিনি আহলে বাইত (আঃ)-এর উপর বিদ্রুপ করেছেন। বুখারীসহ অন্যান্য রাবীগণ হযরত আলীর (আঃ) মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি খুজে পেলেন না, আর না তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তেও মিথ্যার গন্ধ পেলেন, আর না গোনাহ বা ভূল-ভ্রান্তির কোন খোজ পেলেন। খোদা না খাস্তা এ ধরণের কোন বিষয় বস্তু যদি বুখারী পেয়ে যেতেন তাহ্লে তো তার অপপ্রচারের ঠেলায় আসমান জমিন একাকার করে ছেড়ে দিতেন। সেকারণেই বুখারী হযরত আলী (আঃ)-এর প্রতি এই অপবাদ চাপালেন যে, তিনি নামাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। (মায়াজাল্লাহ্)

বুখারী তার সহীহ্র ২য় খন্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় **'কিতাবুল কাসাওফ'**-এ **"তাহরিয়ুন্নবী আলা সালাতিল লাইলে ওয়া তারাকুন্নবী ফাতেমা ও আলীয়্যান আলায়হাস সালামু লাইলাতুস সালাত"** অধ্যায়ে লিখেছেন যে, আমাকে আবুল আইমান শোয়ায়েব যুহরী হতে খবর দিয়েছেন, তাকে আলী ইবনুল হুসাইন খবর দিয়েছেন, হুসাইন ইবনে আলীকে আলী ইবনে আবি তালিব খবর দিয়েছেন এবং তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ আলী ইবনে আবি তালিব বলেন যে, রাসুল (সাঃ) আমাকে এবং ফাতেমা বিনতে রাসুল (সাঃ)-কে রাতের বেলায় জাগালেন এবং বল্লেন, '*তোমরা কি নামজ পড়বে না*'? আমি বল্লাম, '*ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমাদের নফস আল্লাহ্র হাতে, তিনি যখন চাইবেন আমাদের জাগ্রত করবেন তখন আমরা উঠে দাঁড়াব*'। আমি যখন এই কথা বল্লাম তখন নবী (সাঃ) আমাকে কিছু না বলেই ফেরৎ চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, তিনি তাঁর জানুর উপর হাত মেরে বলছিলেন যে, **"মানুষ অতি তর্ক প্রিয়"**।

হে বুখারী! আল্লাহ্কে ভয় করুন! ইনি হলেন সেই আলী যার সম্পর্কে ইতিহাস বেত্তাগণ আমাদের বলেছেন যে, তিনি সিফফিন যুদ্ধে '***লাইলাতুল হারীকে***' রাত্রিকালীন নামাজ আদায় করলেন এবং সেই মুহূর্তে সৈন্যদের উভয় দলের মাঝে বল্লম চমকাচ্ছিল এবং চারি দিক থেকে তীরের বৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি মুসল্লা পেতে দিলেন কোন পরোওয়াই করলেন না এমন কি নামাযও ভঙ্গ করেন নি।

হযরত আলী (আঃ) তো সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের কাছে **'ক্বাযা'** ও **'ক্বদার'**-র (ভাগ্য/আল্লাহ্র ইচ্ছা)-এর অর্থ স্পষ্ট করেছেন এবং মানুষকেই তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু হে বুখারী সাহেব! উক্ত রেওয়ায়েতে আপনি তাঁকে একজন বিতর্ককারী বলে সাব্যস্ত করছেন, যে তিনি অযথাই রাসুল (সাঃ)-এর সাথে তর্ক-

(৩) প্রথম তিন **'খলিফা-এ-মুসলিমিন'**-দের ফজিলাতের জন্য মনগড়া ও মিথ্যা হাদীস সংকলন করেছে এবং হযরত আলী (আঃ)-এর উপরেও তাদের ফজিলাত দিয়েছেন। আর এটাই ছিল মুয়াবিয়ার মনবাসনা, সে তো চেয়েই ছিল যেন আলী (অঃ)-এর স্মরণ দুনিয়া থেকে মুছে যাক।

(৪) এমন সব হাদীস রেওয়ায়েত করলেন যার দ্বারা আহলে বাইত (আঃ)-এর মর্যাদা ও ভদ্রতার প্রতি আঘাত হানে।

(৫) এমন সব হাদীস সংকলন করলেন যেগুলি দ্বারা খেলাফতের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া মাযহাব এবং **'ক্বযা'** ও **'ক্বদার'**-র সমর্থন মিলে এবং নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য উমাইয়া ও আব্বাসীয়গণ সেগুলিকে মাযহাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

(৬) এমন সব মিথ্যা হাদীস রচনা করলেন যা কিস্সা-কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যশীল, যেন উম্মতকে এগুলোতেই মাতিয়ে রাখা যায়। এটি একটি জামায়াতেরই প্রপাগান্ডা যা বুখারীর সময় সামরিক শাসকদের ইচ্ছানুসারে ছিল।

সুধী পাঠকমন্ডলী! আপনাদের সম্মুখে উদাহরণ স্বারূপ আরো একটি রেওয়ায়েত উপস্থাপন করছি। বুখারী তার সহীহ্র **'কিতাব বাদাউল খলক'**-এর **"আইয়ামুল জাহেলিয়াত"** অধ্যায়ে ৪র্থ খন্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমাকে নাঈম ইবনে হামাদ এবং হুশায়ম, হাসীন হতে, তিনি আমরু ইবনে মায়মুন হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে তিনি বলেন যেঃ "*আমি জাহেলিয়াতে যুগে একটি স্ত্রী বাঁদরকে দেখলাম যার চারি পার্শ্বে বাঁদররা জড় হয়েছিল। উক্ত স্ত্রী বাঁদরটি জেনা করেছিল। অতঃপর সকল বাঁদর তার উপর পাথর নিক্ষেপ করল, তখন আমিও তাদের সাথে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম*"।

আমি বুখারী সাহেবকে বলতে চাই, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ পাক বাঁদরদের প্রতি রহম করে পাথর মারার সেই নির্দেশটি মানসুখ (রহিত) করে দিলেন, যা বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ইসলামের যুগে তাদের জন্য **'জেনা'**-কে **'মোবাহ'** ঘোষানা দিলেন, যদিও তা জাহেলিয়াতর যুগে **'হারাম'** ছিল। সে জন্যই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়াত ঘোষনা থেকে নিয়ে আজ অবধি আর কোন মুসলমানই এমন দাবী জানায় নি যে, **'বাঁদরদের কর্তৃক পাথর নিক্ষেপ করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম বা তাদের সাথে শরীক ছিলাম'**!!!

সুতরাং তিনি হাদীস রচনাকারীদের সন্ধান চালালেন এবং তারা তার ফরমাইশ মোতাবেক উক্ত হাদীস রচনা করে দিল যে, **'আলীর পক্ষে রাতের নামাজ পড়া কষ্টকর ছিল'**। আমরা যদি উক্ত হাদীসকে সত্য বলে মেনেও নি তাহলেও কোন সমস্যা নয়, আর না এর কারণে হযরত আলীর (আঃ) দ্বারা কোন গুনাহ সাব্যস্ত হবে। কেননা উক্ত নামাজটি হল **'নফল'** যা পড়লে সোয়াব না পড়লে কোন গুনাহ নাই। এর দ্বারা উমর (রাঃ) কর্তৃক **'ওয়াজিব'** নামাজ ছেড়ে দেয়ার বিষয়ের কোন তুলনা চলে না। সুতরাং রেওয়ায়েতটি সত্য নয় যদিও বুখারী তা সংকলন করেছেন।

আহলে সুন্নাতের নিকট বুখারী সহীহ্‌-শুদ্ধ। আহলে সুন্নাতগণ হলেন খলিফাদের 'মাসলাক' (অকীদা-বিশ্বাস) সমর্থনকারী এবং তার উপর ভিত্তি করেই বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয়দের রাজনীতি নির্ভশীল ছিল। সত্যসন্ধানীগণ এই সমস্ত সত্য থেকে অবগত আছেন। আজ কারোর কাছে গোপন নাই যে, আহলে সুন্নাতগণ ঐ সমস্ত শাসকদেরই আনুগত্য করে থাকেন যারা আহলে বাইত (আঃ) এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতার জন্য ইন্ধন জুগিয়েছেন এবং তারা নিজেদের অজান্তেই আহলে বাইত (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের শত্রুতে পরিনত হয়েছেন। কেননা তারা আহলে বাইত (আঃ)-দের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং আহলে বাইত (আঃ)-দের বন্ধুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। সে কারণেই তারা বুখারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। তাদের কাছে আহলে বাইত (আঃ)-দের কোন নিদের্শ পাওয়া যাবে না আর না তাঁদের ইমাম (আঃ)-গণের কোন বর্ণনা খুজে পাওয়া যাবে। এমনকি **'জ্ঞানের দ্বার'** হযরত আলী (আঃ), নবীর (সাঃ) সাথে যার এমন সম্পর্ক ছিল ঠিক যেমন মূসার (আঃ) সাথে হারুন (আঃ)-এর এবং নবী (সাঃ) তাঁর শিক্ষক ছিলেন -তাঁর বিষয়েও কোন কিছুই পাওয়া যাবে না।

এ স্থানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কাছে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, **"এমন কোন বিষয় আছে যেটাকে অন্যান্য মুহাদ্দেসীন ছাড়া একমাত্র বুখারীই প্রমান করেছেন, যাতে তোমাদের নিকট ফজিলাত পাবেন"**? আমার দৃষ্টিতে এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে ঃ

(১) যে সমস্ত হাদীস হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (রাঃ) এবং মুয়াবিয়ার মত সাহাবীদের বিরুদ্ধে যায়, তিনি সেই সমস্ত হাদীস সমূহে গোঁজা-মিল এবং কাঁট-ছাঁট করেছেন এবং এটাই হল সেই পথ যে পথের দাওয়াত মুয়াবিয়া এবং তার শাসকগোষ্ঠী দিয়েছিল।

(২) আর ঐ হাদীসগুলোকেই সত্য বলে প্রমানিত করেছেন যেগুলি দ্বারা রাসুল (সাঃ)-এর নিষ্পাপতা ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে। আর যেগুলি রাসুল (সাঃ)-কে একজন সাধারণ মানুষ বানিয়ে উপস্থাপন করেছেন যে, তাঁর দ্বারাও ভুল-ভ্রান্তি হত এবং তাঁর মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছিল (নাউজুবিল্লাহ্‌)। আর এটাই হল সেই বিষয় যা দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অতি পছন্দনীয় বিষয় ছিল।

এবং আবু হানিফার মধ্যে যদি কোন ইজতিহাদী বিষয়ে মতভেদ বা সংঘর্ষ দেখা দেয় তাহলে আবু হানিফার রায়কে উত্তম গণ্য করা ওয়াজিব'। কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, **'যেহেতু হাদীসে কিছু কিছু গরমিল পাওয়া যায়, সেগুলি যদি সত্য হয় তাহলে তো ফাব্বিহা (অতি উত্তম) আর যদি সেগুলির সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকে তাতেও কোন অসুবিধা নাই'**।

এভাবেই **'উম্মত-এ-ইসলামিয়া'** ধীরে ধীরে অহংকারের শিকার হয়ে গেল। তারা সব সময়ই হুকুমের গোলাম হয়ে থাকলেন, তাদের জীবন চলার পথ নির্বাচন করত পারস্য, মোঘল, তুর্কি, ফরাসী, ইংল্যান্ড এবং ইতালীয় রাজা-বাদশাহরা।

বর্ণনা করতে দোষ কোথায় যে, অধিকাংশ উলামারা শাসকদের আশ্রয়ে থাকতেন। ফতোয়া দিতেন এবং মাল গ্রহণ করতেন। মালের লোভে তোষামোদি, চাটুকারিতা করতেন। তারা সব সময়েই (সেই জামানার) রাজনীতি অনুসারে আমল করতেন। মতভেদ সৃষ্টি করে নিজেরা নিরাপদ থাকতেন। তারা কাউকেই ইজতিহাদের অনুমতি দেন নি আর না ইজতিহাদের দরজাকে উন্মুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন, যা শাসকগন হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই আহলে সুন্নাতের মাঝে ফিৎনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আহলে সুন্নাতদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং তারাই হুকুমাতের উপর কব্জা করে রেখেছিলেন। আর শিয়াগণ সংখ্যা লঘু ছিলেন এবং শিয়ারাই তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ ছিলেন তাই সে বিষয়েও তাদের চিন্তা ছিল। সুতরাং আহলে সুন্নাতের উলামাগণ রাজনৈতিক খেলায় মেতে থাকলেন এবং শিয়াদের কাফের সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের প্রতি আপত্তি উত্থাপনকারীর কাজে ব্যস্ত থাকলেন। আর সব দিক থেকেই তাঁদের দলা-দালির বিরোধিতা করতে থাকলেন এমন কি এ বিষয়ে হাজারো কিতাবাদিও লেখা হয়েছে এবং হাজারো নেককার মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো হয়েছে। অথচ তাঁদের কেবল এতটুকুই দোষ ছিল যে তাঁরা রাসুল (সাঃ)-এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং ঐ শাসকদের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করতেন যারা জোর-জবরদস্তী ভাবে উম্মতের ঘাড়ে সোয়ার হয়ে গিয়েছিল।

আবার আজকে আমরা যখন স্বাধীন ও আলোর যুগে জীবন যাপন করছি, যেমন আজকের যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বলা হচ্ছে এবং বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো অকাশ যুদ্ধে (তথা শুন্য অভিযানে) একে অপরকে অতিক্রম করার প্রতিযোগিতায় মেতে আছে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর কব্জা জমাতে চায় তখন এমন যুগেও যদি কোন আলেম বিদ্বেষ ও অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে এমন কিছু লিপিবদ্ধ করে যেখানে সামান্যতমও আহলে বায়াত (আঃ)-এর গন্ধ থাকে, তখন তাদের (আহলে সুন্নাতের) রক্ত গরম হয়ে যায় এবং সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে ঐ লেখকের প্রতি লানত করে এবং কাফের প্রমান করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। আর এমনটা তারা শুধু এ জন্যেই করেন যেহেতু উক্ত লেখনী দ্বারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তাই তেলে-বেগুণে জ্বলে ওঠেন। উক্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি যদি বুখারীর প্রশংসায় কিছু লিখতো তাহলে **'আল্লামা'** টাইটেল পেয়ে যেতন, তার প্রতি

আলোচনার সমাপ্তি

জিজ্ঞাসা করি যে, এখনো কি সত্য সন্ধানী এবং মুক্ত চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার আলেমগন সেই সমস্ত বাজে ও জঘন্য বিষয়াবলীর জন্য, যার উদাহরণ বুখারীতে প্রচুর পরিমানে মজুদ আছে, নিরব হয়ে বসে থাকবনে, কিছুই বলবেন না?

হয়তো কিছু লোক বলবেন যে, বুখারীকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে? অথচ অন্যান্য কিতাবাদিতেও তো অনেক দূর্বল হাদীস আছে, সেগুলির প্রতি কেন দোষারোপ করা হচ্ছে না? কথাটা স্পষ্ট, কিন্তু সেগুলির মধ্যে হতে কেবল বুখারীকে এ জন্য বেছে নেয়া হয়েছে যে, বুখারী নামক কিতাবটি এতোই বিখ্যাত ও প্রশংসিত হয়েছে যে, এর ব্যাপারে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করারও অবকাশ নাই। শুধু তাই নয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের কাছে এই গ্রন্থটি কোরআন সমতুল্য মর্যাদা রাখে, যার মধ্যে কোন দিক থেকে বাতিলের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর নয়। কেননা যা কিছু কোরআনে উল্লেখ আছে তার সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য, এতে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। বুখারীর পবিত্র ঝরনার উৎস হচ্ছে রাজা, বাদশা ও শাসকমন্ডলী, বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগ থেকে যখন বেশীরভাগ পদ-পদবীর উপর ইরানীরা কজা করে বসেছিল এবং হুকুমাতের প্রশাসনিক বিষয়ে কল-কাঠি নাড়ছিল। তাদের মধ্য হতে অনেকেই উজির এবং পরামর্শদাতা ছিল এবং কেউ কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ইলমে হায়াতের (জীবন দর্শন) বিশেষজ্ঞ ছিল। কবি আবু ফারাস তার কবিতায় যা বলেছেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপঃ

"হে বনু আব্বাস তোমরা হুকুমত ও খেলাফত পেয়ে গেছ বটে,
কিন্তু এমন দাবী করনা যে তা তোমাদের দখলে এবং ক্ষমতার আওতায় আছে।
বরং এর মালিক হচ্ছে আজমবাসীরা (অনারব)।
এ আবার কেমন গর্বের বিষয় যে,
খেলাফত ও হুকুমত তো তোমাদের ঘরে,
অথচ অন্যরা হচ্ছে তোমাদের শাসক"।

ইরানীরা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের প্রভাব ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাল। এমনকি কোরআনের পরপরই **'বুখারী'**-কে মর্যাদার দিক থেকে প্রথম স্থান দেয়া হল এবং **'আবু হানিফা'**-কে অন্যান্য তিন ইমামের উপর **'ইমাম-এ-আজম'** উপাধি দেয়া হল। আবার ইরানীদের যাদি আরববাসীদের পক্ষ থেকে কোন ভয় না থাকতো, তাহলে হয়তো তারা বুখারীকে কোরআনেরও উপরে স্থান দিয়ে দিত। আমি তাদের এমন ধরনের কয়েকটি চিন্তা-ধারণার কথা অধ্যয়ন করেছি। তাদের মধ্যেকার অনেকেই স্পষ্ট ভাষায় বলতো যে, **'হাদীস হল কোরআনের উপর হুকুম চালানো জন্য'**, আর হাদীস বলতেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল **'বুখারী'**-কে বুঝানো। যেমনটি তারা বলে থাকেন যে, **'নবী (সাঃ)**

সে কারণেই প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনদের বলি যে, শয়তানের উপর লানত করুন এবং নিজের উপর তাকে চেপে বসতে দিবেন না। সেই সমস্ত জ্ঞান-গর্ব আলোচনার প্রতি মনোনিবেশ করুন যেগুলিকে কোরআন ও হাদীস প্রমান করেছে। উক্ত কলেমার দিকে ধাবিত হোন যা আমাদের এবং আপনাদের মাঝে সমান। সেই বিষয়াবলী দ্বারা হুজ্জাত কায়েম করুন যা আমাদের ও আপনাদের কাছে সহীহ্‌-শুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত। আর যেগুলি বিরোধ সৃষ্টির কারণ হয় সেগুলিকে ছুড়ে ফেলে দাও। রাসুল (সাঃ) কি বলেন নি যে, **'আমার উম্মত ভুলের উপর জমা (একত্রিত) হবে না"**? সুতরাং সত্য তো তাই যার উপর শিয়া-সুন্নি উভয়েই ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন। আর যেগুলিতে বিরোধ মনে করেন সেগুলি মিথ্যা (বাতিল)। আমরা যদি সঠিক পথে চলি তাহলে নিশ্চিত রূপে শান্তি ও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হবেই হবে এবং অবশ্যই আমরা একটি সংঘবদ্ধ চাদরের নীচে জমা হতে পারব। এবং নিশ্চিত রূপে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং জমিন ও আসমান সমূহের বরকত আ'ম (সাধারণ) হয়ে যাবে। সময় চলে যাচ্ছে যা আর ফেরৎ আসবে না। উক্ত দিনের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষার পালা আছে, যে দিনে ক্রয়-বিক্রয়ের ও বাহানাবাজির সুযোগ থাকবে না এবং **শিয়া-সুন্নি আমরা সকলেই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অপেক্ষায় আছি। তাঁর 'বাশারাত' বা আবির্ভাবের সংবাদ সম্পর্কে আমাদের কিতাবাদি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একই পথের পথিক হওয়ার জন্য এ কথাটাই আমাদের জন্য দলিল হিসাবে যথেষ্ট নয় কি?** শিয়ারা তোমাদেরই ভাই এবং আহলে বাইত (আঃ)-গণ হলেন তাদের ধন ভান্ডার। বরং মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর আহলে বাইত (আঃ) হলেন সকল মুসলমানদের ইমাম (নেতা) ও রাহ্‌বর (পথ প্রদর্শক)। নিশ্চয়ই শিয়া-সুন্নি আমাদের সকলেরই **'হাদীসে সাকালাইন'**-এর প্রতি ঐক্যমত আছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি অতি ভারি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাক তাহলে কখনোই গোমরাহ হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার ইতরাত (বংশধর)"**।

পূর্বের আলোচনাগুলিতে আমি এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, ঐ হাদীসটি এই হাদীসের বিপরীত নয়, যেখানে 'কিতাব ও সুন্নাতি'র কথা উল্লেখ হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাত দুটোই হল সামেত (নিরব) সেগুলির জন্য বক্তা থাকা অপরিহার্য। সেহেতু রাসুল (সাঃ) আমাদের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, কোরআন ও সুন্নাতের বয়ানকারী হলেন **'আইম্মায়ে আহলে বাইত'** তথা আহলে বাইতের ইমামগণ। যাদের সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যমত আছে যে, তাঁরা ইলম্‌ ও আমলের দিক থেকে সবার উপরে অবস্থান করছেন। আর **ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হলেন তাঁরই তথা রাসুল (সাঃ)-এর ইতরাত (বংশধর), আর এ কথাটি কি দ্বিতীয় দলিল নয়?**

আবার আজ যখন গোমরাহি ও যুলুম অত্যাচারের সেই যুগ শেষ হয়েগেছে যেখানে রাসুল (সাঃ)-এর আহলে বাইতের চাইতে অধিক কারোর প্রতি অত্যাচার হয় নি।

সোনা-রুপার বৃষ্টি বর্ষন হত, চারিদিক থেকে প্রশংসা পেতেন। আর এমন চরিত্রের সব লোক তার সংস্পর্শে এসে যেত যাদের তোষামোদী ও খারাপ কাজের জন্য তাদের নামাজ-রোযাও বাধা দিতে পারে না।

আপনারা সেই সমস্ত ভ্রান্তিকর বিষয়াবলীর প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টিপাত করেছেন, যা বেশির ভাগ মানুষের গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট। ঐ কারণগুলির ব্যাপারে কখনো কি চিন্তা-ভাবনা করেছেন যা অধিকাংশ মানুষকেই গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? কোরআনুল করীম উক্ত গোপন রহস্যকে সেই কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়েছে যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও ইবলিশ মালাউনের মাঝে হয়েছিল ঃ .

আল্লাহ্ ঃ আমার নির্দেশের পরেও তোকে কোন জিনিস সিজদা করা থেকে বিরত রাখল?

ইবলিশ ঃ আমি এ আদম থেকে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে মাটি দ্বারা?

আল্লাহ্ ঃ বেহেশ্ত হতে বেরিয়ে যাও। এখানে থাকতে গেলে তোর অহংকার করার অধিকার নাই। তুই নীচু শ্রেণীদের দলভুক্ত।

ইবলিশ ঃ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হোক।

আল্লাহ্ ঃ তুই অপেক্ষাকারীদের দলভুক্ত হলে।

ইবলিশ ঃ যেভাবে তুমি আমাকে গোমরাহ করেছেন, আমিও তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবো। তাদের চারি দিক থেকে ঘিরে ফেলবো, তখন তুমি তাদের মধ্য থেকে অধিকংশকেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ রূপে পাবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যেঃ **“হে আদম সন্তান! খবরদার, শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোকা না দেয়, যেমনটি সে তোমাদের মাতা-পিতাকে জান্নাত থেকে বাহির করিয়েছে এবং তাদের পরিধান খুলে পড়ে যায় তখন তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি এবং তার সন্তানেরা তোমাদের দেখতে পান কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। আমরা শয়তানকে ঐ সমস্ত লোকের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা ঈমান গ্রহণ করে না। আর এ সমস্ত লোকেরা যখনই কোন খারাপ কাজ করে তখন বলে যে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এভাবেই পেয়েছি এবং আল্লাহ্ পাকই এটার হুকুম দিয়েছেন। (হে রাসুল) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্ মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি সেই সমস্ত কথাকে আরোপ কর, যেগুলিকে তোমরা জানো না। (হে রাসুল) বলে দিন যে, আমার প্রতিপালক ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা নিজের চেহারা সোজা রাখ এবং আল্লাহ্কে খালেছ দ্বীনের সাথে ডাকো। তিনি যেভাবে তোমাদের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন সেভাবেই তার দিকে ফিরে যাবে। তিনি একটি দলকে হেদায়েদ দান করেছেন এবং একটির উপর গোমরাহী চাপিয়ে দিয়েছন, তারা শয়তানকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ্র দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধারণা পোষণ করছে যে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত”।**

নিঃসন্দেহে তার সবগুলিই হচ্ছে আহলে বাইতের জন্য।

যামাখশারী, বয়হাকী এবং ক্বাস্তলানীগণ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আনছারী শাতির নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ নকল করেছেন ঃ

আমি আ'দী ও তামীম গোত্রের আলোচনা খারাপ দৃষ্টি কোণ থেকে করি না।
কিন্তু আমি হলাম বনী হাশিমের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী।
আমি আলী এবং তাঁর শিয়াদের প্রতি ভালবাসার বিষয়ে কোন কথার পরোওয়াহ্ করি না।
কেননা আল্লাহ্‌র বিষয়ে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোওয়াহ্ করা উচিৎ নয়।

লোকেরা বলে যে আনছারের কি হয়েছে যে
সে আলী ও তাঁর দলের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।
আমি কেন তাঁদেরকে ভালবাসব না,
যখন আরব ও আজমের সমস্ত বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মানুষ তাঁদেরকে ভালবাসে।

আমি তাদেরকে এই কথা বলি যে,
তাঁদের ভালবাসাকে আমি সমগ্র সৃষ্টির অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করি
এমনকি চতুষ্পদরাও তাঁদেরকে ভালবাসে।

কিছু কিছু খ্রীষ্টানগণও বিশেষ করে আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর ফাযায়েল (মর্যাদা) এবং মানাক্বিব (প্রশংসা) এবং সাধারণভাবে আহলে বাইত (আঃ)-দের মর্যাদা এবং প্রশংসা বিষয়ে অসংখ্য কিতাবাদি লিখেছেন। যেমনটি ইমাম শাতী এই কথার প্রতি এভাবে ইংগিত করেছেন যে,

"নাসারার কি হয়েছে যে সে আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।
এটি এমনই তাজ্জবের বিষয় যা ধাধা হযে থাকবে।
অন্যথায় কেমন করে সম্ভব যে খ্রীষ্টান আহলে বাইত (আঃ)-দের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করবে
অথচ ইসলাম গ্রহণ করবে না?
কিন্তু আল্লাহ্ পাক যখন আমাদের শক্তি সামর্থ দিবেন তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।
অতঃপর ইচ্ছায় বা ভয়ের কারণে এর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারবে না"।

"কাশাফুল গাম্মাহ্"-এর লেখক ২০তম পৃষ্ঠায় আমীরুল মুমেনীন আলী (আঃ)-এর প্রশংসায় কোন একজন খ্রীষ্টানের নিম্নোক্ত কাওলকে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

আলী হলেন আমীরুল মুমেনীন,
আযীমাতের (সংকল্পের/মোহমন্ত্রের) অধিকারী এবং বীর।
তাঁর ব্যতীত আর কাউকেই খেলাফতের লোভ করা উচিৎ নয়।
হাসাব ও নাসাবে (বংশ ও বর্ণের দিক থেকে) সবার উপরে তাঁর অবস্থান।
তিনি হলেন সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী এবং তাঁর ফাযায়েলে সবার ইজমা আছে।

এমনকি লোকেরা **'মিম্বর-এ-রসুল'**-এর উপর থেকে তাঁদের প্রতি লানত করেছে, তাঁদের হত্যা করেছে, তাঁদের মহিলাদের প্রকাশ্য দরবারে জনসাধারণের সামনে বেপরদা করেছে।

এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যাতে করে আমরা নবীর (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ)-দের উপর থেকে জুলুম ও অত্যাচারকে দূরে ঠেলে দেই এবং সমগ্র উম্মত তাঁদের রহম ও নেয়ামতের ছায়া তলে সংঘবদ্ধ হয়ে যাই। যাঁরা জ্ঞান-গরিমায় এবং আমল-আখলাকে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁদের সেই বৃক্ষের গভীর ছায়ার দিকে অগ্রসর হই যেখানে মেহেরবানি, দয়া ও করুনার ছড়া-ছড়ি। আম্বিয়া ও ফেরেস্তারা তাঁদের প্রতি দরূদ পাঠ করেন এবং মুসলমানদের প্রত্যেক নামাজে তাঁদের প্রতি দরূদ পাঠ করার এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আঃ)-দের ফযিলাতকে কোন মুসলমানরা অস্বীকার করতে পারবে না। তাঁদের বিষয়ে প্রত্যেক যুগের কবিরা পর্যন্ত তাঁদের ফজিলাত সম্বন্ধে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আরবের বিখ্যাত **কবি ফারাযদাক** বলেছেন ঃ

যদি আহলে তাকওয়ার সন্ধান করা হয়
তাহলে তাদের ইমামগণকেই আহলে তাকওয়া রূপে পাওয়া যাবে।
আবার যদি এই কথা বলা হয় যে, 'এই জমিনের বুকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কারা'
তখনও বলা হবে যে তাঁরাই হলেন সর্বোত্তম।
তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করাই হল 'দ্বীন'
এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করাই হল 'কুফুর'।
তাঁদের নৈকট্যই হল আশ্রয়স্থল এবং নিরাপদ ঠিকানা।
আল্লাহ্‌র যিকিরের পরে তাদেরই যিকির হচ্ছে মুকাদ্দম (প্রধান/উর্ধতন)।
কালামের শুরু ও শেষ তাঁরাই।

আর বিখ্যাত কবি আবু ফারাস, তার বিখ্যাত **'কাসিদায়ে শাফিয়াহ্'**-তে তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং আব্বাসীয়দের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করেছেন। আমি তার নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছটি নির্বাচন করেছি ঃ

হে মদ বিক্রেতাগণ!
তাদের প্রতি অহংকার করনা যারা যুদ্ধের দিনে রক্ত বিক্রি করে।
সম্মান তো একমাত্র উলামা ও আমলকারীদেরই হক বা প্রাপ্য।
তারা যদি রাগান্বিত হোন তাহলে গায়রুল্লাহর জন্য নয়,
আবার যখন কোন নির্দেশ দেন তখন আল্লাহ্‌র হুকুমকে নষ্ট করেন না।
সকাল বেলায় তাঁদের গৃহ থেকে তিলাওয়াতের শব্দ ভেসে আসে।
অথচ তোমাদের গৃহ থেকে গান-বাজনার শব্দ ভেসে আসে।
জমজম ও সাফা, রুকন ও খানা (কা'বা) এবং পরদা,
এ সব কিছুই হচ্ছে তাঁদের মঞ্জিল।
কোরআনের মধ্যে যতগুলি কসম বর্ণিত হয়েছে,

সূচি পত্র

লেখকের কথা/৫

আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের মারজা জনাব আবুল হাসান নাদভী সাহেবের প্রতি খোলা চিঠি/১০

জিজ্ঞসা করে নাও/২০

প্রথম অধ্যায়

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে

আল্লাহ্র চেহারা এবং তাঁর মুজাস্সাম (দেহাবয়ব) হওয়া সম্পর্কে/২৩

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আদ্লে ইলাহী (আল্লাহ্র ইনসাফ) ও জবর (বাদ্ধবাধকতা) সম্পর্কে/২৭

আল্লাহ্র প্রতি আহলে যিকিরের ধারণা/৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে

রাসূল (সাঃ)-এর (ইস্মাত) নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে তৃতীয় প্রশ্ন/৪০
রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে মানহানীকর হাদীস/৬১
রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে আহলে যিকিরের ধারণা/৭০

তৃতীয় অধ্যায়

আহলে বাইত (আঃ) সম্পর্কে

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ

আহলে বাইত (আঃ) কারা?/৭২
রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)/৭৬
হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধে/৮২
রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আয়েশা (রাঃ)/৯৬
হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশার (রাঃ) আচরণ/১০০
নিজেদের গৃহে অবস্থান কর .../১০৩
কমান্ডার রূপে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)/১০৬
রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তার ফেতনা হতে সাবধান করেছেন/১০৮
আলোচনার সমাপ্তি/১১১
আহলে বাইত (আঃ)-এর মহত্ব সম্পর্কে আহলে যিকিরের দৃষ্টিভঙ্গী/১১২

আমি যদি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন কোন ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে আমি শিয়া মুসলমান হয়ে যাব।

অতএব, মুসলমানদের উচিৎ, রাসুল (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ)-গণের প্রতি সর্বোত্তম ভালবাসা পোষণ করা, কেননা রিসালতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান তাঁদের ভালবাসার মধ্যেই নিহিত আছে বা তাঁদের ভালবাসার উপরই নির্ভশীল।

অদূর্ভবিষ্যতে আমার ডাক, শ্রবণকারীর কর্ণ, প্রশস্ত কলব (অন্তর) এবং দর্শণকারী চক্ষু পর্যন্ত অবশ্যই অবশ্যই পৌছাবে, যার বদৌলতে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে ভাগ্যবান হয়ে যাব। আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করছি যেন আমার আমলকে খালিস ঘোষণা দেন এবং কবুল করে নেন। আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন, আর আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর খেদমতকারী বানিয়ে দিন। কেননা তাঁদের খেদমত করাতেই সর্ব বৃহৎ সফলতা নিহিত আছে। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালকের পথ হল সরল সোজা।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন
ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা মুহাম্মদিউঁ
ওয়া আলিহিত তৈয়্যিবীনাত ত্বাহিরীন

- মুহাম্মদ তিজানী আস-সামাভী

রাসুল (সাঃ) আর লজ্জা/২৭৪
রাসুল (সাঃ) আর উলঙ্গপনা/২৭৫
রাসুল (সাঃ) দ্বারা নামাজে ভুল হয়/২৭৬
রাসুল (সাঃ) আর ওয়াদা ভঙ্গ/২৭৭
কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) ৪০ জন গোলাম মুক্ত করেন/২৭৮
রাসুল (সাঃ) আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের মধ্যে নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন করতেন/২৮০
রাসুল (সাঃ) শিশু সুলভ আচরণ করেন এবং যে ব্যক্তি সাজা পাওয়ার যোগ্য নয় তাকেই সাজা দেন (মায়াজাল্লাহ্‌)/২৮৪
রাসুল (সাঃ) কোরআনের কিছু কিছু আয়াতকে শেষ করে দিয়েছেন/২৮৫
রাসুল (সাঃ)-এর কথা-বার্তায় বিভ্রান্তি/২৯২
রাসুল (সাঃ)-এর ফাযায়েলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি/২৯৫
রাসুল (সাঃ) ইল্‌ম (জ্ঞান) ও তিব (চিকিৎসা)-এর মধ্যে ত্রুটি বা গরমিল করেছেন/৩০০

অষ্টম অধ্যায়

বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে/৩০৫
বুখারী ও মুসলিম আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর ফজিলাত বয়ান করেছেন/৩০৯
হযরত উমরের (রাঃ) ইজ্জত রক্ষা করার জন্য বুখারী হাদীসের মধ্যে তাদলিস (গরমিল) করেছেন/৩১৬
হযরত উমরের (রাঃ) হাকীকত ফাঁস হয়ে যাওয়া হাদীস সমূহে কাট-ছাঁট/৩১৬
যে সমস্ত বর্ননা দ্বারা আহলে বাইত (আঃ)-গণের মর্যাদাহানী হয়েছে সেগুলি বুখারীর কাছে খুবই প্রিয়/৩২৯

আলোচনার সমাপ্তি

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সাহাবাদের সম্পর্কে/১১৭
পবিত্র কোরআন কিছু কিছু সাহাবার হাকিকাত প্রকাশ করেছে/১২৪
রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস কিছু কিছু সাহাবার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছে/১২৯
সাহাবা এবং রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য/১৪৫
রাসুল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবারা তাঁর সুন্নাতকে রদ-বদল করেছেন/১৫৫
আবু যার গিফারীর (রাঃ) দৃষ্টিতে সাহাবা/১৫৮
বিভিন্ন সাহাবা সম্পর্কে ইতিহাসের স্বাক্ষ্য/১৬০
বিভিন্ন সাহাবা সম্পর্কে আহলে যিকিরের ধারণা/১৭০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম তিন খলিফা-এ-মুসলেমিন সংক্রান্ত/১৭৮
হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়/১৮১
রাসুল (সাঃ) ওফাতের পরে ফাতিমা (সাঃআঃ)-এ সাথে আবু বকরের (রাঃ) ব্যবহার ও আচরণ/১৮৭
কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক ফাতিমা (সাঃআঃ) হচ্ছেন মাসুম/১৯১
হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) সমগ্র জগতের মহিলাদের সম্রাজ্ঞী/১৯১
হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ) বেহেশতে নারীদের সম্রাজ্ঞী/১৯২
হযরত ফাতিমা (সাঃআঃ), রাসুল (সাঃ)-এর টুকরা, তিনি অসন্তুষ্ট হলে রাসুল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হতেন/১৯৩
হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলমানদের হত্যা করেছেন/১৯৯
আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন/২০৫
হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হাদীস সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন/২০৯
হযরত আবু বকরকে (রাঃ) খলিফা বনিয়ে আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ)এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে/২১৭
হযরত উমর (রাঃ) নিজ 'ইজতিহাদ' দ্বারা কোরআনের বিরোধিতা করেছেন/২২৬
শারয়ী হুকুম-আহ্কাম ও সিদ্ধান্ত সমূহের বিরুদ্ধে উসমানও (রাঃ) তাঁর পূর্ববর্তী দুই বন্ধুকেই অনুসরণ করেছিলেন/২৩৯
হযরত উসমানের (রাঃ) কাছে ফেরেশ্তারাও লজ্জা পান/২৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

খেলাফত সম্পর্কে/২৪৬
প্রশ্ন ও উত্তর/২৪৯

সপ্তম অধ্যায়

হাদীস সম্পর্কে/২৬৭
রাসুল (সাঃ) ধোকা দিয়েছেন (মায়াজাল্লাহ্)/২৬৮
রাসুল (সাঃ) কঠিন শাস্তি প্রদান করেন এবং মুসলমানদের হাত-পা কর্তন করে ফেলেন/২৬৮
রাসুল (সাঃ) সহবাসে আসক্ত ছিলেন (মায়াজাল্লাহ্)/২৭০
উমাইয়াদের আমলে নাচ-গানকে জায়েজ করার বিষয়ে কিছু উদাহরণ/২৭২
রাসুল (সাঃ) নাবীজ পান করতেন (মায়াজাল্লাহ্)/২৭৩
রাসুল (সাঃ) আর ইবতিযাল (হীনতা/নীচতা)/২৭৪

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com

ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী

ডঃ মুহাম্মদ তিজানী সামাভী তিউনেশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর কাফসে-তে ১৯৩৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত ধর্মানুরাগী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখান থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক কলেজে অধ্যয়ন করে প্রকৌশল ডিগ্রী অর্জন করেন।

শৈশবকাল থেকেই ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অধিক ঝোঁক-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় জ্ঞান, পান্ডিত্য ও খোদাভীতির কারণে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন এবং অল্প বয়সেই শহরের মসজিদের ইমাম হয়েছিলেন। এমন কি তিনি 'তাফসির' ও 'ফেকাহ্' সম্পর্কেও পাঠদান করতেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মিশর, ইরাক ও সৌদিআরব ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণ ও জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে তিনি শিয়া মায্হাবের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে শিয়া মতাবলম্বী বলে ঘোষনা দেন। অবশেষে তিউনেশিয়া সরকারের অত্যাচারের ফলে দেশ ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে নিজ পরিবারের সাথে বসবাস করছেন। তিনি প্যারিসের সুরবান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের পর বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

ইতিপূর্বে **'অবশেষে আমি সত্য পেলাম'** এবং **'আমিও সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে গেলাম'** নামে তাঁর বহুল প্রচলিত দু'টি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

হাউজা-এ-ইলমিয়া সাহেবুজ্জামান
খালিশপুর, খুলনা।

https://ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com